সমাজবিদ্যার রূপরেখা

পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়
জ্যোতিভূষণ চাকী

দীপঙ্কর সেনগুপ্ত

উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর অবশ্যপাঠ্য।
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ নির্ধারিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী লিখিত।

সমাজবিদ্যার রূপরেখা

[HIGHER SECONDARY SOCIAL STUDIES]

(১ম ও ২য় খণ্ড)

অধ্যাপক **পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়**, এম. এ., বি.টি., এম. এ. (শিক্ষাতত্ত্ব)
রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন পোস্ট-গ্রাজুয়েট বেসিক ট্রেনিং কলেজের সমাজবিদ্যার অধ্যাপক ; ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ আয়োজিত সমাজবিদ্যা-শিক্ষণ-সেমিনারের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ; পূর্বে জগদ্বন্ধু ইনষ্টিটিউশনের সমাজবিদ্যার শিক্ষক ; ভারত সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগের গবেষণাবৃত্তি-প্রাপ্ত ; 'সমাজ পরিচয় গ্রন্থের সহ-প্রণেতা

ও

জ্যোতিভূষণ চাকী, বি এ. (অনার্স), কাব্যতীর্থ
বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনষ্টিটিউশনের সমাজবিদ্যার শিক্ষক, মডার্ণ স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক ; 'পায়ে পায়ে এত দূর' ও 'সংস্কৃত মধুভাণ্ডম্' গ্রন্থের প্রণেতা, 'সমাজ পরিচয়' ও 'ট্যামকুড়্কুড়্' গ্রন্থের সহ-প্রণেতা
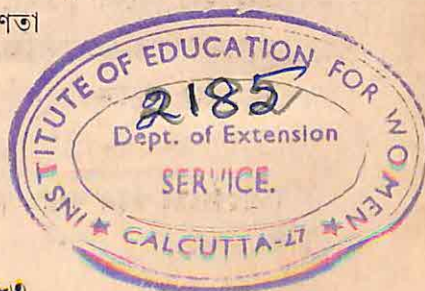
ফোন : ৩৪-৫৫৮৩

গ্রন্থধাম

এ ২, ২-এ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

প্রকাশন

শ্রীহেলেনা দত্ত, বি. এ., বি. টি.

এ ২, ২-এ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

চিত্রণ

শ্রীরবীন নাথ

শ্রীদীপঙ্কর সেনগুপ্ত

শ্রীবিভূতি দাস

মুদ্রণ

শ্রীসুরেশ চন্দ্র দত্ত

সুমুদ্রণ

১০৪ অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা-৯

জানুয়ারী, ১৯৬৫

প্রাপ্তিস্থান

গ্রন্থধাম

এ-২, ২-এ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

বর্ধমান পেপার এণ্ড বুক ডিপো

বড়বাজার, বর্ধমান

মূল্য : ছয় টাকা

সমাজবিদ্যা পড়ানো প্রসঙ্গে

আধুনিক যুগে ব্যক্তির জীবনে ও মনে সমাজের নানা টানাপোড়েনের এত জটিল প্রবাহ এসে পড়েছে যে সমাজ-পরিবেশ বাদ দিয়ে ঘরের নিভৃত কোণে আত্মমগ্ন হয়ে বাঁচার আর উপায় নেই! এই সামাজিক মানুষ গড়ার কাজে আমাদের বিদ্যালয়গুলোকেই শ্রেষ্ঠ কর্মকেন্দ্র বলে মনে করি। আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহ্য, দেশপ্রেম ও নাগরিকতাবোধ সম্পর্কে একটা সামগ্রিক জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্যই অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন। এ প্রয়োজন সুসিদ্ধ করতে পারে সমাজবিদ্যা। সমাজবিদ্যা অধ্যাপনার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে শিক্ষার্থীকে সমাজ-সচেতন করে তোলা, 'সামাজিক মানুষ' রূপে গড়ে তোলা।

বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার কয়েকজন শিক্ষক-বন্ধুর প্রেরণাতেই আমরা এ গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়েছি। এ ছাড়া স্নেহাস্পদ ছাত্র ছাত্রীদের অনুরোধ তো আছেই। 'পশ্চিমবঙ্গ সমাজবিদ্যা শিক্ষক সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকার ফলে শহর ও মফঃস্বলে বহু শিক্ষক শিক্ষিকার অভাব-অসুবিধের কথা কানে এসেছে। ভারত সরকারের 'অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর সেকেণ্ডারী এডুকেশন'-এর উদ্যোগে বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্রে আহূত কয়েকটি সেমিনার বা শিক্ষণ শিবিরের সঙ্গে জড়িত থাকার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ওহায়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ অ্যালান গ্রিফিন এবং নিউ ইয়র্কের রচেষ্টারের মন্‌রো হাই স্কুলের মিঃ ম্যাথু ভ্যান-অর্ডার—এ দু'জন বিশেষজ্ঞের নিকট আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। সমাজবিদ্যা পঠন পাঠনার প্রকৃত স্বরূপটি এ সমস্ত শিক্ষণচক্রে বিস্তারিত ভাবেই আলোচিত হয়েছে। সমাজ বিদ্যার উদ্দেশ্য এই নয় যে শিক্ষার্থীরা কতগুলো বিষয় অন্ধের মতো মুখস্থ করে একটা পাব্লিক এগ্‌জামিনেশনের জন্য প্রস্তুত হবে। আমাদের চারপাশের বিভিন্ন মানুষের জীবনযাত্রা কিরকম, ব্যক্তিগত নানান্ সমস্যার উত্তর কোথায় মিলবে, সমাজের নানা ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে কিভাবে নিজস্ব মৌলিক অভিমত গড়ে তুলতে হয়—এ সমস্তই শেখায় সমাজবিদ্যা।

এ জন্যই সমাজবিদ্যার **পাঠদান কালে** পাঠসূচী থেকে যে কোন একটি বিষয় নির্বাচিত করে সে প্রসঙ্গে একটি '**ইউনিট** তৈরি করতে হবে। এই ইউনিটকে কয়েকটি 'উপ-ইউনিটে বিভক্তকরে তার এক একটি নিয়ে

বিভিন্ন দল কাজ আরম্ভ করবে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষককেই পূর্বাহ্ণে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। পরিকল্পনার পিছনে লক্ষ্য থাকবে দুটি : এক, পাঠের বিষয়টি সম্বন্ধে শিক্ষক কিভাবে ছাত্রদের পরিচালিত করবেন ; দুই, সে-বিষয়টি সম্পর্কে ছাত্ররা প্রত্যক্ষভাবে কতখানি জড়িত। **পরিকল্পনার খসড়াটি** এইরকম হতে পারে :—

১। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক-ছাত্র সহযোগীতায় সমস্যামূলক কয়েকটি **প্রশ্ন উত্থাপন** করে পঠনীয় বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করা।

২। **কর্মোদ্যোগ** (এগুলো 'উদ্দেশ্যমূলক' হওয়া চাই)—

(ক জ্ঞানমুখী কাজ, অর্থাৎ বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে জ্ঞানের পরিধি বাড়ানো।

(খ) অভিজ্ঞতামুখী কাজ, যথা—সমাজ অনুসন্ধান বা সার্ভে শিক্ষামূলক ভ্রমণ, ফিল্ম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ইত্যাদি।

(গ) পরিবেশনমুখী কাজ, যেমন—বিতর্ক সভা, অভিনয় ও প্রদর্শনীর আয়োজন, ছবি-নক্শা-মানচিত্র মডেল প্রস্তুত করা, ইত্যাদি।

৩। কতিপয় **ভাববস্তু বা সাধারণ তত্ত্ব উপলব্ধিতে** ছাত্রদের সহায়তা করা।

এ ধরণের পরিকল্পনার কিছু নমুনা আমাদের বইয়ে সন্নিবেশিত হবে। একটা কথা মনে রাখা দরকার, পাঠ্যসূচীর প্রত্যেকটি বিষয়ই এরকম ইউনিট পরিকল্পনার মাধ্যমে পড়ানো এত স্বল্প সময়ে কুলিয়ে উঠবে না। কাজেই কোন কোন বিষয় সাধারণ বক্তৃতা পদ্ধতি, আলোচনা পদ্ধতি, অথবা গ্রন্থাগার পাঠ পদ্ধতির মাধ্যমেই সারতে হবে। তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

সমাজের নানান্ সমস্যা অনুধাবনে **বিচারধর্মী চিন্তার** (critical thinking) উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই রচিত হয়েছে 'সমাজবিদ্যার রূপরেখা'। পুঁথিগত শিক্ষার মাধ্যমে কেবল বিষয় জ্ঞানের যাচাই করলে সমাজবিদ্যার মূলেই কুঠারাঘাত করা হবে। তাই প্রত্যেক পরিচ্ছেদের উপসংহারে **অনুশীলনী**গুলি এমনভাবে বিন্যস্ত করতে চেয়েছি যাতে শিক্ষার্থীরা নূতন চিন্তা ও কাজে উদ্যোগী হয়। অনুশীলনীতে সন্নিবেশিত প্রশ্নাবলীর উত্তর সবটাই আমাদের আলোচনার মধ্যে পাওয়া যাবে না ; তার জন্য আরও পড়তে হবে, কাজ করতে হবে আরও। **দলগত কর্মোদ্যোগ** (Group activity) সম্পর্কে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এই যে কম সময়ে অনেকখানি কাজ হয়, আর ছেলেমেয়েরা আনন্দও পায় প্রচুর। অনেক শিক্ষার্থীকেই একটি করে **ব্যবহারিক সংকলন** (Practical

Note Book) প্রস্তুত করতে হবে—এ সংকলনখানির কাজের জন্য আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় কিছু নম্বরও (ধরুন ১০%) থাকবে। দলগত কর্মোদ্যোগের নজির হিসেবে ছাত্ররা যে আলাদা আলাদা বিবরণী পেশ করবে তারও গুণাগুণের ভিত্তিতে পরীক্ষায় (ধরুন ১০%) নম্বর ধরে দেওয়া হবে। বিদ্যালয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে শুধু বিচারমূলক প্রশ্নই থাকবে না, কিছু (ধরুন ২০% নম্বরের) Objective প্রশ্নও থাকা বাঞ্ছনীয়। এ বইয়ে তাই এ ধরণের প্রশ্নাবলী কিছু থাকবে।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ সমাজবিদ্যার পাঠসূচীকে তিনটি পর্বে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্ব: Living in Communities. দ্বিতীয় পর্ব: Indian Culture and Contacts with the World. তৃতীয়: পর্ব Citizenship and Government. সাধারণ নির্দেশ আছে এই যে, প্রথম পর্ব পড়ানো হবে নবম শ্রেণীতে, তৃতীয় পর্ব দশম শ্রেণীতে, এবং দ্বিতীয় পর্ব পড়ানো হবে উভয় শ্রেণীতে ভাগ করে নিয়ে। তবে এটা যে মেনে চলতেই হবে, এমন কোন্ বাঁধাবাঁধি নেই। শিক্ষকগণ প্রয়োজনবোধে পর্বের এই পরম্পরা লঙ্ঘন করে **অন্যভাবেও পড়াতে পারবেন।**

আর একটি কথা। এই তিনটি পর্ব পড়ানোর ভার একই শ্রেণীতে আলাদা আলাদা শিক্ষকের উপর (যথা ভূগোল শিক্ষক, ইতিহাস-শিক্ষক ও অর্থনীতি শিক্ষক) **কখনই ন্যস্ত না হয়।** সমাজবিদ্যার শিক্ষণ-শিবিরে এ বিষয়টি সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বার বার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন বিশেষজ্ঞেরা। বরং দরকার হলে একই শ্রেণীর অন্য সেক্‌শনে বা বিভাগে পৃথক শিক্ষকের ব্যবস্থা থাকতে পারে।

এ গ্রন্থ প্রকাশে আমরা সর্বাংশে শিক্ষকবন্ধু ও ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যই গ্রহণ করেছি। অধ্যাপক শ্রীতারকচন্দ্র দাশ, অধ্যাপিকা শ্রীকল্যাণী কার্লেকর, অধ্যাপক শ্রীসুবচনী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীমুরারিমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীযূথিকা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমঞ্জুলিকা সরকার, শ্রীগীতা সেন, শ্রীকণিকা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমরণচন্দ্র কর্মকার, শ্রীকিশোরীমোহন সরকার, শ্রীঅমর ঘোষ, শ্রীবিশ্বপতি চাকী, শ্রীশ্যামাপ্রসাদ সরকার এবং শ্রীসুকুমার দত্ত নানা তথ্য ও পরামর্শ দানে গ্রন্থকারদ্বয়কে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। ভোলানাথ পেপার হাউসের শ্রীমধুসূদন দত্তের নিকটেও আমরা বিশেষভাবে ঋণী।

শ্রীপীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়
জানুয়ারী, ১৯৬৫ সাল শ্রীজ্যোতিভূষণ চাকী

প্রথম খণ্ডের সূচী

প্রথম পর্ব ॥ দেশে দেশে সমাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় পর্ব ॥ যুগে যুগে ভারত

তৃতীয় পর্ব ॥ সমাজ-সমিতি-রাষ্ট্র

—o—

দেশে দেশে সমাজ

সাইডার সী॥ সমুদ্র থেকে লক্ষ লক্ষ একর জমি এইভাবে উদ্ধার করা হয়েছে

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ
০ ২০ ৪০
মাইল
উত্তর আন্দামান
মধ্য আন্দামান
ব ঙ্গো প সা গ র
বরতাং
রিচি দ্বীপপুঞ্জ
দক্ষিণ আন্দামান
উত্তর সেন্টিনেল দ্বীপ
রাটল্যাণ্ড দ্বীপ
ক্ষুদ্র আন্দামান
দীপঙ্কর সেনগুপ্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষের এই সমাজ

"How unconcerned the grazing sheep,
Behaving in such manner ;
They stand upon their breakfast, they
Lie down upon their dinner.
This would not seem as strange to us
If fish grew round our legs,
If we had floors of marmalade
And beds of buttered eggs"

কী সুখী ঐ ভেড়াগুলো! ওদের ব্রেকফাস্ট আর ডিনার—সবুজ কচি ঘাস—তারই ওপর ওরা চরে বেড়ায় কিংবা শুয়ে আরাম করে ঝিমোয়। মেহনৎ নেই একটুও। আমাদেরও যদি এমনটা হত! পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছে মাছগুলো, মোরব্বার মেঝের উপর ডিম-মাখনের পাউরুটির বিছানায় শুয়ে হরদম খাচ্ছি। কী চমৎকার হত তা হলে!

আমরা তো না খেয়ে বাঁচতে পারিনে। শুধু আমরা কেন, সমস্ত জীবেরই ঐ এক চিন্তা—উদরে প্রীতিমাপন্নে। কিন্তু মানুষই হচ্ছে একমাত্র প্রাণী যে নিজের খাবার নিজে বানায়। অন্য সব জীবেরা খাদ্য যেই খুঁজে পায় অমনি খেয়ে নেয়, কিংবা খাদ্য সংগ্রহ করে মজুত করে, নয়ত অন্যান্য প্রাণী মেরে উদরস্থ করে। আর মানুষ? সে 'মাঠে মাঠে বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে, কাজ করে নগরে প্রান্তরে'। তাই বলে যে মানুষ চিরদিনই খাদ্য উৎপন্ন করে আসছে তা নয়। আদিম কালের মানুষ জানত না খাদ্য তৈরি করতে। শিকার করে সে খেত, নয়ত পশুপাখিদেরই মতন খাবার সংগ্রহ করে বাঁচত। বহু কাল পরে একদিন দৈবাৎ সে আবিষ্কার করল খাদ্য উৎপন্ন করার কৌশল। হয়তো প্রাচীন সমাজের একটি মেয়ে

কখনও বুনো ফল বা শস্যের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল তার কুঁড়েঘরের পাশে, একদিন অবাক মেয়েটি দেখল সেখানে গজিয়েছে একটি নতুন চারাগাছ—নতুন জীবনের আনন্দে দুলছে তার সবুজ ডগাটি। উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল মানুষ—তার নতুন সৃষ্টির খুশিতে।

সমাজ গড়ার পথে

নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মতে মানুষ জাতটার বয়স দশ লক্ষ থেকে চল্লিশ লক্ষ বছর। সুদূর সেই প্রাচীন কালে বনে-জঙ্গলে যে সব জন্তুজানোয়ার ঘুরে বেড়াত তাদেরই মতন বুনো চেহারা ছিল সেকালের মানুষের। তবু একটা বিষয়ে ছিল তফাৎ। পশুর যা ছিল না, মানুষের হাতে ছিল তাই—হাতিয়ার। এই হাতিয়ারের দরুনই পশুর জগৎ থেকে মানুষের জগৎ আলাদা হল। এই হাতিয়ারের কল্যাণে মানুষ সভ্য হয়েছে, দেশে দেশে গড়ে তুলেছে সভ্য সমাজ।

প্রথম মানুষ বাস করত নাতিশীতোষ্ণ বা উষ্ণ মণ্ডলের অরণ্যে। অসীম ভয় করত তারা জানোয়ারদের। হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে বাঁচার তাগিদে মানুষের তাই দরকার হয়ে পড়ল পরস্পরের সাহায্য। একসঙ্গে থাকতে থাকতে ক্রমশ কথা বলতে শিখল তারা। হাতিয়ার ছিল কী? গাছের ডাল থেকে তৈরি মুগুর আর বর্শা। আর ছিল পাথর। এইসব পাথরের হাতিয়ারগুলোকে তখনও সে শাণাতে শেখেনি। কাজেই ওদিয়ে চাষবাস করা যেত না, বড়ো জানোয়ার শিকার করা চলত না, বাড়িঘর বানানো তো

আদিম মানুষের পশুশিকার

দূরের কথা। খাবার জুটত কী? গাছগাছড়া, ফলমূল, এই সব আর কি! এটা হল **পুরানো প্রস্তর যুগের** কথা।

তারপর হাজার হাজার বছরের চেষ্টায় মানুষ তার পাথরের অস্ত্রকে

ধারাল করে নিতে শিখল। সেই সঙ্গে এল তার জীবনের নতুন প্রভাত—**নতুন প্রস্তর যুগ**। মানুষের বাঁচার সমস্যা আরও সহজ হয়ে এল। এই শাণানো হাতিয়ার দিয়ে জানোয়ার মারা চলত, সেই মাংস খেত মানুষ। নিজেদের ডোবার চারপাশে পাথরের অস্ত্র দিয়ে মাটি কুপিয়ে এক-আধটু শাকসব্জিও ফলাতে চেষ্টা করল। আর আবিষ্কার করল আগুন। কাঠে কাঠে ঘষে আগুন জ্বালাতে শিখল মানুষ, সেকথা বলা আছে আমাদের ঋগ্বেদ গ্রন্থে।

এই আগুন মানুষের চোখের সামনে খুলে দিল নতুন আলোর পথ। আগুনের কল্যাণে জন্তুকে আর তার ভয় নেই, আগুনে ঝল্‌সে খেতে লাগল তার খাবার। ঠাণ্ডা জলবায়ুতে জীবন কাটানো এবার আর অসহ্য বোধ হল না, দরকার হলে মৃত পশুর চামড়া শুকিয়ে তাই গায়ে জড়িয়ে শীত নিবারণ করা যেত। মানুষ এবার ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর বিভিন্ন নদীপথ বা সমুদ্রতীর ধরে—ছোট গণ্ডি ছাড়িয়ে বৃহৎ মুক্তির সন্ধানে।

কাঠের লাঙল : নতুন প্রস্তর যুগ
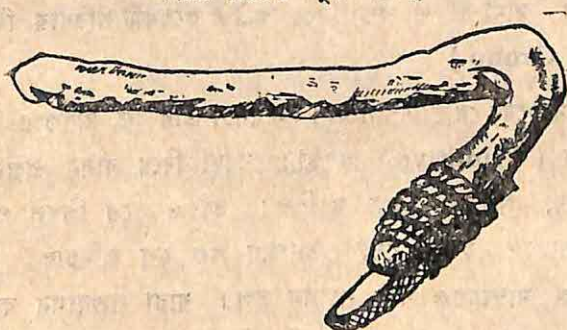
কাঠের সঙ্গে পাথরের ফলা বেঁধে কোদাল : নতুন প্রস্তর যুগ

একসঙ্গে থেকে থেকে মানুষের সংগঠন দৃঢ় হল। এ সংগঠনের নাম সব দেশের ভাষাতেই প্রায় একই রকম। সংস্কৃতে এর নাম **'জন'**। তখনকার

দিনে এক একটি 'জন'-এ খুব বেশি লোক থাকত না। সকলের ছিল সমান মর্যাদা, কাজ করত সবাই মিলে। ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র মূল্য ছিল না। অন্য কোন 'জন' এর কেউ নিজেদের 'জন' এর কাউকে আক্রমণ করলে বা মেরে ফেললে বাইরের 'জন'-এর সাথে লেগে যেত তুমুল লড়াই। সবাই এতে যোগ দিত। আবার শান্তির সময়ে সবাই একযোগে কাজ করত মিলেমিশে।

তীরধনুকের আবিষ্কার মানুষের অনেক বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ফল। বেঁচে থাকার জন্য যে সব জিনিস অত্যন্ত জরুরী তা সে তৈরি করতে শিখল। পাথর ঘষে ঘষে কুঠার বানাল। তাই দিয়ে গাছ কেটে তা থেকে প্রস্তুত করল তক্তা আর নৌকো, কাঠের পাত্র আর আসবাবপত্র, নানান ছাঁদের। মাটি ও পাথরের গড়া ডেরার বদলে এবার তৈরি করল কাঠের ঘরবাড়ী। যারা হ্রদের কাছে থাকত, তারা জন্তুর আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য জলের মধ্যে উঁচু মাচা বেঁধে ঘর বানাত। পশুর লোম, গাছের আঁশ বা বাকল দিয়ে কাপড় বুনে তাই পরতে লাগল। সমস্তই হাতে বোনা।

কাজ যে খুব বেড়ে গেল, সেও এক সমস্যা। তখন দেখা দিল **কর্মবিভাগ**। এ যুগে যাকে বলা হয় 'ডিভিশন অব লেবার'। যুদ্ধ, শিকার, হাতিয়ার তৈরি এসব বাইরের কাজ করত পুরুষেরা। মেয়েদের প্রাধান্য ছিল ঘরে—খাবার তৈরি করা, কাপড় বোনা, ঝুড়ি বানানো।

লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে 'জন' বিভক্ত হয়ে পড়ল কয়েকটি **পরিবারে**। স্বামী-স্ত্রী ও কন্যা নিয়ে গঠিত কয়েকটি পরিবার মিলে গড়ে উঠল গোষ্ঠী (Group)

এতক্ষণ মানুষের যে ইতিহাস বলা হল সেটা তার বন্য অবস্থার ইতিহাস। এর পর বর্বর (Primitive) অবস্থা। কাদা দিয়ে বাসন প্রস্তুত করতে শিখল মানুষ, আবিষ্কৃত হল মৃৎশিল্প। তারও পরে শিখল পশুপালন। পশুদের খাওয়াতে হবে, সেই তাগিদে শুরু হল জমিচাষ। পরে এই চাষবাস থেকে মানুষেরও খাদ্য সংস্থান হল। যারা পশুপালন করত সেই সব গোষ্ঠীর লোকেরা খাদ্য উৎপন্ন ইত্যাদি বিষয়ে উন্নত হবার ফলে সাধারণ বর্বরগোষ্ঠী থেকে পৃথক হয়ে পড়ল। এভাবে সমাজে সর্বপ্রথম এল **শ্রমবিভাগ।**

পশুপালক গোষ্ঠীর লোকেরা খাবার ছাড়া মানুষের ব্যবহারোপযোগী

আরও নানান জিনিসের উৎপাদন-কৌশল আয়ত্ত করল। এ থেকে প্রয়োজন দেখা দিল **দ্রব্য বিনিময়**। আগে গোষ্ঠীর ভিতরেই হত কিছু কিছু জিনিস বিনিময়, এখন থেকে ভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে চল্‌ল লেনদেনের কারবার। বিনিময়টা হত কিসের মাধ্যমে? পশুর। চাষের জমি ছিল গোষ্ঠীর সম্পত্তি। গোষ্ঠী এ জমি ভাগ করে দিত 'জন'-এর মধ্যে। 'জন' দিত প্রতি বাড়ির সম্প্রদায়কে, আর সম্প্রদায় দিত প্রতি পরিবারকে। জমির মতোই পশুর পালও ক্রমে আলাদা সম্পত্তি হয়ে প্রতি পরিবারের প্রধানের অধিকারভুক্ত হল। সমাজে পশুর মূল্য ছিল খুব বেশী। কাজেই বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে পশু নিতে কারোই আপত্তি ছিল না। এযুগে যেমন আমরা টাকা দিয়ে জিনিস কিনি, সেকালে তেমনি পশু দিয়ে সব জিনিস যেত কেনা।
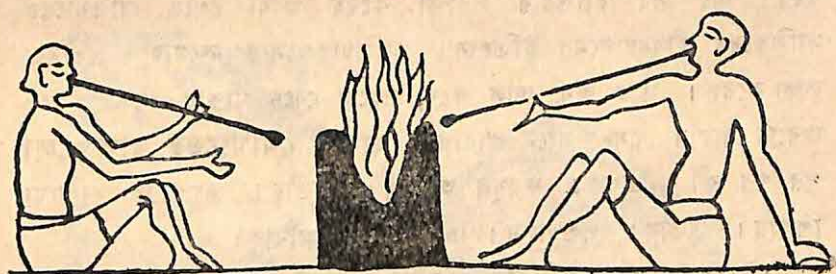
প্রাচীন শিল্পের কামারশালা : তামা গলান হচ্ছে

এই সঙ্গে প্রসার হতে লাগল **শিল্পকর্মের**। দেখা গেল পাথর ছাড়াও ধাতু দিয়ে বানানো যায় আরও ভাল হাতিয়ার। আবিষ্কৃত হল তামা আর টিন; এবং তামা ও টিনের মিশ্রণে যে ধাতু পাওয়া যায়, অর্থাৎ **ব্রোঞ্জ**। সোনারূপার গহনা তৈরি হল, কাপড় বোনা আরম্ভ হল তাঁতের সাহায্যে। তারও পরে মানুষ শিখল **লোহার** ব্যবহার। প্রস্তুত হল মজবুত যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র। পাথরের হাতিয়ার ক্রমশ নেপথ্যে চলে গেল। কৃষিকাজ শুরু হল পশুতে-টানা লোহার লাঙল দিয়ে। চাষের কাজ সহজ হওয়াতে বনজঙ্গল সাফ করে চাষের ও গোচারণের জমি বাড়িয়ে তুল্‌ল মানুষ।

মানুষের ক্রমবিকাশের ধারাটা তাহলে এইরকম দাঁড়াচ্ছে:

পুরানো পাথরের যুগ—নতুন পাথরের যুগ—ব্রোঞ্জের যুগ—লোহার যুগ।

ফসল কাটবার আদিম যুগের কাস্তে : ব্রোঞ্জের তৈরি
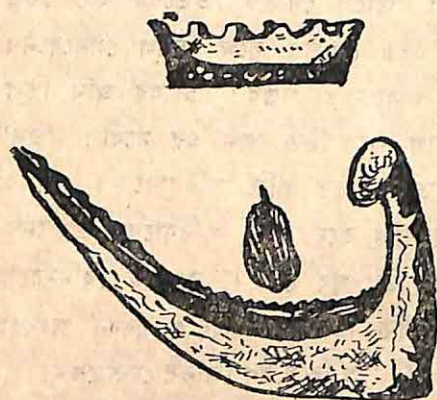
মানুষ সভ্য হল। সভ্যতার শুরু ঠিক কবে থেকে? লেখার হরফ আবিষ্কারের সময় থেকে। যতদিন মানুষ লিখতে শেখেনি ততদিন পর্যন্ত সে সভ্য নয়।

তা হলে মানুষের অ-সভ্য সময়কার হাজার হাজার বছরের ইতিহাস জানব কেমন করে? ঐ যে বলেছি, প্রাচীন কালের হাতিয়ারগুলো সংগ্রহ করে। এই সব হাতিয়ার পরীক্ষা করেই জানা গেছে হাতিয়ারের মালিকদের জীবনযাপনের ইতিহাস। হাতিয়ারগুলোর ক্রমোন্নতি তোমরা লক্ষ্য করেছ। তার অর্থ, ভাল করে, সহজে বেঁচে থাকার রসদ যোগাড় করতে পারা। রসদ মানে খাবার। **খাবার যোগাড়ের ধাপগুলো** পর পর কী? প্রথম: ফলমূল আহরণ। দ্বিতীয়: অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে শিকার। তৃতীয়: পশুপালন। চতুর্থ: চাষ-আবাদ।

এই যে ধাপগুলো—শিকার সংগ্রহের অবস্থা থেকে চাষবাসের উপর নির্ভরশীল সমাজ—স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে মিশরের বুকে। তার প্রমাণ মিলেছে ফাইয়ুম, নেগাদা, মেরিম্‌-ডে, অ্যাবিডস্‌, এল্‌-আম্‌রা ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি-খুঁড়ে-পাওয়া নানা নিদর্শনের মধ্যে। তা ছাড়া কবরের দেয়ালে আঁকা অসংখ্য ছবিতে আর পাওয়া জিনিসপত্রে। চারিদিকের ধূ ধূ শুষ্ক মরুভূমির মাঝখানে ছোট একফালি এই সবুজ দেশের সন্ধান না জানি কেমন করে পেয়েছিল পুরানো প্রস্তর যুগের মানুষেরা, তাদের যাযাবর দল এদেশে এসে নীলনদীর কূলে কূলে বসবাস শুরু করেছিল অনেক—অনেক কাল আগেই।

এই হল মানব সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস। মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই। বাঁচবার তাগিদেই তার নতুন নতুন কৌশল, নতুন নতুন হাতিয়ার। শিকারের অস্ত্র তৈরি, আগুন জালিয়ে বন্য জন্তুদের দূরে রাখা, শীত ও দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাসস্থান নির্মাণ; চাষের সাহায্যে খাদ্য

উৎপাদন, রান্নার জন্য পাত্রের ব্যবহার, লজ্জা নিবারণের পোশাক—এ সমস্তেরই মূলে **জীবনধারণের তাগিদ**। এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর
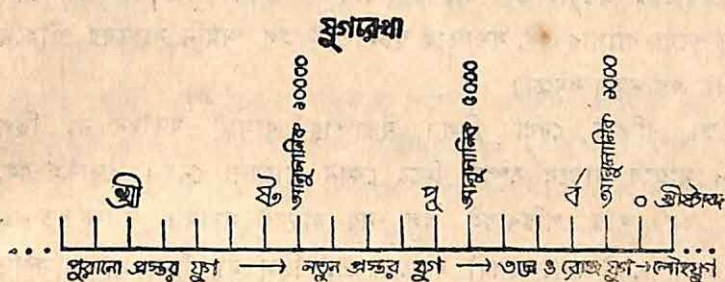
লোকদের মনের ভাব প্রকাশের জন্য কত বিভিন্ন ভাষার হয়েছে সৃষ্টি, শুরু হয়েছে শিল্পকলার চর্চা। স্পেনদেশের আলতামিরার গুহার দেয়ালে ও ছাদে হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তুলি-রং দিয়ে কী
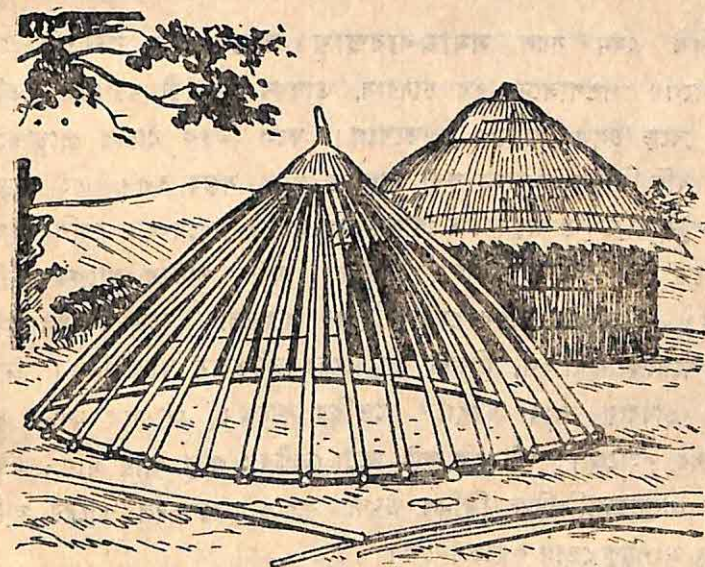
জীবনধারণের তাগিদ : দক্ষিণ আফ্রিকার উপজাতিদের বাসস্থান

অপূর্ব রঙীন চিত্ররাজি এঁকে রেখে গেছে। প্রাচীন মোএঞ্জোদড়ো-হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ থেকে তুলে আনা মাটির পাত্রগুলোর গায়ে যে বিচিত্র নক্‌শা পাওয়া গেছে, তা থেকে পাঁচহাজার বছরের পুরানো অতি উন্নত সমাজ-সভ্যতার ইতিহাস হয়েছে আবিষ্কৃত। আদিম মানুষের জীবনে ধর্মবোধের

সূচনা হয়েছিল অতি প্রাচীন যুগেই। ঝড় জল বিদ্যুৎ আগুন ইত্যাদি প্রকৃতির প্রচণ্ড শক্তিগুলো ছিল তাদের উপাস্য দেবতা।

হাতিয়ারের ক্রমোন্নতিই মানুষকে টেনে আনল সভ্যতার প্রাঙ্গণে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই, সভ্যতার সূচনা যেই হল অমনি মানুষের জীবনে দেখা দিল এক নতুন সমস্যা।

সমস্যা সত্যিই দেখা দিল। সভ্যতার বালাই যতদিন না ছিল ততদিন মানুষে মানুষে সম্পর্ক নিয়ে কোন ঝামেলা নেই। গোষ্ঠীই বল, 'জন'ই বল আর পরিবারই বল—সব মানুষই সমান। ব্যক্তি বড় নয়, সমাজ বড়। সেই সমাজে ধনী দরিদ্রের প্রশ্ন ছিল না, ছিল না ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোনো বালাই। সবই ছিল গোটা সমাজের, সবাইয়ের লক্ষ্য ছিল কী করে খেয়ে-পরে' সমাজের সকলে বাঁচবে। সকলের তরে সকলের আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। এরই নাম **আদিম সাম্য সমাজ**।

কিন্তু এমন সরল **সমাজব্যবস্থায় ভাঙন** ধরল সভ্যতার প্রথম ঊষাকালে। পশুপালনের পর চাষবাস, তারপর দরকারী যন্ত্রপাতি তৈরির কাজ বেড়ে চল্‌ল অসম্ভব দ্রুতবেগে। ফলে নিছক বাঁচার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জিনিস উৎপাদন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হল। এই বাড়তি জিনিসটুকু বা উদ্‌বৃত্ত মানুষ তত বেশি ভোগ করতে পারবে যত বেশি সংখ্যক লোককে সে খাটিয়ে নিতে পারবে। অর্থাৎ খাটিয়ে-লোকের চাহিদা বাড়ল। এ চাহিদা মানুষ মেটাল যুদ্ধের সাহায্যে। যুদ্ধে যে দল হারল তার অনেকে বন্দী হল, বিজয়ী দল এদের ক্রীতদাস করে নিল। নিযুক্ত করল চাষবাস আর যন্ত্রপাতি তৈরির কাজে। এইভাবে ফাটল ধরল মানুষের সমাজে। সৃষ্টি হল স্পষ্ট দুটো শ্রেণীর : প্রভু আর দাস ; একদল খেটে প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিস উৎপন্ন করছে, অপরদল তাদের খাটিয়ে উদ্‌বৃত্ত অংশটুকু ভোগ করছে নিজে।

আর দেখা দিল বণিকের দল। অন্যের শ্রমে উৎপন্ন পণ্য কেনা-বেচাই ছিল এদের কাজ। আগে জিনিস কেনা-বেচা হত সোনারূপো দিয়ে, এখন বাণিজ্যের খাতিরে প্রস্তুত হল মুদ্রা, যা দিয়ে কেনা যায় যে কোন জিনিস।

বিনিময়ের মাধ্যমের ধাপগুলো তাহলে কী রকম দাঁড়াচ্ছে ? পশু—

সোনারূপা—মুদ্রা। মুদ্রাব্যবস্থা দেখতে দেখতে এমন চালু হয়ে পড়ল যে মানুষের অর্থ, উৎপন্ন দ্রব্য, ক্রীতদাস, এমনকি জমিও পরিবারের বংশগত সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হল। পূর্বের মতো 'জন' বা গোষ্ঠীর কোন অধিকারই আর রইল না জমির ওপর।

পরিবার যখন সম্পত্তির মালিকানা পেল, তখনি মানুষের হাতে অর্থ জমতে শুরু করল। বণিকেরা দ্রব্য বিনিময়ের জন্য দূর-দূরান্তে যাতায়াত করত। ধনীরা ধনসম্পদ ও ক্ষমতার লোভে অন্য এলাকার ধনী ও অভিজাতদের হিংসা করতে লাগল। তার প্রকাশ লড়াই আর লুঠতরাজে। এ থেকে প্রতিষ্ঠা হল রাজতন্ত্রের। তারও পর প্রজারা যখন বুঝতে পারল রাজা তাদের মঙ্গল সম্পর্কে উদাসীন, তখন দেখা দিল বিদ্রোহ, বিপ্লব। রাজায়-প্রজায় যুদ্ধ। আজও এই বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য মানুষের জগতেও কত দেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি এমনিতর অত্যাচার আর বর্বরতার অভিযান

তা হলেই দেখছি, সভ্যতা যতই এগিয়ে চলেছে মানুষের সমাজও ততই ভেঙে যাচ্ছে দুটো ভাগে: ধনী আর গরীব। একদল যারা শাসন করবে, আরেক দল যারা শাসন মেনে চলবে। সরকার বা রাষ্ট্রের উদ্ভব হল। রাষ্ট্রের কর্তারা মানুষে মানুষে হানাহানি বন্ধ করতে চাইল, এটা ভালই। কিন্তু মানুষেরা ভুলে গেল আগেকার সেই সহজ ভালবাসার সম্পর্ক, সরল জীবনযাত্রার ঐতিহ্য।

কালের চাকা এগিয়ে চলে। প্রত্যেক স্তরে সমাজ সভ্যতার কী বিরাট উন্নতি! কত ঐশ্বর্যের, কত জ্ঞানবিজ্ঞানের, কত কল কারখানার, কত শিল্পসাহিত্যের ধারক হল মানুষ, হল স্রষ্টিকর্তা। দুনিয়ার সব দেশের মানুষ কিন্তু আজও সমান উন্নত হয়নি, সমান সম্পদশালী হতে পারেনি। তার কারণ এই, কোনো কোনো স্বার্থপর দেশ নিজেরা ঐশ্বর্যবান হয়ে অন্য দেশকে রেখেছে দমিয়ে, হুকুমের চাকর করে। শিক্ষা দেয়নি, সভ্যতার আলো প্রবেশের পথ দিয়েছে রুদ্ধ করে। এরকম কত মানুষের সম্প্রদায় আজও চারপাশে পড়ে রয়েছে অন্ধকারে।

প্রকৃতি বড়, না মানুষ বড়?

আদিম মানুষ থেকে শুরু করে আধুনিক মানুষের সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে লক্ষণীয় এই যে মানুষের চারপাশের যে ভৌগোলিক

পরিবেশ এককালে খুবই প্রভাবশালী ছিল, অর্থাৎ নদী-পাহাড় সমভূমি-মরুভূমি শীত-গ্রীষ্ম বৃষ্টি-অনাবৃষ্টি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন রকম থাকাতে মানব-সমাজের জীবনধারাও বয়ে চলেছিল তারই অনুসরণে, সেই প্রকৃতিকে ক্রমশ আয়ত্ত করতে পেরেছে মানুষ আপন বুদ্ধি ও শক্তির বলে। পশুর সঙ্গে মানুষের তফাৎ তো এখানেই। পশু হল প্রকৃতির দাস, আর মানুষ প্রকৃতিকে জয় করে আপন সুবিধামত তাকে নিজের কাজে লাগিয়েছে। জীবনসংগ্রামের জন্য পশুর যে সব হাতিয়ার দরকার তা আছে তারই দেহের সঙ্গে যুক্ত, যেমন দাঁত নখ লেজ বা শুঁড়। কিন্তু মানুষের জীবনের লড়াই চলেছে দেহ-বহির্ভূত হাতিয়ারের সাহায্যে—বর্শা তীরধনুক লাঙল কাস্তে হাতুড়ি ছুরি ইট কাট তাঁত, ইয়ত্তা নেই তার। এই সমস্ত হাতিয়ারই মানুষকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে বেঁচে থাকতে সহায়তা করেছে। আমরা গরমের দেশের লোক, একটুখানি বরফ মুখে দিলে শিউরে ওঠে গা'—ভাবতেই পারিনে গ্রীনল্যাণ্ড ল্যাপল্যাণ্ডের তুষার-শীতল পরিবেশে কী করে থাকে সব দুঃসাহসী মানুষেরা। কিন্তু কৈ, তারা তো কোনোদিন সেজন্য অভিযোগ জানায়নি কারো কাছে, বরং মাথা খাটিয়ে এমন সব উপকরণ বানিয়েছে যাতে ঠাণ্ডা বরফেও দিব্যি খেয়ে-পরে' বেঁচে আছে তারা। এমনি করেই পৃথিবীর নানান দেশের নানান মানুষ প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, ভূগোলের জমিদারি ধীরে ধীরে গুটিয়ে এসেছে ছোট হয়ে। পুরোপুরি নয়, তবু অনেকটা।

পরিবেশ শত্রু নয়—মানুষের বন্ধু

প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে এইভাবে সর্বদা লড়াই করে মানুষকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে এই পৃথিবীতে। কত হাতিয়ার আর উপকরণের সাহায্যে বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে চলতে হচ্ছে তাকে। এই হাতিয়ারগুলো পাবার দুটো পদ্ধতি আছে: (ক) প্রাকৃতিক উপাদানগুলো সংগ্রহ করে এবং (খ) চাষবাস ও পশুপালনের দ্বারা আরও উপাদান প্রস্তুত করে।

সংগ্রহের উপায়গুলো কী? এক—আহরণ, দুই—শিকার, তিন—মাছ ধরা, চার—ভূগর্ভ থেকে উত্তোলন।

আহরণ তো অতি সহজ ব্যাপার। ফলমূল, শাকপাতা যোগাড় করা। কোন যন্ত্রপাতি বা কলাকৌশল দরকার হয় না, শুধু হাত দুটোই যথেষ্ট। শিকারে কিন্তু কৌশল, ধৈর্য, দ্রুততা সবই প্রয়োজন। আর প্রয়োজন হাতিয়ার—গদা বর্শা রাইফেল খাঁচা জাল ইত্যাদি। মাছধরার কাজে লাগে তীরধনুক বর্শা ও নানা ধরনের জাল।

মাটির তলাকার **খনিজ পদার্থের** মধ্যে নানারকম পাথর, কাদা আর লোহার আকর অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ জিনিসগুলো তো বাণিজ্যের চমৎকার উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; কারণ পৃথিবীর সর্বত্র সবদেশে এগুলো সমান পাওয়া যায় না। আধুনিক যুগে যন্ত্রশিল্পের জটিলতা যতই বাড়ছে খনিজ দ্রব্যের ব্যবহারও জনপ্রতি ততই বেড়ে চলেছে।

এগুলো ছাড়া প্রকৃতির মধ্যে আরও উপাদান আছে যেগুলো মানুষ স্বয়ং সৃষ্টি করেছে, শ্রম ও বুদ্ধির দ্বারা। মানুষ **চাষ-আবাদ** করে কেন? যে গাছ আপনি গজাত তাকে নিয়মিত বিজ্ঞানসম্মত ভাবে জন্মাতে পারলে মানুষের জীবনধারণের সুবিধে হয় বলে। মানুষ **পশুপালন** করে কেন? যে পশুরা ইচ্ছেমত চরে খেত তাদের একটা বাঁধা নিয়ম মাফিক পালন করলে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন আরও সুসিদ্ধ হয় বলে। তার অর্থ আমাদের বেঁচে থাকার সংগ্রামে চাষবাস এবং পশুপালন মস্ত বড় হাতিয়ার।

তা হলে বৃত্তির দিক থেকেও মানুষের দুটি দল: **সংগ্রাহক** মানব-সমাজ, আর **উৎপাদক** মানবসমাজ। সংগ্রহের উপায় আর উৎপাদনের উপায়গুলোতে কিন্তু বেশ পার্থক্য আছে। সংগ্রাহক মানুষকে যাযাবর জীবন যাপন করতে হয়; উৎপাদক মানুষ তার মেষপাল নিয়ে ফসলের জমির বুকেই বাস করে তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপন্ন করতে পারে। আরো একটা কথা, সংগ্রাহক মানবগোষ্ঠীর পশুশিকার বা ফলমূল আহরণ করার পর তা আর কোনো কাজে লাগে না। কিন্তু উৎপাদক মানুষ পশু না মেরেও তার থেকে দুধ ডিম পশম ইত্যাদি কত কিছু পেতে পারে—এক-আধবার নয়, বহুবার। তা ছাড়া **বন-সংরক্ষণ** বা পশুপাখিকে সযত্নে লালন-পালন করলে তো আগের চেয়েও বেশি ফল, বেশি ডিম আর বেশি পশম পাওয়া যাবে।

মানুষ এখন বুঝতে পারল পশুদের না মেরে অনেক বেশি লাভবান

হওয়া যাচ্ছে। বাস্তবিক, হালচষা মালটানা ইত্যাদি নানা কাজে **গৃহপালিত পশুদের নিয়োগ** করার ফলে সমস্ত কৃষিকাজ এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বেচাকেনা কল্পনাতীত উন্নতি লাভ করল। চাষী ও পশুপালক জনগোষ্ঠী এখন থেকে প্রতি ঘণ্টায় অনেকগুণ বেশি সামগ্রী উৎপাদন করতে পারল। এইভাবে জমতে লাগল উদ্বৃত্ত। এর ফলে গোষ্ঠীর সব মানুষেরই চাষ-আবাদ বা পশুপালনে লেগে থাকতে হল না, জীবনের প্রয়োজনীয় আরও সব ক্ষেত্রে অনেকেই জড়িয়ে পড়ল নতুন নতুন পেশা অবলম্বন করে গোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ, আরও স্বচ্ছন্দ করে তোলার উদ্দেশ্যে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানবসমাজ উৎপাদনের প্রক্রিয়াটিকে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে বেশ চমৎকার খাপ খাইয়ে নিয়েছে। নদী-উপত্যকা
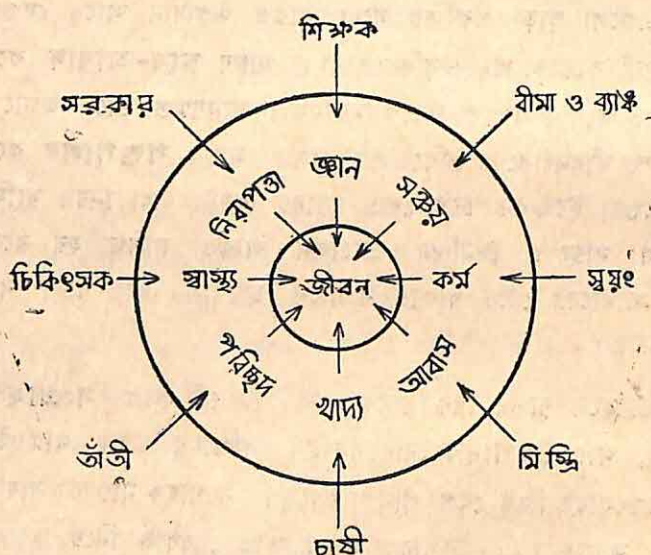
মানবজীবনের আবশ্যিকসমূহের বৃত্তচিত্র

এবং পর্বতসঙ্কুল পরিবেশে মানুষ জোর দিয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচকার্যের উপর; যেদিকে গহন অরণ্যপ্রদেশ, চাষবাস যেখানে অসম্ভব, মানুষ প্রতিপালন করছে বল্গা হরিণ! জীবনযাত্রার দিক থেকে এই যে সব আলাদা আলাদা বৃত্তি, এ থেকেই দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে দেখা দিয়েছে পৃথক পৃথক সমাজব্যবস্থা, পৃথক আচারব্যবহার, পৃথক উৎসব-অনুষ্ঠান ও ধর্মবিশ্বাস।

নানা দেশ নানা ঠাঁই—ভেদ নাই পর নাই

উপরের আলোচনার সূত্র ধরে একটা অতি মূল্যবান্ সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছতে পারি যে কৃষিজাত বা পশুপালনের কলাকৌশল যতই উন্নত হচ্ছে ততই তার প্রয়োগের ক্ষেত্রও আসছে সঙ্কুচিত হয়ে। সমগ্র ভৌগোলিক পরিবেশটাতে নয়, বিশেষ বিশেষ পরিবেশে মাত্র ঐ এক একটি প্রক্রিয়ার ব্যবহার সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। তা যদি না হত তা হলে ওরকম ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থাও বুঝি গড়ে উঠত না মানুষের পৃথিবীতে।

ভিন্ন ভিন্ন বলছি বটে, কিন্তু উৎপাদনের কলাকৌশলের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানব-সমাজে পারস্পরিক নির্ভরতা ও সহযোগিতার ভাবটাও কি অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠেনি? 'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।' মিলনের এই সূত্রটা কী? **যানবাহনের উন্নতি।** একটা সহজ দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। উত্তর আরবের বেছুয়িনেরা উট পালন করে, কিন্তু তাদের খাদ্য হল রুটি আর উটের দুধ। রুটির জন্য গম কোথায় পাবে? গম উৎপন্ন করে ইরাক ও সিরিয়ার ভাই-বেরাদরেরা। দুশ্চিন্তা ঘুচল, পণ্যদ্রব্যের হল বিনিময়। কিন্তু কিসের সাহায্যে? বেছুয়িন-দের যে অমন শক্তসমর্থ 'মরুভূমির জাহাজ'গুলো রয়েছে, তারাই তো পিঠে চাপিয়ে খাদ্যসম্ভার নিয়ে আসে সিরিয়া ইরাকের গুঞ্জনমুখর নানান্ গঞ্জ থেকে।

আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। কলকাতার সদাগরী অফিসের অ্যাকাউন্ট্যান্ট শুভেন্দুবাবু প্রাতরাশ কচ্ছেন—অস্ট্রেলিয়ার তৈরি রুটি মাখন, বিলিতি ক্রীম বিস্কুট, সিঙ্গাপুরী কলা, আর মাদ্রাজের কফি দিয়ে। কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে তিনি হাভানায় প্রস্তুত তামাকের একটা সিগ্রেট ধরালেন, সেই সিগ্রেটের কাগজ আবার কানাডার কাষ্ঠমণ্ড থেকে তৈরি। অর্থাৎ পাঁচ দশ মিনিটের প্রাতরাশের সময় শুভেন্দুবাবু সাহায্য নিচ্ছেন অন্ততঃপক্ষে পাঁচটি বিভিন্ন পরিবেশের। সারা দিনের কাজের শেষে হয়তো দেখা যাবে তিনি পৃথিবীর সব ক'টি মহাদেশের নানা দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করে ফেলেছেন। এক্ষেত্রে বেছুয়িনের মতো তিনি কেবল পার্শ্ববর্তী দুটি পরিবারের উপর নির্ভর কচ্ছেন না। আরও একটা লক্ষণীয় প্রভেদ এই যে, শুভেন্দুবাবু বা তাঁরই সমাজের ব্যক্তিরা প্রাকৃতিক শক্তি থেকে

উদ্ভূত নানারকমের যান্ত্রিক উপায়ের সাহায্যে নিজেদের নিত্যপ্রয়োজন মেটাচ্ছেন; অথচ আরব বেদুয়িনেরা শুধু তাদের হাত এবং পশুশক্তিকে ব্যবহারে লাগাচ্ছে।
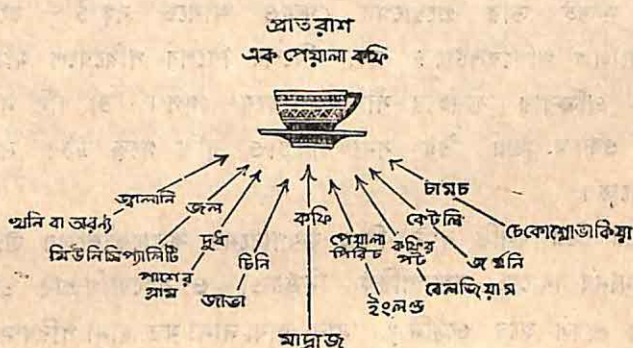
একটা সমস্যা আছে এখানে। প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত যন্ত্রের সাহায্যে পরিবেশ থেকে সর্বাধিক পরিমাণ খাদ্য যা পাওয়া সম্ভব তা কি আমরা হাতের সাহায্যে বা শক্তির প্রয়োগে পেতে পারিনে? নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু আসল মজাটা হল এই যে, যন্ত্র ব্যবহারের ফলে জমির বিঘেপ্রতি উৎপাদনের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি, মানুষের পরিশ্রমের পরিমাণটাই বহুলাংশে দিয়েছে কমিয়ে। একটা দৃষ্টান্ত নিচ্ছি। মাঞ্চুরিয়ার একজন চীনা কৃষক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেইরী অঞ্চলের একজন কিষাণের সমপরিমাণ গমই উৎপন্ন করিতে সক্ষম, কিন্তু সেটা সম্ভব করে তুলতে হলে প্রেইরী অঞ্চলের তুলনায় মাঞ্চুরিয়ায় প্রতি ঘণ্টায় বিঘেপ্রতি অনেক বেশি সংখ্যক চাষীর দরকার হবে। মার্কিন কিষাণেরা ফসল উৎপাদনের কাজে প্রাকৃতিক শক্তিকে ব্যাপক প্রয়োগ করার ব্যাপারে যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেছে।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে একটা সিদ্ধান্তে (concept) পৌছে যাচ্ছি আমরা। পৃথিবীর যেখানেই—যেমন হিমশীতল মেরু-প্রদেশ—মানুষ অত্যন্ত সরল প্রক্রিয়ায় তার খাবার যোগাড় করে চলেছে, সেখানে খাদ্য বাড়তি উৎপন্ন করা খুবই কষ্টকর; আর উৎপাদনের প্রক্রিয়াগুলো যত জটিল ও রকমারি হবে, খাদ্য ততই উদ্বৃত্ত হবে এবং একটি লোকসমাজ থেকে অন্য লোকসমাজে তার বিনিময় হবে—যার ফলে দেখা দেবে শ্রমবিভাগ।

মানুষের খাওয়া-পরা-থাকা

মানুষের জীবনে চাহিদা কী কী? এ প্রশ্নের জবাব, যেখানেই যাই না কেন—নিপ্পন থেকে আর্জেন্টিনা কিংবা সাইবেরিয়া থেকে নিউজীল্যাণ্ড—একই রকম পাবে :—খাদ্য, বস্ত্র আর আশ্রয়।

এ যুগে মানুষগুলোও হয়েছে তেমনি। চাহিদার আর অন্ত নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে নিত্য নতুন আবিষ্কার যতই হচ্ছে, আমাদের চাহিদাও ততই চলেছে বেড়ে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা তো এসব জিনিস ছাড়াই দিব্যি জীবন কাটিয়ে গেছেন। এককালে তো মানুষ গাছের বাকল নয়তো পশুর চামড়া পরে লজ্জা নিবারণ করত। আমরা চাই ঠাস-বুনানি কাপড়ের তৈরি পোশাক। আর চাই এমন একটা বাড়িতে থাকতে যেটা শীতকালে গরম থাকবে, গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা। অথচ আমার প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে একটা গুহা আর সামনে খানিকটা খোলা আগুন—তাই কি যথেষ্ট ছিল না?

আসল কথা, গত যুগে যেটা ছিল বিলাসের সামগ্রী, আজ সেটাই আমাদের কাছে অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'প্রয়োজন' দু'রকমের। দৈহিক এবং সামাজিক। পশুজীবনে দৈহিক প্রয়োজনগুলো মিটলেই হল। কিন্তু মানুষের জীবন তখনই পরিপূর্ণ সুখী যখন তার সামাজিক প্রয়োজনগুলোও মেটান সম্ভব হয়। চারপাশের প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই সামাজিক প্রয়োজন গড়ে ওঠে। পৃথিবীর যে কোনো লোকসমাজ—তা সে যত দূর আর যত ভিন্ন প্রকৃতিরই হোক—এই সামাজিক প্রয়োজনগুলো মেটাবার জন্য সর্বদা নিজস্ব পদ্ধতি উদ্ভাবন করে চলেছে।

চাহিদা পূরণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপায় হচ্ছে : গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করা। **গোষ্ঠী** (Group) কাকে বলে? শুধু কি কতকগুলো লোকের একসঙ্গে থাকা? না। ঐ একসঙ্গে থাকার পিছনে একটা উদ্দেশ্য চাই —একটা লক্ষ্যের পানে সকলের সমবেত পদক্ষেপ। ইস্কুলের ক্লাসঘর হচ্ছে এই গোষ্ঠীর উদাহরণ। 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'—তবেই তো একদল লোক মিলে গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়।

গোষ্ঠী বহুরূপী। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে দুটি : ক্ষুদ্র বা **মুখ্য গোষ্ঠী** (Primary Group), যেখানে প্রত্যেকের সঙ্গে ভাবের ও কর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ—যেমন, পরিবার; কখনও বা ছোট একটি গ্রাম।

বৃহৎ বা **গৌণ গোষ্ঠী** (Secondary Group), যেখানে উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। ক্লাবের সভ্যরা তাদের সভাপতি বা কর্মপরিষদ নির্বাচনে ভোট দেবে, মেনে চলবে নির্দিষ্ট নিয়মকানুন। কিন্তু সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক জানাশুনো খুবই গৌণ।

মুখ্য গোষ্ঠী : পরিবার

পরিবার হচ্ছে তেমনি এক গোষ্ঠী যেখানে মানুষের মূল সমস্যাগুলো মেটে। কিন্তু ছোট ছোট আমাদের পরিবারগুলো **বাইরের বৃহৎ গোষ্ঠীদের উপর নির্ভর করেই** নিজেদের খাদ্য বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। শীতকালে বা নিষ্ফলা বৎসরে আমাদের দরকার হয় না ঘরে খাবার মজুত রাখার। দোকান-দার আর ব্যবসায়ীরা রয়েছে রসদ যোগাতে। কিষাণ ফসল ফলাচ্ছে জমিতে। পরিবহণ বিভাগের কর্মীরা সেই সামগ্রী এনে পৌঁছে দিচ্ছে আমাদের দুয়ারে। এমনি আরও কত অসংখ্য লোক—যারা সবাই গৌণ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

গৌণ গোষ্ঠী : লোকসমাজ

ভালভাবে খাওয়া-পরা-থাকার জন্য পরিবারই সব নয়, বিশেষ বিশেষ কার্যে পটু শত শত কর্মীর উপরেও আমাদের নির্ভর করতে হয়। এজন্যই পরিবারগুলোকে নিয়ে আমরা এক একটি বৃহৎ গোষ্ঠী গড়েছি—যার নাম লোকসমাজ (Community)।

গ্রাম শহর নগর নিয়ে ছোট-বড় নানারকমের লোকসমাজ তৈরি হতে পারে। এদের কোনটিই অন্য কারো মত নয়। তবু কয়েকটি জিনিস প্রত্যেক লোকসমাজেই দেখতে পাওয়া যাবে—ঘরবাড়ি, দোকান-পাট, কারখানা, বিদ্যালয়, ধর্মমন্দির, প্রমোদগৃহ ইত্যাদি। এইসব জায়গা কোনো-না-কোনো প্রকারে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে চলেছে।

লোকসমাজ কাকে বলে ? যদি বলি লোকসমাজ হচ্ছে এমন একটা স্থান যেটা মানচিত্রে দেখানো যায়—তাহলে তো সব বলা হল না। কয়েকটা খালি বাড়ি, ধার দিয়ে চলে গেছে একটা রাস্তা—এটাও মানচিত্রে দেখানো সম্ভব, তাই বলে এটাকে লোকসমাজ বলা যাবে ? না। তার কারণ, ওখানে লোক বাস করছে না। লোকই যদি না রইল তবে সমাজ হবে কাদের নিয়ে ? লোক-সমাজ তা হলে পৃথিবীর এমন একটি 'স্থান' যেখানে 'লোক' বাস করে।

এতেও পুরোপুরি হল না। কোনো স্থানই প্রকৃত লোকসমাজরূপে গণ্য হতে

পারে না যদি তার বাসিন্দারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল না হয়। 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন, এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।' প্রাত্যহিক জীবনে সকলের মেলামেশা ও সহযোগিতাই হচ্ছে লোকসমাজের বনিয়াদ। এইজন্যই লোকসমাজ সাধারণত কয়েক বর্গমাইল আয়তন নিয়ে গড়ে ওঠে। বিরাটাকার হলেই আন্তরিক যোগসূত্রটি যায় ছিঁড়ে।

এ থেকে লোকসমাজের সংজ্ঞাটি দাঁড়াচ্ছে এই : 'পৃথিবীর কোন স্থানে একদল লোক সহযোগিতার ভিত্তিতে যখন বাস করে, তাকেই বলা হয় লোকসমাজ।' এই সংজ্ঞাটির মধ্যে আমরা অন্তত তিনটি উপাদান বা সম্পদের নাম খুঁজে বার করতে পারি যার উপর লোকসমাজের স্থায়িত্ব বা অগ্রগতি নির্ভর করে। (১) একদল লোক, অর্থাৎ **লোকসম্পদ**। এ পর্যায়ে পড়ে মানুষ ও তার স্বাস্থ্য শক্তি বুদ্ধি চেষ্টা, এই সব। (২) একটি স্থান, অর্থাৎ **প্রাকৃতিক সম্পদ।** পৃথিবীর, তার মাটি, জলবায়ু, নদী-পাহাড়-সমভূমির অবস্থান, প্রকৃতি থেকে পাওয়া নানা উপাদান ও শক্তি ইত্যাদি। (৩) সহযোগিতার ভিত্তিতে বাঁচা, অর্থাৎ **সামাজিক সম্পদ**। জীবনের উদ্দেশ্য, রীতিনীতি, কর্মনৈপুণ্য, জনসেবা ইত্যাদি বিষয় এই আওতায় পড়ে। মানুষের ইতিহাস যুগে যুগে সাক্ষ্য দিচ্ছে মানুষ কিভাবে উন্নততর গোষ্ঠীজীবন সংগঠনে এই সামাজিক সম্পদগুলোকে ব্যবহার করতে শিখেছে। সামাজিক সম্পদের বিকাশ করতে না পারলে মানুষকে বোধ হয় আজও গুহাবাসী হয়েই থাকতে হত; এই সামাজিক সম্পদগুলোই বৃহৎ মানবগোষ্ঠীদের সাহায্য করছে জমি, খনি আর অরণ্য থেকে নানা প্রাকৃতিক উপাদান সংগ্রহ করতে, জীবনযাত্রা আরও উপভোগ্য করে তুলতে।

অনুশীলনী

১। যুগ-পরম্পরায় মানুষ কিভাবে বর্তমান সভ্য অবস্থায় পৌচেছে তার আলোচনা কর। মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে 'হাতিয়ারে'র প্রভাব কতখানি ?

২। "হাতিয়ারের ক্রমোন্নতিই মানুষকে টেনে আনল সভ্যতার প্রাঙ্গণে।"

"সভ্যতা যতই এগিয়ে চলেছে, মানুষের সমাজও ততই ভেঙ্গে যাচ্ছে।" —এ উক্তি দুটির ব্যাখ্যা করে সমস্যাটির আলোচনা কর।

৩। দুনিয়ার সমস্ত দেশের মানুষ সমানভাবে উন্নত হয় নি।—এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ কর।

৪। 'লোকসমাজ' বলতে কি বোঝ? লোকসমাজে বাস করতে হলে যদি পারস্পরিক সহযোগিতা অপরিহার্য হয় তা হলে তোমার জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে কোন্ কোন্ মানুষ তোমাকে সাহায্য করছে? [দলগত কর্মোদ্যোগ বা Group activity : ক্লাসের ছাত্ররা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে এই সব মানুষের জীবনযাত্রার মোটামুটি ইতিহাস সংগ্রহ করে তাদের 'ব্যবহারিক সংকলন' বা Practical Note Book-এ লিপিবদ্ধ করবে।]

৫। তুমি যে-লোকসমাজে বাস কর তার আরো উন্নতি কিভাবে সম্ভব সে সম্বন্ধে কয়েকটি গঠনমূলক প্রস্তাব তুলে ধর। তুমি এবং তোমার বন্ধুবান্ধব সমাজের কোন সমস্যার কথা কখনও চিন্তা করেছ কি? কিভাবে তোমরা তার সমাধানে অগ্রসর হয়েছ?

৬। "নানা দেশ নানা ঠাঁই—ভেদ নাই পর নাই"—এ বিষয়টি অবলম্বনে একটি নিবন্ধ রচনা কর। যে রচনাটি বিষয়-শিক্ষকের বিচারে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে সেটি বিদ্যালয় পত্রিকায় ছাপানো যাবে।

৭। প্রদর্শনীর আয়োজন কর॥ বিষয়—'দেশবিদেশের মানব-পরিবার।'

৮। ছবি-নক্শা তৈরি কর॥ বিষয়—'মানুষের হাতিয়ার—যুগে যুগে।'

৯। বিতর্ক সভার ব্যবস্থা কর॥ বিষয়—(ক) 'শক্তিতে মানুষ অপেক্ষা প্রকৃতি বড়।' (খ) 'আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদের চেয়ে সুখী ছিলেন।' (গ) 'সভ্যতার উন্নতিতে মানুষের সমস্যা ও বিপদ আরো বেড়েছে।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খাদ্য সংগ্রহের কথা : আন্দামানী সমাজ

দু'শ সত্তর কোটি মানুষের এই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিবেশে কত বিচিত্র জীবনধারা। আবহমানকাল থেকে খাওয়া-পরা-থাকার অগুনতি সমস্যা মেটাবার জন্য মানুষের কী প্রাণান্তকর প্রয়াস! যেখানকার যা প্রাকৃতিক পরিবেশ তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে মানুষ তার জীবনযাপনের পদ্ধতি নিয়েছে গড়ে। এমনি করেই বার বার ভূগোলের সঙ্গে মানুষের ইতিহাস তার গাঁটছড়া নিয়েছে বেঁধে।

সভ্যতার বিকাশ পৃথিবীর সর্বত্র তো সমান হয়নি। আজও কত উপজাতি বাস করছে কোথায় কোন্ অরণ্যে, পাহাড়ের সানুদেশে, সাগর-ঘেরা দ্বীপের নিষ্প্রদীপ কোণে কোণে। সভ্যতার ছোঁয়া এখনও পড়েনি, কোথাও বা সবেমাত্র পড়তে শুরু করেছে। সহজ চালচলন, প্রাণখোলা কথাবার্তা, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং শিল্পকলায় স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ—এইসব হচ্ছে এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ভাষা, রীতিনীতি, জীবনযাপন প্রণালী—সব দিক দিয়েই এরা সভ্যজাতির চেয়ে একেবারে পৃথক। সাধারণত পশু শিকার, জমি চাষ এবং অরণ্য সম্পদের সদ্ব্যবহার করে এরা ভরণপোষণ চালায় ; আর অবকাশের সময়টুকু কাটায় নাচগান আর নানান্ শিল্পকাজ করে।

এ রকম একটা দ্বীপের আদিবাসীদের কাহিনী আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

ব্রহ্মদেশের নেগ্রেইস অন্তরীপ থেকে দক্ষিণে বহুদূর পর্যন্ত যে দ্বীপমালা প্রসারিত তারই নাম আন্দামান। হুগলী নদীর মোহনা থেকে এর দূরত্ব ৫৯০ মাইল। বঙ্গোপসাগরের বুকে জাহাজে দাঁড়িয়ে তাকালে আন্দামানকে মনে হবে ঘন জঙ্গলে ঢাকা একটি পাহাড়ের শ্রেণী—পাহাড়ের উচ্চতা কিন্তু মোটেই বেশি নয়। সমগ্র দ্বীপপুঞ্জটি দু'ভাগে বিভক্ত : **বড় আন্দামান ও ছোট আন্দামান**। বড় আন্দামানের অন্তর্ভুক্ত চারটি দ্বীপ : উত্তর আন্দামান,

মধ্য আন্দামান, বরতাং ও দক্ষিণ আন্দামান। বড় আন্দামানকে ঘিরে আছে আরো কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ। উপকূল অত্যন্ত ভগ্ন, একারণ কয়েকটি বন্দরের সৃষ্টি হয়েছে। প্রচুর মাছ ও কচ্ছপ পাওয়া যায় সমুদ্রের খাড়িতে। ছোট আন্দামানের বেলাভূমিতে গা' শুকোয় বড় বড় কুমীর। দেশের অভ্যন্তরে বনে জঙ্গলে রাজত্ব করে বনশূয়োর, বনবেড়াল, গেছো ইঁদুর, বাদুড় আর অসংখ্য বিষাক্ত সাপ। এখানকার জঙ্গল দু'রকমের : চিরসবুজ, যেমন 'গর্জন' প্রভৃতি গাছ ; আর পাতাঝরা, যেমন 'প্যাডক্'—যার পাতা বছরে একবার (সাধারণত গরম কালে) একেবারে ঝরে যায়।

আন্দামানের **আবহাওয়া** উষ্ণ ও আর্দ্র। অনেকটা বাংলাদেশের মতো। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এখানে বৃষ্টিপাত হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৩৮ ইঞ্চি। মাঝে মাঝে ঘূর্ণিবাত্যার দাপট চিহ্ন রেখে যায় দ্বীপপুঞ্জের বুকে। 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে'—কবির বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় আন্দামানের বর্ষার সঙ্গে। আকাশ ভেঙে যখন বৃষ্টি নামে তখন একটানা মুষলধারে চলে সেই বৃষ্টি। বর্ষণের সঙ্গে দমকা বাতাস আর সমুদ্রে বড় বড় ঢেউয়ের মাথায় পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা ফেনা। 'দোলে রে প্রলয়দোলে অকূল সমুদ্রকোলে উৎসব ভীষণ।' ভীষণত্বে ও সৌন্দর্যে সে দৃশ্য সত্যি অপূর্ব।

আদিম মানুষ

মানুষের বসতি কবে শুরু হয়েছিল আন্দামানে। যতদূর মনে হয়, বর্মার আরাকান অঞ্চল থেকে স্থলপথে (সুদূর প্রাচীনকালে বর্মার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে আন্দামানের সংযোগ থাকা মোটেই অসম্ভব নয়) অথবা জলপথে মানুষের দল সর্বপ্রথম এসেছিল আন্দামানে। দ্বিতীয় শতাব্দীর মিশরের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক টলেমির পুস্তকে আগিন্নতাই নামে আন্দামানের উল্লেখ আছে। অষ্ট শতকের চীনা পর্যটক ই-সিঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে আন্দামান উল্লিখিত হয়েছে ইয়েঙ-তো-মাঙ নামে। নবম শতকে আরব ভ্রমণকারীরা আন্দামানের অধিবাসীদের নরখাদক রূপে বর্ণনা করেছেন—কিন্তু এ অভিযোগ একান্তই কষ্টকল্পিত। ত্রয়োদশ শতকীয় মার্কো পোলোর ভ্রমণকাহিনীতেও আন্দামানীদের সম্বন্ধে অনেক অসত্য উক্তি মেলে। পর্যটক সিজার ফ্রেডারিক (১৫৬৬ খ্রীঃ) আন্দামানীদের বিষয়ে লিখেছিলেন ;

"......নাম আন্দে মাওন। এক বন্য জাতির অধিবাস। ছোট ছোট নৌকোর সাহায্যে তারা সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহে রত। তারা পরস্পরকে খেতে অভ্যস্ত। দৈব দুর্বিপাকে কোন জাহাজ যদি কখনও তাদের দ্বীপে আটকে যায় তা হলে একটি নাবিকও প্রাণ নিয়ে ফেরে না, সকলেই আন্দামানীদের উদরস্থ হয়। অন্য কোন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এদের যোগাযোগ নেই, কারও সঙ্গে নেই ব্যবসায়িক সম্পর্ক।"

বলা বাহুল্য, এ বর্ণনাও সত্যে-অসত্যে মেশানো। তবে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে লেখা বিভিন্ন পর্যটন-গ্রন্থ পড়ে এটা নিঃসন্দেহে জানা গেছে যে, বিদেশী বিজাতীয় লোকেদের প্রতি আন্দামানীরা স্বভাবতই অত্যন্ত বিরূপ ছিল।

আন্দামানীদের অস্তিত্ব আজ বিলুপ্তির পথে। মাত্র একশ' বছর আগেও **বড় আন্দামানে** আদিম মানুষের সংখ্যা অন্তত ৫০০০ ছিল ; আর ১৯৫৩ সালে এ সংখ্যা মাত্র ২৫ জনে এসে দাঁড়াল। আজ **এরা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।** বেঁচে আছে শুধু ছোট আন্দামানের **ওঙ্গে** উপজাতি, যাদের বর্তমান সংখ্যা ৫০০-র কাছাকাছি।* সুতরাং খাঁটি আন্দামানী বলতে এখন শুধু ওঙ্গেদেরই বোঝাবে, আর সব চাপা পড়ে আছে বিস্মৃতির কবরে।

সমাজের গড়ন

নৃতত্ত্ববিদ্গণ পৃথিবীর যাবতীয় মানুষকে তাদের শরীরের গঠন, গায়ের রঙ, মাথার চুল প্রভৃতি বিচার করে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন : ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, অষ্ট্রেলীয় এবং নিগ্রো জাতীয়। আন্দামানের আদিম বাসিন্দারা শেষোক্ত শ্রেণীতে পড়ে। এরা খর্বদেহ, কৃষ্ণকায়, কুঞ্চিতকেশ ও প্রশস্তনাসিক।

সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের আদি মানুষেরা নিগ্রো শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলেও আন্দামানী-দের দুটি প্রধান বিভাগ : (ক) বৃহৎ আন্দামানী দল ও (খ) ক্ষুদ্র আন্দামানী দল। বৃহৎ আন্দামানীরা—যাদের অস্তিত্বই আজ দুনিয়া থেকে মুছে গেছে—দশটি উপজাতিতে (Tribe) বিভক্ত ছিল—যেমন, আকা-চোরি, আকা-কেদে, আকা-বিয়া ইত্যাদি। বিভিন্ন উপজাতির বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা, তাদের ভাষাও সব আলাদা।

আন্দামানীদের কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি গোষ্ঠী, কয়েকটি গোষ্ঠী মিলে

* উপজাতি-বিশেষজ্ঞ লিডিয়ো সিপ্রিয়ানির হিসেব

এক একটি উপজাতি, এবং গুটিকতক উপজাতির সমবায়ে গড়ে উঠেছে বৃহৎ লোকসমাজ। সমাজের গড়নটা এই রকম :

পরিবার > গোষ্ঠী > উপজাতি > লোকসমাজ।

আন্দামানী সমাজে বিভিন্ন পরিবার বা উপজাতিগুলোর কিন্তু বিশেষ মূল্য নেই। গোষ্ঠীই সর্বেসর্বা। প্রতিটি নারী ও পুরুষ স্থানীয়-গোষ্ঠীর (Local Group) সম্পত্তি বলে বিবেচিত। খাদ্য আহরণ, জীবজন্তু শিকার, প্রাত্যহিক কাজকর্ম সমস্তই গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে তারা করে। প্রতিটি অঞ্চলের গোষ্ঠীগুলো পরস্পর সদ্ভাব বজায় রেখে বাস করে, মাঝে মাঝে ঝগড়া-ঝাঁটিও হয় আবার! যে যে-গোষ্ঠীতে জন্মায় সে সেই গোষ্ঠীরই লোক। তবে নিজের গোষ্ঠী ছেড়ে অপর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে আপত্তি নেই। অরণ্যবাসী ও উপকূলবাসী—বসতি-বিন্যাসের বিচারে এই হল গোষ্ঠীদের মোটামুটি দুটি বিভাগ।

খাদ্য-সন্ধান

খাদ্য উৎপন্ন করে নয়—সংগ্রহ করে পৃথিবীর যে সমস্ত লোক-সমাজ জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে, আন্দামানীরা তাদের অন্যতম। এদের খাদ্যের সংস্থান হয় দুই প্রকারে : আহরণ করে আর শিকার করে। এদের সম্পূর্ণ খাদ্যই যোগাড় হয় অরণ্য এবং উপকূল থেকে।

প্রথমে **অরণ্যচারী**দের কথাই ধরা যাক। সকালে ঘুম ভাঙার একটু পরেই কর্মচাঞ্চল্য জেগে ওঠে প্রতিটি শিবিরে। মেয়েরা থাকে গেরস্থালীর কাজে, পুরুষেরা তীরধনুক হাতে বেরিয়ে পড়ে শিকারের সন্ধানে। কুকুর সঙ্গে থাকে, খুঁজে বার করে বুনো শূয়োর আর বেড়াল।

এই শিকারী কুকুর রাখাও আবার এক সমস্যা। আজকাল কুকুরগুলো বাচ্চা শূয়োর দেখলেই খেয়ে ফেলছে। ফলে মনিবের আহার্যের পরিমাণ ক্রমশই কমে চলেছে।

আন্দামানীরা শিকার ধরে তখনই তার পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বাদ দিয়ে, মাংসটা আগুনে সেঁকে, ভাগাভাগি করে খেয়ে ফেলে। অথবা কাঁধে করে নিয়ে আসে আস্তানায়, যৌথ রান্নাঘরে সেই মাংস ঝল্সে নিয়ে প্রত্যেক পরিবারে বিতরণ করে দেয়। সাপ, গোসাপ, ইঁদুর শিকারও বাদ যায় না। তবে লক্ষণীয় হচ্ছে এই যে, আন্দামানীরা কখনও ফাঁদ পেতে পশু পাখী ধরে না।

এদিকে কুটিরের মেয়েরা ঘরের শিশুদের পরিচর্যার পর ফুরসৎ পেলেই ঢুকে

পড়ে জঙ্গলের মধ্যে। শাকসবজি, ফলমূল বা মৌচাকের মধু সংগ্রহ করে আনে বন থেকে। বয়ে আনে জ্বালানি কাঠ আর জল। পুরুষেরাও তখন শিকার নিয়ে ফেরেনি, খাবার যোগাড় হবে কিসে? তাই মেয়েরা সেই সময়টা আস্তানায় বসে চুপড়ি বানায়, মাদুর বোনে।

আরণ্যক মানুষদের জীবনযাত্রায় ঋতু-পরিবর্তনের প্রভাব যতটা সুপ্রকট, **উপকূলচারীদের** জীবনে ততটা নয়। সমুদ্রতীরের বাসিন্দারা সারা বছর
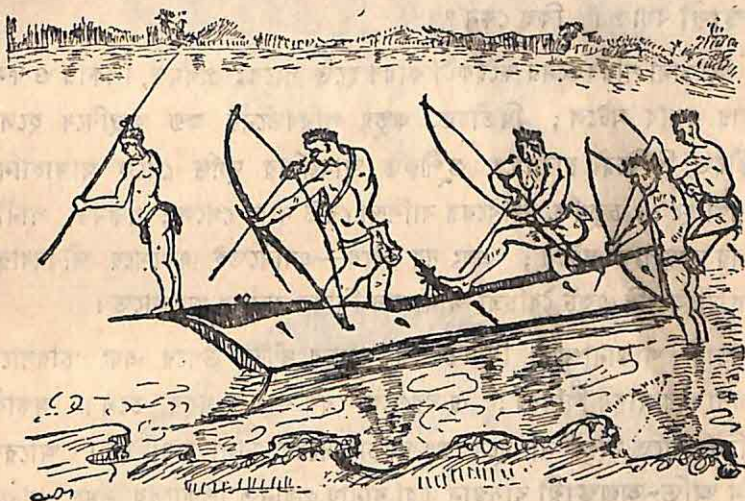
ধরেই জলচর প্রাণী শিকার করতে পারে। প্রয়োজন বিশেষে বনজ ফলমূল শাকসব্জিও এরা আহরণ করে। বর্ষাকালে মাছধরা ও পশু শিকার দুই-ই চলে। উপকূলে খাড়ির কাছে, শালতি বা ডোঙায় চড়ে তীরধনুক ও বর্শার সাহায্যে এরা মাছ কচ্ছপ ইত্যাদি শিকার করে।

একটা মজার ব্যাপার এই, আন্দামানীদের এক একটি দল যখন খাদ্য সংগ্রহ করে তখন কেবলমাত্র নিজস্ব এলাকার মধ্যেই অধিকার সীমাবদ্ধ থাকে। অন্য অন্য দলের এলাকায় ঢুকে শিকার অন্বেষণ করা অনধিকার চর্চা।

বসতি-বিন্যাস

সমুদ্রতীরবাসীই হোক আর অরণ্যচারীই হোক, আন্দামানের প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজের নিজের অঞ্চলের উপর মালিকানা থাকে। আবার গোষ্ঠীর অন্তর্গত খাদ্যান্বেষী বিভিন্ন দলেরও কয়েকটি নির্দিষ্ট বাসস্থান আছে। এসব জায়গাতেই তারা গাছের ডাল-পাতা দিয়ে চালাঘর বাঁধে। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে ছোট আন্দামানে কয়েকটি গুহারও সন্ধান মিলেছে।

সারা বছর কিন্তু একই জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকে না আন্দামানীরা। আরণ্যক দল ঘন ঘন ঘাঁটি বদল করতে পারে না, তার কারণ পরিবহণ সমস্যা। অর্থাৎ মালপত্র সরানোর হাঙ্গামা, এদিকে ডিঙিও নেই। সারাটা বর্ষা এরা কাটিয়ে দেয় একটা প্রধান ঘাঁটিতে, শীত ও গ্রীষ্মকালে সাময়িক কালের জন্য অন্যত্র বসতি স্থাপন করে। এদের বাসস্থানকে তাই বলা যায় **মোটামুটি-স্থায়ী** বসতি।

উপকূলচারীদের মধ্যে যাযাবর বৃত্তিটা বেশি চালু। এদের হচ্ছে তাই **অস্থায়ী** বসতি। কিন্তু কেন?

আস্তানা পরিবর্তনের কয়েকটা কারণ হতে পারে: প্রথমত, শিকার ও ফল-মূলের অভাব ঘটলে; দ্বিতীয়ত, ঋতুর পরিবর্তনের জন্য অসুবিধে হলে; তৃতীয়ত, শিবিরের চারপাশে স্তূপীকৃত আবর্জনার দুর্গন্ধ থেকে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা হলে; চতুর্থত, শিবিরের বাসিন্দা কেউ মারা গেলে; পঞ্চমত, পানীয় জলের দুষ্প্রাপ্যতা ঘটলে; এবং সব শেষে—এমনিতেই একঘেয়ে জীবনধারা, তার মাঝে যদি একটু বৈচিত্র্য আনা যায় শিবির বদলের অজুহাতে।

স্থায়ী আস্তানাগুলো নির্মিত হয় গাছের খুঁটির উপরে এবং চারপাশে তালপাতার মাদুর বিছিয়ে; এ ঘরগুলো বেশ কয়েক বছর চলে। অস্থায়ী বসতিগুলোতে মাদুর না বুনে শুধু পাতা দিয়েই চালা করা হয়। আরেক রকম **অতি-অল্পস্থায়ী** বাসস্থান এরা বানায় প্রধানত শিকারের সময়, দু'চার দিনের জন্য।

আস্তানাগুলোর গঠনপদ্ধতি কী রকম? একটা উপযুক্ত জায়গা সাফ করে আন্দামানীরা তৈরি করে **ছোট পল্লী,** অথবা একই চালার নিচে একসঙ্গে বাস করার উপযোগী একটি 'বুদ' বা **বড় যৌথগৃহ (Communal hut)**। যৌথগৃহের ঘরগুলো বিচ্ছিন্ন নয়। একটি ছাদ, দেয়াল ও বারান্দা পরস্পর সংলগ্ন—দেখতে অনেকটা মৌচাকের মতো। পল্লীগুলোর গড়ন খুবই সরল। পর পর আট-দশটি কুটির বৃত্তাকারে সাজানো, প্রত্যেক কুটিরের সম্মুখভাগ ভিতরের উঠোনের দিকে, উঠোনটি হচ্ছে নাচগানের জায়গা। এক প্রান্তে যৌথ রান্নাঘর, তারই পাশের কুটির অবিবাহিত পুরুষ ও বিপত্নীকদের থাকবার জন্য নির্দিষ্ট। একটি কুটির প্রাপ্তবয়স্কা কুমারী ও বিধবাদের জন্য। আর সব কুটিরে থাকে বিবাহিতরা শিশুদের নিয়ে। প্রত্যেক আন্দামানী পরিবার এইভাবে জীবন কাটিয়ে চলে এক একটি পল্লীতে বা যৌথগৃহে। কী সুন্দর এদের যৌথ জীবনযাত্রা, দৃঢ়বদ্ধ সমাজজীবন।

উপরে—যৌথগৃহের কাঠামো। মধ্যে—আন্দামানীদের যৌথগৃহ। নিচে—আন্দামানী পল্লী : ক—বিবাহিতদের ঘর। থ—কুমারদের ঘর। গ—কুমারীদের ঘর। ঘ—যৌথ রান্নাঘর। ঙ—নাচের আসর। ● ঘরের সামনে আগুন।

পোশাক আসবাব হাতিয়ার

সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, তেমনি সাধারণ তাদের বেশভূষা। আর বেশভূষাই বা বলি কাকে ? একরকম বলতে গেলে নগ্ন দেহেই থাকে এরা। আধুনিক কালে ঔপনিবেশিকদের সংস্পর্শে এসে অল্প-স্বল্প জামা কাপড় পরতে শিখেছে। আন্দামানীরা নানা অলংকরণে নিজেদের দেহ সাজাতে ভারি পছন্দ করে। নানা রঙের মাটি দিয়ে শরীরে কত নক্শা আঁকে, উল্কি কাটে। মেয়েরা পরে ঝিনুকের গয়না, শামুকের মালা।

পোশাক-পরিচ্ছদে যেমন ভোলানাথ, ঘরের আসবাব বা বাসনপত্রেও তেমনি সাদাসিধে ভাব। শামুকের খোলা, ঝিনুক, হাড়, কাঠ, মাটির হাঁড়ি-কলসী ইত্যাদি হচ্ছে তাদের রান্নার পাত্র। শোবার জন্য বেতের উঁচু মাচা। চুপড়ি বা মাদুর অতি চমৎকার বোনে এরা।

হাতিয়ারের মধ্যে প্রধান হচ্ছে তীরধনুক ও বর্শা। আন্দামানীরা সব তীরন্দাজ মানুষ। তীর ও বর্শার ফলা প্রস্তুত হয় হাড় থেকে, গাছের তন্তু থেকে ধনুকের গুণ। আর আছে কুড়ুল, মাছ ধরার জাল এবং জলযান হিসেবে কাঠের ভেলা ও ডোঙা।

সমাজের আর্থিক বনিয়াদ

আন্দামানী সমাজের অর্থনীতিক ভিত্তি সাধারণভাবে **সাম্যবাদী** বলা চলে। দ্বীপপুঞ্জের জমি—যা তাদের খাদ্য যোগান দেয়—কারও একার সম্পত্তি নয়, সমস্ত গোষ্ঠীর। গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট এলাকায় সেই গোষ্ঠীভুক্ত সকলেরই শিকার বা আহার যোগাড় করার অধিকার আছে। তবে শিকার বা সংগৃহীত বস্তুটিকে শিকারী বা সংগ্রহকারীর ব্যক্তিগত মালিকানা জন্মে। বন্য বা সামুদ্রিক জীবজন্তু সর্বপ্রথম দেখে যে তীরবিদ্ধ করবে সেটা তারই। বনের কোলে গাছ যে আগে দেখেছে তার ফলমূল সব তারই। সেই গাছ কেটে যে ডোঙা হবে, সেটারও মালিক সে-ই। কি পুরুষ, কি নারী—এসব ব্যাপারে সবায়ের সমানাধিকার।

এই সাম্যবাদী সমাজের মানুষ বলেই আন্দামানীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও পরকে বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠা নেই, কার্পণ্য নেই। কেউ চাইলে তাকে না দেওয়া ওদের চোখে চরম অভদ্রতা। এটা আমার জিনিস, ওটা তোমার—এ ধরনের ভেদবুদ্ধি ওদের চিন্তায় আদপেই নেই।

শাসন-ব্যবস্থা

স্কুল, ক্লাব, গভর্ণমেণ্ট কি ভাবে কাজকর্ম চালায়? নিশ্চয়ই তার নিয়মকানুন আছে, আছে শাসনতন্ত্র। আন্দামানের এই আদিবাসী সামাজে কিন্তু কোন বাঁধাধরা শাসনতন্ত্র খুঁজতে গেলে ভুল হবে। পুরুষ-পরম্পরায় প্রচলিত রীতিনীতিগুলোই এখানকার আইন-কানুন। সমাজের বায়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরাই গোষ্ঠীর মাতব্বর। তাদের নির্দেশ মেনে চলতে হয় সবাইকে। সর্দার কিন্তু তার ক্ষমতার কখনও অপপ্রয়োগ করে না, ছোটদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বজায় রেখেই সে তার দায়িত্ব পালন করে যায়। শ্রদ্ধেয় পুরুষদের সম্বোধন কালে সম্মানসূচক 'মাই' বা 'মাইয়া' (আমাদের যেমন মিস্টার বা মশাই) বলা হয়, আর শ্রদ্ধেয় স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে 'মিমি'। সবচেয়ে দামী কথা এইটে যে, এই দ্বীপের উপজাতিদের মধ্যে **নারীর মর্যাদা** পুরুষের সমান, সমাজের বহু কাজে মেয়েরাই বেশি অগ্রণী। ছুনিয়ার অনেক সভ্যসমাজেও নারীকে এতটা সম্মানের চোখে দেখা হয় না।

তাই বলে আন্দামানী সমাজ একেবারে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য মোটেই নয়। এখানেও খুন জখম চুরি অন্যায় সবই হয়, তবে তার সংখ্যা খুব কম। এসব অপরাধ সমাজবিরোধী কাজ বলে গণ্য হয়।

ধর্ম ও ক্রিয়াকাণ্ড

ঐ যে বললাম সনাতন রীতিনীতির কথা, ওগুলো যে অন্ধভাবে মেনে চলে আন্দামানীরা তার কারণ ওরা জানে এই প্রথাগুলো মেনে চললেই নানা অমঙ্গল এড়ান যায়। অমঙ্গল সৃষ্টি করে ভূতপ্রেতেরা। প্রকৃতির ছুলাল অই আন্দামানীরা **ভূতপ্রেতে** অত্যন্ত বিশ্বাসী। সমুদ্রে ভূত আছে, ভূত আছে আকাশে, তাই ক্ষণে ক্ষণে পড়ে বাজ, বিদ্যুৎ চমকায়। ভূত আছে অরণ্যে, মাঝে মাঝে হারিয়ে যায় পথের ঠিকানা। তারপর রাতের অন্ধকারে ভূতেরা সব দল বেঁধে কুটিরের চারধারে ঘুরে বেড়ায়।

এদের ধারণা মৃত্যুর পর মানুষ ভূত হয় আর নানারকম অসুখ-বিসুখ ছড়িয়ে বেড়ায়। কেউ পীড়িত হলে আন্দামানীরা মনে করে তার শরীরে দৈবশক্তি ভর করেছে। কী ভয়ানক বিশ্বাস!

আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমাদের মনেও এরকম কত অসংখ্য অন্ধবিশ্বাস বাসা বেঁধে আছে। বারব্রত ষষ্ঠীপূজা লক্ষ্মীপূজা মনসাপূজা শীতলাপূজা— এ সবের লক্ষ্য কী? প্রত্যেক পূজার মূলে আছে লোভ বা অর্থকামনা, কিংবা

বিপদ হতে উদ্ধার পাবার জন্য ব্যাকুলতা। এর মধ্যে ধর্মের সেই উদার প্রসারতা কোথায়? কোথায় সেই গীতা-বেদ-উপনিষদের উদাত্ত ধর্মবাণী, সেই বীর্যের ঘোষণা: 'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্'?

আন্দামানীদের জীবনেও ঠিক তাই। ভূতপ্রেতকে কুটিরের কাছ থেকে দূরে রাখার উপায় কী? আগুন জালিয়ে রাখ, ধনুর্বাণ রাখ, রাতে শিস্ দিয়ো না কেউ। মৌচাক, হাড় বা লাল রঙ মাদুলির মতো ধারণ কর দেহে। তারা বলে যে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমীর বায়ুর সঙ্গে থাকেন 'তেরাই' বা 'দেরিয়া'—বৃষ্টির দেবতা। আর উত্তর-পূর্ব মৌসুমীর সঙ্গে 'বিলিকু' বা 'পুলগা'—ঝড় ও বিদ্যুতের দেবতা। এই দুই দেবতাকে পূজো দিয়ে খুশি করতে পারলেই মঙ্গল, আর এঁরা যদি একবার ক্রুদ্ধ হন তা হলে কারও নিস্তার নেই।

মৃতদেহকে এরা কবর দেয়—মৃতব্যক্তিরই আপন শয্যাস্থানের নিচে, পুরাতন-প্রস্তর যুগের গুহাবাসী লোকদের মতন। মৃত্যুর একসপ্তাহ পরে কবর থেকে মৃতব্যক্তির চোয়ালের হাড় তুলে নিয়ে তাতে লাল রঙ মাখিয়ে নিজেদের গলায় ঝুলিয়ে রাখে আত্মীয়রা।

সব রকম অশরীরী আত্মাকে ভয় করে আন্দামানীরা, আর সম্মান করে **জাদুশক্তির** অধিকারীদের। শরীর থেকে মন্দ আত্মাকে তাড়িয়ে রোগমুক্ত করতে পারে জাদু-জানা ব্যক্তিরা, নিশ্চয়ই এদের যোগাযোগ আছে ভূত এবং দেবতাদের সঙ্গে।

নৃতত্ত্ববিদ্গণ বলেন, জাদুর মূলে সর্বদাই একটা **উদ্দেশ্য** থাকে। জীবনের কামনাকে সফল করার উদ্দেশ্য ও আয়োজন। আন্দামানীদের অধিকাংশ জাদুই শিকার অথবা ফল আহরণ সংক্রান্ত।

সংগ্রহের ব্যাপারটা ভারি মজার। এরা বিশ্বাস করে যে বনের সমস্ত ইয়ামের (একপ্রকার মূল বা কন্দ—আমরা যাকে বলি চুপড়ি-আলু) মালিক হচ্ছে ভূত-প্রেতেরা, কাজেই মাটি থেকে ইয়াম তুলে নিলে গোঁসা হবে তাদের। এরা তখন ফন্দি আঁটে। ইয়ামের শাঁসাল বড় অংশটা কেটে নিয়ে শিকড়ও পাতা-সুদ্ধ বাকী অংশটা আবার মাটিতে পুঁতে রাখে। মনে হবে যেন কেউ ইয়াম স্পর্শ করেনি, ভূতেরাও বোকা বনবে! এদিকে হয় কি, ফেলে-দেওয়া বাকী অংশটা কয়েক মাসের মধ্যেই নতুন মাথা নিয়ে গজিয়ে ওঠে, অরণ্যে ইয়ামের কোনোদিনই অভাব হয় না। একটা ফল যাতে সর্বদা পাওয়া যায় তার পিছনে ধর্মবোধ ও বাস্তব প্রয়োজনবোধের কী চমৎকার মিশ্রণ ঘটেছে! এখানে আন্দা-মানীদের কুসংস্কারই একটা আহার্য বস্তুর অভাব ঘোচাতে সাহায্য করেছে।

আমাদের হিন্দু-ব্রাহ্মণ সমাজে পুত্রদের 'উপনয়ন' হয়, তোমরা জান। পৈতে যতদিন না হচ্ছে ততদিন সে ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য নয়। আন্দামানী ছেলেদের—এবং মেয়েদেরও জীবনে এরকম একটা অনুষ্ঠান আছে। এগার বছরে পা' দিতেই তাদের একটা **উপবাসব্রত** পালন করতে হয় কয়েকদিনের জন্য। এই সময়টা শূকরের মাংস, কচ্ছপ, মধু ইত্যাদি খাদ্য গ্রহণ করা একেবারে নিষিদ্ধ। 'নতুন ব্রহ্মচারী'র আত্মসংযম পরীক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য। যেদিন ব্রহ্মচারী তার কচ্ছপ-উপবাস ভাঙবে, সেদিন কচ্ছপের প্রকাণ্ড একখণ্ড চর্বি আগুনে সেদ্ধ করা হয়। তারপর সেটাকে ঠাণ্ডা করে সর্দার ঢেলে দেয় ব্রহ্মচারীর মাথায়, উপস্থিত সকলে চর্বিটাকে মাখিয়ে দেয় তার সর্বাঙ্গে। এবার কচ্ছপের মাংস ভোজন করিয়ে তাকে ঘরে আনা হয়। সে জোড়াসন হয়ে বসে থাকে নিশ্চুপ, বন্ধুবান্ধব মন্ত্র পড়ে জাগিয়ে রাখে তাকে। এখন জীবন-নাট্যের এক গুরুত্বপুর্ণ অঙ্কে সে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, সেই দুর্ভাবনায় তার মা-মাসিদের সে কী কান্না! যা হোক, চোখের জল শুকোলে তারাই আবার ব্রহ্মচারীর দেহ নানা রঙে সাজিয়ে দেয়। এবার হাতে কয়েকগাছি পাতা নিয়ে সে নাচ আরম্ভ করল, নাচের সঙ্গে তাল দিতে লাগল মেয়ে-পুরুষের দল। তাণ্ডব নৃত্যের শেষে ব্রহ্মচারী তার উপজাতি সমাজের সাবালক সভ্য-পদে উন্নীত হল।

কচ্ছপ-উপবাস প্রথম, তারপর মৎস্য ও মধু উপবাস, এবং সবশেষে শূকর-উপবাস। প্রথম অনুষ্ঠান থেকে তৃতীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রায় বছর-খানেকের ব্যবধান।

আমোদ-প্রমোদ

আন্দামানী জীবনযাত্রার কর্মমুখর, গাম্ভীর্যময় প্রকাশ হচ্ছে আহার্য সংগ্রহে। আর তার হালকা, আনন্দরসস্নিগ্ধ প্রকাশ নাচগানের আসরে। সমস্ত দিন হাড়-ভাঙা খাটুনির শেষে ক্লান্ত হয়ে আস্তানায় ফিরে আসে পুরুষেরা, রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ হলে মাঝখানের আঙিনায় এসে সকলে জমায়েত হয়, বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে শুরু হয় সমবেত নৃত্যগীত। কিংবা কোনদিন একজন শিকারীকে ঘিরে বসে তার মুখে শোনে অদ্ভুত রোমাঞ্চকর শিকার-কাহিনী। কিছুটা সত্য, খানিকটা কল্পনার রঙ মেশানো; তাই তো এত সুন্দর, এত চিত্তাকর্ষক। গল্প বলতে বলতে রাত বাড়ে, শ্রোতাদের শ্রান্ত চোখে নেমে আসে ঘুম।

জীবনের টুকরো কথা

অধ্যাপক লিডিয়ো সিপ্রিয়ানি। আন্দামানী উপজাতিদের সম্বন্ধে গবেষণার জন্য এঁকে পাঠিয়েছিলেন (১৯৫১-৫৩) ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব বিভাগ। এই প্রত্যক্ষদর্শীর দিনপঞ্জী থেকে খানিকটা শোনা যাক :

"ওঙ্গেরা দা উপহার পেয়ে তো মহা খুশী—এর আগে এ অস্ত্রটি চোখেই দেখেনি তারা। বনের পথে যেতে যেতে যা সামনে পেল তা-ই কাটবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।…সন্ধ্যের আগে জঙ্গল থেকে ফিরল দুটি লোক—পিঠে দুটো মরা শূয়োর, সঙ্গে এক ডজন কুকুর। আমি সবাইকে চা, চিনি, লাল ও সাদা রঙের কাপড় আর শুকনো তামাক পাতা বিতরণ করলাম। ওরা খুশী হল পেয়ে। প্রতিদানে আমাকে দিল তীরধনুক আর কয়েকটি পুরাতাত্ত্বিক নমুনা। ঘাঁটিতে এক বুড়োকে দেখলাম, পায়ে ঘা'। আমি ঘা'গুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে, ব্যাণ্ডেজ করে দিলাম পা'। ওরা কিন্তু ব্যাণ্ডেজের কদর বুঝল না, মনে করল বুঝি অলঙ্কার। কিছুক্ষণ পরে দেখি বুড়ো লোকটা 'গয়না'র সদ্ব্যবহার করেছে—ব্যাণ্ডেজটা খুলে তার কচি বৌয়ের মাথায় পরিয়ে দিয়েছে সেটা।…

"আমরা পৌছলাম উকুরেক এলাকায়…একটা অস্থায়ী শিবির।…ঘরের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক বসে আছে মাচার ওপর। আমার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে সে অবাক চাহনি মেলে আমায় দেখতে লাগল। তার দেহ নিস্পন্দ, কিন্তু ডান হাত নেড়ে আমায় যেন বার বার নমস্কার জানাচ্ছে। এরকম অস্বাভাবিক অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে আমিও তাকে নমস্কার করলাম। এতে সে আরও বিস্মিত হয়ে গেল। কাছে, আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে বুঝলাম স্ত্রীলোকটি মৃদু মৃদু হাত নেড়ে শুধু মাছি তাড়াচ্ছিল !

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

সুপ্রাচীন এক মানবগোষ্ঠীর লুপ্তপ্রায় বংশধর এই আন্দামানীরা, এতে আমরা নিঃসংশয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বংশ-পরম্পরায় এরা রক্ষা করে আসছে সেই সমস্ত রীতিনীতি ও জীবন প্রণালী, যার অস্তিত্ব মুছে গেছে সকল মহাদেশেই। আন্দামানী সংস্কৃতি **প্রাক্-প্রস্তর যুগের** বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। অর্থাৎ এমন যুগে,

যে সময় মানুষ পাথরের ব্যবহার জানত না, শুধু কাঠ হাড় আর শামুকের খোলা দিয়ে বানাত হাতিয়ার।* আগুন তৈরির কায়দা আজও জানে না এরা। তাই যেখানেই যায় সর্বদা হাতে থাকে মশাল, রাত্রিতে বিছানার পাশে জ্বলন্ত আগুন। লবণ প্রস্তুত করার কৌশলও এদের অজ্ঞাত, নিমক ছাড়াই এরা আহার করে।

আন্দামানে বিদেশী উপনিবেশ

"যার যাহা আছে তার থাক তাই
কারো অধিকারে যেতে নাই চাই,
শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই
একটি নিভৃত কোণে।"

সাগরঘের একটি নিভৃত দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে নিস্তব্ধ অরণ্যের কোলে একদল আদিম মানুষের বাস। বাইরের জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্কই তারা রাখে না। বিদেশী আগন্তুক দেখলে তার প্রতি মৃত্যুবাণ ছুঁড়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছে কয়েক বছর আগেও।

দেশান্তরের সভ্য মানুষেরা কিন্তু এদের নিভৃত শান্তির জীবন নয়-ছয় করে দিল। ভারতের গভর্ণর-জেনারেল কর্ণওয়ালিসের নির্দেশে প্রথম ১৭৮৯ সালে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর জন্য আন্দামানে এক **সৈন্যনিবাস** স্থাপিত হল। কিন্তু অস্বাস্থ্যকর বিবেচনায় ১৭৯৬ সালে উপনিবেশটি উঠে গেল। তারপর প্রায় যাট বছর আন্দামানীদের নির্ঝঞ্ঝাট জীবন।

এর পর ১৮৫৭ সালে গড়ে ওঠে **কয়েদীনিবাস**—দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত ভারতীয়দের জন্য। এদের বংশধর যারা দ্বীপের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে রইল তাদের সমাজের নাম হল Local-born community বা 'স্থানীয় সমাজ'।

শুধু বন্দীনিবাস স্থাপনই বেনিয়া ইংরেজের লক্ষ্য ছিল না। ভারত মহাসাগরের পথে বাণিজ্য করতে হলে আন্দামানের মতো দ্বীপেই বন্দর প্রতিষ্ঠা

*"No doubt, we must attribute to prelithic, or anyhow to remote prehistoric age, many details of the Onge culture."—Lidio Cipriani.

করা যুক্তিযুক্ত। তার উপর অরণ্যে এত প্রচুর কাঠ। বেশ ফলাও করেই ব্যাবসার জাল পাতা হল!

তারপর কয়েদীনিবাসও উঠে গেল। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর এখানে তৈরি হল **উদ্বাস্তু-নিবাস।** চাষবাস ও নানা শিল্পকর্মের মাধ্যমে ভাগ্যহীন বাঙালী ভাইবোনেরা আজ আন্দামানের মাটিতে তাদের ছিন্নমূল জীবনকে বাঁচিয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।

আর এসেছে **তামিল-তেলেঙ্গী** জেলেরা। হার্পুণ জাল ইত্যাদি আধুনিক হাতিয়ারের সাহায্যে তারা সমুদ্রে মাছ ও কচ্ছপ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। ছোট আন্দামানের বাসিন্দা ওঙ্গে-দের সূচ্যগ্র ভূমিতেও কেউ হাত দেয়নি আজও।

আধুনিকতম সমস্যাবলী

আন্দামানে বনসম্পদের খ্যাতি দেশ বিদেশে বিস্তৃত। এখানকার কাঠের চাহিদা বিদেশের বাজারে এখন প্রচুর। খুব শক্ত 'গর্জন' জাতীয় কাঠ ট্রেনের লাইন পাতার জন্য বিশেষ উপযোগী। এগুলো অধিকাংশ চালান যাচ্ছে সুদানে। দেশলাই এবং আসবাব তৈরির কাঠেরও খুব চাহিদা। এসব শিল্পকর্মের জন্য আন্দামানের বনবিভাগের কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছেন আরও উন্নত ধরনের কাঠ উৎপন্ন করতে। ১৯৫৪-৫৫ সালে এ বিষয়ে কাজ শুরু হয়। দক্ষিণ আন্দামান দ্বীপে ১২০ একর জমিতে সেগুন কাঠের চাষ আরম্ভ হল। তারপর থেকে অন্যান্য দ্বীপেও প্রতিষ্ঠিত হল এ ধরনের বাগিচা। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আন্দামানের বরাতে কিছুই জোটেনি। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় **বন-উন্নয়ন** খাতে পাঁচ কোটিরও বেশি টাকা ভারত সরকার বরাদ্দ করেছেন। বহু অফিসার নিযুক্ত হয়েছেন এ দ্বীপে; কিন্তু কয়েকটি নতুন রাস্তা তৈরি হওয়া ছাড়া উল্লেখযোগ্য কাজ আজ পর্যন্ত কিছু হয়নি।

এখানকার **জলের সমস্যা** দিন দিনই গুরুতর হচ্ছে। জলের অভাবে তরিতরকারিও অগ্নিমূল্য। সম্প্রতি মাছও দুষ্প্রাপ্য হয়েছে। কেন না, তেলেঙ্গী জেলেরা অনেকেই দেশে ফিরে যাচ্ছে, কারণ মদের অভাব। আন্দামানে মদ তৈরি করা বে-আইনী, বাইরে থেকে মদ আমদানি করাও নিষিদ্ধ।

এর পর আদিম উপজাতিদের **বংশলোপের সমস্যা।** ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা এদের মধ্যে সভ্যতা বিস্তারের চেষ্টা অবশ্যই করেছে। কিন্তু এ

প্রয়াস বিশেষ ফলপ্রদ হয় নি ; কারণ আন্দামানীরা নিজ ভূমিতে বিজাতীয়ের পদার্পণ আদপেই পছন্দ করেনি। বিশেষজ্ঞরা বলেন ইউরোপীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলেই আন্দামানীরা নির্বংশ হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ কী ? শুধু কি ব্যাধি সংক্রামিত হচ্ছে বলে, না কি সভ্য মানুষের নতুন, কুসংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে আন্দামানীদের যুগপ্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও জাদুশক্তির সার্থকতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে বাঁচবার উৎসাহ তাদের কমে যাচ্ছে বলে ?

ওঙ্গেরা আজ সুখে-শান্তিতে বাস করছে। খাদ্য যেমন প্রচুর মেলে, ওদের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যও তেমনি চমৎকার। সভ্যতার লক্ষ্য যদি হয় মানুষের জীবনে সুখ বিধান করা, তাহলে আদিম আন্দামানীদের চেয়ে সুখী আর কে আছে ? আবার এটাও ভুললে চলবে না যে, নীলগিরির টোডা (তাদের সংখ্যা আজ মাত্র ৩০০) বা আন্দামানীদের মতো মানুষের জীবনে **সভ্যতার মানেই বংশলুপ্তি**। পৃথিবীর ইতিহাস তো বারে বারে একথারই সাক্ষ্য দিয়েছে। কাজেই এক্ষেত্রে আমাদের উচিত হচ্ছে ওঙ্গেদের শান্তিনিকেতনে গিয়ে উৎপাত না করা। দুনিয়ার সব সভ্যজাতি লুপ্তপ্রায় জীবজন্তু গাছপালা রক্ষা করতে আজ ব্যগ্র, লুপ্তপ্রায় আন্দামানী জাতটাকে রক্ষা করাও কি তাদের কর্তব্য নয় ? আমরা তাই বলি কি "ওঙ্গে এলাকা" নাম দিয়ে ছোট আন্দামান দ্বীপটাকে সংরক্ষিত বলে ঘোষণা করা হোক, গভর্ণমেণ্টের অনুমতি ছাড়া কারও সেখানে প্রবেশাধিকার থাকবে না। কোনো উপনিবেশও চলবে না স্থাপন করা।

সারা ভারতবর্ষে আদিম উপজাতির সংখ্যা আজ প্রায় দু'কোটি। শিক্ষায় এরা পশ্চাৎপদ, আধুনিক সমাজের গতিবিধির সঙ্গেও অপরিচিত। কাজেই এদের সমস্যাও খুবই জটিল। এ ক্ষেত্রে সভ্যসমাজের কাছে এরা প্রত্যাশা করে সহানুভূতি ও দরদ। ১৯৫২ সালে নয়াদিল্লীর উপজাতি উন্নয়ন-বিষয়ক সম্মেলনে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সুচিন্তিত ভাষণ সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। তারই খানিকটা উদ্ধৃত করে বর্তমান আলোচনার পূর্ণচ্ছেদ টানা যাক :

"আমার মনে হয় এদের শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে, উন্নত করতে হবে আর্থিক জীবন। এরা পারিপার্শ্বিক সমাজের সঙ্গে মিশে জীবন যাপন করবে, নিজেদের পৃথক উপজাতীয় অস্তিত্ব বজায় রেখে চলবে—সেটা স্থির করার ভার তাদেরই ওপর ছেড়ে দিতে হবে। স্বতন্ত্র সামাজিক সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতেই যদি তারা চায়, তা অসম্ভব হবে না বিচিত্র-জীবনের-দেশ এই ভারতবর্ষে। আর যদি তারা মনে করে যে মিলে-মিশে থাকলেই তাদের মঙ্গল হবে, তা হলে তাও তারা করতে পারবে আমাদের ব্যাপক চেষ্টা ব্যতিরেকেই॥"

অনুশীলনী

১। আমাদের নিজেদের অতীতকে ঠিকমতো চিনতে হলে পৃথিবীর আনাচে কানাচে পড়ে-থাকা অসভ্য মানুষগুলির কথা ভাল করে জানতে হবে।—আন্দামানী উপজাতিদের জীবনযাত্রা আলোচনা করে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত কর।

২। আন্দামানের জনসংখ্যা-ক্রম :

সন		
১৮৫৮	৪,৮০০	জন
১৮৮১	৩,২৫০	
১৯০১	১,৮৮২	
১৯১১	১,৩১৭	
১৯২১	৭৮৬	
১৯৩১	৪৬০	
১৯৫৩	৫২০	

উপরের পরিসংখ্যানটিকে রৈখিক লেখ-চিত্রে (Line graph) এঁকে দেখাও এবং এটি অবলম্বনে একটি বিবরণী প্রস্তুত কর।
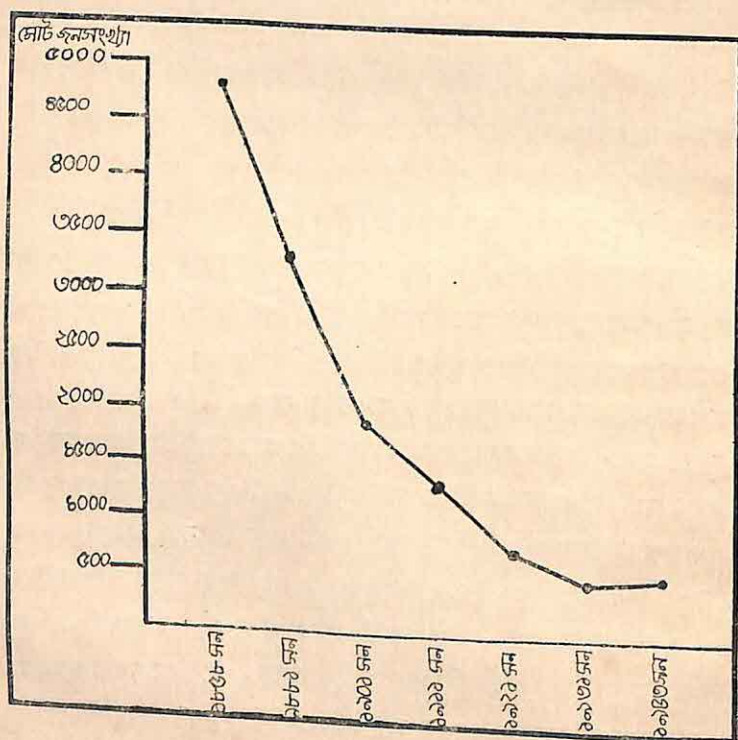
৩। তোমাদের ক্লাবের আইনকানুনের সঙ্গে আন্দামানী সমাজের বিধি-নিয়মের পার্থক্য কোথায়? অনমনীয় (rigid) শাসনতন্ত্র আর নমনীয় (flexible) শাসনতন্ত্র—এ দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টি ভাল, দৃষ্টান্তসহ বিশ্লেষণ কর।

৪। আদিম মানুষেরা এমনই অসহায় যে, তাদের জীবনসংগ্রামের জন্য জাদুবিশ্বাসের ওপর নির্ভর না করে উপায় নেই।—আন্দামানের অধিবাসীদের জীবনে জাদুর প্রভাব কতখানি?

৫। ১৮৫৮ সাল আন্দামানীদের জীবনে এক বিপর্যয়কারী তারিখ—এ উক্তিটিকে বিশদ কর।

৬। বড় আন্দামানের উপজাতিদের বংশলোপের জন্য বিদেশী উপনিবেশ গুলি কতটা দায়ী? অসভ্য আন্দামানীদের মধ্যে সভ্যতা বিস্তারের চেষ্টা তাদের জীবনে সর্বনাশ ডেকে এনেছে—একথা কতদূর সত্য? এ ধরনের উপজাতিদের এখনও বাঁচিয়ে রাখা উচিত কেন? এ সম্পর্কে সভ্যসমাজের কর্তব্য কী?

৭। আন্দামানীদের মতন ভারতবর্ষের অন্যান্য উপজাতির মধ্যেও কি লোকক্ষয় ঘটছে? [দলগত কর্মোদ্যোগ : ক্লাসের ছাত্ররা কয়েকটা দলে বিভক্ত হয়ে আসামের নাগা-কুকী-গারো, বাংলা ও বিহারের সাওতাল-ওঁরা-মুণ্ডা-বিরহো, উড়িষ্যার হো, মধ্যভারতের ভীল, নীলগিরির টোডা এবং কেরালার কাডার-পালাইয়ান ইত্যাদি উপজাতির সম্পর্কে মোটামুটি তথ্য সংগ্রহ করে 'ব্যবহারিক সংকলন' পুস্তকে বিবরণী লিখে রাখবে।]

৮। শুধু খাদ্য সন্ধানই নয়, আন্দামানী সমাজে উৎসব-অনুষ্ঠানও একটি প্রধান বিষয়—এ কথাটির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন কর।

৯। নিম্নোক্ত সমস্যাগুলোর সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করে তার প্রতিকারের উপায় নির্দেশ কর।

(ক) "বহু ওঙ্গে আজকাল ঔপনিবেশিক চোরাকারবারীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে শূয়োরের চামড়া, কচ্ছপের খোলা, ঝিনুক ইত্যাদির বিনিময়ে মাদক দ্রব্য, তামাক ইত্যাদি গ্রহণ করেছে।"

(খ) "সভ্যজ্যাতি উপহারের সামগ্রী দিতে গিয়ে আন্দামানীদের ভিক্ষুক করে তুলেছে।"

(গ) "আন্দামানের মৃৎশিল্প সম্প্রতি নষ্ট হতে বসেছে।"

(ঘ) "দ্বীপপুঞ্জে শূয়োরের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।"

১০। অভিনয়ের আসর॥ ওঙ্গে উপজাতির খাদ্য-সন্ধান ও উৎসব অনুষ্ঠান বিষয়ক একটি নাটিকা রচনা কর। তারপর তাদের মতো সাজ-পোশাক ঘরবাড়ি তৈরি করে, নাটিকাটি অভিনয়ের আয়োজন কর।

১১। মডেল তৈরি কর॥ আন্দামানীদের নানাধরনের বাসগৃহ।

১২। চল যাই প্রদর্শনী॥ কলকাতার যাদুঘর ; বিজ্ঞান কলেজের নৃতত্ত্ব-বিদ্যার বার্ষিক প্রদর্শনী। এ সব প্রদর্শনী দেখে এসে তোমাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ 'ব্যবহারিক সংকলন' পুস্তকে লিপিবদ্ধ কর।

১৩। ফিল্ম প্রদর্শনী॥ ভারত সরকারের তথ্য-মন্ত্রণালয়ের তোলা আন্দামান সম্পর্কে ডকুমেণ্টারী ছবি।

[গুটিকতক আন্দামানী শব্দ : 'আকা' = মুখ। 'ওকোজুমু' = জাদুজানা লোক। 'এন্‌-ইরেগেল' = খাঁটি লোক (ওঙ্গে)। 'টেবোচনা' = কুমীর।]
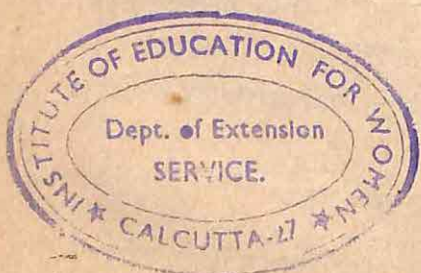
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

খাদ্য উৎপাদনের কাহিনী : আলমোড়ার সমাজ

প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিত্য লড়াই করে মানুষকে বাঁচতে হচ্ছে এ পৃথিবীতে। শুধু মানুষ কেন, দুনিয়ার যাবতীয় প্রাণী -মায় উদ্ভিদ্‌কে পর্যন্ত। এ লড়াইয়ে যার জিত সেই থাকবে টিঁকে। যে হারবে তার আর বাঁচোয়া নেই। এরই নাম জীবন-সংগ্রাম। এরই জন্য জীবনের কত সাধনা, কত কল্পনা, কত হাতিয়ার আর উপকরণের সাহায্যে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার দুস্তর চেষ্টা।

এই উপকরণগুলো আমরা পাই দুটি উপায়ে : হয় সংগ্রহ করে, নয়ত উৎপন্ন করে। প্রকৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে জীবনযাপনের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে দ্বীপবাসী আন্দামানীরা। তারা 'সংগ্রাহক মানবসমাজ'। আর চাষবাস ও পশুপালনের দ্বারা আরও উপাদান তৈরি করে বেঁচে আছে আলমোড়ার পার্বত্য জাতি। তারা 'উৎপাদক মানবসমাজ'। পরিবেশ এবং বৃত্তির দিক থেকে পার্থক্য থাকার দরুনই আন্দামানীদের থেকে আলমোড়াবাসীদের জীবনচর্যায় এত তফাত।

আন্দামানীদের জীবন তো দেখা হল। এবার আলমোড়ার পাহাড়ী উপজাতির কাহিনী।

ইতিহাসের ডায়েরী থেকে

আজ থেকে ষোলশ' বছর আগেকার একটি তারিখ। তৃতীয়-চতুর্থ শতকের ইতিহাস আলমোড়ার শিলাগাত্রে এখনও অক্ষুণ্ণ হয়ে আছে। কবে এসেছিলেন **ক্ষত্রী রাজারা** তা আজ আর কেউ বলতে পারবে না তবে কাতুর উপত্যকায় বৈজনাথে তাঁরা যে একদা রাজত্ব করতেন তার প্রমাণ আজও লোকের মুখে মুখে, তাঁদের স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ এখানে-ওখানে।

সপ্তম শতাব্দীর কাহিনী। চীনা পরিব্রাজক **হিউয়েন সাঙ** তরাই ও ভাবরের অরণ্যসঙ্কুল দুর্গম পার্বত্য দেশ পার হয়ে চলেছেন। হিংস্র ব্যাঘ্র, ক্ষুধার্ত হায়েনা আর বিষধর সর্পের বিচরণভূমি কুমায়ুন। সে-সবে ভ্রূক্ষেপ নেই। জ্ঞানভিক্ষু মহাস্থবিরের দুই দৃষ্টি প্রসারিত বহু উর্ধ্বের তুষারকিরীট শৈলশৃঙ্গ ব্রহ্মপুরের পানে।

দশম শতকে এলাহাবাদের নিকটবর্তী ঝুসি থেকে এলেন শ্যামচাঁদ। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে **চাঁদরাজা**দের অধিকার বিস্তৃত হল বহু ক্ষুদ্র পার্বত্য জাতির উপর। কল্যাণচাঁদ আলমোড়াতে স্থানান্তরিত করলেন তাঁর রাজধানী।

এর দুশ' বছর পর। রোহিলাখণ্ডের তখ্‌তে তখন আলি মহম্মদ খান। সেই সময় কুমায়ুনের গুহায় গুহায় সঞ্চিত হীরা-মণি-মাণিক্যের প্রবাদ তাঁর লালসা জাগিয়ে তুল্‌ল। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি (১৭৪৪ খৃঃ) কুমায়ুনের গিরিকন্দর প্রকম্পিত হল **রোহিলা** অশ্বখুরে। সেই প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে চাঁদ বংশীয় রাজারা খড়কুটোর মতোই উড়ে গেলেন। রোহিলা সেনা আলমোড়া লুণ্ঠন করল—কান্নার রোল উঠল নিরীহ পর্বতবাসীর কুটিরে কুটিরে।

ঐ শতাব্দীর শেষভাগে হল **গুর্খা** অভিযান। আলমোড়ার ভাগ্য-সূর্য আরেকবার হল অস্তমিত। তারপর টানা চব্বিশ বছর নেপালীদের রাজত্ব।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে আলমোড়ার শান্তি শেষবারের মতো বিঘ্নিত হল **ব্রিটিশ** আক্রমণে। ১৮৯৫, এপ্রিল মাস। মাকু ইস অব হেষ্টিংস তখন ভারতের গভর্ণর-জেনারেল। পাহাড়ে-অরণ্যে বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা। অবশেষে কর্ণেল নিকোলাস গুর্খাদের হাত থেকে আলমোড়া কেড়ে নিলেন। সগৌলির সন্ধির সর্তানুসারে গুর্খারা বাধ্য হল কালী নদীর ওপারে আপন বাসভূমি নেপালে ফিরে যেতে।

তারপর ভাগ্যের পরিহাসে ১৯৪৭ সালে ইংরেজকেও চলে যেতে হল—শুধু আলমোড়া ছেড়ে নয়—সমগ্র ভারতভূমি পরিত্যাগ করে।

ভূগোলের নক্‌শা

হিমালয়-দুহিতা আলমোড়া। পর্বতের দোলায় শুয়ে ছোট্ট মেয়ে যেন দোল খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়েছে। পাহাড়ের পর পাহাড়, মাঝে মাঝে উপত্যকা, আর যেদিকে তাকাও শুধু দেবদারু, ওক, পাইন ও রডোডেন্‌ড্রন বৃক্ষের

'প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে অরুণকিরণে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেন্‌ড্রন-গুচ্ছ।'

অরণ্য-সমারোহ। গিরিশৃঙ্গের মধ্যে নন্দাদেবী (২৫, ৬৬০ ফিট) ত্রিশূল ও দুনাগিরি উল্লেখযোগ্য।

প্রত্যেক উপত্যকার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে সব খরস্রোতা নদী। ভূতাত্ত্বিকদের মতে নদীর গতি তিন প্রকার: প্রাথমিক, মধ্য ও নিম্ন। কঠিন

পার্বত্য ভূমিতে চলতে চলতে পাথর শিলা সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে যখন নদী তীব্রবেগে পথ কেটে নেয় তখন তার **প্রাথমিক গতি**। আলমোড়ার পার্বত্য নদীগুলিও এমনি খরস্রোতা। কালী সরযূ রামগঙ্গা কোশী অলকানন্দা, আরও কত নদী! হিমবাহের মধ্যে নাম-করা হচ্ছে পিণ্ডার।

আলমোড়ার দক্ষিণে নৈনিতাল, পশ্চিমে গাড়ওয়াল, উত্তরে তিব্বত এবং পূর্বে নেপাল—যাকে আলমোড়া থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে কালী নদী। আলমোড়া, নৈনিতাল ও গাড়-ওয়াল—এই তিনটি জেলা নিয়ে কুমায়ুন বিভাগ। মানচিত্রে ক্যাপকট থেকে অ্যাসকট পর্যন্ত কোণাকুণি একটা কানিক রেখা (Second Territorial Line বা দ্বিতীয় সীমান্তরেখা) টেনে আলমোড়া জেলাকে দুভাগ করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব অংশের নাম **ভোটিয়া অঞ্চল** এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ **আলমোড়া অঞ্চল**। পাহাড়ের পাদদেশে বনাচ্ছাদিত, জলশূন্য ভাবর এলাকা। তার দক্ষিণে ঘন লম্বা ঘাসে পরিপূর্ণ বিখ্যাত তরাই—যার এলাকা পূর্বে নেপাল-দার্জিলিং পর্যন্ত বিস্তৃত।

বন ও পাহাড়ে ঘেরা বলে আবাদী জমি এখানে অতি অল্প। সমগ্র জেলার লোকসংখ্যা ৬ লক্ষ; তার মধ্যে ভোটিয়া এলাকায় বাস করে মোট জনসংখ্যার মাত্র কুড়ি ভাগের এক ভাগ।

আলমোড়ায় বছরে মোটামুটি **তিনটি ঋতু**র সাক্ষাত মেলে। পাহাড়ীদের ভাষায় (১) 'রুবী' বা গ্রীষ্মকাল—ফেব্রুয়ারী থেকে জুন; (২) 'চৌমাস বা বর্ষাকাল—জুন থেকে সেপ্টেম্বর; (৩) 'হিউন' বা শীতকাল—সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী। শীতের প্রকোপই খুব বেশী—এবং সেটা হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

চাষের কথা

সমগ্র আলমোড়ায় জমির পরিমাণ ৩৪, ৩০, ৩০০ একর। তার মধ্যে মাত্র তিন লক্ষ একর জমিতে লোকে চাষবাস করে। যেখানে পাহাড় আর অরণ্যই অধিকাংশ জায়গা দখল করে আছে সেখানে কৃষিকাজ খুবই দুঃসাধ্য। এজন্যই আলমোড়ায় দেখা যায় খণ্ড খণ্ড কৃষিক্ষেত্র—ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। জমির এই খণ্ডিত চেহারা চাষ ও চাষীর একটা মস্ত সমস্যা।

পার্বত্যভূমির মধ্য দিয়ে অসংখ্য ছোট নদী কুলকুল শব্দে বয়ে যাচ্ছে; সেই সব নদীর তীর থেকে চাষের জমিগুলি উঠে গেছে পাহাড়ের ওপর পর্যন্ত। পাহাড়ের গায়ে **ধাপ কেটে কেটে** (যাকে বলে terracing) ভোটিয়ারা ক্ষেতগুলো তৈরি করে, দেখতে ভারি সুন্দর। পাহাড়ী ঝর্নার জল বাঁধ দিয়ে রাখে এক জায়গায়, সেখান থেকে প্রয়োজন মত ছোট ছোট ধারায় জল চালান করে এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে।

ভোটিয়াদের আরেক রকম চাষ আছে, যার নাম **কাটিল প্রথা**। এক্ষেত্রে সিঁড়ি-প্রথায় জমি চাষ করার দরকার হয় না। বনজঙ্গল কেটে যে নূতন জমি পাওয়া গেল সেখানেই কাটা-গাছগাছড়াগুলো ফেলে রাখা হয়। সেগুলো শুকিয়ে জ্বালানির মত হলে তাতে আগুন ধরানো হয়। এ ছাই থেকে উত্তম সার হয়। বর্ষার প্রারম্ভে একদিন শুভক্ষণে বীজ ছড়ানো হয়। কাটিল চাষ কিন্তু সারা বছর চলে না।

জিবু নামক এক বিশেষ ধরণের গরুর সাহায্যে ভোটিয়ারা জমি চাষ করে। কিন্তু এটা অত্যন্ত অসুবিধেজনক বলে ওরা নিজেরাই কোমরে দড়ি বেঁধে লাঙল টানে, হাতে থাকে একটা লাঠি অবলম্বন হিসেবে। আরেকজন হাল ধরে থাকে পিছনে।

পাহাড়ে-জমিতে চাষের কাজ, নিশ্চয়ই খুব মেহনত-সাপেক্ষ। ক্ষেতিকারেরা তাই গান গেয়ে পরিশ্রমের ভার লাঘব করে। এর ফলে একঘেয়েমি যেমন দূর হয় তেমনি কাজে সংহতিও আসে। এদের **চারা রোপণের গানে** একজন থাকে মূল গায়েন, পাহাড়ী ভাষায় বলে 'হুরকিয়া'। নানা পৌরাণিক গল্প এবং গ্রাম্য গাথা গেয়ে যায় হুরকিয়া, আর যারা চাষ করছে, সকলে এই সঙ্গীতে যোগ দেয়। নিচের গানটি জমির সম্পদ ও উর্বরতা বৃদ্ধির কামনায় ভূমিদেবতার উদ্দেশে রচিত। পাহাড়ী ভাষা বাংলায় অনুবাদ করে দেওয়া হল:

ভুঁই-দেবতা মোদের পানে মুখ তুলে চাও
মুখ তুলে চাও আজি।

আমার লাগি আমার বাপের ঘরকন্নার লাগি
মুখ তুলে চাও আজি
গঙ্গাজলের মতই তুমি বও করুণার বান।
দুধ দুইয়ে তোমায় দেব—
ক্ষেতে আমার দাওগো নতুন প্রাণ।
তোমার জন্য জ্বালব আমি মাটির প্রদীপখানি
উপছে-পড়া ক্ষেতের ফসল তোমায় দেব আনি।
তোমার পুজোয় সাজিয়ে দেব নৈবেদ্যের সাজি।
ভুঁই-দেবতা মোদের পানে
মুখ তুলে চাও আজি॥

গানের মাঝে মাঝে হুরকিয়া চট্‌পটে কর্মীদের তারিফও করে আর অলসগুলোকে ধমক লাগায়।

বীজ বপনের সময়ে জমিতে হাল চষা ছাড়া আলমোড়ার পুরুষেরা কিছুই কাজ করে না। শুধু তাস আর জুয়া খেলা, হুক্কা টানা, চায়ের দোকানে জমিয়ে বসে পরনিন্দা পরচর্চা এবং গাঁয়ের যত সব কেলেঙ্কারি নিয়ে শত মুখে রঙ চড়ানো! হ্যাঁ, কর্মী বটে আলমোড়ার মেয়েরা! ক্ষেতের দেখাশুনো, গরু-ঘোড়া-মোষের পরিচর্যা, আবার সংসারের কাজ সমস্তই তারা করে। এ যেন অনেকটা বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়েরই আরেকখানি চিত্র।

কুমায়ুন অঞ্চলের **ভূমি-ব্যবস্থার** তুলনা সারা ভারতবর্ষে আর কোথাও মেলে না। অধিকাংশ লোকেরই নিজস্ব জমি আছে, কিন্তু সেটা পর্যাপ্ত নয়। কাজেই এসব 'হিস্সেদার'কে জমি বর্গা নিতে হয় মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ হিস্সেদারগণের কাছ থেকে, যারা নিজেরা চাষবাস করে না। সাধারণত খোদ চাষীর চেয়ে উচ্চবর্ণের হিস্সেদারেরা অনেক গরীব।

সুগন্ধি বাসমতি চাল দিয়ে যে পোলাও রান্না হয় সেটা উৎপন্ন করে আলমোড়ার ক্ষেতিকারেরাই। আলমোড়া অঞ্চলের নিচু জমিতে আর কী কী ফসল হয়? গম জোয়ার আলু আদা আখ বাঁধাকপি তৈলবীজ গাঁজা ইত্যাদি: ফলের মধ্যে আঙুর আপেল আখরোট। পর্বতসঙ্কুল ভোটিয়া অঞ্চলে গম যব সর্ষে শালগম ওলকপি ইত্যাদির চাষ হয়: তবে এর পরিমাণ এত কম যে দক্ষিণের আলমোড়া

অঞ্চল থেকে শস্য আনিয়ে তবে খাদ্যের চাহিদা মেটানো হয়। খাবারের 'মেনু' (menu) হচ্ছে রুটি, সঙ্গে আলুপোড়া আর কাঁচা লঙ্কা—ব্যস!

আলমোড়া অঞ্চলে একটা মজার বিষয় হচ্ছে জলস্রোতের সাহায্যে গম পেষাই। নদীতীরে একটা বড় পাথর, তার গর্তের মধ্যে একখানি দণ্ড। সেই দণ্ড যুক্ত রয়েছে জলের মধ্যেকার একটি চক্রের সঙ্গে। তীব্র জলস্রোতে যখন চাকাটা ঘোরে সেই দণ্ডটিও সবেগে ঘুরতে থাকে। তখন পাথরের গর্তে গম দিলে আপনা থেকে তা গুঁড়ো হয়ে যায়।

দক্ষিণ অঞ্চলে দুই ঋতুর ফসল উৎপন্ন হয়। বর্ষাকালে খাড়িফ—এতে কোন জলসেচের দরকার হয় না; এবং শীতকালে রবিশস্য—এতে জলসেচের প্রয়োজন হয়।

শস্যের বড় শত্রু হচ্ছে বরফের ধস। এ বিপজ্জনক বস্তুটির হাত থেকে জমিকে রক্ষা করার উপায় হচ্ছে কাঠ বা পাথরের বেড়া বানানো অথবা ঘন জঙ্গল করা। এ সময়ে যে লুকিয়ে জঙ্গল কাটবে তার শাস্তি হবে।

পশুচারণের গল্প

আলমোড়াবাসীদের জীবনের প্রধান অবলম্বন গরু-ছাগল-ভেড়ার পালগুলি। শুধু খাদ্য যোগান দেওয়াই নয়, তাদের জামাকাপড়, বিছানা, তাঁবু, আসবাবপত্র ইত্যাদি জীবনের প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যই যুগিয়ে আসছে ঐ পশুগুলি তাই পাহাড়ের রুক্ষ-কঠোর পরিবেশে এই পশুদের অনেক কষ্ট করেই বাঁচিয়ে রাখতে হয়, কেননা ওরাই যে আবার বাঁচিয়ে রাখে ওখানকার মানুষদের।

পশুদের খাদ্য ঘাসপাতা। সুতরাং খোঁজ করতে হয় চারণভূমির। পাহাড়ের উপত্যকায় শীতের প্রকোপ যখন কমে আসে, বরফ গলে গিয়ে দেখা দেয় নরম শ্যাম তৃণ, গাছে গাছে নব কিশলয়ের হাসি, তখন পশুচারক ভোটিয়ারা ঘাসের সন্ধানে বেরোয় পশুকুল সঙ্গে নিয়ে। এদিকেও শীতের শেষে গ্রীষ্মের রুদ্রমূর্তি উঁকিঝুঁকি মারছে, শুষ্ক আবহাওয়ায় খাদ্য-পানীয় এসেছে ফুরিয়ে, তা ছাড়া এমন দুর্গম পার্বত্য পথে বহুদূরের তৃণভূমি থেকে রোজ পশুর খাদ্য ঘাড়ে করে বয়ে আনাও কষ্টকর। কাজেই আর নয় নিচেকার গ্রামে। যেতে হবে উঁচু পাহাড়ে—উঁচু—আরও উঁচুতে। যেখানে আছে তৃষ্ণার জল, আছে তাজা সবুজ ঘাস।

পশুগুলোকে চারণভূমিতে পাঠানো হয় একদল রাখালের জিম্মায়। বেরিয়ে পড়াটা খেয়ালখুশি মাফিক যখন-তখন হলেই চলে না। ভেবে-চিন্তে দিন-ক্ষণ দেখে তবে **পর্বতারোহণ** শুরু হয়। চারণক্ষেত্র যদি খুব দূরে না হয় তা হলে এক **গ্রীষ্মকালেই** অন্তত চার বার পশুগুলোকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়, আবার ফিরিয়ে আনা হয়। **প্রথম যাত্রা :** চৈত্রের মাঝামাঝি গিয়ে বর্ষা আরম্ভের পূর্বে বৈশাখেই ফেরা হয়। সে সময়টা গম কাটা ও ধান তোলার জন্য গ্রামে

একটি পশুপালক পরিবার

লোকের দরকার, লাঙল টানার জন্য গরু-মহিষের। **দ্বিতীয় যাত্রা :** খাড়িফ বা হৈমন্তী শস্যের বুনন শেষ হয়ে গেছে, পাহাড়ের গায়ে নূতন ঘাসের মখমল, তখন আষাঢ় মাসে দ্বিতীয় বার পর্বতারোহণের পালা। ফেরা হয় শ্রাবণের শেষে, যখন নিচেকার গ্রামগুলির আশেপাশে কচি ঘাস গজিয়েছে। **তৃতীয় যাত্রা :** আশ্বিনের প্রারম্ভে, যখন চাষবাসের জন্য লোকের প্রয়োজন নেই। প্রত্যাবর্তন, খাড়িফ ফসল কাটার সময় হলে। **চতুর্থ যাত্রা :** শস্য কর্তনের অবসানে,

আশ্বিনের শেষাশেষি। ইতিমধ্যে পাহাড়ের উপর শীতের খেলা শুরু হয়, কাজেই দু-সপ্তাহের মধ্যেই পশুপাল নিয়ে সবাই নেমে আসে যে-যার ঘরে।

নেমে আসে ভাবরে

এটা তো গেল গ্রীষ্মকালের রোজনাম্চা। আলমোড়াবাসীরা **শীতকালে** কী করে? কন্‌কনে ঠাণ্ডা, তুষার পড়ছে অবিশ্রান্ত, চাষবাসও বন্ধ, তখন পাহাড়িয়াদের শুরু হয় **পর্বত থেকে অবরোহণ**। এসে আস্তানা বাঁধে ভাবর অঞ্চলে। উত্তরে পর্বত দক্ষিণে তরাই, মাঝখানে এই ভাবর। এখানে আসার সুবিধে এই, ব্যাবসা-বাণিজ্য এক-আধটু হল, কাজের খোঁজও বা পাওয়া গেল, নিদেনপক্ষে বিনে পয়সায় আকণ্ঠ সূর্যরশ্মি পান করা।

আলমোড়াবাসীদের আশ্চর্য রোমাঞ্চকর এই **যাযাবর জীবন**। যাত্রার প্রস্তুতি চলতে থাকে কয়েক দিন আগে থেকেই। জ্যোতিষী দিন স্থির করে দিলে যাত্রীরা ভুরিভোজন সেরে, জমকালো পোশাকে সেজে-গুজে গ্রামদেবতাকে প্রণাম করতে যায়। প্রণাম সেরে স্ত্রী-পুরুষ সবাই বেরিয়ে পড়ে পথে। পঁচিশ-ত্রিশ জনের এক একটি দল; দলের সব মেয়ে-পুরুষই নিজের নিজের মাল বহন করে। বড়লোক যাত্রীরা হয়ত বলদের গাড়ী সঙ্গে নেয়—শুধু মালপত্রই নয়, বুড়োবুড়ি কাচ্চাবাচ্চাদেরও বইবার জন্য। দিনে দশ-পনের মাইল পথ ভেঙ্গে রাত্রিতে পথিপার্শ্বে বিশ্রাম। আগুনের চারপাশে বসে তামাক টানা আর খোশগল্প। পশুগুলো বাঁধা থাকে নিকটেই।

এইভাবে প্রায় এক সপ্তাহ পথ চলার পর পৌঁছানো গেল ভাবরে। এবারে গ্রামের লোকেরা পুরুষানুক্রমে-ব্যবহৃত গোঠে বা জমিখণ্ডে ঘর বেঁধে ফেলে। এসব ঘরে মানুষ ও পশুপাল একইসঙ্গে থাকে।

ভাবরে **অবতরণকারীদের চার শ্রেণী:** (১) ঘমতাপ্পা—যারা ভাবরের জঙ্গলে ঘাস কাটা, মধু সংগ্রহ করা, কাঠ কাটা ও বয়ে নেওয়া, ইত্যাদি মজুরের কাজ করে। সংখ্যায় এরাই বেশি। (২) রাখাল—পশুপালন নিয়ে যারা যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ায়। (৩) চাষী—জলসেচের উত্তম ব্যবস্থার সাহায্যে যারা ভাবরে ফসল ফলায়। (৪) ব্যবসায়ী—যাদের দোকানে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর কেনা-বেচা হয়।

ভাবরে নেমে আসার কতকগুলি অসুবিধেও কিন্তু আছে। চাষবাসের অবহেলা, ম্যালেরিয়ার আক্রমণ, সর্বোপরি—গ্রামজীবনের ছন্দো-গাঁথা কর্মসূচীতে ভাঙন।

বসতি-বিন্যাস

আলমোড়ার অধিবাসীদের দু-রকমের বাসস্থান : স্থায়ী ও অস্থায়ী। সাধারণত নদীতটবর্তী কৃষিযোগ্য উর্বর ভূমিখণ্ডের নিকটে **স্থায়ী বাসগৃহ** গড়ে ওঠে। কতগুলো ঘর একত্র হয়ে এক একটি গ্রাম—নদীতীর থেকে শুরু করে পর-পর মালার মতন সাজানো।

পশুপালকের দল চারণক্ষেত্রে পৌঁছে তৈরি করে **অস্থায়ী বাসগৃহ**। এখানে গ্রামের বিভিন্ন পরিবার যৌথভাবে বসবাস করে। সমস্ত পরিবারের
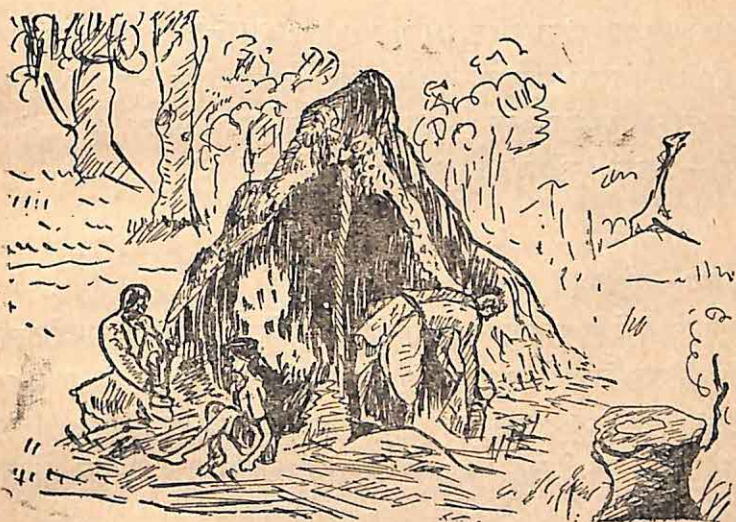
তাঁবুর মত দেখতে ঘুঙুটিয়া কুটির

থাকে সাধারণ চারণক্ষেত্র বা 'খাটা'। প্রতি গ্রামের বাসিন্দারা পাশাপাশি তাদের কুটির বেঁধে নেয়। এই সাময়িক কুটিরগুলো নানা প্যাটার্নের হয়ে থাকে (ক) চারকোণা খড়ক, যার দু-দিক ঢালু চালা, কঞ্চি বা ডালপালার বেড়া (খ) পিরামিডের মতন চালা বিশিষ্ট চারকোণা খড়ক (গ) তাঁবুর মতন দেখতে ঘুঙুটিয়া কুটির। (ঘ) কাঠের বা পাথরের দেওয়াল-যুক্ত শীতকালীন কুটির এইসব অস্থায়ী খড়কে কেবল মানুষই নয় ছাগল-ভেড়া-গরু মহিষের শাবকগুলিও থাকে।

পোশাক ও হাতিয়ার

ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের জীবনযাত্রার উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চলে আলমোড়ার যাযাবর মানুষকে খাদ্যের জন্য প্রতিনিয়তই লড়াই করতে হচ্ছে, তাদের বাসগৃহের ধরণও তাই আমাদের সমভূমির অধিবাসীদের চেয়ে কত আলাদা পোশাকের বেলায়ও তাই। সমগ্র কুমায়ুন অঞ্চলটা মোটামুটি শীতের রাজ্য, তার প্রভাব পড়েছে পাহাড়িয়াদের পোশাকে। ভেড়ার লোম থেকে পশমের সূতা প্রস্তুত করে পোশাক বানায় তারা। ভোটিয়া মেয়েরা বয়নশিল্পে ওস্তাদ।

আলমোড়াবাসীদের হাতিয়ার কী কী? কৃষিকার্যের যন্ত্রপাতি নিতান্ত সাধারণ। 'বারাথ' বা কাস্তে, কুঠার, মুগুর এবং গাঁইতিই প্রধান ; আর লাঠি ও দড়ি। লাঙলের ব্যবহার খুব কম, কারণ পার্বত্যভূমিতে লাঙল দিয়ে চাষ করা অত্যন্ত অসুবিধেজনক। বর্ষায় কিষাণের মাথায় থাকে পাতার-তৈরি ছাতা—টোপো এবং চত্ত'র ('ছত্র' শব্দ থেকে এসেছে ?)।

ব্যাবসা-বাণিজ্য

মানুষ বাণিজ্য করে কখন ? যখন জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর সবগুলিই নিজের নিজের এলাকায় বা স্বদেশে উৎপন্ন হয় না, কিংবা যখন সেই সামগ্রীগুলি এত বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, প্রয়োজন মিটিয়েও উদ্বৃত্ত অংশটা অন্যত্র রপ্তানি করা হয়। এ থেকেই কেনা-বেচার ও বিনিময় ব্যবস্থার সূত্রপাত।

আগেই বলেছি, ভোটিয়ারা পশুপালক। পশুর পশম দিয়ে ভোটিয়া রমণীরা উত্তম শীতবস্ত্র প্রস্তুত করে। এ ছাড়া আছে বিভিন্নপ্রকার কৃষিজ ও বনজ দ্রব্য। আর কত বিলাস-সামগ্রী। এগুলো বিক্রয়ের জন্য **গ্রীষ্মকালে** চলে যায় তিব্বতে, নেপালে। সেখান থেকে নিয়ে আসে গম, যব, কমলালেবু, ঘি, মৃগনাভি, পশম, চামড়া, কম্বল ইত্যাদি। **শীতকালে** কেনাকাটা হয় দ্বিতীয় সীমান্ত রেখার দক্ষিণে ভাবর অঞ্চলে। পশম, পশমী বস্ত্র, মূল্যবান টুকরো পাথর, আয়ুর্বেদীয় ঔষধে লাগে এমন বহু সামগ্রী, আরও কত জিনিসপত্র পাওয়া যায় এখানকার বাজারগুলিতে।

আলমোড়ার এই যাযাবর ব্যাবসায়িগণ সাধারণত দল বেঁধে সপরিবারে যাতায়াত করে। পণ্যদ্রব্যগুলি ছাগল ভেড়া জিবু ঘোড়া বা চমরীগরুর পিঠে।

ধর্ম ও মেলা-পার্বণ

আলমোড়ার পর্বতবাসীরা জাতিতে মঙ্গোল-শ্রেণীভুক্ত ; তবে ধর্মে প্রায় সবাই হিন্দু। ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নানান্ উৎসব পালন করে এরা। শীতের শেষে **বসন্ত-পঞ্চমী** তিথিতে এখানকার অধিবাসীরাও সরস্বতী পূজা করে বাসন্তী রঙের কাপড়চোপড় পরে। বসন্তকালে পাহাড়ের গাছে গাছে রঙবেরঙের ফুল যখন খুশির নিশান উড়িয়ে দেয় তখন এদের **ফুলদেই** উৎসব। এ সময়টাতে শুধু নাচ-গান-স্ফূর্তি। পয়লা শ্রাবণ এদের বর্ষা-উৎসব **হরিয়ালা** ; পয়লা ভাদ্র **ঘি-সংক্রান্তি** ; জমির বীজ বোনা, চারা পোতা, ফসল কাটা ও নবান্নের সময়ও নানারকম উৎসবের আয়োজন হয়।

উৎসবের মূল আকর্ষণ কিন্তু **মেলা**। আলমোড়ার মেলাগুলো দু'রকমের : এক, ব্যবসায়িক ও ধর্মীয় (সাধারণত ফসল কাটার পরে) ; আরেক, নিছক ধর্মীয়। প্রধান কয়েকটি মেলার নাম : জৌলজীবী, বাগেশ্বর ও থল। এ ছাড়া বিভিন্ন উপাস্য দেবদেবীর মন্দিরকে উপলক্ষ করেও অনেক মেলা হয়—যেমন, দেবী মন্দির—পূর্ণগিরি মেলা, শিব মন্দির—যাগেশ্বর মেলা, কালী মন্দির—গঙ্গলীঘাট মেলা, নন্দাদেবী মন্দির*—আলমোড়া মেলা। কোনো পুণ্য তিথিতে আলমোড়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় এই সব মেলা অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার আবালবৃদ্ধবনিতার ভিড়ে, নাচে-গানে, আমোদ-আহ্লাদে মেলার পরিবেশটি জীবন্ত হয়ে ওঠে—চারিদিকে যেন আনন্দের এবং অর্থ উপার্জনের মরশুম পড়ে যায়। খাদ্য ও শস্য, শৌখিন ও দরকারী জিনিসপত্র, গরু-ভেড়া-ছাগল, গরম পোশাক আর ওষুধপত্র ইত্যাদি কেনাবেচা চলতে থাকে দিনরাত, পূর্ণোদ্যমে।

কেনাবেচার আর্থিক লাভালাভের নগ্ন স্বার্থগন্ধী রূপটাকে আলমোড়াবাসীরা অতি সুন্দর ধর্মমূলক সাংস্কৃতিক রঙে-রসে নতুন জন্ম দিয়েছে।

আলমোড়ার অধিবাসীদের মনে ধর্মবিশ্বাস এবং **কুসংস্কার** একই সঙ্গে মিশে রয়েছে ওতপ্রোত। আলমোড়ার পার্বত্য অঞ্চলের বিচিত্র সব ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার থেকে এখানকার বাসিন্দাদের মনে দানা বেঁধেছে হরেক রকম মানসিক ব্যাধির বীজ। এ ধরনের একটি হচ্ছে "সতীন দেবী" সংস্কার।

---

*কথিত আছে, কোন চাঁদরাজা গাড়োয়ালী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য একদা তুষার কিরীটিনী নন্দাদেবীর নিকট শক্তি ভিক্ষা করেছিলেন। রাজার প্রার্থনা পূর্ণ হলে তিনি নন্দাদেবীর নামে এ মন্দিরটি উৎসর্গ করেন।

একটি বৌ তার স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আত্মহত্যা করে। স্বামী আবার বিয়ে করল, কিন্তু সংসারে রোজই সব অঘটন ঘটতে লাগল। ধারণা হল যে, আগের স্ত্রীর রোষ পড়েছে সংসারের ওপর। তখন ঘরের ভিতর পাথর বসিয়ে তার মাথায় সিঁদুর দিয়ে সতীন দেবীর প্রতিষ্ঠা করা হল। কত উপায়ে পরিতুষ্ট করার চেষ্টা। নইলে যে সংসার টেঁকে না।

আরেকটি হল "অপদেবতা" সংস্কার। এদের সমাজে দেখা যায় দেবতার চাইতে **অপদেবতার** খাতির বেশী। যেমন, দুই দলের ভিতর যুদ্ধে পরাজিত দলের কতগুলো লোককে হত্যা করা হল। তখন বিজয়ী দল ঐ মৃত ব্যক্তিদের দিনের পর দিন পুজো করতে থাকবে। মৃত লোকগুলো পাছে অপদেবতা হয়ে কোথায় কী ক্ষতি করে বসে, তাই পুজো-আর্চা দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট রাখা চাই।

শুধু ভয়-দেখানো অপদেবতাই নয়, পাহাড়ীদের কাজেকর্মে সাহায্য করার জন্য **দেবতাও** রয়েছেন অনেক। 'রুনিয়া'—পশুর রক্ষাকর্তা দেবতা। অসুস্থ পশুকে সারিয়ে তুলতে হলে প্রার্থনা কর 'সিধুয়া' আর 'বিধুয়া'র কাছে। 'কুঙ্গর' হলেন বৃষ্টির দেবতা—বৃষ্টি দরকার তো তাঁকে ভেট দাও ভেজা গম, আর বৃষ্টি বন্ধ করতে হলে শুকনো গম।

লোকসঙ্গীত

ভারত-বিখ্যাত আলমোড়ার লোকসঙ্গীত। গান তো নয়—মুঠো মুঠো সোনা। বহুযুগের **লোকায়ত দর্শন** ও ঐতিহ্য এগুলির ভিত্তিভূমি ; সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, স্নেহ-ভালবাসা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার আলেখ্য অবলম্বনে এগুলির সূক্ষ্ম কাব্যরস দানা বেঁধেছে। আলমোড়ার মত আখ্যান, কত উপকথা, কত প্রবাদ প্রবচন আর লোকগাথার মধ্যে জীবন্ত হয়ে রয়েছে তার জনগণের নানান্ অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের ইতিহ্যস, বাস্তব জীবনের মুখোমুখী দাঁড়াবার সঙ্কল্প ও সাহস। বীজ বপনের, চারা রোপণের, ঘাস কাটার—কতই যে গান আছে। আর আছে 'জাগর'—কোন বীর বা মহাপুরুষের জীবনগাথা। আলমোড়ার **লোক-নৃত্যে** মূর্ত হয়ে উঠেছে শ্রমিকের কর্মের ঘর্মের কাহিনী, তাদের যৌথ

জীবনযাত্রার আনন্দ-বেদনার যুগ্ম-স্পন্দন।* বিস্মৃতির গুহা থেকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এই মহামূল্য কোহিনূরগুলিকে উদ্ধার করার কাজ সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে।

বর্তমান সমস্যাবলী

আলমোড়ার অধিবাসীদের জীবনে সমস্যারও কিছু অন্ত নেই। সৈন্যবাহিনী আর হোটেলে অফিসে যদি চাকরি না পেত তা হলে তো এদের সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে উঠত। জীবিকা অর্জনের জন্য যাযাবরের মতো স্থান হতে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ানোও এদের পক্ষে অসম্ভব হত যদি-না আলমোড়ার মেয়েরা সব দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিত। এসব কারণে পাহাড়িয়াদের জীবনযাত্রার একদিকে যেমন আর্থিক সঙ্গতি এসেছে এবং তার সঙ্গে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, অপর দিকে তেমনি **গৃহ-বিবাদের** সূত্র ধরে নানা রকম দুঃখ-দুর্দশাও দেখা দিয়েছে। অতি সামান্য কারণে মামলা-মোকর্দমা করা এখানে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

শিক্ষার আদর খুব বেড়েছে এখানে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে কত লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। আলমোড়া শহরের ১৫,০০০ বাসিন্দার জন্য আছে একটি ডিগ্রী কলেজ, তিনটি ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ ছাত্রদের, দুটি ছাত্রীদের, আর ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য তিনটি করে হাইস্কুল।

হিমালয়-নন্দিনী আলমোড়ার পূর্বদিগন্তে আজ নূতন উষার অভ্যুদয় দেখা যাচ্ছে। তরাই অঞ্চলে পুনর্বাসন, পথঘাট যানবাহন ও তার-বেতারের উন্নতি, শিক্ষার অগ্রগতি, জমিদারী প্রথার বিলোপ ইত্যাদি বহু পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের হাতে। মালবাহী জিবু বা টাট্টুর যাতায়াতের পথের এখনও সংস্কার সাধিত হয়নি। শীতকালে যাযাবর কৃষকেরা ভাবরে বা তরাইয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়, সেই সময় তাদের জন্য কোনো বিকল্প কাজের সুযোগ নেই। ফলের চাষ, পশুপালন ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রেই এক নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত না হওয়া পর্যন্ত পাহাড়িয়াদের জীবনযাত্রা

---

*"......although the finest specimens of individual creation given us precious stones in a magnificent setting, the stones themselves were created by the collective strength of the popular masses. Art is within the powers of the individual, but only the community is capable of true creation. It was the Greek People who created Zeus, Phidias merely carved him in marble."—GORKY.

আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলবে কী করে? উপজাতি নেতাদের কর্তব্য সাধারণ মানুষকে বর্তমান সভ্যতার উপযোগিতার কথা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া। স্বাধীন ভারতের অগ্রগতির পথে আলমোড়াবাসীদেরও এগিয়ে আসতে হবে—পুরোভাগেই বা নয় কেন?

অনুশীলনী

১। (ক) রুক্ষ পার্বত্য পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন করা অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ।

(খ) কঠোর পরিবেশই পর্বতবাসীদের জীবনযাত্রায় সংহতি ও সহযোগিতার ভাব এনেছে।—এ উক্তি দুটি যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

২। আলমোড়ার কৃষিকার্যে বাধা আসে কোন্ কোন্ কারণে?

৩। পশুপালনই আলমোড়াবাসীদের বাঁচবার প্রধান অবলম্বন এরই ওপর তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে।—কেন?

৪। ভোটিয়া প্রভৃতি উপজাতি যাযাবর জীবন যাপনে বাধ্য হয়; কিন্তু অন্যান্য সভ্য জাতিকে যাযাবরবৃত্তি গ্রহণ করতে হয় না।—এর কয়েকটি কারণ নির্দেশ কর।

৫। দলগত কর্মোদ্যোগ। ছাত্র-ছাত্রীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান মেলাগুলির তথ্য এবং সম্ভব হলে তাদের ছবি সংগ্রহ করে নিজেদের 'ব্যবহারিক সংকলনে' সন্নিবেশিত করবে। এই প্রসঙ্গে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের মেলা-সম্পর্কীয় আলোচনাটি পড়ে নাও।

৬। "অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে মেলার গুরুত্ব"—এ বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনা কর। আলমোড়ার জীবনযাত্রায় মেলার স্থান কতখানি?

৭। নক্শা-চার্ট ও অনুষ্ঠান॥ ভারতের বিভিন্ন স্থানের ও পূর্ব-পাকিস্তানের লোকসঙ্গীত যতগুলি পার সংগ্রহ কর। অধুনা চীন, জাপান, ব্রহ্ম, হাঙ্গেরী, রুশিয়া ইত্যাদি দেশের লোকগীতির বাংলা অনুবাদ নানান্ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। এগুলো নিয়ে তোমাদের সঙ্গীত-শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে একটি গীতি-চক্রের আয়োজন কর এবং ঐ গানগুলি চার্টে লিখে প্রদর্শনীর জন্য জমা কর।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাংলার কৃষি-সমাজ

মানুষের জীবনধারণের সমগ্র ইতিহাসে খাদ্য সংস্থানের চারটে ধাপ নির্দিষ্ট করা যায়। প্রথম : ফলমূল আহরণ। দ্বিতীয় : অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে জীবজন্তু শিকার। তৃতীয় : পশুপালন। চতুর্থ : কৃষিকাজ। শিকার এবং পশুপালন—দুই ক্ষেত্রেই মানুষের যাযাবর জীবন। প্রাচীন মানুষের অগ্রগতির পথে কৃষিকার্যই এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল। মানুষ স্থায়িভাবে একটা জায়গায় আস্তানা গাড়তে শিখল।

কৃষিবিদ্যার আবিষ্কারক মেয়েরা

শিকার থেকেই মানুষ পশুপালন শিখেছিল। জন্তুকে মেরে না ফেলে যদি ধরে এনে সযত্নে লালন-পালন করা যায় তা হলে যে অনেক বেশি লাভ। শিকারের মতোই পশুপালন প্রায় সর্বত্রই পুরুষের কাজ। কিন্তু কৃষিবিদ্যা আবিষ্কার করেছিল মেয়েরা। কৃষিকার্যের আদিপর্বে আস্তানার আশে-পাশে ছোট ছোট জমি খুঁড়ে বাগানের মতো ক্ষেত করা (garden-tillage) সে তো মেয়েদেরই কাজ। দলের পুরুষেরা যখন বনে-জঙ্গলে শিকারে নিযুক্ত অথবা যুদ্ধে ব্যাপৃত, মেয়েরা তখন ডেরার চারধারে ছুঁচলো কাঠের টুকরো বা পাথরের কুড়ুল দিয়ে মাটি খুঁড়ত। এই কৃষিবিদ্যার রীতিমত উন্নতি হবার আগে পর্যন্ত (অর্থাৎ যতদিন না পশু-জোতা লাঙলের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে) এ কাজের দায়িত্বটা মেয়েদের হাত থেকে পুরুষদের হাতে যায়নি।* কৃষিবিদ্যা যে প্রথম মেয়েরাই আবিষ্কার করেছিল তার স্মৃতি নানান্ দেশের আদিম মানুষদের বহু উপকথার মধ্যে আজও মিশে রয়েছে। এ বিষয়ে ঐকান্তিক গবেষণার জন্য ইরেন্‌ফেলস্, স্টেইনেন, রবার্ট ব্রিফল্ট, জেন হ্যারিসন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি দেশ-বিদেশের মনীষীর নিকট আমরা বিশেষ ঋণী।

এই গবেষণার সূত্র ধরে আমরা আরও একটা সমস্যার সমাধান করতে পারি। বৈদিক যুগের কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সন্ধান আমরা পাইনি, অথচ তারও আগেকার হরপ্পা-মোএঞ্জোদড়োর মানুষেরা আমাদের জন্য কত

* "Encyclopaedia of Religion and Ethics" : vol. 1, page 227.

প্রাচীন কীর্তির নমুনা রেখে গিয়েছে। এ বৈষম্যের কারণ কী? আবার বৈদিক সাহিত্যে প্রায় সর্বত্র পুরুষ-দেবতাদেরই প্রাধান্য, অপরপক্ষে সিন্ধু-সভ্যতার মূক সাক্ষী হয়ে আছে কত অসংখ্য দেবীমূর্তি। এটাও কি অদ্ভুত নয়?

এ অদ্ভুত ব্যাপারেরও কারণ নির্দেশ করা খুব দুঃসাধ্য নয়। বৈদিক মানুষেরা ছিল প্রধানভাবে পশুপালক-গোষ্ঠী, সেক্ষেত্রে স্থায়ী নগর গড়ে তুলবার সুযোগ কোথায়? কাজেই প্রত্নতাত্ত্বিক কোন চিহ্ন থেকে আমরা স্বভাবতই বঞ্চিত হয়েছি। পরন্তু প্রাচীন কালে সিন্ধু-অঞ্চলের অধিবাসীরা চাষবাসের ভিত্তিতে এক সমৃদ্ধ নগর-সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, যার ধ্বংসাবশেষ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস রচনার অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে আজ স্বীকৃত হয়েছে। এই কৃষিবিদ্যার আবিষ্কার করেছিল ভারতীয় মেয়েরাই, তার প্রমাণ মিলেছে হরপ্পা-মোএঞ্জোদড়োর খুঁড়ে-পাওয়া দেবীমূর্তিগুলোর মধ্যে। আচার্য ইরেন্‌ফেল্‌স্ লিখছেন: "এখানকার (ভারতবর্ষের) মেয়েরা শুধুই যে সুষ্ঠুভাবে মাটি খননের প্রণালী উদ্ভাবন করেছিল তা নয়, সে-প্রণালীকে কাজেও রূপ দিয়েছিল। ব্যাপারটা একেবারেই সহজ ছিল না, সেই আদিম সমাজে রক্ষণশীলতা এমন উগ্র ছিল···জমিচাষের ফলস্বরূপ···মানুষেরা বনে-জঙ্গলে ঘোরা বন্ধ করে আস্তানা গড়ল সেই প্রথম।"

'লোকায়ত' মানে কী

কৃষিবিদ্যা প্রসঙ্গে একটি শব্দের সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা দরকার। সেটা হল "লোকায়ত"। আলমোড়ার লোকসঙ্গীতের কথা বলতে গিয়ে এ শব্দটি আমরা ইতিপূর্বে ব্যবহার করেছি। 'লোকায়ত'র মধ্যে দুটি শব্দ: 'লোক' আর 'আয়ত'। আ+যৎ+অ করে 'আয়ত' কথাটা পাচ্ছি। আ উপসর্গের অর্থ 'সম্যকভাবে'; যৎ ধাতুর মানে 'চেষ্টা বা উদ্যম করা'। কাজেই আয়ত শব্দের অর্থ দাঁড়াচ্ছে 'সম্যকভাবে চেষ্টা করা'। কিসের চেষ্টা? 'লোক'-এর। পণ্ডিতপ্রবর মনিয়ের-উইলিয়াম্‌স্ বলছেন সংস্কৃত ভাষায় 'লোক' শব্দের আদি অর্থের সঙ্গে চাষের জমির সম্পর্ক থাকা খুব স্বাভাবিক। লোক শব্দের আদিতে একটা উ থাকত—উলোক। উলোক=উরুলোক, যার মানে হল মাঠ বা জমি। লাতিন এবং লিথুনিয়ান ভাষায়ও দুটো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—যথাক্রমে *lucus* এবং

laucus. প্রথমটির মানে, চাষের জন্য জঙ্গল-সাফ-করা জায়গা। আর দ্বিতীয় শব্দটির মানে, চাষের জমি।

জমির বুকে ফসল ফলানোর উদ্যম, তাঁরই নাম লোকায়ত। চাষী কত পরিশ্রম করে মাঠে মাঠে বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে। দেশে দেশে সেই শস্য বাঁচিয়ে রেখেছে মানুষকে। খাদ্যের প্রয়োজন মিটিয়ে এই মানুষই তখন ধর্মচিন্তায় মগ্ন হয়েছে, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে করেছে আত্মনিয়োগ। কৃষিকর্মের ভিত্তিতে সভ্যতার উষালোক উদ্ভাসিত হল পুণ্যতোয়া সিন্ধু, নীল, তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিস ও হোয়াং নদীর কূলে কূলে।

কৃষির প্রকার-ভেদ

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একটা জাতি যখন চাষবাসের দ্বারা শুধু আপন প্রয়োজন মিটিয়েই ক্ষান্ত হল না, বরং খাদ্যশস্য বাড়তি হবার ফলে অন্য জাতির সঙ্গে বাণিজ্যে মন দিলে, তখন থেকেই তার আর্থিক সমৃদ্ধি, তখন থেকেই তার সামাজিক বোধ ও চেতনার বিকাশ। যারাই কৃষিকর্মকে বাণিজ্যিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছে তারাই তত উন্নত এবং সুখী—তার চেয়েও বড় কথা যে অনগ্রসর বা অসমৃদ্ধ জাতির দুঃখের লাঘব হল।

এই কৃষিকার্যের ব্যবস্থা পৃথিবীর সব দেশে কিন্তু একরকম নয়। কৃষিপদ্ধতি মোটামুটি তিন রকম :

(ক) **স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি,** অর্থাৎ উৎপন্ন শস্যসম্পদ কেবলমাত্র নিজের দেশেরই চাহিদা পূরণ করে।

(খ) **এক-ফসলী কৃষি,** অর্থাৎ একটি মাত্র ফসল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করে তার উদ্বৃত্ত অংশটা বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এ ধরনের চাষে কিছু কিছু সুবিধা আছে, অসুবিধাও আছে।

(গ) **বহু-ফসলী কৃষি,** অর্থাৎ বিভিন্ন জমির উৎপাদনশক্তির তারতম্য অনুযায়ী নানারকম শস্য উৎপন্ন করে দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য ঠিক রাখা।

প্রাচীন বাংলার কৃষিসমাজ

'বাংলা' বা 'বাঙ্গালা' নামটা এল কোথা থেকে? আকবরের সভাসদ্ আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বঙ্গ+

আল্=বাঙ্গাল, বাঙ্গালা হয়েছে। আল্ বলতে শুধু ক্ষেতের আল্ নয়, ছোটবড় বাঁধও বোঝায়। বাংলাদেশে জল-বৃষ্টির আধিক্য ; বাঁধ না দিলে বৃষ্টি ও বন্যার হাত থেকে ভিটে-মাটি-ক্ষেত-খামার বাঁচানো অসম্ভব। আবার যে অঞ্চলে জল কম হয় সেখানে বর্ষার জল ধরবার জন্য বাঁধের দরকার। তাই আল্ বেশি বলেই এ দেশের নাম বাঙ্গালা বা বাংলাদেশ।

বাংলার ইতিহাসের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ* থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি ঃ

"প্রাচীন বাংলার ধনদৌলত আসত প্রথমত এবং প্রধানত কৃষি থেকে। অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বিভিন্ন লেখার মধ্যে 'ক্ষেত্রকর' 'কর্ষক' 'কৃষক' ইত্যাদি কথার বরাবর উল্লেখ পাওয়া যায়। জনসাধারণ যেসব শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল তার মধ্যে কৃষকেরা ছিল বিশেষ একটি শ্রেণী। সমাজে কৃষকের রীতিমতো খাতির ছিল। পঞ্চম থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত সমস্ত তাম্রপট্টোলিতেই দেখা যায় লোকে বেশি জমি চাইছে চাষের জন্য। ডাক আর খনার বচন থেকেও প্রাচীন বাংলার কৃষিপ্রধান সমাজের প্রমাণ পাওয়া যায়। য়ুয়ান চোয়াঙের বিবরণ থেকে প্রাচীন বাংলার শস্যসম্ভারের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।...

"এ দেশে অসংখ্য নদীনালা থাকা সত্ত্বেও ধানের জন্য বৃষ্টির উপর একান্তভাবে নির্ভর করতে হয়। তাই এদেশের ছড়ায়, গানে, পল্লীবচনে, লোকায়ত ব্রত আর পূজানুষ্ঠানে মেঘ আর আকাশের কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়। আজও আমরা সুর করে বলি ঃ আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব মেপে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে ব্রাহ্মণদের যে সব গ্রাম দান করা হত, তাতে থাকত চাষের ক্ষেত এবং বাগান। ক্ষেতে প্রচুর শালিধান হত। কালিদাস 'রঘুবংশ' কাব্যে এক উপমার ভিতর দিয়ে বাংলার ধানচাষের বিশিষ্ট পদ্ধতির কথা বলেছেন ঃ ধানের চারাগাছ যেমন করে একবার উপড়ে ফেলে আবার রোয়া হয়, তেমনি করে রঘু বঙ্গজনদের একবার উৎখাত করে আবার প্রতিরোপিত করেছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যের কবি-প্রশস্তিতে প্রাচীন বাংলার ধান মাড়াইয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। গোলাকারে সাজানো কাটা-ধানের উপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে

* নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙ্গালীর ইতিহাস"। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কৃত কিশোর-সংস্করণ।

গরু-বলদ হাঁটিয়ে ধান মাড়াই করা হত। ত্রয়োদশ শতকের এক অজ্ঞাতনামা কবির কবিতায়···বাংলার গ্রামের ছবি—

"চাষীর ঘরে নতুন-কাটা শালীধানের কী বাহার? গাঁয়ের শেষ ক্ষেত জুড়ে প্রচুর যব: নীল পদ্মের মত স্নিগ্ধ সবুজ তাদের শীষগুলো। ঘরে ফিরে নতুন খড় পেয়ে গরু-বলদ-ছাগলদের আনন্দ ধরে না। আখমাড়াই কলের ঘর্ঘর শব্দে গ্রামগুলো দিনভর মুখর; গুড়ের গন্ধ সারা গাঁয়ে ভুর ভুর করছে।"······

পাল ও সেন আমলে ভূমিপতি বা সাধারণ গৃহস্থের মোটামুটি সচ্ছলতা থাকলেও ভূমিহীন গৃহস্থ ও সমাজ-শ্রমিকদের যে কী দুরবস্থা ছিল, তার আভাস মেলে পুরানো চর্যাপদ গীতি ও সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থ থেকে। একটি গীতিতে বলা হয়েছে: টিলাতে আমার ঘর, পাড়াপড়শী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, সারাদিন ক্ষিদেয় ধুঁকছি।' আরও নিষ্করুণ চিত্র আছে: 'পরণে তার ছেঁড়া কাপড়, বিষণ্ণ শীর্ণ দেহ। ক্ষিধেয় শিশুদের চোখ গর্তে-ঢোকা, পেট-পিঠ এক হয়ে গেছে; তারা খাবে বলে কাঁদছে। দীন দুঃস্থ ঘরের বউ চোখের জলে মুখ ভাসিয়ে প্রার্থনা করছে—এক মুঠো চাল যেন একশ' দিন চলে।

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

কিন্তু সুপ্রাচীন এই বাংলা দেশ আজ দ্বিধাবিভক্ত। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পাওয়ার সময় আমাদের চরম মূল্য দিতে হয়েছে—বাংলার বৃহত্তর পূর্বভাগ গেছে পাকিস্তানের অধিকারে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আয়তন ৩৪ হাজার বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ২ কোটি ৬৩ লক্ষের উপর। এত যার লোকবল সে দেশের কৃষিসম্পদের কথা আলোচনা করা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের ভূমিভাগের বন্ধুরতা এখানকার কৃষিজ দ্রব্যে বৈচিত্র্য এনেছে। দার্জিলিং জেলাটা আর জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশ নিয়ে এর পাহাড়ে-অঞ্চল। পুরুলিয়া জেলা এবং বর্দ্ধমান-বাঁকুড়া দুটো জেলার পশ্চিম ভাগটা ছোটনাগপুরের মালভূমির অন্তর্গত, আগ্নেয় শিলায় গঠিত। এ ছাড়া সমস্ত বাকী অংশটা গাঙ্গেয় সমভূমি, পাললিক শিলা দিয়ে তৈরী। গুণের দিক দিয়ে মৃত্তিকারও দুটি ভাগ: এঁটেল মাটি আর দোআঁশ মাটি।

পশ্চিমবঙ্গ নদীমাতৃক দেশ। জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। গ্রীষ্মকালে

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর একটি শাখা বঙ্গোপসাগর থেকে এসে এ রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়।

এখানকার কৃষিসম্পদ বলতে দু-রকম শস্যকে বোঝায়ঃ বর্ষাকালীন **খাড়িফ শস্য** এবং শীতকালীন **রবিশস্য**। খাড়িফের মধ্যে ধান ও পাট সর্বপ্রধান; আর রবিশস্য বলতে মুগ-কলাই-মসুরী-মটর-চা-তৈলবীজ-শাকসবজি ইত্যাদি।

নদনদী আশীর্বাদ না অভিশাপ?

পশ্চিমবঙ্গ নদনদীর দেশ। সেকথা সত্যি, কিন্তু ভাববার কথা এই, নদনদী পশ্চিমবঙ্গের আশীর্বাদ না অভিশাপ? নদীর প্রধান কাজ তার অববাহিকার জল-নিষ্কাশন। পলিতে ভরাট হয়ে যাওয়াতে গঙ্গার শাখানদীগুলি মুর্শিদাবাদ-নদীয়া-চব্বিশ পরগনার সমস্ত জল বহন করতে অসমর্থ। ফলে ঐ সব জেলায় এত জলাভূমির আধিক্য। আবার স্বল্পব্যয়ে যাত্রী ও মালপত্র আনা-নেওয়া যাবে, নদীর কাছে এটাই আমরা আশা করি। কিন্তু বাংলার অধিকাংশ নদীতেই সারা বৎসর জল থাকে না, কিংবা বর্ষাকালে খরস্রোতা—এই কারণে সেগুলি নাব্য নয়। যেসব নদী পূর্বে নৌচলনযোগ্য ছিল তাদের অনেকেই উপর্যুপরি পলিসঞ্চয়ে এখন অগভীর হয়ে গিয়েছে। এ জন্যই এক হুগলী নদী ছাড়া অন্য নদীতটে সমৃদ্ধ বন্দর গড়ে উঠছে না। নদীর আরেকটি কল্যাণমুখী কাজ শস্যক্ষেত্রে জলসিঞ্চন দ্বারা ফসল উৎপাদনে সহায়তা করা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলি একাজেও ব্যর্থ হয়েছে। ছোটনাগপুরের মালভূমি থকে যেসব নদী প্রবাহিত, সেগুলি অনাবৃষ্টির সময় প্রায় জলশূন্য থাকে, যার ফলে প্রয়োজনের সময় ফসলের জমিগুলি নির্জলা উপোস করে থাকে। বহু নদী অবিরাম এক তীর ভাঙছে, অপর তীর গড়ছে, কত ঘরবাড়ি আর শস্যক্ষেত্র নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অজয়, দামোদর ও তিস্তার বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতি ও দুর্দশার হিসেব কে করবে!

ধানের কথা

প্রাচীন বাংলায় সাধারণ মানুষের প্রধান উপজীব্যই ছিল ধান। হাঁড়িতে ভাত না থাকলে তার অবস্থা কাহিল। 'নৈষধচরিতে' এক ভোজসভার

বর্ণনা এইরকম : পাতে গরম ভাত দেওয়া হয়েছে—তা থেকে ধোঁয়া উঠছে ; প্রত্যেকটি কণা তার অভগ্ন, একটা থেকে আরেকটা আলাদা করা যায়। সরু সরু প্রত্যেকটি দানা তার সুসিদ্ধ, সুস্বাদু এবং দুধের মত সাদা—তাতে ভুর ভুর করছে চমৎকার গন্ধ। গৃহস্থ বাঙালীর আকুল প্রার্থনা হল : "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে!" ভারতে ধানের প্রথম উল্লেখ পাই খৃষ্টজন্মের হাজার বছর আগে, সুপ্রাচীন গ্রন্থ অথর্ব বেদে।

ধান উৎপাদনের উপযোগী উপকরণ কী কী? জল আর তাপ। তাপমাত্রা চাই ৭৫ ডিগ্রীর উপর। জল বলতে বৎসরে অন্তত ৪৫" ইঞ্চি বৃষ্টিপাত। বর্ষা যদি যথাযথ পরিমাণে না হয়, কিংবা সময়মত না আসে তবে যে কৃষকের চোখে অন্ধকার! আমাদের কৃষি অনেকটা পরিমাণেই বর্ষানির্ভর। 'ঘৃতস্রাবী যবকণা'র জন্য বেদ-গ্রন্থেও আমরা বৃষ্টির আরাধনা শুনতে পাই : "বৃষ্টিদাতা হে মঘবা অশ্বে এস সোমপানে।"

দোআঁশ মাটি—যেখানে কাদা ও বালি সমান সমান—ধান উৎপাদনের খুব উপযোগী নয়। ধানের পয়লা নম্বর দোস্ত এঁটেল মাটি—যাতে কাদা বেশি থাকে।

উৎপাদনের সময়ভেদে বাংলা দেশে তিন জাতের ধান হয়—আমন, আউশ, বোরো। আমন ধান রোপণের সময় হচ্ছে শরতের প্রারম্ভে, মৌসুমীধারায় স্নাতসিক্ত ভূমিতে। এই উৎকৃষ্ট শস্য শীতকালে কেটে ঘরে তোলা হয়। শীতের অবসানে নদীর চরে, খালবিলের ধারে ও জলাজমিতে বোরো ধানের চাষ হয়। বপন বা রোপণের পর ষাট দিনে পাকে বলে এর আরেক নাম 'ষেটে' ধান। চৈতালী বা বৈশাখী ঝড়ের দুরন্তপনায় বোরো ধানের খুব ক্ষতি হয়। কালবৈশাখীর শেষে বপন করা হয় আউশ বা আশু ধানের বীজ। নাম 'আশু' হলেও এর ফসল খুব শীঘ্র ফলে না। চারার বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য জল দরকার হয় প্রচুর। বর্ষার দ্বিতীয় মাসে এই ধান কাটা হয়।

যেহেতু আউশ এবং বোরো ধান খুব নিকৃষ্ট শ্রেণীর সেইহেতু এ দুই ধানের চাহিদা স্থানীয় অঞ্চলের বাইরে হতে পারে না।

একমাত্র নদীয়া জেলা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সারা রাজ্য জুড়ে আমন ধানের শীষ ঢেউ খেলে যায়। নদীয়ার চাষের জমির তিন-চতুর্থ অংশেই আউশ ফসল ফলে। মালদহে ও পশ্চিম-দিনাজপুরে আউশ, আমন ও বোরো তিন রকমই ধানই জন্মে।

পাটের কথা

ধানের পরেই আসে পাটের কথা—বাংলা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর কৃষিসম্পদ। পাটের কাপড়ের উল্লেখ পাই আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে ("পরিবারে দিহ খুঞা[১] উড়িতে[২] খোসলা[৩]"—চণ্ডীমঙ্গল), সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর ময়মনসিংহ-গীতিকা ও নানান্ লোকসাহিত্যে।

উনিশ শতকে বাংলায় হাতে-টানা-তাঁতে নানা ধরনের পাটের মোটা কাপড় প্রস্তুত হত, এমন কি বিদেশেও চালান যেত। এদেশ থেকে ইউরোপে প্রথম পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে। এই সমৃদ্ধ কুটির শিল্পটি ধীরে ধীরে ধ্বংস হতে থাকে ইংরেজদের উদ্যোগে পাটকল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে। প্রায় একশ' বছর আগে, ১৮৫৫ সালে শ্রীরামপুরের নিকটে সর্বপ্রথম পাটসূতার কারখানা স্থাপন করেন সিংহলের কফি-ব্যবসায়ী জর্জ অকল্যাণ্ড। দ্বিতীয় পাটকলের নাম 'বোর্ণিও কোম্পানী লিমিটেড'= বর্তমান পরিচয় বরানগর জুট মিল্স্। ১৮৬৪ সালের পর থেকে কলিকাতার আশে-পাশে দ্রুত পাটকলের প্রসার হতে থাকে। প্রথম দিকে স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডী বন্দরের সঙ্গে পাটের বাণিজ্য চলত আমাদের; পরে ইতালী, ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বহু কলকারখানা স্থাপিত হয়। হুগলী নদীর উভয়তীরে আমাদের পাটকলগুলি গড়ে উঠেছে, কিন্তু অবিভক্ত বাংলায় ব্যাপক পাটচাষ হত সমগ্র পূর্ববঙ্গ জুড়ে। কাজেই দেশবিভাগের পর কাঁচামালের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্প খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

উত্তম পাট উৎপন্ন হবে কোন্ মাটিতে? নদীবাহিত নূতন পলিমাটীতে। এজন্য উত্তর বিহার, পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে সেরা পাট মেলে। উচ্চভূমি ও জলাভূমি—দু-রকম জমিতেই পাট জন্মে। বৎসরে ৬০" ইঞ্চির বেশি বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে চারা বোনা হয়, ফসল কাটা হয় ভাদ্র-আশ্বিনে। এক জাতীয় পাট দেখতে খর্বাকৃতি; আরেক প্রকার পাট দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই-মানুষ সমান। পাটের ডাঁটাগুলি কেটে জলের মধ্যে পনের-কুড়ি দিন রেখে পচানো হয়; পরে তা থেকে সযত্নে আশ ছাড়ানো হয়। এর

---

১ কুঞা=মোটা কাপড়। ২ উড়িতে=গাবে দিতে। ৩ খোসলা=কাঁথা।
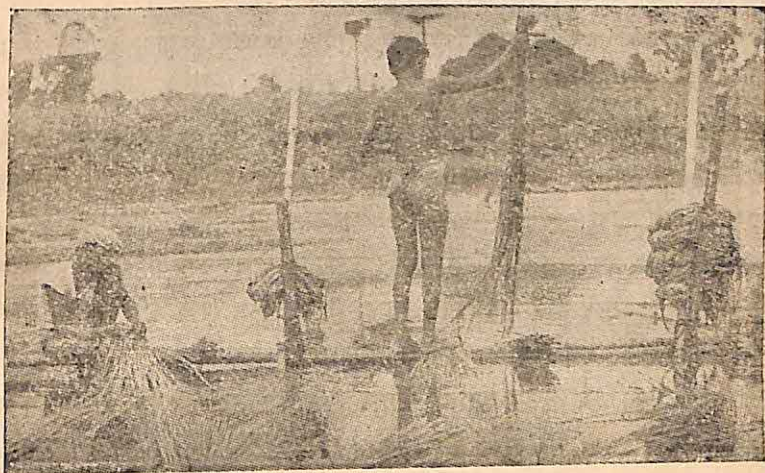
পর রৌদ্রে শুকিয়ে সেই শুষ্ক পাট গাঁট বেঁধে চালান দেওয়া হয় গঞ্জে-বন্দরে বা চটকলে।

পাটের ব্যবসা অধিকতর লাভজনক বলে আজকাল ধানচাষ কমিয়ে পাটের চাষ বাড়ানো হচ্ছে। বর্ধমান, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, মালদহ ইত্যাদি জেলাতে পাটচাষের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরবঙ্গে, আগেই বলেছি, প্রচুর পাট জন্মে।

আমাদের খাদ্য-সমস্যা

রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'খাদ্য ও কৃষি সংস্থা'র বিশেষজ্ঞ ওয়েবার সাহেব ভারতবর্ষকে "A Land of Contrasts" বা বৈপরীত্যের দেশ বলেছিলেন। তিনি বলেছেন: "একদিকে ভারতে খাদ্যশস্যের প্রচুর ঘাটতি, অপরদিকে বিস্তীর্ণ পতিত জমি পড়ে রয়েছে অকর্ষিত অবস্থায়, অথবা মান্ধাতা-আমলের প্রণালীতে সামান্য চাষ চলেছে সেখানে। এদিকে উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে ফসলের কি বিরাট অপচয় হচ্ছে। একটা দরিদ্র দেশ এরকম সর্বনেশে বিলাসের প্রশ্রয় কিছুতেই দিতে পারে না।"

ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদও কোয়েম্বাটুরের এক জনসভায় দুঃখ করে বলেছিলেন: "একটা কৃষিপ্রধান উর্বর দেশ, যার আছে প্রচুর জলসম্পদ, শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতা, আর কোটি কোটি মানুষ, সেই দেশ কিনা তার অধিবাসীদের উদারান্নের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে আছে—কিমাশ্চর্যমতঃপরম্? জাতির পক্ষে এটা পরম লজ্জার বিষয়।"

আনন্দবাজার পত্রিকা একটি প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

"কৃষিপ্রধান দেশ ভারতে খাদ্যশস্য ঘাটতি পড়ার কারণ কী? ফসল খারাপ হলে দোষারোপ করা হয়ে থাকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অর্থাৎ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতির উপর। এর আসল কারণ অন্যরূপ।...

"বর্তমান জগতে দুটি প্রসিদ্ধ প্রগতিশীল দেশ রাশিয়া ও আমেরিকার সঙ্গে এবিষয়ে ভারতের অবস্থা তুলনা করলে তফাৎটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। রাশিয়া ও আমেরিকায় কতটুকু জমিতে কী ফসলের চাষ করা হবে তার নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে সরকার হতে এবং উৎপাদিত ফসলও চাষীদের বিক্রয় করিতে হয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দরে। ফলে সহসা কোন ফসলের যেমন ঘাটতি হবার উপায় থাকে না, তেমনি কোন ফসল উৎপাদনের পরিমাণ চাহিদা বা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হলেও সরকার হতে ক্রয় করা হয় বলে চাষীদের ক্ষতি স্বীকার করতে হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে? আমাদের দেশের সরকারী **পরিসংখ্যান-শুদ্ধতা** সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। পরিসংখ্যানের কথা ছেড়ে দিলেও অধিকাংশ আবাদী জমিতেই কৃষকরা বা জমির মালিকগণ নিজ **ইচ্ছানুযায়ী শস্য রোপণ** করে থাকে, জনসাধারণের চাহিদার প্রতি নজর দেবার মতো শিক্ষা প্রবৃত্তি তাদের থাকে না। কোন কোন সময়ে অধিকাংশ জমিতে **একই ফসলের চাষ** করার ফলে সে ফসলের ঘটে প্রাচুর্য এবং অন্যান্য ফসলের দেখা দেয় অনটন। এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় চাষীকেও যেমন উৎপাদিত পণ্যের মূল্য হ্রাস পাওয়ার জন্য ভুগতে হয় অশেষ দুর্ভোগ, জনসাধারণকেও তেমনি অন্যান্য ফসলের জন্য হতে হয় পরদেশের মুখাপেক্ষী। আর সর্বশেষে সে সকল প্রয়োজনীয় ফসল বিদেশ হতে আমদানি করার জন্য সরকারকে ব্যয় করতে হয় দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রা।...

"শ্রীনেহেরুর মতে **শ্রম-পুঁজিপ্রধান চাষের** (intensive cultivation) ব্যবস্থা করলে আমাদের দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ৫০-৬০ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।...স্পেন দেশে যেখানে একর-প্রতি গড়ে ৩২৩৪ পাউণ্ড এবং ইতালীতে গড়ে ৩১০৫ পাউণ্ড চাল উৎপন্ন হয়, সেখানে ভারতে উৎপন্ন হয় মাত্র ৭২২ পাউণ্ড। সুতরাং আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে ভারতের উৎপন্ন চালের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু উৎপাদন-বৃদ্ধিমূলক পন্থায় আন্তরিকভাবে চাষ-আবাদ করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে কে? সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিগণ যে অভিমত

ব্যক্ত করেছেন তার মর্মার্থ হল এই যে, জমিতে প্রয়োগ করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে রাসায়নিক সার, বপনের জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ এবং জমিতে সিঞ্চন করার জন্য প্রয়োজনীয় জলের এখন পর্যন্ত ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। এই যদি আসল রূপ হয় তবে কোটি কোটি টাকা খরচ করে বাঁধ নির্মাণ, খাল কাটানো বা রাসায়নিক সার তৈরির কারখানা স্থাপন করার সার্থকতা কোথায় ?...

"খাদ্যশস্যের ঘাটতি মেটাবার জন্য অন্য একটি পন্থা যা আছে তা হল **আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা**। ... আমাদের দেশে প্রচুর আবাদযোগ্য অনাবাদী জমি এখনও বিদ্যমান, তা হতেই যদি ১ কোটি একর জমি আবাদ করা যায় তা হলেই খাদ্যশস্য ঘাটতির স্থায়ী প্রতিকার সম্ভব।"

যে কোনো সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অবশ্যই দেখা দরকার যে কৃষিপণ্যগুলির—বিশেষত খাদ্যশস্যের—মূল্য অপরিবর্তিত থাকে, নইলে উন্নয়নমূলক কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে না। একথা বিশেষভাবে খাটে যে সমস্ত অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রে যেখানে কৃষিই জাতির অর্থভাগ্য নির্ধারিত করে দিচ্ছে। ফসলের দাম যখন কম্‌তির দিকে তখন স্বভাবতই কৃষকেরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে এবং চাষী সম্প্রদায়ের ক্রয়শক্তি কমে যাওয়ার সুদূরপ্রসারী মানে হচ্ছে শিল্প-উৎপাদনের মারাত্মক ক্ষতি।

আমাদের সমস্যা কিন্তু ঠিক এর উল্টো। ১৯৫৬ সালের মাঝা-মাঝি থেকে শস্যের দাম ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, এই মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ চাষীর হাতে এক কপর্দকও এল না; বড় বড় জমিদার আর দালালরা প্রচুর পয়সা কামিয়ে নিল। এর উপর দেশের বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে দীর্ঘদিন ধরে অনাবৃষ্টি কৃষকের দুর্দশা আরও বাড়িয়ে তুল্‌ল। এদিকে কৃষিদ্রব্যের দাম বাড়ার দেখাদেখি দৈনন্দিন প্রয়োজনের অন্যান্য সামগ্রীরও দাম বেড়ে গেল, তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হল বাঁধা-উপার্জনের চাকুরিয়াগণ, যাদের আয়ের অঙ্ক জিনিসের দামের সমানুপাতে বাড়েনি।

কাজেই কৃষি-ভারতের সমস্যা হচ্ছে দুটি: (১) ক্রেতাদের স্বার্থের কথা ভেবে কি করে খাদ্যশস্যের দাম কমানো যায়, এবং (২) দালালদের দূর করে দিয়ে কীভাবে কৃষকের ভাগ্য ফেরানো যায়।

পাটশিল্পের সমস্যা

ভারতের অর্থকর শস্যের (cash crop) মধ্যে পাট সর্বপ্রধান। কিন্তু

এই মূল্যবান পণ্যটি আজ নানা সমস্যার সম্মুখীন। সেগুলো একে একে আলোচনা করা যাক।

ভারতে বর্তমানে প্রায় একশত চটকল আছে, তার প্রায় সবগুলিই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এই চটকলগুলির সঙ্গে এ রাজ্যের লক্ষ লক্ষ পাট-চাষীর ঘনিষ্ঠ স্বার্থসম্পর্ক রয়েছে বর্তমানের চটকলের শ্রমিকদের মধ্যে যদিও অধিকাংশ শ্রমিক অবাঙালী, তবু চটকলগুলির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বিরাটসংখ্যক বাঙালীর জীবিকার সংস্থান হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চটকলগুলির জন্য উৎপাদন-শুল্ক, বিক্রয়-কর ইত্যাদি বাবদ বহুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করেছেন। ভারত থেকে বিদেশে রপ্তানি-কৃত পাট ও পাটজাত পণ্যের উপর ভারত সরকার যে রপ্তানি-শুল্ক আদায় করছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফি বছর তারও একটা অংশ পাচ্ছেন, ১৯৫৬-৫৭ সালে যার পরিমাণ ছিল দেড় কোটি টাকা

দুঃখের বিষয়, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের এই সুবৃহৎ শিল্পটির উন্নতির পথে নানা অন্তরায় দেখা দিয়েছে। দেশবিভাগের পর অধিকাংশ পাটের জমি পূর্ব-পাকিস্থানে পড়ে যাওয়াতে পশ্চিমবঙ্গের চটকলগুলি প্রথমটায় যেরকম বিব্রত হয়ে পড়েছিল, বর্তমানে ভারতের নানা স্থানে পাটচাষ বৃদ্ধি পাওয়াতে সেই সঙ্কট দূর হয়েছে। কিন্তু কাঁচামালের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হলেও চটকলগুলির বিপদ রয়েছে অন্যত্র। স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্থানে চটকলের সংখ্যা বেড়েছে, তাতে **উন্নত ধরনের কলকব্জা** বসানো হয়েছে, এসব কল অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে উৎকৃষ্টতর পাটও পাচ্ছে। এদিকে ডাণ্ডী প্রভৃতি অঞ্চলের চটকলে প্রচলিত তাঁতের পরিবর্তে উন্নত ধরনের সার্কুলার তাঁত ও অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতি বসানো হচ্ছে। চীন ফরমোসা ইন্দোচীন অষ্ট্রেলিয়া আর্জেন্টিনা ব্রেজিল রাশিয়া ইত্যাদি প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দেশগুলিও পাট উৎপাদনে অগ্রসর হয়েছে। স্বভাবতই ভারত আজ কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন।

পশ্চিমবঙ্গের চটকলসমূহে যদি উন্নত শ্রেণীর কলকব্জা বসান হয় এবং কলগুলির **পরিচালন-ব্যবস্থার সংস্কার** করে যদি আরও অল্প খরচে অধিকতর পরিমাণে থলে, চট ইত্যাদি উৎপাদনের ব্যবস্থা হয় (ইংরাজীতে যাকে Rationalisation বলে) তবেই এ রাজ্যের চটকলগুলি বহির্ভারতীয় বাজারে প্রতিযোগিতা করতে সমর্থ হবে। চটকলের শ্রমিকেরা কিন্তু এই

র‍্যাশনেলাইজেশন নীতির বিরোধী ; কারণ এর ফলে অপেক্ষাকৃত কম শ্রমিকের সাহায্যে কলের কাজ চালানো যাবে বলে অনেক শ্রমিক বেকার হয়ে পড়বে। তাদের এ আপত্তি অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু এটাও সত্যি যে চটকলগুলিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি যদি না বসানো হয় এবং তার ব্যয়-বাহুল্য যদি না কমানো হয় তা হলে অনেক চটকল শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে, যার ফলে আরও বেশি মজুর চাকরি খোয়াতে বাধ্য হবে। কলকাতার নিকটবর্তী একাধিক চটকল ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

পাটশিল্পের আরেকটি গুরুতর সমস্যা **পাটচাষী ও পাটশ্রমিকের শোচনীয় অবস্থা**। পাট ও পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদনে বা রপ্তানিতে প্রতি বৎসর যে বিরাট টাকা মুনাফা হয় তার মোটা অংশই যায় ফড়ে, দালাল, আড়তদার ও মিলের মালিকদের পকেটে। সরকারী হিসাবে প্রকাশ, একজন পাটচাষীর কষ্টেসৃষ্টে পরিবার পালন করতে যেখানে বাৎসরিক ব্যয় অন্তত ৮০০ টাকা, সেখানে ১৯৫৬-৫৭ সালে চাষের সব খরচ বাদ দিয়ে তার গড়ে বাৎসরিক আয় মাত্র ১১২ টাকা। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

আরেকটি সমস্যা : **ধানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা**। পাটে বেশি লাভ করা যাবে বলে বহু ধানজমিকে পাট উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ সর্বনাশা নীতির পরিণাম 'ভেতো' বাঙালীর জীবনে অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে দেখা দিতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের চটশিল্পের এই জীবন-মরণ **সমস্যার সমাধানের** জন্য ভারত সরকার খুবই ব্যগ্র। শিল্পমালিক, শ্রমিক ও সরকার—এই তিন দলের প্রতিনিধিবর্গ নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। কিভাবে ক্রমে ক্রমে চটশিল্পের র‍্যাশনেলাইজেশন করলে শ্রমিকদের ছাঁটাই করার প্রয়োজন হবে না, শ্রমিকদের বাড়তি খাটুনির জন্য কীভাবে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া যাবে—ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে এই ত্রিদলীয় কমিটি তাঁদের সুনিশ্চিত অভিমত পেশ করেছেন। আমরা আশা করব, কলের মালিকরা এবং শ্রমিক প্রতিনিধিগণ তাঁদের নিজ নিজ স্বার্থের উপর অত্যধিক জোর না দিয়ে ঐ প্রস্তাবগুলিকে বাস্তবে কার্যকরী করার উপযুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করবেন ; তবেই না পাটের 'স্বর্ণসূত্র' (Golden Fibre of Bengal) নামে সত্যে পরিণত হবে!

দক্ষিণবঙ্গের জীবনধারা

বাংলার গ্রামীণ সভ্যতার বয়স বহুশত বৎসরের। খৃষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকে বাংলাদেশে কিছুটা উত্তর-ভারতের নাগরিক সভ্যতার ছোঁয়াচ লেগেছিল। পল্লীসমাজে জীবনের আদর্শটি সহজ অনাড়ম্বর। সেই আদর্শ রূপ পেয়েছে প্রাচীন কবি শুভাঙ্কের কাব্যে :

"বিষয়পতির লোভ নেই, বাড়ীতে গরু থাকায় গৃহ পবিত্র, নিজের নিজের ক্ষেতে চাষ হয়, অতিথির সেবায় গৃহিণীর ক্লান্তি নেই।"

গ্রামের গরীবদের কিন্তু দুঃখের অন্ত নেই। এই দুর্দশার টুকরো টুকরো ছবি নানা কবিতা ও গানের মধ্যে ছড়ানো। ঘরে চাল বাড়ন্ত; উপোস তো রোজকার ঘটনা—অথচ ব্যাঙের সংসার বেড়েই চলেছে! শিশুরা ক্ষিধেয় ধুঁকছে, অস্থিচর্মসার তাদের দেহ, পরনে শতচ্ছিন্ন কাপড়, সেলাই করার স্ুঁচও ঘরে নেই। ভাঙা কুঁড়েঘরের খুঁটি নড়ছে, চাল উড়ছে, বর্ষার জলে মাটির দেয়াল গলে' গলে' পড়ছে।

গরীব মানুষের দুঃখের জীবনে একমাত্র আনন্দ ছিল বোধ হয় গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকেদের বাড়ির পূজোপার্বণ এবং অন্ত্যজ সমাজের নানা আদিম কৌমগত যৌথ নাচ, গান আর পূজো। বাঙালীর ধর্মকর্মময় সাংস্কৃতিক জীবন নগরসীমা পেরিয়ে গ্রামের ফসলের মাঠে, গৃহস্থের আঙিনায়, চণ্ডীমণ্ডপে, বারোয়ারিতলায়, নদীর পাড়ে, জনহীন শ্মশানে, নাচ-গান-পূজোর বিচিত্র আনন্দে, শোক-দুঃখের বিচিত্র লীলায় বিস্তৃত ছিল।

পল্লীবাংলার **কৃষিজীবনের** সঙ্গে যারা পরিচিত তাদের জানা আছে, মাঠে হলচালনার প্রথম দিনে, বীজ ছড়াবার, শালিধান বোনার, ফসল কাটবার বা ঘরে গোলায় তুলবার আগে নানা আচার-অনুষ্ঠান এদেশে প্রচলিত। এই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই বিচিত্র শিল্পসুষমায় মণ্ডিত। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, এর একটিতেও সাধারণত কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। **জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেই** এই পূজানুষ্ঠানের অধিকারী। নবান্ন উৎসব বা নূতন গাছের বা নূতন ঋতুর প্রথম ফল ও ফসলকে কেন্দ্র করে এই সব পূজানুষ্ঠান পল্লীবাসীদের দুঃখধান্দার জীবনে আনন্দের রেশ জাগিয়ে তোলে। শুধু কৃষিজীবনকে আশ্রয় করেই তো নয়, **শিল্পজীবনেও** দেখা যায়, বিশেষ বিশেষ দিনে কামারের হাঁপর, কুমোরের চাকা, তাঁতীর তাঁত, চাষীর লাঙল, ছুতোর-রাজমিস্ত্রীর কারুযন্ত্র প্রভৃতিকে আশ্রয় করে এক ধরনের

ধর্মকর্মানুষ্ঠান গ্রামে গ্রামে প্রচলিত—তারই কিছুটা সংস্কৃত-রূপ আমাদের বিশ্বকর্মাপূজা।

দক্ষিণ বাংলার গ্রামে গ্রামে পুরনো জমিদারের ভিটে আজ ভগ্নস্তূপে পরিণত। কোথাও বা সামান্য সংস্কার করে নিয়ে তাতেই মাথা গুঁজে আছে বংশধরেরা। সামান্য দু-তিন বিঘে জমি হয়ত হাতে আছে। চাকরি করে খাওয়া ছাড়া উপায় নেই। শিক্ষিতদের অনেকেই দশ-পাঁচটার জীবনে বাঁধা ডেইলি প্যাসেঞ্জার। ভোরে উঠেই বেরুতে হয়, ফিরতে বেশ রাত্তির। গ্রামের সঙ্গে এদের সংযোগ সামান্যই।

গ্রামবাসীদের অধিকাংশই চাষের উপর নির্ভরশীল। প্রধান কৃষি ধান পাট আর আলু। জলের অভাব খুব। সেচ সমস্যা প্রবল। সমবায় প্রথা চালু হয়নি বললেই হয়। কৃষির ব্যাপারে সরকারী সাহায্য কিছু কিছু নিয়েছে গ্রামবাসীরা। অধিকাংশই ভাগচাষী। অত্যন্ত দরিদ্র। ফসল ভাল না হলে হাহাকার পড়ে যায়। চুরিচামারি শুরু হয় অনেক জায়গায়।

কুটিরশিল্প যেখানে আছে, খুব দুর্বল অবস্থায় সম্পূর্ণ অবলুপ্তির দিন গুণছে। একদিন পাড়াগুলি শ্রেণীভিত্তিক ছিল, কিন্তু আজ কামার-পাড়ায় কামার নেই, কুমোর-পাড়ায় কুমোর নেই। অনেকেই জাত ব্যবসা ছেড়ে মিল্ বা ফ্যাক্টরীতে কাজ নিয়েছে শহরে। কুটিরশিল্প যেটুকু আছে, গ্রামের প্রয়োজন তাতে মেটে না। জেলে প্রত্যেক গ্রামেই কিছু আছে।

সাবেক কালের পাঠশালাগুলো অচল হয়ে পড়ে ছিল। এখন সরকারের 'স্পেশাল কেডার' পাঠশালা হয়েছে অনেক গ্রামে। ছাত্রসংখ্যা একেবারে মন্দ নয়। পাঠশালার সঙ্গেই কয়েকটি গ্রামে খেলবার উপযুক্ত মাঠও চোখে পড়ে। ছোট বড় সবাই খেলে সেখানে—ফুটবল মরসুমে গ্রামে গ্রামে প্রতিযোগিতা হয় সর্বত্র।

পূজাপার্বণে আমোদপ্রমোদ এখনও দিব্যি হয়। দুর্গাপুজো গ্রাম্যজীবনে এখনও গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে আছে। যাত্রা প্রায় উঠে গিয়েছে। পূজাপার্বণে নাটক অভিনীত হয়। তবে উৎসব-অনুষ্ঠানের সে আন্তরিকতা বা সারল্য আর নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবল শহুরেপনা। মেলা এখনও হয় কোন কোন গ্রামে, তবে আগেকার সেই বৈশিষ্ট্য নেই তাতে। ভিখিরীদের অনেকেই রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক গান গেয়ে ভিক্ষা করে, অনেকেই সুকণ্ঠ। বীরভুম ছাড়া আর কোথাও ঠিক বাউল সম্প্রদায়ের কাউকে দেখিনি। পুরনো মন্দির আছে অনেক গ্রামে। এই মন্দির এবং মন্দিরের বিগ্রহ নিয়ে

গ্রামে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত। **হুগলী জেলার হুল্ল্যা গ্রামে** একটি পুরনো পুকুরের পাড়ে শুভাঠাকরুণের মন্দির। পুকুরটির নাম শুভাপুকুর। এই গ্রামের বিখ্যাত ঘোষ পরিবারের একজন স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে শুভাপুকুর থেকে একটি শিলাখণ্ড উদ্ধার করেন। ইনিই শুভাঠাকরুণ। পরে শুভাঠাকরুণের সঙ্গে শুভেশ্বরের প্রতিষ্ঠা হয়। এই শুভেশ্বর আর কেউ নন, শিবঠাকুর। শিবলিঙ্গের সঙ্গে মস্ত সাপের ফণা। মন্দিরের গায়ে লেখা আছে "বিরাজহ শুভাদেবী শুভেশ্বর সনে। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাহার পূজনে।" মন্দিরটির বয়স দেড়শ' বছর। সম্মুখে একশ' বছরের পুরনো একটি সমাধি। গঙ্গাসাগর থেকে ফেরবার পথে সন্ন্যাসীরা হুল্ল্যা গ্রামে এসে ঘোষ পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করতেন। একটি সন্ন্যাসী একবার এইখানেই দেহত্যাগ করেন। সমাধিটি তাঁরই। দীর্ঘ দিনের পুরনো শুভাপুকুরের ধারে অতীতের সাক্ষী একটি বটগাছ। তারই তলে শুভাদেবীর এই মন্দির আর সন্ন্যাসীর সমাধি। কোন মাঙ্গলিক কাজে গ্রামবাসীরা এখানে এসে প্রণাম করে যায়।

অন্যান্য গ্রামের জীবনেও এক একটি মন্দির বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ।

গ্রামগুলির আজ ভগ্ন দশা। কিন্তু আশার কথা, এই গ্রামগুলিতে এখনও এমন শিক্ষিত যুবক আছেন, যাঁরা গ্রাম ছেড়ে যাওয়া তো দূরের কথা, গ্রামকে নতুন করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছেন। উন্নয়নের কাজ অবশ্য তাঁরা প্রথমে ব্যক্তিগতভাবেই শুরু করেছেন, কিন্তু তাতেও পরোক্ষভাবে সাধারণ গ্রামবাসীর যথেষ্ট উপকার হচ্ছে। একটা নৈতিক প্রভাব অন্তত পড়ছে গ্রামবাসীর উপর। এই যুবকদের উদ্যোগেই গ্রামে টিউব-ওয়েল হচ্ছে, মহামারীর সময় টিকা নেবার ব্যবস্থা হচ্ছে, সংস্কার হচ্ছে পথঘাটের, খোলা হচ্ছে বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র আর পাঠাগার। অল্প কথায়, একটা নিরাপত্তার মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে। হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল, তারকেশ্বর ও বর্ধমান লাইনে ইলেকট্রিক ট্রেন চলছে। এতে শহরের সঙ্গে গ্রামের সংযোগ রক্ষা সহজ হবে, গ্রামোন্নয়নের সম্ভাবনা দৃঢ়তর হয়ে উঠবে।

পল্লীবাংলার আরেকটি চিত্র তুলে ধরছি :

"**মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম** অঞ্চল বিচিত্র সব উৎসব-পার্বণের গিরিনির্ঝর বিশেষ।...সাঁওতালদের মধ্যে সোহরায় পরব হচ্ছে সবচেয়ে বড় পর্ব। আষাঢ় মাসে বীজ বপনের উৎসব। বীজ লাগানো শেষ করে শ্রাবণ মাসে সবুজ রঙের মুর্গী পূজো দিতে হয়, ধান যাতে সবুজ হয় সেইজন্য। কী

চমৎকার কল্পনা ও কামনার সংমিশ্রণ! পুজোর মন্ত্র হল: 'এই যে আমরা বীজ বুনবার নামে দিচ্ছি, এক জায়গায় বুনলে যেন দশ জায়গায় হয়। বৃষ্টির জলে যেন ভাসিয়ে দেয়, ভাসিয়ে নিয়ে যায় গ্রামের মধ্যে যত দুঃখের ও পাপের অসুখ-বিসুখ আছে সব।' তারপর অগ্রহায়ণ মাসে জানথাড় পুজো হয়। গ্রামের লোক শূয়োর কিংবা ভেড়া বলি দেয়; প্রার্থনা হল: 'হে বাপু ঠাকুর! ধানচালের যেন শোধ বাড়ে, জমিতে যেন খামার তৈরি করতে পারি। ইঁদুর ইত্যাদি যারা ক্ষেতের ধান নষ্ট করবে, হে ঠাকুর, তাদের তাড়িয়ে দেবেন।' এরপর গ্রামের লোক ঘরে ঘরে ধান নাওয়াই (নবান্ন) করবে। পৌষ মাসে ধান কাটাঝাড়ার পর হবে সোহরায় পরব—আমরা বলি পৌষালি, পৌষ-পার্বণ। কয়েক দিন ধরে বিরাট উৎসব, বিবিধ তার অনুষ্ঠান। তার মধ্যে গো উৎসবটি বিশেষ লক্ষণীয়। পৌষ-সংক্রান্তিতে টুসু উৎসবও খুব বিখ্যাত।…প্রধানত উৎসবের আনন্দের জন্য গানগুলি রচিত হলেও, কৃষক-কবিদের রচিত এইসব গানের মধ্যে তাদের নিজেদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ ও বেদনার কথা অনেক সময় যেন অজ্ঞাতসারেই মূর্ত হয়ে ওঠে। (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ॥ বিনয় ঘোষ)

চা-প্রসঙ্গে

'চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতক-দল চল হে
টগবগ উচ্ছল কাথলিতল-জল কলকল হে—

চা সত্যি আজ বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছে। খুবই আনন্দের কথা, চা-উৎপাদনে ভারতের স্থান প্রথম। ভারতে উৎপন্ন চায়ের শতকরা ৫৬ ভাগ উৎপন্ন হয় আসামে আর ২৩ ভাগ উৎপন্ন হয় পশ্চিমবঙ্গে। জলপাইগুড়ি আর দার্জিলিঙে বছরে ১৫৩,০০,০০০ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫৬ সালে বাহিরের বাজারে ১৪৩ কোটি টাকার ভারতীয় চা বিক্রি হয়েছিল। ১৯৫৬-৫৭ সালে চা-কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে এসেছিল প্রায় ২২½ কোটী টাকা।

চা চাষের জন্য দরকার ৮০ ফারেনহাইট উত্তাপ এবং ৮০″ বৃষ্টিপাত। পাহাড়ের গায়ে যেখানে জল দাঁড়াতে পারে না সেখানেই চায়ের চাষ ভাল

হয়। চা বীজ থেকে প্রথমে নার্সারিতে চারা উৎপন্ন করা হয়, তারপর সেগুলোকে চা ক্ষেতে বোনা হয়। ৫ থেকে ৭ বছরের মধ্যে গাছগুলি পাতা সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। গাছগুলিকে তিন-চার হাতের বেশি বাড়তে দেওয়া হয় না। মাঝে মাঝে ছেঁটে দেওয়া হয়। ফলে গাছগুলো ঘন ঝোপে পরিণত হয়। তারপর সময়মতো ঝোপের মাথা থেকে তোলা হয় কুঁড়ি-সমেত দুটি কচি পাতা—'দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি'। ভারতে ভাল চায়ের পাতা তোলা হয় শরৎকাল থেকে বর্ষা শুরু হওয়া পর্যন্ত। পাতা তোলা হলে সেগুলোকে শুকিয়ে মাড়াই করে নেওয়া হয়, তারপর গাঁজিয়ে নিয়ে আবার শুকিয়ে ফেলা হয়।

চা-শিল্পের সমস্যা

বর্তমানে ভারতীয় চা-উৎপাদন সঙ্কটের মুখে। আফ্রিকা, সিংহল ইত্যাদি অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারত পেছিয়ে পড়েছে। যে চা উৎপন্ন হচ্ছে তার সবটা বিদেশের বাজারে বিক্রি হচ্ছে না। ফলে **অতি-উৎপাদন** সঙ্কট দেখা দিয়েছে। অন্যান্য দেশ ভারতের তুলনায় অনেক সস্তায় চা দিতে পারছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আবগারি আর রপ্তানি-শুল্ক, এবং রাজ্যসরকারে অন্যান্য ট্যাক্স আর পরিবহণ খরচ বহন করে যে দামে ভারতীয় চা বিদেশের বাজারে বিক্রি হচ্ছে তাতে নাকি উৎপাদন-ব্যয়ই উঠে আসছে না। অর্থনীতিবিদ্‌রা বলছেন ভারতের **চা-শুল্ক-নির্ধারণের** মধ্যে **অসামঞ্জস্য** আছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি ইউরোপীয় কোম্পানী নাকি তাঁদের চা-বাগিচা বিক্রি করে আফ্রিকায় গিয়ে নতুন ভাবে চা-উৎপাদনের পরিকল্পনা নিয়েছেন। সমস্যাটা অবশ্য সাধারণ চা-কে নিয়ে, প্রথমশ্রেণীর ভারতীয় চা অবশ্য বিদেশের বাজারে ভাল দামেই কাটছে। কিন্তু ভারতীয় চা উৎপাদনের বেশির ভাগই হচ্ছে এই 'সাধারণ চা'। চায়ের এই সমস্যা আমাদের জাতীয় সমস্যাগুলির অন্যতম, কারণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এই সমস্যা **সমাধানের** প্রথম পথ শুল্কনীতির পুনর্বিবেচনা। অনেকে বলছেন রপ্তানি-শুল্ক হ্রাস করবার কথা। চায়ের গুণাগুণ অনুসারে শুল্ক নির্ধারণের পরামর্শও দিচ্ছেন কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ। এ ছাড়া একটি

শক্তিশালী 'আন্তর্জাতিক চা-নিয়ন্ত্রণ সংস্থার'ও প্রয়োজন। বিভিন্ন সময়ে এ-জাতীয় সংস্থা গড়ে উঠলেও স্থায়ী হয়নি।

কিন্তু সমস্যা সমাধানের একটি পথ আজও অনালোচিত। **চায়ের তেল** দিয়েই চায়ের সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। অবাক হবার মতোই কথা। চা-বীজ থেকে সত্যই তেল পাওয়া যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চায়ের তেল উৎপন্ন হচ্ছে। ডালদার মতো চায়ের তেল দিয়ে লুচি ভেজে খাওয়া চলতে পারে, আবার কলকজাতেও এ তেল ব্যবহার করা চলতে পারে। বীজ পেতে হলে গাছগুলোকে অনেক বেশি বাড়তে দিতে হবে, ছেঁটে দেওয়া চলবে না। আমরা যখন অতি-উৎপাদনের সমস্যায় ভুগছি তখন বেশ কিছু পরিমাণ গাছ বেড়ে চলুক এবং তা থেকে তেল তৈরির আয়োজন চলতে থাকুক। অতি-উৎপাদন সঙ্কটও এভাবে এড়ান যাবে। আর উৎপন্ন চা-তেল দিয়েও যা টাকা আসবে তাতে ঘাটতি অনেকটা পূরণ হতে পারবে। বনস্পতি ঘি তৈরির কাজেও বাদামতেলের বদলে চা-তেল ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে অনর্থক এত বাদাম নষ্ট হবে না। বরং বেশি করে বাদাম রপ্তানি করতে পারলে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাও অনেক বাড়বে।

চা-বাগানের জীবন

ভারতে ৭,৯১,২০২ একর জমিতে ৬,৮৪০ চা-বাগান আছে। এতে প্রায় ১১ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের প্রায় দুই লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। স্থানীয় শ্রমিক কম, বেশির ভাগই উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের।

পাহাড়ের গা ঘেঁসে থাকে-থাকে সাজানো চা-ক্ষেতগুলো দেখতে সত্যই অপূর্ব। চা-ক্ষেতের মাঝে দাঁড়ানো কর্মরত কুলি-রমণী, দূরে সারি সারি কুলি-ব্যারাক আর মালিকদের বাংলো, নিকটবর্তী ফ্যাক্টরীর চিমনির ধোঁয়া—'ডি-এচ্-আর"-এর গাড়িতে যেতে যেতে ছবির মতন লাগে সব। শুধু বিজ্ঞাপন নয়, অনেক শিল্পীই চা-বাগানের দৃশ্যকে ধরে রেখেছেন তাঁদের শিল্পকর্মে।

'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি'। নামটাও বেশ কাব্যিক। কিন্তু প্রশ্ন জাগে দুটি পাতা একটী কুঁড়ি যারা দিনের পর দিন তুলে যায় তাদের জীবনে কোন কাব্য আছে কি-না।

কিছুদিন আগেও অত্যধিক শ্রম এবং নির্যাতনই ছিল চা-শ্রমিকদের

ভাগ্যলিপি। শ্বেতাঙ্গ মালিকেরা শ্রমিকদের মানুষ বলেই মনে করতেন না। তারা ছিল লোভের শিকার মাত্র। মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দের 'টু লীভস্‌ অ্যাণ্ড এ বাড্‌' উপন্যাসে চা-শ্রমিকদের বিড়ম্বিত জীবনের ছবি আছে।

সময় এগিয়ে চলেছে। মানুষের চিন্তাধারায় এসেছে যথেষ্ট পরিবর্তন। মানুষ ক্রমশ নিজের মূল্য বুঝেছে। মাথা তুলে দাঁড়াতে শিখেছে। শ্রমিকদের উপর নির্বিচার নির্যাতন চালানো মালিকের পক্ষে আর সম্ভব নয়। শ্রমিক-কল্যাণে রচিত আইনে আজ শ্রমিকের শ্রম-কাল সুনির্ণীত। বাড়তি-পারিশ্রমিক না দিয়ে ৮ ঘণ্টার বেশী খাটানো আজ বেআইনী। চা-শ্রমিকেরাও আজ শ্রমিক-কল্যাণে রচিত বিধানগুলির ফলভোগী।

কিন্তু আজও চা শ্রমিকদের মধ্যে সুস্থ জীবন-বোধ আসে নি। শ্রমান্তে অত্যধিক মদ্যপান এবং তজ্জনিত গর্হিত ক্রিয়া-কলাপ আজও অব্যাহত। আমোদ-উল্লাস এবং পালপার্বণে একত্র মিললেও সমাজ-বোধ চা-বাগানের জীবনে ঠিক আসেনি মনে হয়। চা-ও একটি কৃষিকাজ বটে কিন্তু বাংলার খেতে-খামারে-খাটা কৃষকদের সঙ্গে চা-বাগানের শ্রমিকদের পার্থক্য অনেক। গ্রামের মাটির সঙ্গে কৃষকদের নাড়ীর যোগ, চা-বাগানের শ্রমিকদের তেমনটি নেই।

হে অরণ্য কথা কও!

ভারতের বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে অনেক অরণ্য রয়েছে। সমুদ্রতীরে আর পাহাড়ী অঞ্চলে এই অরণ্যসম্পদের প্রাচুর্য। প্রাচীন ভারতের অরণ্য একদিন ছিল মানুষের প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা অরণ্য থেকে দূরে সরে এসেছি কিংবা অরণ্যকেই দূরে সরিয়ে রেখেছি। সে যাই হোক, আমাদের যেটুকু অরণ্যসম্পদ আপাতত রয়েছে তা শুধু যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রম্যনিকেতন তাই নয়, প্রাণিজগতের কল্যাণের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। আমাদের বাংলাদেশ একসময়ে অরণ্যসম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু বাংলা বিভাগের পর সুন্দরবনের বিরাট ভূখণ্ড পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পশ্চিম বাংলার বন বলতে আমরা এখন বুঝি উত্তর সীমান্তে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ সীমান্তে

সুন্দরবনের সামান্য অংশ ও পশ্চিমে মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, আসানসোল ও বাঁকুড়ার কতকগুলো অঞ্চল। পশ্চিম বাংলার বনে সাধারণত শাল, শিমূল, বাঁশ, খয়ের, আবলুস, ফার্ন, পাইন ও ফার বৃক্ষ দেখা যায়।

বনের **উপকারিতার** কথা বলে শেষ করা যাবে না। যেমন: (১) আবহাওয়ার সাম্য রক্ষা করে ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়তে সাহায্য করে। (২) জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং ভূমিক্ষয় নিবারণ করে। (৩) বায়ুর গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। (৪) বন্যা প্রতিরোধে বিশেষ সহায়তা করে। (৫) নিকটবর্তী মরুভূমির গ্রাস থেকে জনপদকে রক্ষা করে।

এছাড়া বন্যসম্পদকে আমরা নানাভাবে কাজে লাগাচ্ছি। যদি এরও একটা ছোট্ট তালিকা করা যায় তবে বিস্মিত হতে হবে। দরজা জানালা; কড়ি বরগা, রেলিং শ্লিপার, খুঁটি ঢেঁকি, চরকা তাঁত, এরোপ্লেন, জাহাজ, নৌকো ডিঙি, গাড়ি, বাসন, কাঠের মূর্তি, কাঠখোদাই যন্ত্রের হাতল, বাক্স রেডিও, গ্রামোফোন, কাগজ—কোথায় নেই বনের অযাচিত দান? বন থকে আমরা যে জ্বালানি কাঠ পাই দৈনন্দিন জীবনে তারও কত বড় একটা গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু শুধু এই জালানি কাঠ কেন, বন থেকে মানুষের প্রাণদায়িনী বহু মূল্যবান ঔষধপত্র তৈরি করা সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। বন থেকে আহৃত ফলমূল, মধু, মসলা, গাছের তেল ইত্যাদি মানুষের কত প্রয়োজন সিদ্ধ করে। বন থেকে যে তূলা পাওয়া
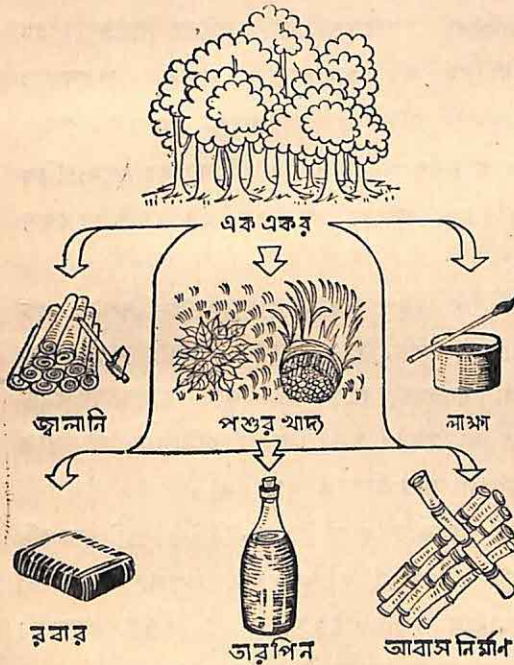
যায় সেই তূলাই আমাদের দেশের বস্ত্রশিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অরণ্যের **পশুসম্পদ**ও আমাদের অমূল্য জাতীয় সম্পদ। জন্তুর চামড়া, লোম, শিং ইত্যাদি দিয়ে কতরকম জিনিসই না তৈরি হয়।

বন সংরক্ষণের সমস্যা

বন আমাদের জাতীয় জীবনে কতখানি, তা আর বাড়িয়ে বলবার দরকার নেই। বন সংরক্ষণ করার জন্য সরকারী দপ্তরও আছে। কিন্তু জনসাধারণ যদি বনরক্ষার বিষয়ে সজাগ না হয় তবে শুধু সরকারী প্রচেষ্টা সার্থক হতে পারবে না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে বন-উন্নয়নের কথা চিন্তা করা হয়েছে। শান্তিনিকেতনের "**বৃক্ষরোপণ**" অনুষ্ঠান আমাদের জাতীয় উৎসবে পরিণত হচ্ছে, এ খুবই আশা আর আনন্দের কথা। রবীন্দ্রনাথ জাতীয় কল্যাণের কত পথই না চিন্তা করে গেছেন। আর এ চিন্তাধারাও এসেছে ঐতিহ্য-সূত্রে। অশোকের অনুশাসনে আছে: "পশুর ও মানুষের ছায়াপ্রদ হইবে বলিয়া আমি পথে ন্যগ্রোধ রোপণ করাইয়াছি, আমবাগান বসাইয়াছি, আধক্রোশ অন্তর আমি ইঁদারা করাইয়াছি, ঘাটবাঁধানো জলাশয় করাইয়াছি—পশু ও মানুষের সুখ শান্তির জন্য।"

সমস্যাও আছে প্রচুর। নগরীকরণ যত বাড়বে বন-ও তত কমে যাবে। এ তো খুবই স্বাভাবিক। বনগুলো একসঙ্গেও নেই, ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন জায়গায়। একসঙ্গে অনেকটা বন কম জায়গাতেই আছে। সংরক্ষণের সে-ও আরেক অসুবিধা। বনের চারিদিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রাম। গ্রামবাসীরা জ্বালানির জন্য বন আক্রমণ করছে সর্বদা। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে ব্যাবসা-বাণিজ্যের ক্রমবিস্তারে কাঠের প্রয়োজন এত বেশি যে রক্ষণ পরিকল্পনা বানচাল হতে চলেছে।

সমস্যা সমাধানের সহজ নীতি এই: একটা গাছ কাটলে দশটা গাছ বুনতে হবে। কাটা হয়ে গেলে কাটা গাছ থেকেও আবার নতুন গাছ গজিয়ে ওঠে। এজন্য লক্ষ্য রাখতে হবে গাছ কাটা হবার পর বনটি যেন গোচারণ-ভূমিতে পরিণত না হয়। গরু মহিষরা কচিপাতা আর ডাল খেয়ে ফেলে, তার ফলে, গাছগুলো আর বাড়তে পারে না।

স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, রেলওয়ে সংস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যদি নিজেদের এলাকায় বৃক্ষরোপণ পরিকল্পনা করেন তবে সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়। অঙ্গনে ও প্রাঙ্গণে সুপরিকল্পিতভাবে এটা হওয়া দরকার। আমাদের মূলমন্ত্র হোক: 'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে।'

পাহাড়ী গ্রাম

নদীমাতৃক বাংলা দেশে সবুজ-ফসলে-ঘেরা শান্ত স্নিগ্ধ গ্রামগুলো

দেখতেই আমরা বেশি অভ্যস্ত। কিন্তু সমুদ্র অরণ্য ও পর্বত-বেষ্টিত বিচিত্র বাংলা দেশে পাহাড়ী গ্রামেরও অভাব নেই। হিমালয়ের চির-রহস্যময় আবেষ্টনীর মধ্যেও গড়ে উঠেছে ছোট ছোট প্রাণকেন্দ্র। প্রকৃতির অযাচিত সৌন্দর্যে ও পার্বত্য বনভূমির নানা সাহায্যে পুষ্ট হয়ে এই সব পাহাড়ী গ্রামে মানুষ গড়ে তুলেছে শান্তির নীড়। উঁচু পাহাড়ের ওপর যেখানে আছে চাষ করবার মতো সামান্য জমি, পানীয়ের জন্য আছে ঝর্ণার জল, সেইখানে সাধারণত দেখা মিলবে পাহাড়ী গ্রামের। পাহাড়ী গ্রাম প্রায়ই ঘনবসতিপূর্ণ হয় না। বাংলার পাহাড়ী গ্রামগুলোতেও এর ব্যতিক্রম নেই। অসমতল ভূমিতে বাঁশের খুঁটির ওপরেই হয়ত বা দাঁড়িয়ে আছে ছাড়াছাড়া কয়েকটা কুটির। আবার কোথায় বা পাহাড় কেটে সমতল করে তৈরি হয়েছে ছোট ছোট বাড়ি।

পাহাড়ী গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে বেশির ভাগই নেপালী, লেপচা ভুটিয়া ও তিব্বতী। এরা সকলেই পরিশ্রমী। চাষ করা এদের পেশা। গ্রামের মধ্যে বহিরাগত ব্যবসায়ী ও কুসীদজীবী হিসেবে কিছু কিছু মারোয়াড়ী, বাঙালী ও বিহারীর সাক্ষাৎ মেলে। গ্রাম্য মানুষ কৃষিকাজ, পশুপালন, বন্য কাঠ সংগ্রহ ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত থাকে। অরণ্য ও তুষারশোভিত বিচিত্র পার্বত্য জীবনে সাধারণ গ্রাম্য মানুষেরা সকলেই হয়ে ওঠে কষ্টসহিষ্ণু কর্মঠ ও সহজ সরল।

পাহাড়িয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে নানা ধর্মের লোক আছে। এর মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধই প্রধান। গ্রামের মানুষদের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্য আছে বলে কিন্তু কোন বিরোধ নেই। অস্পৃশ্যতার কোন চিহ্ন এদের মধ্যে নেই; তবে সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে এরা মুক্ত নয়। শিলাবৃষ্টি থেকে জমিকে রক্ষার ব্যাপারে এরা লামার শরণাপন্ন হয়। কোন বাড়ীতে দেবতার কোপদৃষ্টি না পড়ে সেজন্য এরা খুবই সজাগ।

পাহাড়ী গ্রাম্য মানুষেরা আধুনিক সভ্য সমাজের মানুষের মতন বিয়ের ব্যাপারে সাধারণত কোন উৎসব করে না। মৃত্যুর পরের অনুষ্ঠান বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই পালন করা হয়। গ্রাম্য মানুষদের সব ব্যাপারেই নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এদের সমাজ সংস্কৃতি ধর্ম সবই এক বিশিষ্ট গতিতে চলে। কিন্তু এর মধ্যেও পরিবর্তনের ঢেউ এসেছে খৃষ্টান মিশনারীদের দৌলতে। খৃষ্টধর্ম ও ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রচারে এদের স্বকীয়তার মধ্যেও এসেছে সামান্য কিছুটা পরিবর্তন। ইদানীং জাতীয় সরকারের

উদ্যোগে নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় দেশ গড়ার কাজে সকলকে উদ্বুদ্ধ করে তোলবার চেষ্টা চলছে।

পাহাড়ী গ্রামের উন্নতির উপর দেশের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভরশীল। এইসব জায়গাতেও বিদ্যুৎ, বেতার ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষার আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে এইসব গ্রামকে অন্তত কুটিরশিল্পে উন্নত করে তোলা উচিত। স্বাভাবিক বৃত্তির সঙ্গে কুটিরশিল্পের যোগ ঘটাতে পারলে দরিদ্র পাহাড়ী গ্রামবাসীর দারিদ্র্য দূর হয়ে শান্তিময় আদর্শ পাহাড়ী গ্রাম গড়ে উঠবে।

পাহাড়ী শহর

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি হিমালয়ের বুকে বাংলার তিনটি বড় শহর—দার্জিলিঙ, কার্সিয়াঙ, কালিম্পঙ। একদিন যেখানে ছিল গভীর অরণ্য ও দুর্গম রহস্য, মানুষের চেষ্টায় সেখানে গড়ে উঠল এইসব শহর। আকাশচুম্বী দার্জিলিঙ পাহাড়ের ওপর বন্ধুর পার্বত্য পথ কেটে যে রেলপথ বা পায়ে-চলা পথ তৈরি হয়েছে তা সত্যই বিস্ময়কর। প্রকৃতির অটল ধ্যান-গাম্ভীর্যের মধ্যে হিমালয় পাহাড়ের তুষারধবল কাঞ্চনজঙ্ঘা ও নিবিড় অরণ্যের সঙ্গেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে মানুষের সখ্য। আর এই মিতালির ফলই হল সুন্দর পাহাড়ী শহরগুলো! আধুনিক সভ্যতার স্পর্শে পাহাড়ী শহরগুলোতে বৈদ্যুতিক আলো, সুন্দর পথঘাট, বড় বড় সুদৃশ্য বাড়ি, কিছুরই অভাব নেই। এরই সঙ্গে মিলেছে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোহারী রূপ। রডোডেন্ড্রন ও ম্যাগনোলিয়ার মনভোলানো সুষমা। কাঞ্চনজঙ্ঘা, মাউণ্ট এভারেষ্টের সূর্যস্নাত তুষারশৃঙ্গে জড়িয়ে থাকে সুদূরের আহ্বান। পাহাড়ী শহরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে আকৃষ্ট হয়ে পৃথিবীর দূর দূর দেশ থেকে ভ্রমণকারীর দল বেড়াতে আসে। দার্জিলিঙ তো এ বিষয়ে বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণ। আর সেজন্যই এ জায়গাটি বিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

দার্জিলিঙ চা-শিল্পের একটা বড় কেন্দ্র। এজন্য এক বিরাট বাণিজ্যশহর হিসেবে দার্জিলিঙের সুখ্যাতি। দার্জিলিঙে বেশ বড় একটি শিক্ষাকেন্দ্র আছে। তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে কালিম্পঙের মাধ্যমে। তিব্বতী ও চীনাদের মধ্যেও অনেকে এ অঞ্চলে ব্যবসায়ে নিযুক্ত। কিন্তু নেপালী, লেপচা, ভুটিয়া প্রভৃতি পাহাড়িয়া মানুষের মধ্যে

ব্যবসায়ীর সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। বিহারী মারোয়াড়ী ও বাঙালী ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে।

পাহাড়ী শহরগুলোতে বড় বড় হোটেল স্বাস্থ্যনিবাস হাসপাতাল প্রমোদ-উদ্যান ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। দার্জিলিঙে স্থাপিত প্রথম মাউন্টেনিয়ারিং কলেজ ভারতের এক বিশেষ গৌরবের স্বাক্ষর বহন করে। দার্জিলিঙে একটা পশুশালাও তৈরি হয়েছে, এ অঞ্চলের বিচিত্র পশুপাখি ও গাছপালা সংরক্ষণ এখানে সহজসাধ্য হয়েছে।

কিন্তু তাই বলে পাহাড়ী শহরগুলো একেবারে সমস্যামুক্ত, এমন নয়। এর মধ্যেও অনেক ত্রুটি, অনেক অনগ্রসরতা রয়েছে। ধনীর বিলাসকেন্দ্র হিসাবে পাহাড়ী শহরের ঐশ্বর্যকেই শুধু দেখলে চলবে না। অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত দরিদ্র শহরবাসীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে হলে **জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার** প্রয়োজন। আশার কথা, এ বিষয়ে সরকার ও জনসাধারণ সচেতন। অদূর ভবিষ্যতে শিল্প-বাণিজ্যে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে পাহাড়ী শহরের মানুষও আদর্শ স্থান অধিকার করবে, এতে সন্দেহ নেই।

বেচা-কেনা-পরিবহণ

"…মাঠের স্তূপাকার ফসল নাও, গাড়ি তৈরি কর, যা অনায়াসে ফসল বয়ে নিয়ে যেতে পারে।" এ চিত্র বৈদিক যুগের। 'রাশি রাশি ভারা ভারা ধান-কাটা হল সারা।' এবার শকটের সাহায্যে আশেপাশের গ্রামে নিয়ে যাবার পালা। এ প্রথা চলে এসেছে যুগ যুগ ধরে ; পুরনো ভারতে গঞ্জে হরপ্পা-মোএঞ্জোদড়োর যুগেও যে এভাবে আমদানি রপ্তানি চলত তার নজীর আছে। হিতোপদেশের মিত্রভেদ গল্পে পড়েছি—বর্ধমান গাড়িতে ফসল সাজিয়ে চলেছে গ্রামান্তরে।

এ চিত্র সর্বত্র। ফসল ফলিয়ে বা শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করে চাষী বা শিল্পী যদি বসে থাকে তবে তার পেট চলবে না। উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রি চাই। আর বিক্রি করতে হলে চাই খরিদ্দার। খরিদ্দার কোথায়? আগে কৃষক, শিল্পী, জেলে, তাঁতী নানান্ বৃত্তির লোকেরা যৌথজীবন যাপন করত। তখন ছিল **বিনিময়প্রথা**। অর্থাৎ জিনিসপত্রের বিনিময়ে চলত বেচা-কেনা। তাই কোনো গ্রামে উৎপন্ন সামগ্রীর উৎপাদন-বণ্টন ঐ গ্রামেই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ সঙ্কীর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থার ঘটল

পরিবর্তন। কৃষক শিল্পী জেলে তাঁতী কামার কুমোর তাদের উৎপন্ন সামগ্রী মাথায় নিয়ে চল্‌ল ভিন্‌-গাঁয়ে, চল্‌ল গঞ্জে হাটে শহরে। পথে হয়ত দর্শন মিল্‌ল বেপারী, ফড়িয়া, আড়তদারের। বিক্রীর ব্যবস্থা করা হল। আর যা অবশিষ্ট থাকল তারও সদ্গতি হল গঞ্জে বা শহরে গিয়ে। কিন্তু মাথায় করে আর কতটুকু শস্য বা শিল্পসামগ্রী নেওয়া যায়! তা'ছাড়া মানুষের কায়িক পরিশ্রমের সীমা আছে। তাই এল গরুর গাড়ি। গরুর গাড়ি বোঝাই মাল চল্‌ল। গঞ্জে সে মাল এসে পৌছলে মহাজনের গুদামে। গাড়ি চলতে চাই পথ। তৈরি হল পথ—কাঁচা সড়ক, পাকা সড়ক। রাষ্ট্রশক্তি এদিকে নজর দিল, কেন না এতে দু'পয়সা আসে শুল্ক হিসাবে। জানা গিয়াছে, ভারতবর্ষে নাকি প্রায় ৯০ লক্ষ গরুর গাড়ি প্রতি বছর ১০ লক্ষ টন মাল বহন করে।

ব্যাবসা-বাণিজ্যের অন্যতম বাহন হল নৌকা। গ্রাম থেকে মালপত্তর নিয়ে নদী বয়ে নৌকো এসে থামে রেলষ্টেশন, লরীর পথ কিংবা শহরে। ভারতে যেসব অঞ্চলে নদীগুলো নাব্য সেখানেই নৌকার চলাচল বেশি। শুধু কলকাতাতেই প্রতি বছর প্রায় ৪৫ লক্ষ টন মাল আমদানি-রপ্তানির জন্য আসে।

নৌকো ছাড়া দূর-পাল্লার বাণিজ্যপথে চলে ষ্টীমার, জাহাজ। তবে এতে মাশুল অনেক বেশি পড়ে। যানবাহনের মাশুল আবার জিনিসপত্তরের দামকে অনেকখানি প্রভাবিত করে। আমদানি রপ্তানির ব্যাপারে পরিবহণ খরচা যত বেশি হবে উৎপন্ন সামগ্রীর দামও তত বেড়ে যাবে।

গরুর গাড়ি বা নৌকো যে মালপত্তর পৌছে দেয় গঞ্জে বা শহরে তা আবার চলে যায় আরও দূরের শহরে, বাজারে, এমনকি অন্য প্রদেশে, মহাদেশে। যেমন, গ্রামে হাটে-বাজারে নৌকোপথে বা গরুর গাড়ি বোঝাই ধান এল। সেখান থেকে ফড়ে বা বেপারীরা কিনে আড়তদারের আড়তে আনল। সেখান থেকে লরী বা রেলের ওয়াগন বোঝাই হয়ে ধানকলে এল। আবার চাল তৈরি হবার পর মহাজনের গুদামে বস্তাবন্দী হল। বস্তা-বোঝাই চাল এল রেল বা ষ্টীমারে চড়ে বন্দরে। বন্দর থেকে বড় বড় জাহাজে কিংবা এরোপ্লেনে উড়ে চল্‌ল দূরান্তরের বাজারে। তা হলে দেখতে পাচ্ছি, দূর দেশের সঙ্গে জিনিসপত্র আমদানি রপ্তানি করবার বাহন হল প্রধানত ট্রেন, জাহাজ ও এরোপ্লেন।

উত্তর বঙ্গ ও আসামের পার্বত্য অঞ্চলের **কাঠ পরিবহণের** সমস্যার

সমাধান করছে খরস্রোতা পার্বত্য নদীগুলি। ভারী ভারী কাঠ নদীর বুকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, তারপর নির্দিষ্ট জায়গা থেকে সেগুলি সংগৃহীত হয়। নদীতে কাঠ ভাসাবার ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে হাতীর সাহায্য নেওয়া হয়।
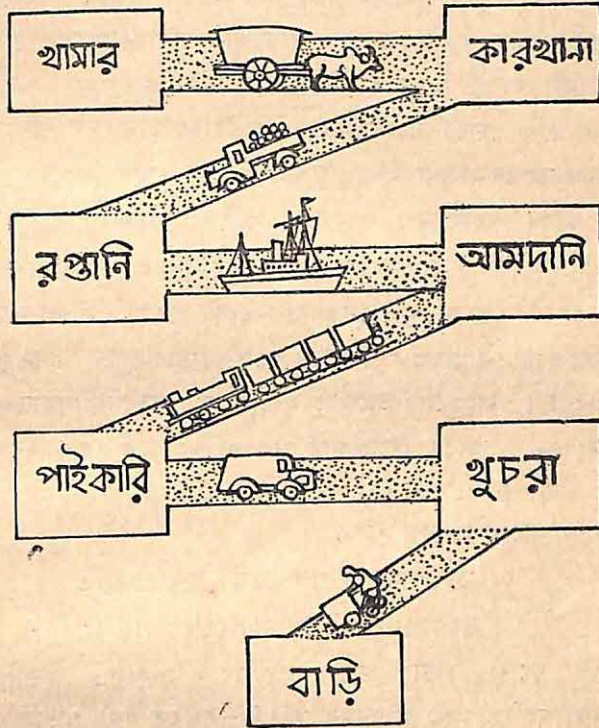
সব নদীরই অবশ্য এই পরিবহণ ক্ষমতা নেই। কাঠ অনেক সময় পাহাড়ের গায়ে আট্‌কে যাবারও সম্ভাবনা আছে। প্রকৃতির কোন্ শক্তিকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, মানুষ সে বিষয়ে সব সময়ে সচেতন—এই যা রক্ষে।

পোশাকি কথা

পাশ্চাত্য দেশে একটা কথা চল্‌তি আছে যে, কোনো ভদ্রলোকের সামাজিক অবস্থার পরিচয় মেলে তাঁর পত্নীর বেশভূষা থেকে। কিন্তু বেশভূষা কি কেবল আভিজাত্যের সূচক? পরিচ্ছদের আর কোন মূল্য নেই? পোশাক কি শুধুই 'পোশাকি'?

মানবসমাজের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে বেশভূষার বহুল পরিবর্তন হয়েছে আদিম উলঙ্গ মানুষেরা যখন বুঝল যে, গায়ের চামড়া ঢাকা থাকলে

প্রকৃতির বিভিন্ন খেয়ালখুশি থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, তখন গাত্রাচ্ছাদনের উপায় আবিষ্কৃত হল। পরবর্তী কালে পোশাক পরাটা সভ্যসমাজের একটা রীতিতে দাঁড়িয়ে গেল, জানোয়ার থেকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য। প্রাচীন কালে মানুষের আচ্ছাদন ছিল বৃক্ষপত্র বা পশুচর্ম। ক্রমশ সুতো ও পশম থেকে পোশাক তৈরি হল। আর আজ রসায়নাগারে প্রস্তুত রেয়ন-নাইলনের মিহি কাপড় মানুষের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করছে।

জার্মান কবি গ্যেটে বলেছেন: পৃথিবীর প্রাচীনতম শিল্পগুলির মধ্যে তাঁতশিল্প হল মহত্তম যা যথার্থই মানুষকে পশু থেকে পৃথক করতে পেরেছে।' আমাদের ঋগ্বেদ বলেছেন: 'বস্ত্রবয়ন কবিতা রচনার মতো।' সুতো বোনাকে অনেক দেশের প্রাচীন কাব্যেই পবিত্র শিল্পকাজ হিসেবে দেখানো হয়েছে। প্রাচীন লেখক রবার্ট গ্রেভস্-এর একটি রচনায় ওম্‌ফেল তার বন্ধুকে বলছে সুতো কাটা শিখতে: "পৃথিবীতে সুতো কাটার মতো এমন তৃপ্তিদায়ক কাজ আর নেই। আঙুলের ভাঁজে তুলোর পাঁজ। তকলি ঘুরচে—সবচেয়ে ভাল খেলনা যেন। বুনতে বুনতে গান গাও গুনগুন করে, গল্প কর স্বজনদের সঙ্গে, আর মনটাকে ছেড়ে দাও নিরুদ্দেশে!"

এ তো আমাদের ঘরেরও ছবি:

'চরকা আমার পুত, চরকা আমার নাতি
চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতী।'

মানুষের সুতো কাটার আদিম যন্ত্র হচ্ছে তকলি। তকলির উন্নত সংস্করণ চরকা আবিষ্কার হয় আমাদের দেশেই—সম্ভবত সপ্তম শতকে। আমরা করলাম হাতে-চালানো চরকা, পরে চীন করল পায়ে-চালানো চরকা। আরবেরা আমাদের কাছ থেকে শিখে ইউরোপকে শেখাল চরকা চালানোর কৌশল।

শুধু কি সুতো থেকে? অ্যাসবেস্টস-জাতীয় ধাতু ও পাথরের তন্তু দিয়েও কাপড় বোনা হয়েছে। আলেকজাণ্ডার জলন্ত আগুনে একখানা ন্যাপ্‌কিন ছুঁড়ে দিয়ে অতিথিদের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। ন্যাপ্‌কিন আগুনে পুড়ল না, কারণ ধাতুতন্তুতে তৈরি। সীরিয়ার অ্যাসবেস্টস-কাপড় চীনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এ থেকে আলোর পল্‌তে তৈরি হল—এমন পল্‌তে যার আর ক্ষয় নেই—ভারি মজা! শৌখিন কাপড়ে সোনা আর রূপোর সুতো ব্যবহারের কথাও আছে বাইবেলে, আর সেই সঙ্গে তাঁতীদের কী প্রশংসা!

একথায় সকলেই সায় দেবে যে, সামাজিক রুচি ও শালীনতা অনেকখানি নির্ভর করে আমাদের বেশভূষার উপর। এর মধ্যেও কত সমস্যা। শহুরে পোশাক আর গ্রামবাসীদের পোশাকে কত পার্থক্য। ছোটদের জামা-কাপড়ই বা কেমনতর হবে? মনে রাখা দরকার, পোশাকের মুখ্য প্রয়োজন গাত্রচর্মকে রক্ষা করা। সুতরাং আমাদের বাসভূমির জল-হাওয়ার উপযোগী পোশাক আমাদেরই নির্বাচন করতে হবে। আরেকটা কথা পরিচ্ছদ সাদাসিধে হোক, কিন্তু তা পরিচ্ছন্ন হতে হবে। বিশ্রী পোশাকে শুধু মানুষকেই হতশ্রী দেখায় না, জন্মভূমিকেও শ্রীহীন করে তোলে॥

অনুশীলনী

ইউনিট-পরিকল্পনার খসড়া॥ বিষয়ঃ "কৃষি"

[এক] প্রশ্নের আলোচিতব্য বিষয়গুলির অনুধাবন

১। আমরা যে সব খাদ্য গ্রহণ করি তা কোথা থেকে আসে?

২। সভ্যতার সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক কী? কৃষিবিদ্যার প্রথম আবিষ্কারক মেয়েরা—তার প্রমাণ কী?

৩। বাংলাদেশে কতরকম ধান হয়?

৪। পাটকে 'বাংলার স্বর্ণসূত্র' বলা হয় কেন?

৫। বাংলার চাষীর জীবনযাত্রা কিরূপ? [সময়মত জলের অভাব, মূলধনের অভাব, নগণ্য আয়, ঋতুবিশেষে কর্মাভাব, মামলাপ্রিয়তা, গবাদি পশুর স্বাস্থ্য, সুষম খাদ্যের অভাব—ইত্যাদি বিষয় এ প্রসঙ্গে আলোচ্য।]

৬। চাষবাসের কী কী নতুন পদ্ধতি দেশ-বিদেশে অবলম্বিত হয়েছে?

৭। চা উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা কী?

৮। বনসম্পদে পশ্চিমবঙ্গ খুবই সমৃদ্ধ কেন?

৯। ধান পাট চা ও অন্যান্য কৃষিসম্পদ কিভাবে কেনা-বেচা হয়?

১০। দক্ষিণবঙ্গের শহর ও গ্রাম এবং উত্তরবঙ্গের পাহাড়ী অঞ্চলের শহর ও গ্রামের জীবনযাত্রার পার্থক্য কী?

[দুই] সমস্যা ও বিচারধর্মী প্রশ্ন

১। পশ্চিমবঙ্গের ভূমিভাগের বন্ধুরতা এ রাজ্যের কৃষিদ্রব্যে বৈচিত্র্য এনেছে।—এ উক্তির তাৎপর্য কী?

২। ভারতের চাষী পাশ্চাত্ত্য দেশের চাষী অপেক্ষা অধিক সময় খাটে। তবু পাশ্চাত্ত্যদেশের তুলনায় ভারতে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অনেক কম।—এর কারণ কী?

৩। আমাদের দেশে শতকরা ৮০ জনেরও বেশি লোক গ্রামে বাস করে এবং কৃষিকর্মে নিযুক্ত; তবু খাদ্যের জন্য আমাদের পরদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় কেন?

৪। নিজের জমি নিজে অথবা নিজ তত্ত্বাবধানে চাষবাস করবার লোকের হার ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গেই সবচেয়ে কম।—এ সমস্যার ফলে কৃষিক্ষেত্রে কোন্ কোন্ অসুবিধে দেখা দিতে পারে?

৫। ভূমির উপর অতি-জনতার চাপ উৎপাদনে ক্ষতি করে। —এ কথা মানো কি-না?

৬। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি মহকুমার শহরের উন্নতি চা-শিল্পের উন্নতিরই প্রত্যক্ষ ফল।—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৭। পশ্চিমবঙ্গে এক কৃষিক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত জনগণ কর্মের সন্ধানে অন্য কৃষি-অঞ্চলে না গিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকুরি নিচ্ছে।—দেশের পক্ষে এটা সমস্যা কি-না বিচার কর।

[তিন] কর্মোদ্যোগ

(ক) জ্ঞানমুখী কাজ :

১। ছাত্ররা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে ধান, পাট ও চা—এই তিন কৃষির ইতিহাস সংগ্রহ করবে।

২। চাষীর অবস্থার উন্নতিসাধনের উপায়—এ বিষয়ে জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে ছাত্ররা কয়েকটি দল গঠন করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে :

জমি সমস্যার প্রতিকার ॥ বিখণ্ডীকরণ রোধ করে জমির সুষ্ঠু বিলি ব্যবস্থা, জলসেচের ব্যবস্থা; নদী-উপত্যকা-পরিকল্পনা; সমবায়ের আদর্শে সেচপ্রণালী সমিতি, ক্রয় বিক্রয় সমিতি, গো-বীমা সমিতি; নূতন পদ্ধতিতে চাষ (যেমন জাপানী প্রথা)।

মূলধন সমস্যার প্রতিকার ॥ সমবায় ঋণদান সমিতি; আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ।

শ্রম সমস্যার প্রতিকার ॥ কৃষক সমিতির মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি, কৃষি-পত্রিকা; ভাগচাষী ও ক্ষেত মজুরের সমস্যা।

(খ) অভিজ্ঞতামুখী কাজ :

১। সমাজ অনুসন্ধান বা সার্ভে ॥ ছাত্ররা নানান্ এলাকা থেকে আসে। সেই সব এলাকার বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের জীবনযাপন প্রণালী সম্পর্কে মোটামুটি

তথ্য যোগাড় করবে ছাত্রদের এক একটি দল। ক্লাসে এই সব রিপোর্টের আলোচনার ফলে বৃত্তিজীবীদের তুলনামূলক জীবনচিত্রটি চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

২। শিক্ষামূলক সফর ॥ একটি কৃষি এলাকা; একটি সমবায় সমিতি।

৩। ফিল্ম-প্রদর্শনী ॥ ভারত সরকারের ফিল্মস্ ডিভিশনের নির্মিত দলিল-চিত্রাবলী।

(গ) পরিবেশনমুখী কাজ ঃ—

১। বিতর্কের আসন ॥ "নদনদী পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে আশীর্বাদ নয়—অভিশাপ।"

২। প্রদর্শনীর আয়োজন ॥ বিভিন্ন প্রকারের ধানের নমুনা এবং পাটজাত নানান্ দ্রব্যের নমুনা সংগ্রহ কর; কাঠের কয়েকটি আসবাব প্রস্তুত কর।

৩। চার্ট ॥ (ধান উৎপাদনের তুলনামূলক পরিমাণ)

ইতালী	...	৩০০০	পাউণ্ড প্রতি	একরে
জাপান	...	২৩০০	,,	,,
মিশর	...	২০০০	,,	,,
যুক্তরাষ্ট্র	...	১৪৫০	,,	,,
চীন	...	১৪০০	,,	,,
ভারত	...	৮০০	,,	,,

উপরের পরিসংখ্যানটিকে দণ্ডলেখ চিত্রে (Bar graph) এঁকে দেখাও এবং ঐ সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র বিবরণী প্রস্তুত করে তোমার 'ব্যবহারিক সংকলন' পুস্তকে লিপিবদ্ধ কর।

৪। মানচিত্র ॥ পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র এঁকে প্রধান প্রধান ফসল কোথায় উৎপন্ন হয় দেখাও।

৫। গানের আসর ॥ সোনার বাংলার ফসলকে উপলক্ষ করে কয়েকটি গান ও কবিতা সংকলন কর এবং একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে সেগুলো পরিবেশন কর।

[চার] কতিপয় ভাববস্তুর উপলব্ধি

১। খাদ্য সম্পর্কে স্বাবলম্বী হওয়াই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

২। চাষবাসে নূতন পদ্ধতি প্রয়োগ হওয়া মানেই শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি।

৩। পশ্চিমবঙ্গে যারা বহিরাগত, তারা কৃষিসম্পদ বাড়িয়ে রাজ্যের খাদ্যোৎপাদনে সাহায্য করে না; তারা প্রধানত অকৃষি-কর্মক্ষেত্রেই অর্থ উপার্জনে আগ্রহী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাংলার শিল্প-সমাজ
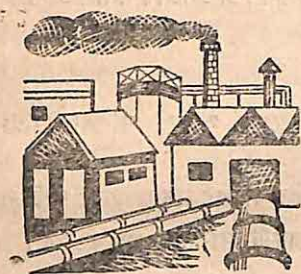
চলতি কথায় আমরা বলি, অমুক লোকের প্রচুর সম্পত্তি। সম্পত্তি কাকে বলে? শুধু টাকাকড়িই তো নয়—খাওয়া-পরা-থাকা এবং এ ছাড়া আরও অজস্র চাহিদা মেটানোর জন্য মানুষের যা দরকার সে সবকিছুই হল সম্পত্তি। একার চেষ্টায় সবকিছু জোটানো মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এজন্য চাই পরস্পরের সাহায্য ও সহযোগিতা—যার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে সমাজ।

প্রাচীন বাংলার শিল্প

প্রাচীন বাংলার সম্পত্তি বা ধন উৎপাদনের উপায় ছিল তিনটি: কৃষি শিল্প, আর ব্যাবসা-বাণিজ্য। কৃষির কথা আমরা আগের পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি। শিল্প সম্বন্ধে অতি সুন্দর তথ্য সংগ্রহ করে দিচ্ছি:

খৃষ্টের জন্মের আগে থেকেই বাংলার বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কার্পাসের চাষ, গুটিপোকার চাষ, কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্পই ছিল প্রাচীন বাংলার সবথেকে প্রধান শিল্প এবং অর্থাগমের অন্যতম প্রধান উপায়। বঙ্গে ও পুণ্ড্রে প্রাচীন কালে চার রকমের বস্ত্রশিল্প ছিল: দুকূল, পত্রোর্ণ (এণ্ডি ও মুগা-জাতীয়), ক্ষৌম ও কার্পাসিক। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে বলেছেন, বঙ্গের দুকূল যেমন নরম তেমনি সাদা; পুণ্ড্রের দুকূল শ্যামবর্ণ দেখতে মণির মতো পেলব; কামরূপের দুকূল দেখতে ভোরের সূর্যের মতো। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকেরাও বার বার বাংলার এই সম্পদের কথা উল্লেখ করেছেন। পেরিপ্লাস গ্রন্থে (খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) বলা হয়েছে, এদেশ থেকে সবচেয়ে মূল্যবান রপ্তানির জিনিস ছিল বাংলার মসলিন···চর্যাগীতির মধ্যেও কার্পাসের কথা পাওয়া যায়। তুলো ধুনবার ছবিও আছে: তুলো ধুনে ধুনে আঁশ তৈরি হচ্ছে, আঁশ ধুনে ধুনে আর কিছু বাকী নেই। তুলো ধুনে ধুনে শূন্যে ওড়াচ্ছি, তাই নিয়ে আবার

ছড়িয়ে দিচ্ছি।* এক চীনা পরিব্রাজক পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, এদেশে ছ'রকমের মিহি কার্পাসবস্ত্র তৈরি হয়; এদেশে গুটিপোকার চাষ হয় এবং রেশমের কাপড় বোনা হয়।

"প্রাচীন বাংলায় পাটের কাপড়ের শিল্পও ছিল। পূজাপার্বণ, ব্রত, বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে পট্টবস্ত্র ব্যবহারের রীতি ছিল। পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসার বিবরণ থেকে জানা যায় যোড়শ শতকের গোড়াতেও ভারতের বিভিন্ন দেশে, সিংহলে, আরবে, পারস্যে চিনি রপ্তানির ব্যাপারে দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ পাল্লা দিচ্ছে।

"এছাড়া কারুশিল্প কম ছিল না। বড়লোকদের মধ্যে সোনারূপার এবং মণিমুক্তা-বসানো গয়নাগাঁটির খুবই ব্যবহার হত! সোনারূপার থালাবাসন ছিল।

"লৌহশিল্পের যে খুব প্রচলন ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কারণ কৃষিকর্মে ও কৃষিসমাজে পদে পদে লোহার দরকার। দা-কুড়াল খুরপি-খন্তা-লাঙল ছাড়াও লোহার জলপাত্র, তীর, বর্শা, তলোয়ার ইত্যাদি তৈরি হত। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে একজন চীনা পরিব্রাজক বাংলাদেশে দুমুখো ধারাল তলোয়ারের খুব তারিফ করেছেন। মৃৎশিল্প, হাতীর দাঁতের শিল্পও প্রচলিত ছিল।

"আমাদের প্রাচীন বাস্তুশাস্ত্রে সূত্রধর বলতে স্থপতি, তক্ষণকার, খোদাইকার, কাঠমিস্ত্রী সবাইকে বোঝাত। প্রাচীন বাংলার গৃহস্থালীর জিনিসপত্র, ঘরবাড়ি, মন্দির, পাল্কি, রথ, গরুর গাড়ি, নানারকমের নদী-গামী নৌকো এবং সমুদ্রগামী বড় বড় নৌকো ও জাহাজ ইত্যাদি সমস্তই কাঠ দিয়ে তৈরি হত। আজও যে সব প্রাচীন কালের স্তম্ভ, খিলান, খুঁটির স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে পাওয়া যায়, তার কারু ও শিল্পনৈপুণ্য দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।...

"ভাটেরা গ্রামের তাম্রশাসনে গোবিন্দ নামে এক কাঁসারীর উল্লেখ থেকে কাঁসাশিল্পের আভাস পাওয়া যায়। নানারকমের মিশ্র ধাতুশিল্পের প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া যায় অসংখ্য ব্রোঞ্জ ও অষ্টধাতুর তৈরি মূর্তির মধ্যে।...

---

* "তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু।
আঁসু ধুণি ধুণি নিরবর সেসু॥
তুলা ধুণি ধুনি সুণে অহারিউ।
পুণ লইয়া অপণা চটারিউ॥" [শান্তিপাদ, ২৬

"সমাজে এই সব কারুশিল্পীদের বিশেষ রকমের খ্যাতি ছিল।" (বাঙালীর ইতিহাস॥ নীহাররঞ্জন রায়)

শিল্প-ব্যবস্থার আধুনিক চেহারা

সামান্য ভাত রান্না থেকে বিরাট ইঞ্জিন তৈরি করা পর্যন্ত যাবতীয় কর্মই শিল্পকর্ম। ইয়োরোপের শিল্প-বিপ্লবের বহুকাল পূর্বেই ভারতবর্ষকে পৃথিবীর মধ্যে 'শিল্পকার্যের কারখানা' বলে মনে করা হত। এদেশে বৃটিশ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ক্রমবর্ধমান শিল্পগুলোর অবনতি আরম্ভ হয়। বৃটিশ কলকারখানার উৎপন্ন দ্রব্য ভারতের বাজারে আমদানি করা হয়, এবং দামে কিছুটা সস্তা হওয়ায় বিলাতী পণ্যদ্রব্য ধীরে ধীরে দেশীয় শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যগুলিকে বাজার থেকে বিতাড়িত করে। ব্রিটিশ শাসকের বেনিয়া বুদ্ধি ভারতকে কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে পরিণত করে। জীবিকার্জনের জন্যে ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ২জন মাত্র লোক শিল্পের উপর নির্ভরশীল ছিল; আর কৃষির উপর নির্ভর করত শতকরা ৭০ জন। এর সঙ্গে তুলনীয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিল্পনির্ভর লোকেদের সংখ্যা: যুক্তরাষ্ট্র ৭ জন, ফ্রান্সে ২৫ জন, এবং জাপানে ৪৮ জন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা শুরু হয়। ১৮১৮ সালে হাওড়া জেলায় প্রথম কাপড়ের কল ও ১৮৫৫ সালে হুগলীর রিষড়াতে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। চা-শিল্পের পত্তন হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু এইসব ভারতীয় শিল্পের গুরুতর প্রতিবন্ধক ছিল বহু—মূলধন, সুদক্ষ কারিগর, উৎসাহী শিল্পপতি প্রভৃতির অভাব এবং সর্বোপরি সরকারী ঔদাসীন্য। ফলে কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী এদেশের শিল্পায়ন পরিচালিত হয়নি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারত সরকার শিল্পক্ষেত্রে যে **সংরক্ষণ নীতি** (Policy of protection) অবলম্বন করেন তাতে বিদেশী শিল্পদ্রব্যের উপর উপযুক্ত পরিমাণ শুল্ক বসানোর ফলে সে সব জিনিসের দাম বেড়ে গেল, তখন প্রতিযোগিতায় দেশী শিল্পগুলির কিছুটা সুবিধা হল।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বহুরকমের চাপ পড়ায় এদেশের শিল্পব্যবস্থা মর্মান্তিক ক্ষতি স্বীকার করে। উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস পেল, অভাব দেখা দিল ভোগ্যপণ্যের (consumer goods)। লোকের হাতে টাকা ছিল কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ ভোগ্যপণ্য—যা জীবনধারণের পক্ষে নিতান্ত অপরিহার্য—তারা কিনতে পারত

না। জিনিস কেনার জন্যে মানুষ 'কিউ' দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু বাজারে জিনিস নেই।

শুধু তাই নয়। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ল। আশ্চর্য কথা, দেশ স্বাধীন হল কিন্তু দেশী শিল্পগুলির চরম দুর্দশা। কাঁচামালের নিতান্ত অভাব, আর প্রত্যেকটি জিনিসের উৎপাদন খরচ ক্রমেই বাড়তে থাকে। জীবনধারণের ব্যয়ের অঙ্ক বেড়ে গেল, কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ, অসন্তোষ প্রকাশ পায় ধর্মঘটে, ধর্মঘটের ফল উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাওয়া।

উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সকল ধরনের শিল্পোদ্যোগ যাতে পরস্পরের সঙ্গে ঐক্য ও সামঞ্জস্য বজায় রেখে কাজ করে যেতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে জাতীয় সরকার একটা সুষ্ঠু শিল্প-নীতি গ্রহণ করলেন ১৯৪৮ সালে। এ নীতির লক্ষ্য হল, দেশের শিল্পোন্নয়নের পক্ষে উপযোগী যে সম্পদ রয়েছে তাকে চূড়ান্তভাবে কাজে লাগিয়ে দেশে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। কলকারখানার মালিক, শ্রমিক ও সরকার—এই তিন দলের সহযোগিতার ভিত্তিতে শিল্প-দিগন্তে নূতন প্রভাতের সূচনা হল।

কয়লা খনির দেশে

পশ্চিম বাংলার শিল্পগুলি প্রধানত চারটি এলাকায় অবস্থিত: (১) রাণী[illegible]ঞ্জ-আসানসোল অঞ্চল (২ [illegible] াওড়া অঞ্চল (৩) কলিকাতা চব্বিশপরগনা অঞ্চল (৪) দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি অঞ্চল; শেষোক্ত অঞ্চলটির চা ও কাঠ শিল্পের কথা আগের পরিচ্ছেদেই আলোচিত হইয়াছে। বাকী তিনটী অঞ্চলের শিল্পের কথা আলোচনা করব।

প্রথমে কয়লার কথা। এখন থকে কুড়ি কোটি বৎসর পূর্বে গণ্ডোয়ানা অঞ্চল (বর্তমান দাক্ষিণাত্যে) বড় বড় অরণ্যভূমি মাটির নিচে চাপা পড়ে যে পাথুরে কয়লার উৎপত্তি হয়েছিল তাকে বলা হয় **গণ্ডোয়ানা কয়লা**। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যভারত, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যে এ যুগের কয়লা পাওয়া যায়। আরেক প্রকার কয়লার সৃষ্টি হয়েছিল প্রায় পাঁচ কোটি বছর আগে, একে বলা হয় **টারশিয়ারী যুগের কয়লা**। ভূ-নিম্নের প্রবল

আন্দোলনের ফলে এই কয়লার স্তরগুলি ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে, তাই এর বাণিজ্যিক মূল্য কম।

রাণীগঞ্জ আসানসোল অঞ্চলেই পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ কয়লার খনি অবস্থিত। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কোলিয়ারী স্থাপিত হয় রাণীগঞ্জে, আজ এই এলাকায় ২৭৯টি কয়লাখনি দিবারাত্র কাজ করে চলেছে। বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় এক কোটি টন। সমগ্র ভারতে কয়লা উত্তোলন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৫৫ সালে এর পরিমাণ ছিল ৪ কোটি টন। উত্তোলিত কয়লার ৩০% আসে পশ্চিমবঙ্গের খনিগুলি থেকে।

আসানসোল—রাণীগঞ্জের শিল্পাঞ্চলের এত **সমৃদ্ধির কারণ** কী?

(১) এখানকার কয়লাখনি অবলম্বন করে লৌহ, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়ম, ইঞ্জিন, সাইকেল, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন, কাগজ, চীনামাটির দ্রব্য ইত্যাদি শিল্প এখানে গড়ে উঠেছে। উৎপাদনের খরচ কম হবে, তাই **কয়লাখনির সান্নিধ্যে** এসব শিল্পালয় স্থাপিত হয়েছে। যন্ত্রশিল্পের শক্তির যা মূল উৎস সেই কয়লা এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর দুয়ারেই পাওয়া যায়।

(২) কাছেই **জল-বিদ্যুৎ** ও **তাপ-বিদ্যুৎ** উৎপাদন ও সরবরাহের কেন্দ্র।

(৩) সারা অঞ্চল জুড়ে রেলপথ ও মোটরপথের ব্যবস্থা থাকায় পণ্যদ্রব্য **পরিহণের** খুব **সুবিধা**। কলিকাতা বন্দর, বিবিধ খনি অঞ্চল, কাঠের জন্য অরণ্য এবং প্রধান প্রধান বাণিজ্য-শহরের সঙ্গে এ অঞ্চলের সংযোগ আছে।

(৪) শিল্পের জন্যে **শ্রমিক** চাই। পার্শ্ববর্তী বীরভূম বাঁকুড়া সিংভূম ও সাঁওতাল পরগণা থেকে সহজেই শ্রমিক মেলে এই শিল্পাঞ্চলের জন্য। কারখানার কতকগুলো কাজ আছে যা প্রায় সব শিল্পেই একই রকম; কাজেই কোনো কারণে কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে শ্রমিকদের বেকার হবার ভয় নেই, পাশের এক শিল্পালয়ে চাকুরি জুটে যায়।

(৫) এখানকার শুষ্ক **জল-হাওয়া** শ্রমিকদের কর্মশক্তি বাড়াবার পক্ষে প্রচুর সহায়তা করে। ম্যালেরিয়া-মুক্ত, খুবই স্বাস্থ্যকর এ অঞ্চলটি।

(৬) পূর্বে বর্ধমান ও দক্ষিণে বাঁকুড়া জেলার ধানশস্য এ অঞ্চলে **খাদ্য** যোগায়।

(৭) **বহির্বাণিজ্যের** আনুকূল্যে এই শিল্পাঞ্চলের এত সমৃদ্ধি। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বাজারে এখানকার শিল্পদ্রব্যের খুব চাহিদা আছে।

উপরের আলোচনা থেকে একটা **সমস্যা** উঁকি দিচ্ছে এইবার। আসানসোল রাণীগঞ্জের শিল্পসমৃদ্ধির উপরোক্ত অনুকূল অবস্থাগুলি এই

শিল্পাঞ্চলকে এক নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে, তার ফলে শিল্পাঞ্চলটি বেশীদূর প্রসারিত হতে পারেনি।

আরেকটা কথা। দেশের কৃষিসম্পদ ফুরিয়ে গেলে আবার পূরণ করার বহু উপায় আছে; কিন্তু খনিজ সম্পদ? কয়লা? পূরণ করার উপায় সত্যিই নেই। অতএব খনিজ সম্পদের উত্তোলনে আর ব্যবহার অপচয় বন্ধ করতে হবে।

তা ছাড়া, দেশের অধিকাংশ খনিতে পুরানো পদ্ধতিতে কাজ হচ্ছে। একেই তো বেশির ভাগ খনি আয়তনে খুব ছোট, তদুপরি তাতে প্রয়োজন-মতো টাকা খাটানো হচ্ছে না বলে সে সব খনির কাজ বাধা পাচ্ছে। এর অর্থ, খনিজদ্রব্য উৎপাদন আশানুরূপ হচ্ছে না। এ সমস্যা দূর করবার জন্য সরকারের
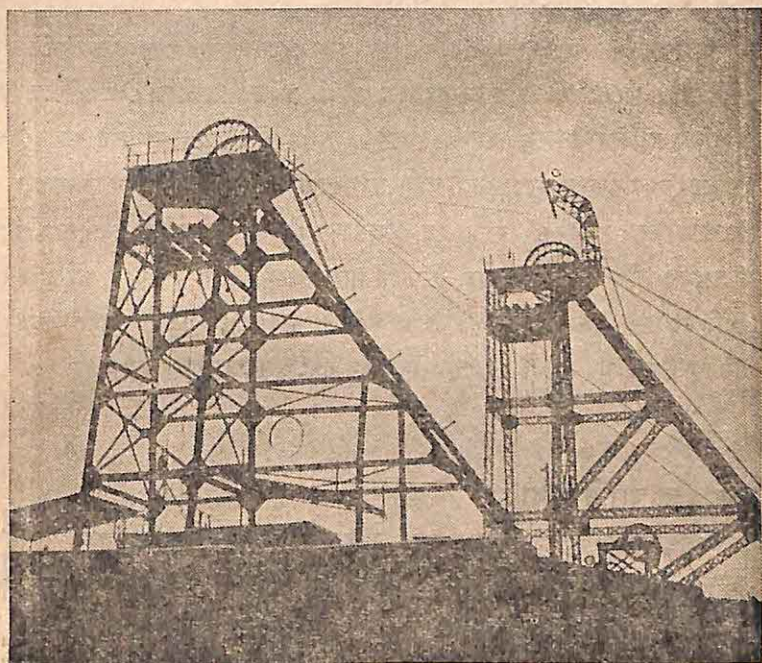
সন্ধ্যার আকাশে কয়লাখনির নিশানা ঃ
উঁচু উঁচু মঞ্চের ওপর দুটো করে লোহার চাকা

পরিকল্পনা-কমিশন নির্দেশ দিয়েছেন যে, খনির মালিকদের সুদক্ষ লোক নিযুক্ত করতে হবে, আর রাখতে হবে ভূতত্ত্ববিদ্ ও খনির ইঞ্জিনিয়ার। এদের কাজ

হবে খনি পরিদর্শন করে উন্নতিমূলক পরামর্শ দেওয়া এবং সে পরামর্শ কাজে প্রতি-পালিত হচ্ছে কি-না তাই দেখা। কমিশনের আরও সুপারিশ হচ্ছে, খনিশিল্প সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা এবং খনিশিল্পের উন্নতি বিষয়ে গবেষণা চালানো।

কয়লাখনি চোখে দেখার বস্তু, লিখে বোঝাবার নয়। রাণীগঞ্জে-আসানসোলের দিকে যেতে রেল লাইনের দু-পাশে দেখা যায় উঁচু উঁচু মঞ্চের উপর ঘুটো করে লোহার চাকা ; পাশ দিয়ে ছোট ছোট ট্রলি-ভর্তি যাচ্ছে কয়লা। সুড়ঙ্গের মতো পথ চলে গেছে **খাদের নীচে**, ওপর থেকে ডুলিতে করে শ্রমিকেরা নেমে আসে, হাতে গাঁইতি আর লণ্ঠন। পাতালপুরীর অন্ধকারে শুরু হয়ে যায় কয়লা কাটা। মাথার উপরকার ছাদ—সেও কয়লা—দাঁড়িয়ে থাকে অসংখ্য কয়লা-থামের ওপর। পরে সেই থামও একে একে কেটে নেওয়া হয়, ছাদ ভর করে থাকে কাঠের খুঁটির ওপর। রাশি রাশি কয়লা কেটে কেটে ট্রলিতে বোঝাই করে যন্ত্রের সাহায্যে তোলা হয় ওপরে।

সমস্যাও আছে। আমাদের দেশে খনি থেকে কয়লা তোলার পদ্ধতি বড্ড সেকেলে ; ফলে কয়লার প্রচুর অপচয় হয়। অথচ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কত আধুনিক যান্ত্রিক উপায়ে কয়লা তোলা হয়। মালিকেরা আবার সস্তায় মজুর খাটিয়ে যেমন-তেমন করে কয়লা তুলিয়ে লাভের অংশ দ্রুত ফাঁপিয়ে তুলতে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে জীবনও বিপন্ন হয় মজুরদের। হঠাৎ কয়লার ধস ভেঙে পড়ে, বাতাসের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, ভিতরে গ্যাস জমে বিস্ফোরণ ঘটে, প্লাবন হয়—এমনি কত দুর্ঘটনায় কর্মরত শ্রমিকেরা প্রাণ হারায়। ১৯৫৮ সালে চিনাকুড়ি খনি দুর্ঘটনার মর্মন্তুদ স্মৃতি কোনদিন মন থেকে মুছে যাবার নয়।

লোহার আদি কথা

খৃষ্টজন্মেরও বহু শতাব্দ পূর্বে ভারতবর্ষে ঢালাই লোহার ব্যবহার ছিল দিল্লীর কুতব মিনারের অঙ্গনে যে লৌহস্তম্ভটি আছে সেটা নির্মিত হয়েছিল গুপ্ত-আমলে—প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। ইউরোপ এরও অনেক পরে এত বড় লৌহস্তম্ভ তৈরি করতে পেরেছে। তেইশ ফুট আট ইঞ্চি এর দৈর্ঘ্য, ১৬ইঞ্চি ব্যাস, ৬ টন ওজন। আর সবচেয়ে বিশেষত্ব এই যে, সুদীর্ঘকাল রৌদ্র-বৃষ্টি-বাতাসের আক্রমণ সত্ত্বেও এ স্তম্ভের গায়ে বিন্দুমাত্র মরচে ধরেনি। বিজ্ঞানের তো আজ খুব জয়গান করি আমরা, কিন্তু আজও কোনো বৈজ্ঞানিক এরকম লোহা আবিষ্কার করতে কি পেরেছেন যা রোদ-জল-হাওয়ার প্রভাবে মরচে ধরে না?

আরও নিদর্শন আছে। ভারতীয় স্থপতিবিদ্যার উৎকর্ষের প্রমাণ ত্রয়োদশ শতকে প্রস্তুত কোনারকের বিখ্যাত সূর্যমন্দির। এই দেউল নির্মাণে ৩৬ ফুট লম্বা, ৮ ইঞ্চি চওড়া আর ১০ ইঞ্চি উঁচু লোহার কড়ি ব্যবহৃত হয়েছিল। যন্ত্রযুগের পূর্বেই এরকম কড়ি-বরগা নির্মাণ এ দেশের লৌহ-শিল্পীদের আশ্চর্য নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করে। বিষ্ণুপুরের দলমাদল কামান ভারতীয় লৌহশিল্পের আরেকটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

বাংলার লৌহশিল্প

ভারতবর্ষে খুব উৎকৃষ্ট লোহাপাথর আছে। লৌহপ্রস্তর সঞ্চয়নে পৃথিবীতে রোডেশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের পরেই ভারতের স্থান। পশ্চিম বাংলায় আসানসোল-রাণীগঞ্জ অঞ্চলে ও বাঁকুড়ায় কিছু লোহাপাথর পাওয়া যাচ্ছে ; তবে ময়ূরভঞ্জ ও

সিংভূম জেলার লৌহপ্রস্তরের সাহায্যেই জামসেদপুর-কুলটি-বার্ণপুরের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছে। ১৮৭৫ সালে প্রথম লোহার কারখানা চালু হয়

বরাকরে। বর্তমান 'ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কর্পোরেশন' কর্তৃক পরিচালিত বার্ণপুরের কারখানাটি পশ্চিমবঙ্গের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাত তৈরির প্রতিষ্ঠান। ভারতের বিভিন্ন লৌহ কারখানা এখন বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ টন পাকা ইস্পাত প্রস্তুত করে, কিন্তু আমাদের প্রয়োজন অন্তত এর দ্বিগুণ।
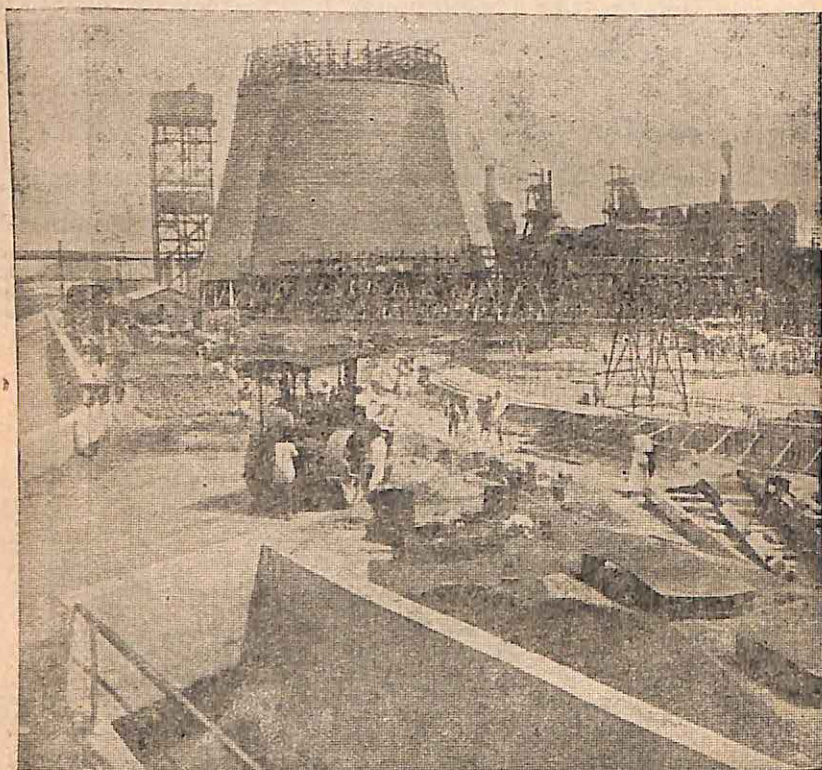
কুলটি কারখানার দৃশ্য

কলকাতা থেকে ৯৮ মাইল দূরে দুর্গাপুরেও ভারত সরকারের উদ্যোগে এবং ব্রিটেনের অর্থসাহায্যে একটি বিরাট ইস্পাত কারখানার নির্মাণকার্য দ্রুত সমাপ্তির পথে, ইস্পাত উৎপাদনও ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

বার্ণপুর বা দুর্গাপুরে কারখানা স্থাপনের সুবিধা হচ্ছে এই : (১) নিকটেই রাণীগঞ্জের কয়লাখনি থাকায় কয়লা সরবরাহের সুবিধা ; (২) সিংভূমের লৌহখনি থেকে অনায়াসে লোহাপাথর আনা যাবে; (৩) উড়িষ্যা-মধ্যপ্রদেশ থেকে চুনাপাথর (লোহা পরিষ্কার করার জন্য) ও ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যাবে ; (৪) দামোদর

উপত্যকা কর্পোরেশন থেকে জল ও বিদ্যুৎশক্তির সুলভতা ; (৫) রেলপথে কলকাতা বন্দরের সঙ্গে সংযোগ।

পশ্চিম বাংলায় প্রচুর পরিমাণে কয়লা পাওয়া গেলেও লৌহখনি বিশেষ নেই বার্ণপুর-দুর্গাপুর ছাড়া কলকাতা ও হাওড়া অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ-ঢালাই কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা অসংখ্য রয়েছে। পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে এদের উৎপাদিত লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্যের বিশেষ চাহিদা ছিল ; বর্তমানে ভারত সরকার দেশের সর্বত্র ইস্পাতের দাম সমান ধার্য করায় এদের ব্যবসায়ে দারুণ সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

অথচ দেশের পক্ষে কত প্রয়োজনীয় শিল্প এই লোহা আর ইস্পাত। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা আজকাল লোহার উপর এত নির্ভরশীল যে আধুনিক সভ্যতাকে এক কথায় **লৌহ সভ্যতা** বলা যায়।

রেল-নগরী চিত্তরঞ্জন

একটা দেশের কলকারখানায় হরেক রকম জিনিস তৈরি হচ্ছে, মাঠে মাঠে ফলছে সোনার ফসল—এগুলো কেনা-বেচা বা আমদানি-রপ্তানির তো ব্যবস্থা চাই। অর্থাৎ চাই পরিবহণের সুবিধা। কুলীর মাথায়, গরুর গাড়িতে, নৌকায়, ষ্টীমার—আর ট্রেনে-এরোপ্লেনে। মালপত্র নিয়ে, দুটো লম্বা লোহার পাতের উপর দিয়ে ছুটে চলে রেলগাড়ি।

দুটো লোহার পাত মাত্র ? এই রেল লাইন খুলতে গিয়েই না কয়েক বছর আগে সিন্ধু জেলায় মোএঞ্জোদড়োয় পাঁচ হাজার বৎসরের এক প্রাচীন সভ্যতার গোপন ইতিহাস আবিষ্কৃত হয়ে গেল মাটির তলা থেকে। যে সত্যি ঘটনা যে উপন্যাসের চেয়েও বেশি রোমাঞ্চকর !

দেশের শিল্পোন্নতির প্রয়োজনে রেলপথের গুরুত্ব অসীম। এতকাল ইঞ্জিন বগী ও ওয়াগনের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত আমাদের ; স্বাধীনতা লাভের পর চিত্তরঞ্জনে পশ্চিম বাংলার প্রসিদ্ধ রেল-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বাংলার সর্বত্যাগী দেশনেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নামানুসারে এই রেলনগরীর নামকরণ হয়েছে। ১৯৫৩ সাল থেকে এ কারখানায় আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান-সম্মত প্রথায় ইঞ্জিন তৈরি হচ্ছে।

চিত্তরঞ্জনে রেল-কারখানা অবস্থিত হওয়ার সুবিধা হচ্ছে রাণীগঞ্জ থেকে কয়লা, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ থেকে কাঠ এবং কুলটি-বার্ণপুর থেকে ইস্পাত সরবরাহের সুযোগ।

চিত্তরঞ্জন লোকো ওয়ার্কস উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে যেমন বিশেষ দৃষ্টি রেখেছে তেমনি **শ্রমিকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য** বিধানও কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। আলো হাওয়াযুক্ত বাসগৃহ, কর্মীদের ছেলেমেয়ের শিক্ষা, চিকিৎসা, আমোদ-প্রমোদ, সমবায় সমিতি—ইত্যাদি ব্যবস্থার কল্যাণে এ কারখানাটি সমগ্র ভারতের শিল্পজগতে এক উচ্চমানের আদর্শ স্থাপন করেছে। রেলওয়ের পরিচালনাধীনে কারিগরী বিদ্যার শিক্ষণালয়ে রেল-কর্মীদের ছেলেরা হাতে-কলমে **শিক্ষা** লাভ করে থাকে। প্রত্যেক কলোনীতে একটি ডিসপেন্সারী : হাসপাতালে আর ডিসপেন্সারীতে রেলশ্রমিকদের পরিবারবর্গের বিনা পয়সায় **চিকিৎসা** চলে। **আমোদ-প্রমোদের** সর্বপ্রকার সুবিধে আছে শ্রীলতা ইনসষ্টিটিউট ও বাসন্তী ইনসষ্টিটিউট-এ ; লাইব্রেরী, খেলাধূলা, সঙ্গীতচর্চা, সুইমিং পুল—কিসের ব্যবস্থা নেই এখানে। **সমবায় সমিতি** অল্প সুদে শ্রমিকদের ঋণ দিয়ে থাকে, সমবায় দোকানগুলিতে খাদ্যশস্য, কাপড়, কয়লা, রকমারি দ্রব্য সবই পাওয়া যায়। ভারতে এই প্রথম একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সমস্ত শ্রমিককে **বাসগৃহ** দেওয়া হয়েছে; প্রতিটি কোয়ার্টারের মাসিক ভাড়া সাড়ে চার টাকা। রেল-কারখানাটি নির্মাণ করতে মোট ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৫ কোটি টাকা; এর অর্ধেক খরচ হয়েছে গৃহনির্মাণে। চিত্তরঞ্জন শহর যেন ইস্পাত ও সিমেন্টের ছন্দে গাঁথা একটি কবিতা!

কলকাতা-হাওড়ার কলকারখানা

হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে অপ্রশস্ত ভূখণ্ডের মোট ১২৬ বর্গমাইল স্থান জুড়ে হুগলী-হাওড়া শিল্পাঞ্চল! কলকাতা-চব্বিশপরগণা শিল্পাঞ্চলটি নদীর পূর্বতীরে ব্যারাকপুর, কলকাতা ও বজবজ এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছে; এটিও অপ্রশস্ত ভূখণ্ড—মোট আয়তন ২৭৬ বর্গমাইল।

হুগলী নদীর দু-ধারে এইসব ছোটবড় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় শিল্প ও কৃষি—কাজের দরকারী নানান্ যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয়। তা ছাড়া আছে কাপড়ের কল, চটকল, কাগজের কল! আর আছে চামড়া, রবার, কাচ, বৈদ্যুতিক বাতি ও পাখা, সাবান, দেশালাই, ওষুধপত্র, প্লাষ্টিক, এনামেল, প্রসাধন দ্রব্য, রং, গোলাবারুদ, মোটরগাড়ি-তৈরি ও রেলগাড়ি-মেরামতের কারখানা।

আসানসোল-রাণীগঞ্জের শিল্পাঞ্চলের মতোই হুগলী-হাওড়া এবং কলকাতা-চব্বিশপরগণা এই দুই শিল্পাঞ্চলও নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যের আবদ্ধ। কিন্তু এই দুই অঞ্চলের সীমাবদ্ধতার কারণ, আর আসানসোল-রাণীগঞ্জ এলাকার সীমাবদ্ধতার কারণ (যা আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি) সম্পূর্ণ পৃথক।

হুগলী নদীর তীরবর্তী শিল্পাঞ্চল সীমায়িত হবার মুখ্য কারণ **কলকাতা বন্দরের অবস্থান**। আসানসোল-রাণীগঞ্জ এলাকার কারখানাগুলো গড়ে উঠেছে কোন **মূল শিল্পকে** (Basic industry) ভিত্তি করে। কিন্তু হুগলির দুই পাড়ে যে সমস্ত **উপশিল্পের** (Secondary industries)) কলকারখানা আছে তার নানান্ চাহিদা দ্রুত মেটানো একমাত্র কলকাতার মতো বন্দরের পক্ষেই সম্ভব।
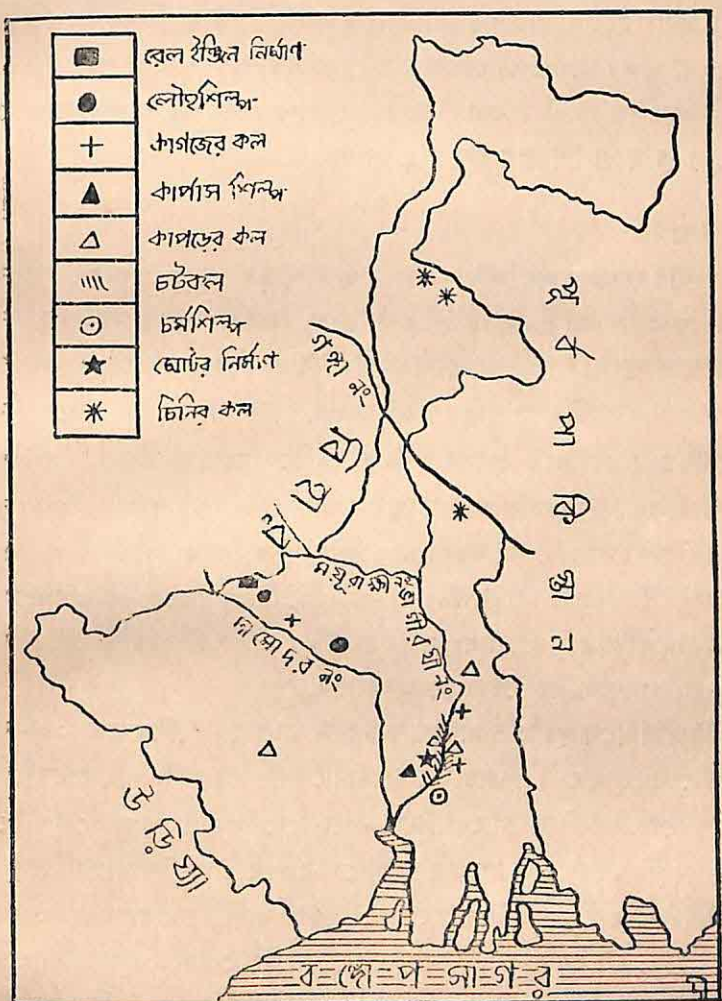
বড় বন্দর নিকটে থাকিলে মাল তোলা, নামানো, গুদামে ভর্তি করা ও স্থানান্তরিত করা ইত্যাদিতে খরচ বেশি পড়ে ; ফলে জিনিসের উৎপাদন-ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়।

জিনিসের বাজার-দর বেড়ে গেলে কাট্‌তি কম হয়; কাজেই প্রচুর সামগ্রী অবিক্রীত পড়ে থাকার ভয়। কলকাতার সস্তা বিদ্যুৎশক্তিও বিস্তৃত এলাকায় শিল্পপ্রসারণের অন্তরায়। বন্দর থেকে দূরে থাকার ফলে আমাদের দার্জিলিং জলপাইগুড়ির চা-বাগানগুলোর অসুবিধে তো আমরা জানি। চা-শিল্পের লোকেরা ভাবে সুন্দরবনের কাছাকাছি চা-বাগিচাগুলো বসাতে পারলে তারা বেঁচে যেত!

এইসব সুযোগ-সুবিধে হুগলী তীরের শিল্পাঞ্চল দুটিকে তাদের একশ বছরের পুরানো গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রেখেছে, রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেয়নি। তাই মনে হয়, হুগলী-হাওড়া শিল্পাঞ্চল জেলার অভ্যন্তরে সম্প্রসারণের চেষ্টা করলে **কৃষি ও শিল্পের বিরোধ** ঘটবে।

যানবাহন

লোকসমাজের অর্থনৈতিক জীবনে যানবাহনের গুরুত্ব অনেক। ব্যাবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতি নির্ভর করে পরিবহণ ব্যবস্থায় সুযোগ-সুবিধার উপর। প্রথমে **রাস্তাঘাট**। নানা ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্ত সঞ্চারিত হয়ে যেমন শরীর সুস্থ রাখে, তেমনি রাস্তাগুলি বিভিন্ন অঞ্চল, হাটবাজার ও গঞ্জ বন্দরের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। শেরশাহ-নির্মিত গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড আজ 'পশ্চিম বাংলার অর্থনীতির স্বর্ণপথ'। গ্রাম্য রাস্তা থেকে জেলা সড়ক, জেলা সড়ক থেকে রাজ্য সড়ক, রাজ্য সড়ক থেকে জাতীয় সড়ক (National Highways)—এইভাবে পথ-ঘাটের জাল বিস্তার করা হয়েছে আমাদের পাঁচসালা পরিকল্পনায়। এই সব সড়কের উন্নতির ফলে মফস্বল এলাকাগুলির চেহারা দ্রুত বদলে যাচ্ছে।

রেলপথে খুব দ্রুত মালপত্র আনা-নেওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে ১৯০০ মাইল দীর্ঘ রেলপথ আছে। তার মধ্যে বর্ধমান জেলায় এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি; কিন্তু কেন? শিল্পে অগ্রসর, নদী-নালা কম, যাত্রীর সংখ্যা বেশি—কোন কারণে? বর্তমানে এ রাজ্যের কোন কোন পথে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু হয়ে জনসাধারণের খুব সুবিধে হয়েছে। কিন্তু বাণিজ্যের ব্যাপারে ওয়াগনের সংখ্যাল্পতা মস্ত বড় সমস্যা। অনেক সময় আবার লোভী ব্যবসায়ীরা ওয়াগান থেকে মালপত্র সরাতে ইচ্ছে করে দেরী করে, ফলে বাজারে জিনিসের অভাবের দরুন তার রাম বেড়ে যায়, পকেটে টান পড়ে ক্রেতাদের।

ভারতবর্ষে অন্তর্বাণিজ্য, বহির্বাণিজ্য ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে সাংস্কৃতিক

যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রাচীনতম, সর্বোত্তম ও সর্বাধিক-ব্যবহৃত উপায় ছিল আমাদের **জলপথ**। আধুনিক যুগে রেল বা এরোপ্লেনের গুরুত্ব অনেক বেড়েছে। একমাত্র হুগলী নদী ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে আর স্থনাব্য নদী নেই। বর্তমানে গঙ্গা-বাঁধ পরিকল্পনার দ্বারা একটি খাল কেটে হুগলীকে মূল গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত করা হবে; দুর্গাপুর খাল ভাগীরথী ও দামোদরে মিলন ঘটাবে—ফলে আসানসোল রাণীগঞ্জ শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে **কলিকাতা বন্দরের** নৌপথে সংযোগ স্থাপিত হবে। এ রাজ্যের আমদানি-রপ্তানির প্রধান বন্দর কলকাতা।

দামোদর পরিকল্পনা

মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগরের পুণ্যস্মৃতির সঙ্গে দামোদরের নামও অক্ষয় অমর হয়ে আছে। বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমির সাত হাজার বর্গমাইল পরিমিত জমির জলধারা বয়ে আনছে দামোদর আর তার উপনদীগুলি। পশ্চিম বাংলায় ঢুকে দামোদর দক্ষিণ-পুর্ব দিকে বেঁকে ভাগীরথীতে এসে মিশেছে। ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে দামোদর যে প্রচুর পলল বয়ে আনে তা অবিরাম সঞ্চিত হচ্ছে ভাগীরথীর নিম্নভাগ অবধি। পলিসঞ্চয় এত বেশি যে মাটি-কাটা জাহাজ দিয়ে অনবরত সেই পর্বতপ্রমাণ মাটি কেটে ফেলতে হয়, নইলে ভাগীরথী পর্যন্ত ভরাট হয়ে যেত, কলকাতা বন্দরের অবস্থা হত প্রাচীন তাম্রলিপ্তির মতো। দামোদরও এখন এমনই ভরাট হয়ে উঠেছে যে জলবহনের ক্ষমতা তার নেই বললেই চলে। অথচ বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টির সময় দামোদরের জল তীর ছাপিয়ে বন্যার আকারে গ্রামে বা ফসলের ক্ষেতে ঢুকে পড়ে।

তা ছাড়া, স্বল্পবৃষ্টির এই অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে জলসেক দানের জন্য আছে মাত্র দুটি খাল-দামোদর খাল ও ইডেন খাল। দুটির কোনটিই স্থায়ী খাল নয়; ফলে শীতকালে যখন দামোদর শুকিয়ে আসে তখন খাল দুটিতেও আর জল থাকে না।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার সৃষ্টি মূলত এই দুটি সমস্যার প্রতিকারের জন্য: বন্যা নিবারণ, আর জমিতে সারা বছর প্রয়োজনমতো জল সরবরাহ। তবে পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপায়িত হবার পিছনে আরও **বিবিধ উদ্দেশ্যের** অবতারণা করা হয়েছে: (১) প্রচুর জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন করে কলকাতা-বর্ধমান-আসানসোল-রাণীগঞ্জ-দুর্গাপুর-জামসেদপুর ইত্যাদি শিল্পপ্রধান স্থানের বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংযোগ সাধন। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হলে কুটীর-

শিল্পগুলো প্রাণ ফিরে পাবে। জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে মাইথন, তিলায়া ও পাঞ্চেৎ
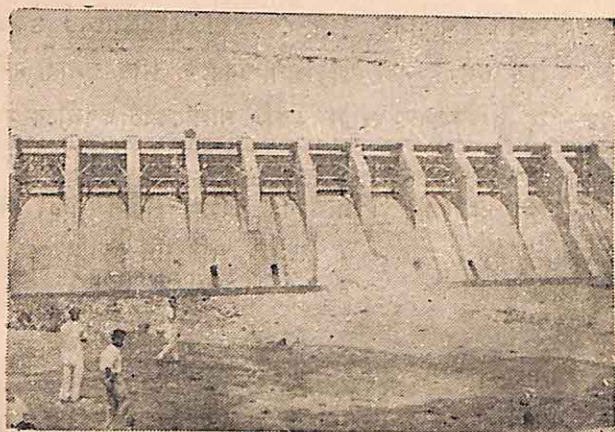
মাইথন বাঁধ

কেন্দ্রে, তাপশক্তি বোকারোতে।* (২) এ অঞ্চলের শহরগুলির ঘরে ঘরে সারা বছর পরিমিত জল সরবরাহ। (৩) কয়লা সংরক্ষণ। (৪) পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন। (৫) অরণ্য সংস্থাপন। (৬) কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি করে মাছের চাষ। (৭) জমির জয় নিবারণ। (৮) স্বাস্থ্যপ্রদ নগর নির্মাণ। (৯) গ্রাম উন্নয়ন। (১০) নতুন নতুন শিল্পকারখানা স্থাপন। (১১) অমোদ-প্রমোদের সুযোগদান, ইত্যাদি। এসব উদ্দেশ্য বিচার করে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনাকে **বহুমুখী পরিকল্পনা** বলা যুক্তিসঙ্গতই বটে!
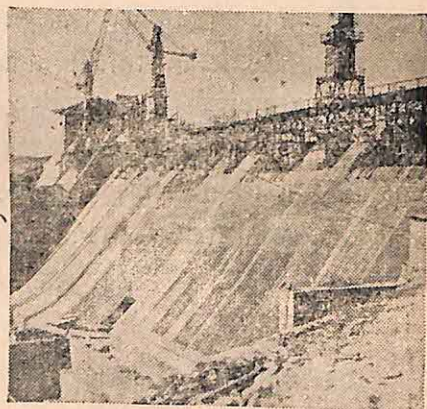
দামোদরের আরেকটি বাঁধ

দামোদর পরিকল্পনার কাজে আজকাল প্রচুর **সমালোচনা** হচ্ছে। পর্যাপ্ত তথ্য যোগাড় না করেই এ পরিকল্পনা কার্যকরী করবার চেষ্টা করাতে কতগুলো

---

* দামোদর ও তার উপনদীগুলোর উপরে দশটি বাঁধের নাম : তিলায়া, বলপাহাড়ী, মাইথন, আয়ার, বারমো, পাঞ্চেৎ, বোকারো এবং কোনার (তিনটি বাঁধ)

মারাত্মক ত্রুটি থেকে গিয়েছে। এ পরিকল্পনার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হতে পারত জলবিদ্যুৎ উৎপাদন। কিন্তু সেই জলবিদ্যুৎ উৎপন্নের কাজই পরিত্যক্ত হচ্ছে

নানান্ অজুহাতে। তা ছাড়া, **নদীর খাত** মজে যাওয়ার ফলে নিম্নাঞ্চলে বন্যাও বন্ধ হবার আশা নেই। ঐ অঞ্চলের বহু অংশ চিরস্থায়ী জলাশয়ে পরিণত হবে।

সুষ্ঠু জলনিকাশী পরিকল্পনার অভাবে আরামবাগ মহকুমা, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার খুবই ক্ষতি হবে। মূল দামোদরের খাত, রূপনারায়ণের খাতও অন্যান্য মজা-কানা নদীর পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা হয়নি। **সেচের খাল** কাটা হয়েছে, কিন্তু এই খালের জলে বন্যার পলি থাকবে না, সুতরাং জমির উর্বরতাও হ্রাস পাবে। অথচ নিম্নাঞ্চলে পর্যাপ্ত ও সময়োচিত বৃষ্টির তো অভাব নেই; পাম্প জলাশয় প্রভৃতির সাহায্যে বিকল্প সেচ ব্যবস্থায় দু-তিন রকমের ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা অনায়াসেই হতে পারত। জলবিদ্যুৎ সুলভে সরবরাহ করতে পারলে শিল্পে-বাণিজ্যে এ এলাকার সম্পদ বাড়তে পারত। তারও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। নিম্নাঞ্চলে সেচের খালগুলো আর মজা নদীগুলো মিলে মহামারী রূপে ম্যালেরিয়া সৃষ্টি করতে পারে। আবার দামোদরের বন্যা রুদ্ধ হলে **কলকাতা বন্দরের নাব্যতা** ধ্বংস হবে। দামোদর-পরিকল্পকগণ এ সবের প্রতিকার করতে পারলেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি।

শিল্পায়নের সমস্যা

একটা দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির উপর। এজন্য চাই শিল্পায়ন (Industrialisation)। কিন্তু দ্রুত শিল্পায়নের পক্ষে বাধা হচ্ছে আমাদের **মূলধনের স্বল্পতা**। তা হোক, পশ্চিম বাংলার একটি মস্ত সম্পদ আছে—জনবল। সুতরাং এ রাজ্যের শিল্পগুলো হবে শ্রমভিত্তিক —মূলধনভিত্তিক নয়। পাশ্চাত্য দেশগুলির মতো ভারী ভারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার না করে এদেশে ছোট যন্ত্রপাতির সাহায্য নেওয়া হবে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানও আকারে ক্ষুদ্র হবে। তা না হলে লোকেরা কাজ পাবে কোথায়? আজকাল তো বৈদ্যুতিক শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ছোট যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্ভব হয়েছে; ফলে নানা ক্ষুদ্র কারখানার কতরকম উপশিল্প গড়ে তোলা যাচ্ছে।

বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় **ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান** আত্মরক্ষা করবে কি করে? ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে মালিকের নিজের পক্ষে সবকিছু দেখাশোনা করা সম্ভব, এতে অপব্যয়ের আশঙ্কাও কম। আবার বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে সুবিধে হল এই যে, এখানে প্রচুর কাঁচামাল দরকার হয় বলে সস্তা দরে পাওয়া যায়, আর উৎপন্ন দ্রব্য একসঙ্গে বহুল পরিমাণে বিক্রি করার জন্য বিক্রয়ব্যবস্থাজনিত খরচও কম পড়ে। এই দু-রকম সুবিধাই ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়ত্তে আনা যায় **সমবায় প্রথার** উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা। এজন্য সারা দেশজোড়া সরকারী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়া দরকার, যারা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের, আর তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে : শিল্পায়নের উপর জোর দেওয়ার পর উৎপাদিত দ্রব্যের অধিকাংশই অবিক্রীত পড়ে থাকবে কিনা ? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, আমাদের প্রয়োজনের তো আর অভাব নেই, অভাব হল টাকা-পয়সার, অভাব ক্রয়ক্ষমতার। এ সমস্যার প্রতিকার হচ্ছে গ্রামে গ্রামে "গ্রাম বিনিময় সঙ্ঘ" (Village Exchange) প্রতিষ্ঠা করা। এই সঙ্ঘকে একটিমাত্র গ্রামের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে "একই উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যাঙ্কে" (Commodity Bank) পরিণত করলে আরও উত্তম হয়। গ্রামের কারিগরেরা তাদের উৎপাদিত জিনিস এই ব্যাঙ্কে জমা দেবে ; জিনিসের মূল্য হিসেবে কারিগরের নামে টাকা জমা পড়বে, আবার তাদের প্রয়োজনানুসারে শিল্পকাজের নানা উপকরণ তারা নিতে পারবে। তা হলেই দেখছ, এই বিনিময় সঙ্ঘ সমস্ত গ্রাম-এলাকার তথা সমগ্র দেশের আর্থিক সমৃদ্ধিতে সাহায্য করবে ; **বেকার সমস্যার** সমাধানের পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সূচনা হবে।

দেশের কোনো একটি এলাকা যাতে বহুতর শিল্পব্যবস্থার আতিশয্যে ভারাক্রান্ত হয়ে না পড়ে, সেজন্য **বিকেন্দ্রীকরণ** (Decentralisation) নীতি অনুযায়ী আমাদের শিল্পোদ্যোগ-সমূহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। ভারতে জিনিসের ওজন ও পরিমাপ সম্বন্ধে **দশমিক প্রথা** (Metric system) প্রবর্তিত করে সকল ধরনের শিল্পক্ষেত্রের উন্নয়ন সাধনের ব্যবস্থা হচ্ছে, যার ফলে কাঁচামালের সরবরাহের পরিমাণ বাড়ানো যাবে। তা ছাড়া আমাদের কুটিরশিল্প-জাত বিবিধ পণ্যদ্রব্য দেশবিদেশে বিক্রয়ের সুব্যবস্থার পিছনেই লুকিয়ে আছে আমাদের জন্মভূমির প্রকৃত ঐশ্বর্যের বীজ।

অনুশীলনী

১। তুমি যে শহরে বা গ্রামে বাস কর সেখানকার প্রধান শিল্প কী কী? এসব শিল্পের কাঁচামাল কোন জায়গা থেকে আসে, কোন্ কোন্ পরিবহণের সাহায্য নিয়ে ?

২। মূল শিল্প আর উপশিল্প বলতে কী বোঝায়? পশ্চিম বাংলার শিল্পাঞ্চল কিভাবে ভাগ করা হয়েছে? কোথায় কোথায় মূল শিল্প এবং উপশিল্পের প্রাধান্য আছে ?

৩। আসানসোলের কয়লাখনি, বার্ণপুরের লৌহখনি বা চিত্তরঞ্জনের রেল-কারখানা পরিদর্শন করে তোমার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ কর।

৪। তুমি যেখানে থাক, তার কাছাকাছি কোনো ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কারখানায় গিয়ে কোনো শ্রমজীবীর সঙ্গে আলাপ করে তাঁর জীবনকথা জানবার চেষ্টা কর।

৫। কলকাতা বন্দরের এত সমৃদ্ধির কারণ কী? ভারতের এই বৃহত্তম বন্দরটির বাণিজ্যিক কাজকর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি ডক-এলাকা সফর করে এস।

৬। স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাসের সঙ্গে শহরের ইতিহাস জড়িত—পুরানো শিল্পনগর হাওড়া এবং নতুন শিল্পনগর চিত্তরঞ্জন বা জামসেদপুরের চিত্র অবলম্বনে এ উক্তির তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ কর।

৭। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-বাণিজ্য প্রধানত বহিরাগত উদ্যোক্তাগণেরই সৃষ্টি এবং তাঁরাই তা চালু রাখছেন।"—কথাটা ব্যাখ্যা করে এ রাজ্যে ব্যাবসা-বাণিজ্যে বাঙালীর পশ্চাদ্‌বর্তিতার কয়েকটির কারণ অনুধাবন কর।

৮। আমাদের দেশ যদি জিনিস রপ্তানি না করে শুধু আমদানিই করে, তবে কোন্ কোন্ অসুবিধে দেখা দিতে পারে?

৯। শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা কী কী? [কাঁচামালের অভাব, বিদ্যুৎশক্তির অপ্রতুলতা, মূলধনের স্বল্পতা, শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার অভাব বৃহৎশিল্পের কারখানা পরিচালনায় মালিকের উদাসীনতা, উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহে গাফিলতি—ইত্যাদি বিষয় আলোচিতব্য]।

১০। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসমূহের স্থানীয়করণ (Localisation) কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে? (১) কাঁচামালের প্রাচুর্য (২) স্থানীয় অধিবাসীদের পেশা (৩) জলবায়ু (৪) স্থানীয় পরিবেশের সুযোগ-সুবিধা—এই চারটি বিষয়ের আলোচনা কর।]

১১। এ রাজ্যে কুটিরশিল্পের এত অবনতি কেন? [যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতা, রাজা-মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতার অবসান, বিদেশী শাসন-যন্ত্রের অবহেলা—ইত্যাদি আলোচ্য]

১২। কুটিরশিল্পের উন্নতির উপরেই গ্রামের সমৃদ্ধি নির্ভর করছে:—ব্যাখ্যা কর। [কারিগরদের শিক্ষা, অল্প সুদে মূলধন সরবরাহ, উন্নত ধরনের কলকব্জা প্রবর্তন, উন্নত বিক্রয়-সংগঠন, প্রচার কার্য—আলোচিতব্য]

১৩। "ল্যাঙ্কাশায়ারের একজন শ্রমিক ভারতের তিনজন শ্রমিকের সমান কাজ করতে পারে।"—আমাদের দেশের শ্রমজীবীদের অযোগ্যতার কারণগুলি নির্ধারণ কর। শ্রমিক-কল্যাণের জন্যে বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় কী ব্যবস্থা অবলম্বিত হচ্ছে?

১৪। "দেশের সমৃদ্ধিতে কৃষি ও শিল্পের পরস্পর-নির্ভরতা"—এ বিষয়ে একটি ছোট নিবন্ধ রচনা কর।

১৫। বিতর্কের আসর: (ক) "পশ্চিম বাংলার উন্নতিতে ক্ষুদ্রশিল্প অপেক্ষা বৃহৎ-শিল্পের উপরই গুরুত্ব দেওয়া উচিত।"

(খ) "পশ্চিম বাংলার শিল্পক্ষেত্রে দুর্দশার জন্য বৃটিশ শাসনই দায়ী।"

১৬। ফিল্ম প্রদর্শনী: একটি শিল্প কারখানা; জলসেচ [ভারত সরকারের এরকম বহু ডকুমেণ্টারী ছবি স্কুলের ব্যবহারের জন্য পাওয়া যায়।]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গ্রাম ও শহর

গ্রাম শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যেখানে (মানুষকে) আমন্ত্রণ করা হয় বা আহ্বান করে আনা হয়'।* প্রয়োজনের আহ্বানেই মানুষ একদিন গ্রামের স্থায়ী বসতিতে একত্রিত হয়েছে। মানুষ যখন চাষ করতে শিখল, তখন বাস করতেও শিখল। গড়ে উঠল গ্রাম। যতক্ষণ মানুষ কেবল পশু-শিকারী ততক্ষণ সে যাযাবর। যেই সে পশুপালন শুরু করেছে, ক্ষেতে ফসল ফলাতে শিখেছে তখনই হয়েছে সে গ্রামবাসী, মাটির সঙ্গে বাঁধা পড়েছে সে। প্রায় ১০,০০০ বছর আগে মানুষ গ্রাম গড়তে শিখেছে। আমাদের দেশে সিন্ধুসভ্যতার এলাকায় প্রাচীন গ্রাম্য বসতির অনেক চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে।

আজও আমাদের দেশ গ্রাম-প্রধান। গ্রামগুলির মধ্যে একটা মৌলিক ঐক্য থাকলেও গঠনগত পার্থক্য আছে। কোনো কোনো অঞ্চলে গ্রামের গৃহ-বিন্যাস অসংবদ্ধ বা ছাড়া-ছাড়া, কোনো কোনো অঞ্চলের সংবদ্ধ বা আটবাঁধা।

বাংলাদেশ

বাংলাদেশের, বিশেষ করে দক্ষিণ বাংলার গ্রামে বাড়িগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আসাম ও উড়িষ্যার অধিকাংশ গ্রামেও তাই। শুধু বাড়িগুলিই যে ছাড়া-ছাড়া তা নয়—দুইটি গ্রামের মধ্যেও যথেষ্ট ব্যবধান। একটি গ্রামের পর মাঠ পেরিয়ে আবার আরেকটি গ্রাম।

কেরালা

দক্ষিণ ভারতের কেরালায় দুরকমের গ্রাম-বিন্যাস দেখা যায়। উত্তরের পাহাড়ে অঞ্চলের গ্রামগুলি বিক্ষিপ্ত, আর দক্ষিণের ধানক্ষেত অঞ্চলের গ্রামগুলি সংবদ্ধ। উত্তর কেরালার গ্রামবাসীদের আবাসগুলি চারদিকে তাল বা নারকেল

---

* গ্রাম (আমন্ত্রণ করা অর্থে চুরাদিগণীয়) + অ। সমূহবাচক গ্রাম শব্দটিও এক্ষেত্রে স্মরণীয়। অঞ্চলবাচক (পল্লি) শব্দটি ক্রমে গ্রাম-বাচক হয়েছে।

ইং village, 'vill' a country-house, farm.

গাছ দিয়ে ঘেরা থাকে। একটা বাড়ি আরেকটি বাড়ি থেকে এইভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গরীব গৃহস্থরাও এইভাবে নিজেদের বাসগৃহগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে।

উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাব

উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের গ্রামগুলি সুসংবদ্ধ। গ্রামগুলির বসতিও ঘনসংলগ্ন। একফালি জমি দুইটি বসতির মধ্যে সামান্য ব্যবধান সৃষ্টি করে, আর এই জমিটুকুই হল যাতায়াতের পথ। **সুসংবদ্ধতার কারণ হচ্ছে:** আত্মরক্ষার তাগিদে, জলসেচের সমবায় প্রচেষ্টা, সমবৃত্তিকতা, ইত্যাদি। এ জাতীয় বিশেষ কোনো কারণ না থাকলে গ্রামগুলি হয় এলোমেলো।
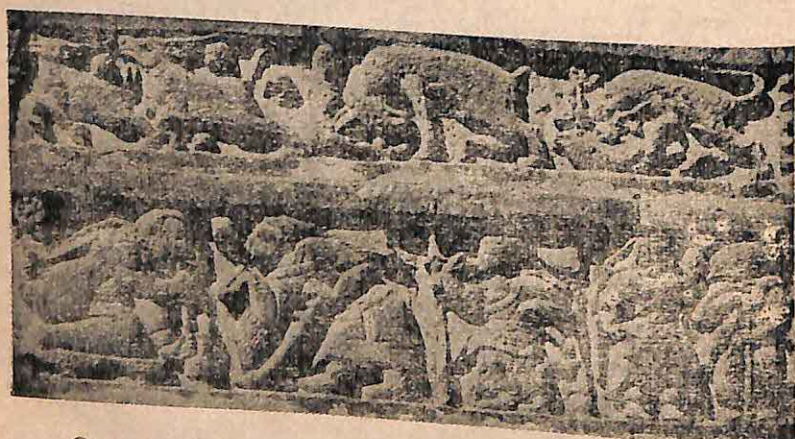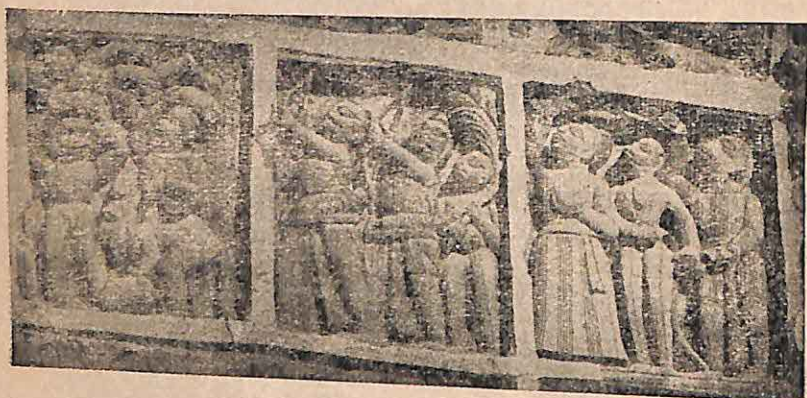
দক্ষিণবঙ্গের মন্দির গাত্রে পোড়ামাটির (terracota) কাজের দুটি নমুনা

গৃহ ও গৃহনির্মাণের উপকরণ

প্রধানত ভৌগোলিক কারণে গ্রামগুলির গৃহনির্মাণে বৈচিত্র্য দেখা যায়। যেখানে বৃষ্টি বেশি সেখানে ঘরের চালে ঢাল বেশি, যেখানে বৃষ্টি কম সেখানে চালাগুলি অপেক্ষাকৃত সমতল (ফ্ল্যাট)। মাটি বাঁশ বা হোগলারই বেড়া, খড় ইত্যাদি সাধারণত গৃহনির্মাণের উপকরণ ; চালগুলিতে টিন, খোলা বা খাপরা ও খড় ব্যবহৃত হয়। ঘরগুলির চেহারায় নানা বৈশিষ্ট্য প্রধানত 'চাল' বা 'চালার' গঠনের উপরেই নির্ভর করে। একচালা দোচালা চারচালা আটচালা—কত রকমের ঘর। বিভিন্ন ধরনের চালা বাঁধায় বাংলার ঘরামির নৈপুণ্য সর্বজনস্বীকৃত। * বাংলার মাটির ঘরও বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। চালাঘরের অনুকরণে পাকা মন্দিরও তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। গুপ্তিপাড়া বিষ্ণুপুর ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দিরের গঠন ও কারুকার্য বাংলার স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন। পরবর্তী কালে স্থাপত্যশিল্পের এই গৌড়ীয় রীতির সঙ্গে মোগল শিল্পরীতির সমন্বয় ঘটে।

পশ্চিম বাংলার কুটিরশিল্প-প্রধান গ্রাম

নানাকারণে কুটিরশিল্পের আজ ভগ্নদশা। তবে এখনও পশ্চিম বাংলার কিছু পল্লী অঞ্চলে কুটিরশিল্প সগৌরবে বর্তমান। বিষ্ণুপুর, শান্তিপুর,
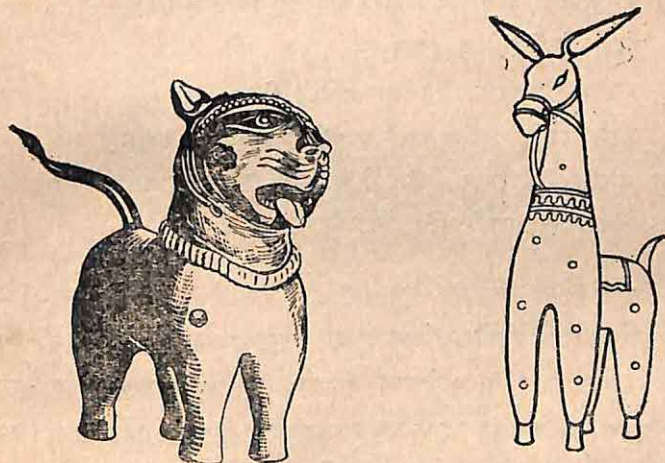
ধনেখালি, আঁটপুর, রাজবলহাট ইত্যাদি অঞ্চলের তাঁতের কাপড় ; বিষ্ণুপুর,

* "এমন ঘর ছাইতে ভারতবর্ষের, বুঝি বা পৃথিবীর আর কোনো জাতি পারে না। বাংলার আটচালা আর চণ্ডীমণ্ডপ সত্যই বিদেশীদের বিস্ময় উৎপাদন করিত, তেমনটি আর কোথাও ছিল না, নাইও।"—বাঙালীর বিশিষ্টতা॥ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

খাগড়া, ঘাটাল ইত্যাদি অঞ্চলের পিতল কাঁসার বাসন; মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার রেশমশিল্প; কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প; কাঞ্চননগরের ছুরি কাঁচি; বাঁকুড়ার পোড়ামাটির পুতুল ও ঘোড়া ইত্যাদি এখনও সর্বত্র সমাদৃত।

হাট

হাট গ্রাম্যজীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সব গ্রামেই হাট বসে না। তবে যে কোনো গ্রামের দু-এক মাইলের মধ্যে সপ্তাহে দু-দিন কি এক দিন হাট বসে। হাটের সম্বন্ধে বেশি কথা না বলে অবিস্মরণীয় সেই 'হাট' কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করি:

> কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি—বোঝাই করা কলসি হাঁড়ি
> গাড়ি চালায় বংশীবদন, সঙ্গে যে যায় ভাগ্নে মদন।
> হাট বসেছে শুক্রবারে বক্সিগঞ্জে পদ্মাপাড়ে।
> জিনিসপত্র জুটিয়ে এনে গ্রামের মানুষ বেচে কেনে।
> উচ্ছে বেগুন পটল মূলো, বেতের বোনা ধামা কুলো,
> সর্ষে ছোলা ময়দা আটা, শীতের র‍্যাপার নক্সা কাটা।
> ঝাঁঝরি কড়া বেড়ি হাতা, শহর থেকে সস্তা ছাতা।
> কলসি ভরা এখো গুড়ে মাছি যত বেড়ায় উড়ে।
> খড়ের আঁটি নৌকো বেয়ে আনল যত চাষীর মেয়ে।
> অন্ধ কানাই পথের'পরে গান শুনিয়ে ভিক্ষে করে।
> পাড়ার ছেলে স্নানের ঘাটে জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটে।

গ্রাম্য হাটের এর চেয়ে ভাল চিত্র আর কী হতে পারে! শুধু হাটের নয়, গ্রাম্য জীবনেরও একটি চিত্র ফুটে উঠেছে ছত্রে ছত্রে।

গঞ্জ

কোনো অঞ্চলের হাটে কৃষিজাত বা পণ্যদ্রব্যের কেনাবেচা যদি বেশি হয়, কাছে নদী থাকে, বা পরিবহণ ব্যবস্থার অন্যান্য সুবিধে থাকে তবে সে অঞ্চলটি ক্রমশ গঞ্জে রূপ নেয়। গঞ্জ হল আধা-শহর গোছের। এখানে স্থায়ী বাজার সৃষ্টি হয়। ব্যাবসা-বাণিজ্যের খাতিরে লোকসমাগম বেশী হতে থাকলে ক্রমশ প্রয়োজনের তাগিদে রাস্তাঘাট ডাক্তারখানা হোটেল রেষ্টুরেণ্ট ইত্যাদি গড়ে ওঠে, ক্রমশ পুরোপুরি শহরের রূপ নেয়। বড় রকমের হাট বাজার বা গঞ্জ থেকে বাংলাদেশে অনেক আধা-শহর বা শহর গড়ে উঠেছে। উত্তর বাংলার কালিয়াগঞ্জ, কিষাণগঞ্জ, রায়গঞ্জ, দক্ষিণ

বাংলার রামপুরহাট, রাজবলহাট ইত্যাদি জায়গা যে আগে বড় হাট বা গঞ্জ ছিল তা তো নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে। কলকাতার বৌবাজার, বড়বাজার, লালবাজার, শোভাবাজারও একদিন গ্রাম ছিল; বাজারের প্রাধান্য থেকেই ক্রমশ এই অঞ্চলগুলো শহর হয়ে ওঠে। কলকাতার ইতিহাস আলোচনায় একথা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মেলা

কোনো একটা উপলক্ষ করে যেখানে মানুষজন একসঙ্গে মেলবার সুযোগ পায় তাই মেলা। অবশ্য সাধারণত ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করেই মেলাগুলি বসে। যেমন রথ উপলক্ষে রথের মেলা, চড়ক উপলক্ষে চড়কের মেলা, পৌষ সংক্রান্তির মেলা, এমনি অনেক।

পাশ্চাত্য দেশের মেলার উৎপত্তি ঠিক এমনি ভাবেই হয়েছে। ল্যাটিন শব্দ *Feria* থেকে air শব্দের উৎপত্তি। *Feria* মানে holiday অথবা feast day.

মেলা যে কতদিন থেকে চলছে তার সন তারিখ নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ বহু বহুদিন থেকে চলে আসছে মেলা। রোমীয় আবির্ভাবের আগেও বসত মেলা। এর উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন জাতি বা শাখার মধ্যে ব্যাবসা-বাণিজ্য ও সখ্য স্থাপন করা।

মানুষ যখন অসভ্য ছিল তখনো এমনি মেলা বসত। তারা প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ করত, কিন্তু কী আশ্চর্য, মেলাপ্রাঙ্গণে তারা কখনও শান্তি ভঙ্গ করত না। কারণ তারা মনে করত এটা শান্তিভূমি। মেলাভূমিকে তারা মনে করত ধর্মীয় ও পবিত্র স্থান। অন্তত এই জায়গায় কেউ কাউকে ঠকাতে পারবে না, কিংবা বিবাদ করতে পারবে না, তাহলে ভগবান ক্রুদ্ধ হবেন এবং অপরাধীকে ভীষণ শাস্তি দেবেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতেই বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে ছোট, বড়, মাঝারি মেলা বসে; তবে গ্রামাঞ্চলেই এগুলির প্রাধান্য বেশি, কারণ সেখানকার অধিবাসীরা কলকারখানার বা ব্যাবসা-বাণিজ্যের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। নিজেদের ঘরোয়া শিল্পের অর্ঘ, নানা রকমের দ্রব্যসম্ভার তারা গ্রাম্য মেলায় নিয়ে আসে, বেচাকেনার সুযোগ হয়। হাতাখুন্তি, বাসনপত্র থেকে শুরু করে তাঁত ও রেশমশিল্প-জাত বস্ত্র, শঙ্খের কাজ, এমনকি হাতীর

দাঁতের কাজ পর্যন্ত মেলায় দেখা যায়। শুধু তাই নয়, লোহা তামা পিতলের নানাপ্রকার তৈজসপত্রেরও বিপুল প্রদর্শনী এইসব মেলায় অনুষ্ঠিত হয়।

পশ্চিম বাংলায় মেলার সংখ্যা নেহাত কম নয়। সরকার প্রকাশিত Fairs and Festivals in West Bengal নামক ছোট্ট সংকলন থেকে জানা যায় ছোট বড় সব মিলিয়ে প্রায় ১৬০০র কাছাকাছি মেলা প্রতি বছর বাংলার মাটিতে বসে। সব ঋতুতেই মেলা বসে, তবে তার মধ্যে শীতকালটাই মেলার পক্ষে প্রশস্ত। তাই ধানের ক্ষেত সোনার বরণ হতে না হতেই বাংলার কোণে কোণে মেলার সাড়া পড়ে যায়। দূর গাঁ থেকে ধূলো পায়ে জড়ো হয় কত ক্রেতা বিক্রেতা আর দর্শনার্থী, এ ছাড়া আসে কত সন্ন্যাসী, কত বাউল, কত বৈষ্ণব পীর ফকির।

রাস ঝুলন থেকে শুরু করে একটার পর একটা পর্বকে উপলক্ষ করে চৈত্র সংক্রান্তি পর্যন্ত এ অঞ্চলে থেকে ও-অঞ্চলে মেলাগুলো যেন ঘুরতে থাকে। কখনো বা একসঙ্গেই জেলার বিভিন্ন এলাকায় কয়েকটি জায়গায় মেলা বসে যায়। কোনটা বা একদিন। কোনটা বা তিনদিন আবার কোনোটা বা একমাস ব্যাপী।

পূর্বস্থলীর (বর্ধমান) অন্তর্গত জামালপুর গ্রামে, নান্নুরের (বীরভূম) অন্তর্গত জুবুতিয়া গ্রামে, জঙ্গীপুরের (মুর্শিদাবাদ) অন্তর্গত ফরিদপুর গ্রামে, রায়গঞ্জের (পশ্চিম দিনাজপুর) অন্তর্গত বিন্দোল, কালিয়াগঞ্জে, জলপাইগুড়ির অন্তর্গত জলপেশ, মেখলিগঞ্জের (কুচবিহার) অন্তর্গত চাংরাবন্ধ গ্রামে যে মেলাগুলি বসে তার স্থায়িত্ব একমাসকাল। পশ্চিম বাংলার মেলাগুলির মধ্যে বীরভূমের মেলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলিকে 'আনন্দমেলা' বলা চলে। কেনাবেচা মেলার অন্যতম আকর্ষণ হলেও প্রাণবিনিময়ই যেন মেলার আসল লক্ষ্য মনে হয়। অবশ্য প্রত্যেক মেলাতেই প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, তবে এখানে যেন একটু বৈচিত্র্য বেশি।

কবি জয়দেবের জন্মভূমি জয়দেব-কেঁদুলিতে পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে যে মেলা বসে তা সত্যই অপূর্ব। অজয়ের কোলে সারিবাঁধা দোকানে কেনাবেচা চল্‌ল সারাদিন ধরে। ছেলে বুড়ো সকলের কোলাহল থামল, সন্ধ্যাবেলা গাছের ডালে ডালে লণ্ঠন ঝুলিয়ে আউল আর বাউলের দল জুড়ল গান। একতারাগুলো সব একসঙ্গে বেজে উঠল : রিম ঝিম কাঁটা কাঁটা রিম ঝিম কাঁটা কাঁটা। শুধু আউল নয়, ডুলে বাগ্‌দীদের জাতগান, কীর্তন, কথকতা ইত্যাদি কত কী। গাছের নিচে শীতের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য খড়-কুটোয় জেগে উঠল আগুনের গান,

আর সেই সঙ্গে বাউলের গলা আকাশ কাঁপিয়ে বলে উঠল···পাগলা মনটারে তুই বাঁধ··· ।

"আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লীমাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্ত চলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান করে। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সঙ্কীর্ণতা বিস্মৃত হয়—তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা।" (স্বদেশী সমাজ ॥ রবীন্দ্রনাথ)

নগর বা শহর

নগর কাকে বলব? প্রথমে শব্দটির ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধান করা যাক : নগ
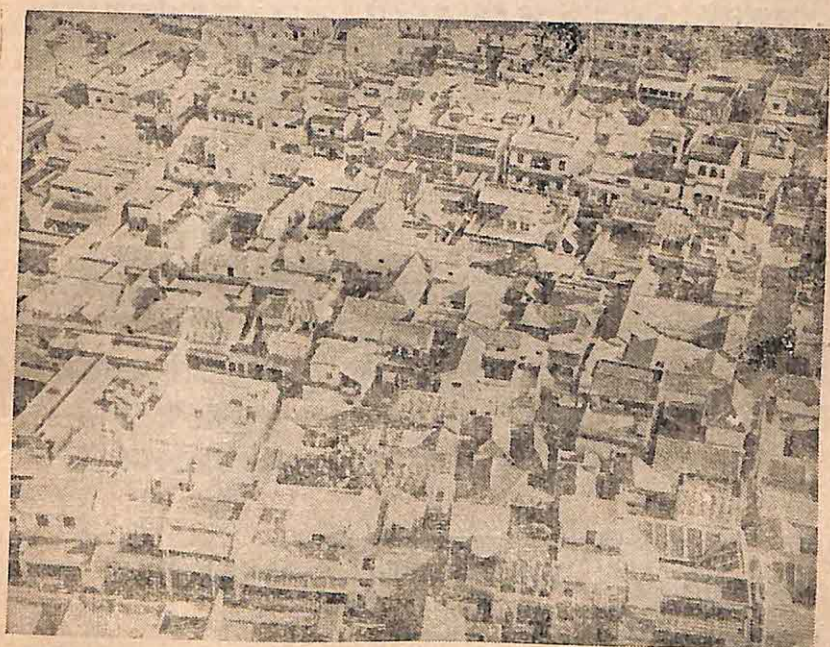
রক ফোর্টের ওপর থেকে ত্রিচিনোপল্লী শহর

পর্বত)+র (অস্ত্যর্থে), অর্থাৎ পাহাড়ের মত উঁচু সৌধ বা অট্টালিকা

আছে যে লোকালয়ে তাই হচ্ছে নগর। ব্যুৎপত্তিগত অর্থের গুরুত্ব না দিলেও এ কথা বলা চলে যে, নগরের একটি লক্ষণ অন্তত আছে এই আভিধানিক অর্থে। বড় বড় বাড়ি তো নগরে থাকবেই। তবে এ তো নগর সম্বন্ধে সব কথা নয়। নগরের লোকসংখ্যাও গ্রামের চেয়ে অনেক বেশি ; আর কৃষিই যাদের একমাত্র বৃত্তি এমন লোক থাকে না এখানে। এই হল নগরের বৈশিষ্ট্য। নগর কথাটির ফার্সী প্রতিশব্দ শহর।* বড় নগরকেও আমরা শহর বলি। ইংরেজীতে বড় শহরকে বলে city.

গ্রাম থেকে শহর

আমরা এর আগে দেখেছি ব্যবসায়িক কারণে কি করে শহর গড়ে ওঠে (গঞ্জ>শহর)। আরও অনেক কারণে শহর গড়ে উঠতে পারে।

কোনো গ্রামে যদি কোন দেবস্থানের মাহাত্ম্য দীর্ঘদিন ধরে প্রচারিত হতে থাকে তবে কালক্রমে সেটা হয়ে ওঠে তীর্থস্থান, আর এই তীর্থস্থানই ক্রমে লোকসমাগমের নানা প্রয়োজনে শহর হয়ে ওঠে। একে বলে **তীর্থনগর**।

কোনো গ্রামে যদি খনিজসম্পদ আবিষ্কৃত হয় তবে খনিকে কেন্দ্র করে শহর গড়ে ওঠে। বিশেষ কোনো শিল্পের জন্য কোন বড় জায়গা বেছে নিলে সেই জায়গাই ক্রমশ নগরে রূপ নেয়। এ হল **শিল্পনগর।**

পাহাড়ের স্বাস্থ্যকর কোনো অঞ্চলে স্বাস্থ্যকামীদের ভিড় জমতে থাকলে ক্রমশ সেখানে নগর গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা। এ হল **স্বাস্থ্যনগর**।

পশ্চাদ্‌ভূমি উন্নতধরনের হলে সমুদ্র বা নদীর তীরবর্তী কোনো গ্রামের নগর রূপে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। একে বলে **বন্দর** বা নদীনগর।

প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সরকারী অফিস আদালত কোথাও বসলে সে জায়গাটিও ক্রমে নগরে রূপান্তরিত হয়। একে বলে **প্রশাসনিক নগর**। এ জাতীয় নগরের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকলে তা রাজধানীতে পরিণত হয়।

---

* নগর কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ Town. Town শব্দটির মূলে আছে অ্যাংলো-স্যাকসন tun (তুন) = বেষ্টনী। তুলনীয়ঃ জার্মন Zaun (ৎসাউন) = বেষ্টনী বা বেড়া। এই ব্যুৎপত্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আগে নগরগুলির চারিদিকে বেষ্টনী দেওয়া থাকত। প্রাচীন ব্যাবিলন, মোএঞ্জোদড়ো, পাটলিপুত্র এসব নগরী তো প্রাচীর-ঘেরাই ছিল।

কলকাতার জন্মকথা

১৬৮৬ সাল। ভারতে ইংরেজ কুঠিয়াল জব চার্ণক এলেন (হল্ট করলেন) হুগলী নদীর তীরে **সুতানুটি** গ্রামে। পছন্দ করলেন গ্রামটিকে—ব্যাবসা-বাণিজ্যের পক্ষে মন্দ না জায়গাটা। কাছেই বড় হাট। শেঠ আর বসাকদের জাঁকালো ব্যাবসা। সামরিক প্রয়োজনের দিক থেকেও গ্রামটি ফেল্‌না নয়। তবে আর কী? এখানে একটা কুঠি চাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর। জব চার্ণকের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিল, ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট। জলাজঙলা দূর করে তিনি কুঠি বসালেন সুতানুটিতে। বাগবাজার কুমারটুলি আর বড়বাজার এই নিয়ে ছিল সুতানুটি গ্রাম। সুতানুটির দক্ষিণে ছিল **কলিকাতা** গ্রাম-বড়বাজার থেকে এস্‌প্ল্যানেড পর্যন্ত। এর পর ছিল **গোবিন্দপুর** গ্রাম—নদীর তীর বরাবর হেষ্টিংস পর্যন্ত। চার্ণক এই তিনখানি গ্রাম কেনার অনুমতি পেলেন মোগল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। ১৬৯৮ সালের ১০ই মে বড়িষা-বেহালার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে তিনি মাত্র তেরশ' টাকায় এই তিনটি গ্রাম কিনে নিলেন। ক্রমে এই তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল শহর। শহরটির নাম হল কলকাতা*।

"Thus from the midday halt of Charnock
Grew a city", —*R. Kipling*

গ্রাম নগরের সম্বন্ধ

মানুষ নিজের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছে গ্রাম, নিজের প্রয়োজনেই গড়ে তুলেছে শহর। মানুষের প্রয়োজন এবং প্রয়োজনবোধ যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। গ্রাম থেকেই শহর গড়ে উঠেছে বটে, কিন্তু গ্রামের উপর শহরকে নির্ভর করতেই হয়; প্রাণের যোগান যে আসে গ্রামের সবুজ ক্ষেত থেকেই। গ্রামকেও তেমনি জীবনযাত্রার নানা চাহিদা মেটাতে শরণ নিতে হয় শহরের। গ্রামের জীবনের সঙ্গে শহরের জীবনের যোগ ঘনিষ্ঠতর হলেই দেশের মঙ্গল। কিন্তু আজ সবাই শহর-মুখী হয়ে পড়েছে। গ্রামগুলো নিষ্প্রাণ নিরুত্তাপ। যারা শহরে বাস করছেন, গ্রাম-ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ যে তাঁদের মন ভোলায় না, তা নয়। আসলে সেদিকে চোখ ফেরাবার সময় নেই। গ্রাম আজ শহরবাসীদের অতীতের সুখ-স্মৃতি হয়ে আছে। সাম্প্রতিক উপন্যাস

* কলিকাতা নাম কেমন করে এল—এ বিষয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা হয়েছে। ভাষা-তাত্ত্বিকদের মতে সুতার নুটি বা আড়ত থেকে যেমন সুতানুটি গ্রাম, কলি (কলিচুনের) কাতা (অঞ্চল) থেকে তেমনি কলিকাতা। অর্থাৎ চুনের কারখানার জন্য গ্রামটি বিখ্যাত ছিল বলে এর নাম হয়েছিল কলিকাতা।

কবিতা চলচ্চিত্র সর্বত্রই দরদ-দিয়ে আঁকা গ্রামের ছবির ছড়াছড়ি। কিন্তু ধানসিঁড়ি নদীর জন্য বেদনা বোধ করলেও সে নদীর তীরে ফিরে যাবার তো আর উপায় নেই। এদিকে শহরে মানুষের চাপ ক্রমশ বাড়ছে—ইটের পর ইট মধ্যে মানুষ কীট। এ অবস্থা কি চলতেই থাকবে? কলকাতা মহানগরীর জীবন তো জনসংখ্যার চাপে বিপর্যস্ত হতে চলেছে। কিন্তু গ্রামে ফিরে যাও বললেই তো আর সমস্যার সমাধান হবে না, সেখানে বাঁচবার ব্যবস্থা চাই। শিল্পবাণিজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য শহরের সঙ্গে শহরতলীর সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ **গ্রামের নগরীকরণ** চলেছে। শহরের চাপ এতে সামান্য কিছু কমবে। সরকার থেকে **গ্রামাঞ্চলে আদর্শ কলোনী** গড়ে তুলে শহরের চাপ কমাবার চেষ্টাও চলেছে।

এই নগরীকরণের যেমন ভাল দিক আছে, তেমনি **সমস্যা**ও আছে। নগরীকরণ যত বাড়বে চাষের জমি ততই কমতে থাকবে। খাদ্য সমস্যায় এমনিতেই আমরা বিপর্যস্ত। দ্রুত নগরীকরণের জন্য চাষের জমি কমতে থাকলে খাদ্য সমস্যা তীব্রতর হবে বলাই বাহুল্য। উন্নত দেশগুলির সর্বত্রই নগরীকরণ দ্রুতগতিতে চলছে। আজ যে সব দেশের উপরে আমরা খাদ্যের জন্য কিছুটা নির্ভর করতে পারি, অদূর ভবিষ্যতে হয়ত তা পারব না। এইজন্য নগরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে পতিত জমি উদ্ধার করা, বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবাদী জমির ফলন বাড়ানো এবং বন-নাশ জনিত ক্ষতিপূরণের জন্যে বৃক্ষরোপণ করার ব্যাপারে আমাদের আরও উদ্যোগী হতে হবে।

নগরীকরণের একটা বিজ্ঞানসম্মত সীমাও নির্ধারিত হওয়া উচিত। **গ্রামগ্রাসী সভ্যতার** উপর প্রকৃতির প্রতিশোধ কি অনিবার্য?

অনুশীলনী

১। গ্রাম ও শহরের পার্থক্য কী?

২। গ্রামবিন্যাসে সংবদ্ধতা এবং অসংবদ্ধতার কারণ কী?

৩। একটি পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত কর এবং তোমরা—ছাত্ররা কি ভাবে এই উন্নয়নকাজে অংশ নিতে পার বল।

[ভারতের পল্লীবাসিগণ আজ গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন। ভাগচাষীর ক্রমবর্ধমান হার, জীবনধারণের উপযোগী অর্থোপার্জনে কৃষিমজুরের অক্ষমতা, ভূমির উৎপাদিকা শক্তির ক্রমাবনতি—এইগুলো হচ্ছে গ্রামের প্রধান সমস্যা। পল্লীর জনগণের স্বাস্থ্য সুখ সমৃদ্ধি নির্ভর করছে ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং কৃষিকাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের উপর। কৃষি ও শিল্পের মধ্যে নূতন সমন্বয় ঘটানোই গ্রামগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার শ্রেষ্ঠ উপায়।]

৪। নদীনালার আশেপাশে গ্রামের পত্তন হয়েছে।—এর কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ খুঁজে বার কর।

৫। ভূমি ও কৃষির উপর একান্তভাবে নির্ভর করার ফলে গ্রাম্যজীবন সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে বাঁধা পড়ল।—গ্রাম্যজীবন সঙ্কীর্ণ হওয়ার ফলেই কি গ্রামগুলোর আজ এত দুর্দশা? তোমার কী মনে হয়?

৬। পশ্চিম বাংলার মতো ক্ষুদ্র রাজ্যে চারিটি বড় বড় শিল্পাঞ্চল আছে, তবু শহরগুলি এ রাজ্যের ধনবৃদ্ধি অথবা অধিবাসীদের কর্মের সংস্থান করতে পারছে না।—এ সমস্যাটির কয়েকটি কারণ অনুধাবন কর।

৭। হাট, মেলা আর গঞ্জ—এ তিনের মধ্যে পার্থক্য কী?

৮। গ্রাম থেকে শহর গড়ে ওঠবার কতকগুলি কারণ অনুধাবন কর। ভারতের কতকগুলি শহরের নাম কর এবং উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণ করে এগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ কর। শ্রেণীগুলির নামকরণ কর।

৯। জাতীয় জীবনে নগরের ভূমিকা কী? নাগরিকতার মধ্যে দিয়ে কি আমাদের মৌল সমস্যাগুলির সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভব?

[আলোচনা সূত্র ॥ আমাদের পুরাতন শহরগুলি যেমন শিল্পবাণিজ্যে ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছে, তেমনি শিল্পনগরগুলি দ্রুত সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে। এ ঘটনাটিকে অনায়াসেই "শিল্পের যুগান্তর" বলা যেতে পারে। কৃষিক্ষেত্রে অতি-জনতার চাপ থেকে মুক্তিলাভের আশায় পল্লীবাসীরা শহরে ছুটে আসে; কোনো স্থির পরিকল্পনা নেই, শহরে যে কোন জীবিকা জুটলেই হল। অথচ কাজের যোগাড় হলেও তাদের স্বল্প উপার্জনে পরিবারসহ শহরে বাস করা সম্ভব হয় না। কাজেই পরিবারের একাংশকে কৃষির উপর নির্ভর করে গ্রামের বাড়িতেই রাখতে হয়।]

১০। "শহরের জীবন গ্রামের জীবনের চেয়ে অধিকতর উপভোগ্য"—এ বিষয়ে একটি বিতর্কানুষ্ঠানের ব্যবস্থা কর।

১১। রচনা লেখ:

(ক) একটি গ্রামের আত্মকথা; (খ) একটি শহরের আত্মকথা।

১২। মডেল তৈরী কর॥ একটি আদর্শ গ্রাম; একটি আদর্শ শিল্পনগর।
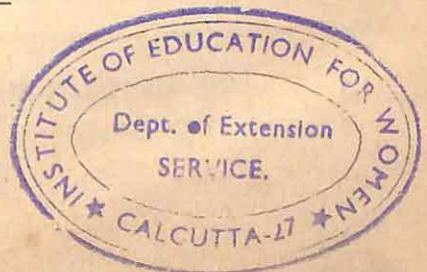
সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ বিদেশের লোক-সমাজ ॥

মানবজাতির গোটা ইতিহাসখানা চঞ্চলতা আর এগিয়ে-চলার কাহিনী। কিন্তু মানুষ যদি এগিয়ে চলে তো দেশে দেশে সমাজে সমাজে এত প্রভেদ কেন? মানুষ এগিয়ে চলেছে কোন্ নিয়মে? প্রাণীদের বিকাশের বেলায় যেমন, মানুষের অগ্রগতির পিছনেও তেমনি রয়েছে একটিমাত্র কারণ—বেঁচে থাকার লড়াই। এ লড়াইয়ের কৌশল সব দেশের মানুষ সমানভাবে আয়ত্ত করতে পারেনি, তখনই তারা পড়েছে পেছিয়ে। তাই তো দেখি বিভিন্ন লোকসমাজে এত তফাৎ।

মালয়ের লোকসমাজ

আন্দামান দ্বীপের আদিম জাতিদের বিচিত্র জীবন কথা আমরা জেনেছি। সেরকম আরেকটি মানব সমাজ গড়ে উঠেছে মালয়ের সেমাঙদের নিয়ে। সভ্য মানুষদের তাড়া খেয়ে এরা দেশের অভ্যন্তরে গভীর বনেজঙ্গলে গিয়ে বাসা বেঁধেছে। ফলমূল আহরণ এবং পশুশিকার করে এরা টিকে আছে পৃথিবীর মাঝে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি অপ্রশস্ত অথচ দীর্ঘ উপদ্বীপ—নাম মালয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্গত এই দেশটিতে সারা বৎসর উষ্ণ আবহাওয়া আর দিনরাত বৃষ্টি—সমগ্র ভূভাগ জুড়ে নিবিড় অরণ্য। উপদ্বীপের মধ্যস্থলে অরণ্য-ঢাকা পাহাড়ের শ্রেণী, উজ্জ্বল নীল আকাশের পটভূমিকায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, পাহাড়ের সানুদেশে ঢেউ-খেলানো সমতল ভূমি, ধীরে বয়ে যাচ্ছে নদী সাগর-সঙ্গমে, সাগরের জলে আর আকাশের নীলে কী প্রশান্ত-সুন্দর কবিতা!

মালয়ীদের শক্তসবল বেঁটে শরীর, তামাটে রঙ, মস্ত মুখ আর চওড়া নাক। মেয়ে-পুরুষ-শিশু সবাই ঢিলেঢালা পোশাক পরে, মাথায় টুপি ব্যবহার করে—নিরক্ষদেশের সূর্যের যা প্রচণ্ড তেজ! মালয়ীরা বেশির ভাগই চাষী, বনজঙ্গল সাফ করে **সমুদ্রোপকূলের** গ্রামে বাস করে। স্যাঁতসেতে মাটি বলে প্রায় চার ফুট উঁচুতে এরা কাঠের বাড়ি বানায়, তালপাতার ছাউনি আর জানালা। একটিমাত্র ঘর, দরজার সামনে বারান্দা, তার সঙ্গে

মই নেমে এসেছে মাটিতে। ঘরের পিছনে আরেকটি বারান্দা—রান্নার জায়গা। ঘরের উচু পাটাতনের নিচে পশু বা শস্য রাখা হয়। তাল, নারকেল, কলা, আনারস, ডুরিয়ান, মিঠে আলু, শসা, সাগু, নানারকম মসলা—কত কী উৎপন্ন হয় এখানে। জমির বেশী অংশটাতেই ধান চাষ হয়। মালয়ীরা শহরে মোটর ড্রাইভারি করে ; কিন্তু তারা নিজের গ্রামে থেকে চাষবাস করতেই বেশি পছন্দ করে।

মালয়ের **অরণ্যবাসী সেমাঙরাও** নিগ্রোবটু শ্রেণীর। আদিম আন্দামানীদের মতোই পোশাকের ধার ধারে না, কোমরে এক ফালি ন্যাকড়া জড়ানো। পাহাড়িয়া অঞ্চলে গভীর বনের মধ্যে নদীর ধারে এরা আস্তানা বানায়—মুখোমুখি, ঘন ঘন সব কুঁড়ে। এদের ঘরের চালাগুলো ভারি মজার, ইচ্ছেমত ওঠানো-নাবানো চলে। রোদ বৃষ্টি বা বাতাস চাইলে চালা তুলে দিতে হয় ; না চাইলে—চালা নামিয়ে দিলেই হল! শোবার মাচার দু-পাশে আগুন জ্বালানো থাকে—রাতের ঠাণ্ডা আর জন্তু-জানোয়ারের হাত এড়াবার জন্য। আস্তানাগুলো সাময়িক, কেননা সেমাঙরা ছোটবেলা থেকেই যাযাবরের মতন ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত।

ফলমূল আহরণ করে আর পশুপাখি শিকার করে সেমাঙদের জীবন কাটে। ফল সংগ্রহের জন্যে প্রত্যেকেরই খানিকটা করে নির্দিষ্ট এলাকা আছে। কিন্তু মূল সংগ্রহ বা শিকারের সময় সেরকম কোনো ভাগাভাগি নেই ; বাঁশঝাড়ের বনে অথবা দশ-বারো ফুট উচু ঘাসের বনে কিংবা জোঁক আর মশাতে ভর্তি নদীপাড়ের জঙ্গলে—যেখান থেকে খুশি খাবার যোগাড় করা চলে, কেউ বাধা দেবে না।

সেমাঙ রমণীরা অনেক সময় মালয়ীদের ঘর-সংসারের কাজ করে দেয় ; পুরুষেরা ব্যাবসা করে মালয়ীদের সঙ্গে। চাল-কলা আর আখের বিনিময়ে সেমাঙদের কাছ থেকে মালয়ীরা নেয় মাদুর, ঝুড়ি আর বাঁদর। নারকেল গাছে উঠে ফল পাড়ার কাজে বাঁদরগুলোকে ট্রেনিং দেয় মালয়ীরা।

মালয়ের অরণ্য অঞ্চলে আরেকটি উপজাতি হচ্ছে **সকাই**। পশু শিকারে এরা ভারি ওস্তাদ। আন্দামানের ওঙ্গে বা নীলগিরির টোডা উপজাতিরই মতো সকাইরাও বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীটা হচ্ছে ভূতপ্রেতের রাজ্য—তাদের সন্তুষ্ট করতে হবে নানা অনুষ্ঠান ও উপহারের দ্বারা।

সকাই-সেমাঙদের অনুন্নত সমাজের পাশাপাশি মালয়ের বিভিন্ন শহরে ও বাণিজ্যকেন্দ্রে একটি **সভ্য সমাজ**ও গড়ে উঠেছে। ইউরোপীয়গণ এদেশে

বহু রবার বাগিচা স্থাপন করেছে। চীনা, মালয়ী, ভারতীয় ও পাকিস্তানীরা রবারের বাগানে ও কারখানায় কাজ করে। অনেক মূল্যবান টিন ফ্যাক্টরীর মালিক হচ্ছে চীনারা। বর্তমানে শিল্প শিক্ষা স্বাস্থ্য চিকিৎসা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মালয় ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে।

উত্তর চীনের লোকসমাজ

পৃথিবীর সুপ্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে চৈনিক সভ্যতা অন্যতম। প্রায় হাজার বছরের পুরনো এই সভ্যতার আদি পীঠভূমি উত্তর চীনের ওয়েই (Wei) এবং হোয়াঙ (Hwang) নদের মধ্যবর্তী বিশাল সমালভূমি। সুদূর অতীতে চীন জাতি এ অঞ্চলে কৃষি ও ব্যাবসা-বাণিজ্য দ্বারা শান্তিময় জীবন কাটিয়ে চীনে এক উন্নত সভ্যতার বীজ বপন করে গেছে। তারা যেসব খাল কেটে উত্তর চীনের অনুর্বর মরুপ্রদেশকে শস্যশ্যামল করে তুলেছিল তাদের চিহ্ন আজও বিদ্যমান। হোয়াঙ হো-র (পীত নদী) গতিকে বশে আনা যেমন তাদের জীবনে প্রধান ব্রত ছিল, তেমনি উত্তর-পশ্চিম দিকের পরাক্রান্ত মোঙ্গল তাতার প্রভৃতি যাযাবর জাতির অবিরাম আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করাও তাদের অন্যতম কর্তব্য ছিল। এইভাবে যুগ যুগ ধরে উত্তর চীনের ইতিহাস গড়ে উঠেছে। বিদেশীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ২০৯ খৃষ্টপূর্বাব্দে সম্রাট চীন-শী-হুয়াঙতি দু-হাজার মাইল দীর্ঘ **চীনের প্রাচীর** নির্মাণ করান। কত শত উপকথা যে এই প্রাচীর নির্মাণের সঙ্গে জড়িত তার ইয়ত্তা নেই। পর্বতের বাধা জয় করে, নদ-নদীর উভয় তীরকে সেতুবন্ধে আবদ্ধ করে, পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম এই বিশাল প্রাচীর মানুষের ধৈর্য, অধ্যবসায় ও শক্তির অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ স্বরূপ আজও বিরাজমান। ভগবান বুদ্ধের অমৃতবাণী গ্রহণ করে চীন তার প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছিল সেই দু-হাজার বছর আগে।

চীনের উত্তর-পশ্চিমে কোন উচ্চ পর্বতশ্রেণী না থাকায় শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে উত্তর চীনে। বসন্তের দক্ষিণ বাতাসে যখন দক্ষিণ চীনের মাঠে-প্রান্তরে সবুজ শস্য ঢেউ খেলে যায়, তখন উত্তর চীনের ধূ ধূ মাঠে ঘূর্ণিবায়ুর মাতামাতি চলে। এখানে বছরে তিন চার মাস মাত্র চাষবাস হয়—তাও অনেক মেহনত করে। এখানকার বিপুল লোকসংখ্যার অনুপাতে চাষের জমি অত্যন্ত কম ; অনাবৃষ্টির জন্য প্রায়ই দুর্ভিক্ষ হয়। আবার হোয়াঙ নদের বন্যায় দুর্দশা চরমে ওঠে।

প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে এইভাবে অবিশ্রান্ত লড়াই করে উত্তর চীনের লোকেরা বেঁচে আছে। যে স্বল্পপরিমাণ জমি চাষের উপযুক্ত তাতেই **উৎপাদন বৃদ্ধিমূলক পন্থায় চাষ** (intensive cultivation) চালাতে হচ্ছে। এতটুকু জমিও তারা ফেলে রাখে না। এদেশে আধুনিক প্রথায় কৃত্রিম সার তৈরির ব্যবস্থা নেই ; মানুষের মল শুকিয়ে সাররূপ ব্যবহার করা হয়। চাষের কাজ চলে গাধা ও বলদের সাহায্যে।

উত্তর চীনে গম, বার্লি, জোয়ার, সয়াবীন ও মিষ্টি আলু উৎপন্ন হয়। আর বাড়িতে বাড়িতে তুঁত গাছে হয় গুটিপোকার চাষ। চীনের রেশমী কাপড় জগদ্বিখ্যাত। শত শত বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে 'চীনাংশুক' চালান আসত। এখানকার আমদানি দ্রব্য হচ্ছে চা, তেল ও লবণ।

১৯৪৯ সাল থেকে সাম্যবাদী সরকারের নেতৃত্বে চীনে **নবজাগরণের সূত্রপাত** হয়েছে। 'পায়োনীয়ার্স' দল ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অশিক্ষিত চাষীদের শিক্ষাদানের ভার নিয়েছে। জমির খণ্ডীকরণ বন্ধ করে যৌথ খামার (collective firm), আধুনিক যন্ত্রপাতি, কৃত্রিম সার, বাঁধ নির্মাণ, ভূমিক্ষয় নিবারণের জন্য বন সংস্থাপন, পতিত জমি উদ্ধার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উত্তর চীনের অধিবাসীরা শুধু কৃষিজীবীই নয়। এরা ব্যাবসা-বাণিজ্য করে, কলকারখানায় ও যানবাহন বিভাগে কাজ করে। বিভিন্ন কয়লাখনি, লৌহখনি ও তৈলখনিতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত। সাহিত্যে ও চিত্রশিল্পে খুবই উন্নত এরা।

সাইডার সী-র লোকসমাজ

উত্তর চীনের মানবসমাজের মতোই প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে আরেকটি জাতিকে দুনিয়ায় টিকে থাকতে হচ্ছে—তারা হল্যাণ্ডের ডাচ বা ওলন্দাজ। উত্তর সাগরের তীরে ইউরোপের ছোট একটি দেশ হল্যাণ্ড বা নেদারল্যাণ্ডস্ (= নিচু দেশ); আয়তন আমাদের বর্ধমান বিভাগের সমান, লোকসংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ। এ দেশেই আছে সাইডার সী (Zuider Zee) উত্তর সাগরের সঙ্গে সংযুক্ত একটি অগভীর খঁড়ি।

হল্যাণ্ডের প্রায় সিকি অংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকেও একশ' ফিট নিচু ; তাই বারে বারে সাগরের জল দেশের ভিতর ঢুকে গ্রামের পর গ্রাম ডুবিয়ে দিত। প্রকৃতির সংহারক মূর্তির সামনে ওলন্দাজেরা একান্ত অসহায় ছিল। কিন্তু

আজ? আজ হল্যাণ্ডের কোথাও জলাভূমি বা সাগরের জল দেখতে পাওয়া যাবে না; তার পরিবর্তে ফসলের ক্ষেত, আঁকাবাঁকা খাল আর ঝলমলে গ্রাম সূর্যের রৌদ্রে হাসছে।

সমস্যা প্রধানত ছিল দুটি : সমুদ্রের প্লাবন, আর দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। তাই সাইডার সী থেকে জল সরিয়ে একে কৃষিযোগ্য ভূমিতে পরিণত করাই ডাচদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। ফ্রীজল্যাণ্ড থেকে উত্তর হল্যাণ্ড পর্যন্ত বিশ-পঁচিশ ফিট্ উচু **বাঁধ** (dike) নির্মিত হল বহু বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে; এই বাঁধগুলোর উপরে চমৎকার কংক্রীটের রাস্তা বানিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি করা হল। বাঁধের সাহায্যে বন্যা আটকে নিয়ে বাঁধের অপর দিকের নিম্নভূমির জল পাম্প করে বের করার জন্য স্থাপিত হল সব **হাওয়া-কল** (Windmill), আজকাল অবশ্য এই হাওয়া-কলগুলো হাওয়ায় চলে না, বিদ্যুতের সাহায্যে চলছে। উইণ্ড-মিল থেকে যে জলটা বেরিয়ে আসছে সেটাকে নদীতে বা সাগরে নিয়ে ফেলছে অসংখ্য ছোট ছোট খাল; এ সমস্ত খাল থাকায় জলপথে চলাচলের ভারী সুবিধে হয়েছে। এই ভাবে উইণ্ডমিল ও খালের সাহায্যে জল নিকাশ করে যে জমিগুলি উদ্ধার করা হয়েছে তাদের নাম **পোল্ডাস** (Polders)। প্রস্তাবিত চারটি পোল্ডার্সের মধ্যে এখন দুটিতে চাষাবাদ চলছে। গোটা পরিকল্পনাটির কাজ সম্পূর্ণ হলে প্রায় সাড়ে পাচ লক্ষ একর জমি শস্যের মুখ দেখবে।

হল্যাণ্ডে দীর্ঘদিন ধরে একটা প্রবাদ চলে আসছে, "God created the world, but the Dutch made Holland." ওলন্দাজেরা যদি নিজেদের সম্বন্ধে এ গর্ব করে তা হলে কি খুব অন্যায় হবে?

একদা দেশ-দেশান্তরে ওলন্দাজদের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল; আজ তাদের প্রভুত্বের পরিধি অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। আজ তারা চাষবাস ও পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করছে। উদ্ধার করা জমিগুলোতে গম রাই ওট বীট আলু সব্জি ও তুলা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানকার দুধের ব্যাবসা খুব জমজমাট; আকমার (Alkmaar) বাজার পনীর ও মাখন কেনাবেচার জন্য জগদ্বিখ্যাত। সমুদ্রতীরবর্তী অনেকেই মাছ শিকার ও রপ্তানি করে সংসার চালায়।

হল্যাণ্ডের অধিবাসীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আবার অসাধারণ সৌন্দর্যপ্রিয়। স্যাতসেতে দেশে এদের কাঠের জুতো পরতে

হয়। সাইকেলের খুব চলন। বসন্তের ফুল ফোটার দিনে ছেলে-বুড়ো সবাই উৎসবে মেতে ওঠে।

বাঁধ, উইণ্ডমিল, খাল ও পোল্ডার্স নির্মাণ করে, সমুদ্রকে শাসন করে সাইডার সী-র বাসিন্দারা উন্নত সমাজ গড়ে তুলেছে। অক্লান্ত অধ্যবসায়ের দ্বারা প্রমাণ করেছে, মানুষ শুধু প্রকৃতির দাসই নয়—তার প্রভুও হতে পারে।

প্রেইরী অঞ্চলের লোকসমাজ

আমেরিকায় ইউরোপীয়েরা এসে বসবাস শুরু করবার পর প্রথম দু'শ' বছর পর্যন্ত কোথাও নতুন খামার পত্তন করবার একমাত্র উপায় ছিল জঙ্গল কেটে সাফ করা। এসব জায়গায় যখন নতুন নতুন লোক এসে বসতি স্থাপন করতে উৎসাহী হল তখন অদম্য প্রাণশক্তি নিয়ে যাঁরা প্রথম আবাদ সৃষ্টি করেছিলেন সেই অগ্রদূত কৃষিপরিবারগুলি পরবর্তী আগন্তুকদের কাছে তাঁদের খামারগুলো বিক্রি করে দিতেন। তারপর চলে যেতেন আরও পশ্চিমে। এইভাবে কৃষকদের মেহনতের উপর নির্ভর করে ক্রমশ চাষবাসের প্রসার ঘটতে লাগল।

উনিশ শতকের প্রথমভাগে এই কৃষক পরিবারগুলি পূর্বাঞ্চলের বিরাট অরণ্যের প্রান্তসীমায় এসে পৌছলেন। গহন অরণ্যের রুদ্ধ পরিবেশ থেকে প্রেইরীর রৌদ্রকরোজ্জ্বল বিশাল তৃণপ্রান্তরে তাঁরা যেন মুক্তির স্বাদ পেলেন। মধ্যাঞ্চলের সুদূর-প্রসারিত এই তৃণভূমি একেবারে ক্লান্তিকর নয়, ঈষৎ তরঙ্গায়িত, নয়নাভিরাম। এখানে-ওখানে বনভূমির চিহ্নও সুস্পষ্ট। মধ্যাঞ্চলের এই অববাহিকায় আদিম তুষার যুগে (Ice Age) যে **হিমবাহ** বয়ে গিয়েছিল তা কোথাও বাঁধা পায়নি ; তাই এখানকার জমির উর্বরতা অত্যন্ত বেশি। তবু প্রথম যারা সেই প্রান্তরে ফসল ফলাবার চেষ্টা করে, কী কঠোর পরিশ্রমই না তাদের করতে হয়েছিল! অবশেষে ইস্পাতের লাঙ্গল তৈরি করল প্রেইরীনিবাসী এক চাষী ১৮৩৩ সালে।

নানা দিক দিয়ে উপকার করলেও ঐ হিমবাহ একটা **অসুবিধারও** সৃষ্টি করেছিল। প্রেইরী এলাকায় বৃষ্টির জল বের হবার যে স্বাভাবিক প্রণালী-গুলো ছিল, সমস্ত অকেজো হয়ে গেল, ক্ষেতের মধ্যে জল জমে থাকায় ফসল পচে যেত। চাষীরা বুঝল, ফসল ভাল পেতে হলে এইসব জমিতে **জলনিকাশের ব্যবস্থা** করতেই হবে। কৃষকদের সমবেত চেষ্টায় ক্ষেতের

পাশ দিয়ে বহু খাল কাটা হল; তা ছাড়া, কিছুটা জল যাতে জমির তলা দিয়ে ধীরে ধীরে চুঁইয়ে যায়; সেজন্য মাটির নিচে দিয়ে টালি-ঢাকা নালাও কাটা হল হাজার মাইলব্যাপী। এই জলনিষ্ক্রমণ ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিচ্ছিল প্লাবন, ভূমিক্ষয় রাস্তানির্মাণ ইত্যাদি। এবারেও প্রেইরী অঞ্চলের কিষাণ কর্মীদেরই উদ্যোগে ১৯৩৩ সালে এক **ভূমিক্ষয়-নিবারণ পরিকল্পনা** গৃহীত হল সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের জন্য। প্রেইরীর রুগ্ন শস্যক্ষেত্রে নূতন প্রাণের জোয়ার এল।

বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এক একটি খামার। চমৎকার কংক্রীটের রাস্তার পাশে একটা তেতলা **খামারবাড়ি**—ইটের তৈরী! পাশে অনেকগুলো গোলাঘর, ফসল মজুতের জন্য। বাড়িটাকে ঘিরে আছে ঘন ঘন গাছ। বিদ্যুৎকেন্দ্রের দৌলতে বাড়িতে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে, গৃহস্থালির কাজকর্ম সবই বিদ্যুতে চলছে। টেলিফোন আছে, আর আছে দুটো মোটরগাড়ি।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যাঞ্চলের অববাহিকায় এরকম হাজার হাজার খামারবাড়ি আর শত শত ছোট বড় মফঃস্বল শহর চোখে পড়বে। কিন্তু এশিয়ায় বা ইউরোপে যেমনটি দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক সেরকম শ্যামশ্রীমণ্ডিত, ঘনসংবদ্ধ গ্রামের দেখা কোথাও মিলবে না। প্রেইরীর কৃষকেরা নিজের নিজের ক্ষেত-খামার আলাদা আলাদা এবং অনেক দূরে দূরে বাস করে। খামার অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা স্থানীয় গ্রাম্য বিদ্যালয়ে আট বছর পড়াশুনো করে তারপর কোন শহরের হাইস্কুলে ভর্তি হয়। সেখানে সাহিত্য, ইতিহাস ও ভূগোলের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিবিদ্যা, হস্তশিল্প ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পড়ানো হয়। ছাত্ররা অনেকেই বাপের খামারে ফিরে আসে না, শিক্ষকতা রাজনীতি বা ওকালতি যা হোক একটা বৃত্তি বেছে নেয়। কৃষক পরিবারটি গ্রামে গিয়ে গির্জার উপাসনায়, সভাসমিতিতে আর নাচ-গান-সিনেমায় যোগদান করে। উৎপাদিত শস্য খামার থেকে নেওয়া হয় গ্রাম্য ষ্টেশনে, তারপর ট্রেনে করে গঞ্জে বা বাজারে।

প্রেইরী অঞ্চলের কৃষকেরা আজকাল **বাণিজ্যিক চাষপ্রণালী** অনুসরণ করছে। খামারজাত সমস্ত পণ্যদ্রব্যই বিক্রি করে ফেলা এবং পণ্য উৎপাদনের জন্যে জমি, যন্ত্রপাতি ও পরিশ্রম যথাসাধ্য নিয়োগ করা একেই বলে "কমার্শিয়াল ফার্মিং"। এই নিতুন প্রণালীতে কৃষি বিপ্লবের যথার্থ রূপ প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রেইরীতে আজ যব, বার্লি, ভুট্টা এবং আঙুর

আপেল, পীচ, চেরী প্রভৃতি ফলের প্রচুর চাষ হচ্ছে। 'প্রেইরীর তোরণ' উইনিপেগ শহর পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ গম-উৎপাদন কেন্দ্র।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের **কৃষিপদ্ধতি** খুবই আধুনিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সর্বাধুনিক সাজসরঞ্জাম-সহ ট্রাকটর প্রথায় চাষ হয়ে থাকে। উন্নত ধরনের রাসায়নিক ও জৈব সার, ব্যাপক জলসেচ ও সংকর বীজ ব্যবহারের ফলে প্রতিটি অঞ্চলের উৎপাদন হার বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যশস্যের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ। এদেশে প্রচুর পশুখাদ্যশস্য উৎপাদন হওয়ার ফলে ডেয়ারী শিল্পের খুবই সমৃদ্ধি ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিব্যবস্থার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, শুধু দক্ষ লোকেদেরই চাষবাসে নিযুক্ত করা হয়, অতিরিক্ত শ্রমিকদের জন্যে অন্যান্য উৎপাদনশিল্প নির্দিষ্ট।

ফসলের খামার ছাড়াও প্রেইরীতে অনেক **গো-খামার** (Ranch) গড়ে উঠেছে। গো-খামারের এক একজন মালিকের অধীনে শত শত গরু, বলদ ও ষাঁড় থাকে ; পশুদের দেখাশোনার ভার থাকে গোপালকদের (Cowboys) উপর। কাউবয়গণ কাঠের ঘরে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাস করে। মাঝে মাঝে গরু বেচবার জন্যে শহরে যায়।

প্রেইরীর আদিম অধিবাসীদের বলা হয় **রেড ইণ্ডিয়ান**। ইউরোপীয়দের আসার পর থেকে এরা পশু শিকার ছেড়ে পশুপালনের কাজ করছে।

রেড ইণ্ডিয়ান সমাজে নানারকম প্রথা আর আচার, এবং সেগুলো ভারি মজার। শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে যোদ্ধা। তার মৃতদেহ সাজানো হল রঙের বাহারে। গায়ে চাপানো হল ঝলমলে পোশাক। যেন কোন মহারাজ চলেছে নাচের বা ভোজের আসরে। শব নামানো হল কবরে। পাশে রইল আবাল্যসহচর তীর-ধনুক আর খাবার-দাবার। তার প্রিয় ঘোড়াটাকেও মারা হল ; পরলোকে সেই ঘোড়ার পিঠে করে সে যেন যেখানে খুশি যেতে পারে।

পরিবারের কোনো শিশু হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে—যে ঘুম তার কোনোদিনই আর ভাঙবে না—তার মা তার ছোট্ট দোল্‌নাটি পিঠে ঝুলিয়ে নেয়। যদি কখনও তার খোকনসোনা ঘরে ফিরে এসে শুতে চায়। স্বর্গে যেখানে ভগবান থাকেন, সে দেশ তো অনেক দূরে—সেখানে পৌঁছবার আগেই হয়ত খোকা ক্লান্ত হয়ে পড়বে, হয়ত খোকা মায়ের জন্যে কাঁদবে।

অনুশীলনী

১। মালয়ের অরণ্যবাসী সেমাঙ ও সকাই এবং উপকূলবাসী মালয়ীদের জীবনযাত্রার পরিচয় দাও। এদের সঙ্গে আন্দামানীদের জীবনের তুলনা কর।

২। মানুষ শুধু প্রকৃতির দাসই নয়, তার প্রভুও হতে পারে—উত্তর চীন এবং সাইডার সী অঞ্চলের লোকসমাজ কিভাবে একথা প্রমাণ করেছে?

৩। প্রেইরী অঞ্চলে লোকদের ইতিহাস প্রকৃতির সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস।—বুঝিয়ে দাও।

৪। মডেল তৈরী কর॥ (ক) মালয়ীদের কাঠের বাড়ী।

(খ) বাঁধ, উইণ্ডমিল, খাল ও পোল্ডার্স—এগুলোর সাহায্যে সাইডার সী-র জলনিকাশী পরিকল্পনা।

৫। শিক্ষামূলক সফর॥ কলকাতার দক্ষিণ সোনারপুর-আরপাঁচ [জলনিকাশী পরিকল্পনা। এটাকে সাইডার সী-পরিকল্পনার ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যেতে পারে।

৬। ফিল্ম প্রদর্শনীর॥ "The Vanishing Prairie"—ওয়াল্ট ডিস্নী। American Farmer"—মার্কিন সরকার। "This is Malaya" "Tanjong Karang"—ব্রিটিশ ইন্‌ফরমেশন সার্ভিস।

দ্বিতীয় পর্ব

যুগে যুগে ভারত
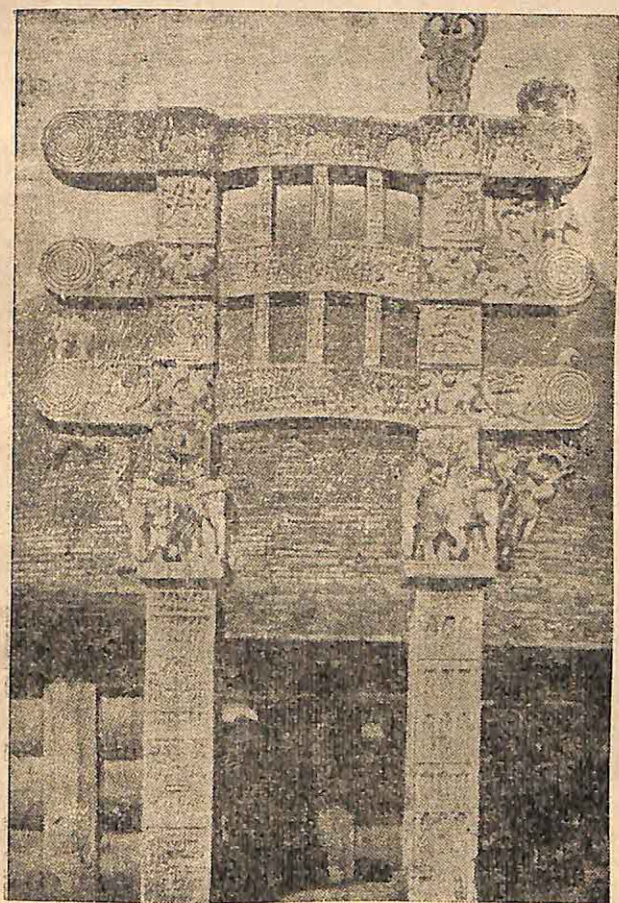
সাঁচী স্তূপের প্রধান তোরণ

লিপি থেকে ইতিহাস। প্রাচীন মিশরীয় রাজার মমি
মমির গায়ে খোদাই মিশরীয় লিপি

প্রথম পরিচ্ছেদ

কত মানুষের ধারা

ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা

পুরনো দিনে গল্প বা কোন ঘটনা বর্ণনা করে উপসংহারে বলা হত—"ইতি হ আস" অর্থাৎ এই রকমই ছিল বা ঘটেছিল। এই 'ইতি হ আস' থেকেই 'ইতিহাস' শব্দ এসে থাকবে এমন কল্পনা করা চলতে পারে। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে থেকেই ইতিহাস শাস্ত্রের পর্যায়ে এসেছে। ইংরেজী history শব্দটি এসেছে গ্রীক *historia* শব্দ থেকে। *Historia* মানে inquiry অর্থাৎ অনুসন্ধান। অর্থাৎ কিনা ইতিহাস হল অতীতের অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসা। Story কথাটি history কথাটিরই সংক্ষিপ্ত রূপ। Story মানে গল্প। ইতিহাসও গল্প—মানুষের গল্প। মানুষ কেমন করে বড় হয়ে চলেছে তার গল্প। মানুষের সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি কিছুই ইতিহাসের বাহিরে নয়। প্রাচীনকালেও ইতিহাসকে ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। কৌটিল্য বলেছেন—পুরাণ, ইতিবৃত্ত আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র এই নিয়ে ইতিহাস। তবে ইতিহাস বলতে আমরা নিছক বৃত্তান্তই বুঝি না, কোনো বিষয় বা ঘটনার ক্রমবিকাশ বা ক্রমপরিণতিও বুঝি। যখন বলি ভারতবর্ষের ইতিহাস তখন বোঝা উচিত ভারতবর্ষের সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস। কিন্তু মজা এই, ইংরেজদের আমলে ছেলেদের ভারতবর্ষের যে ইতিহাস পড়তে দেওয়া হয়েছে তা প্রধানত রাজনৈতিক ইতিহাস, রাজা বাদশাদের প্রভুত্ব আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ ধ্যানধারণার কথা সেখানে নিতান্ত গৌণ। এমন ইতিহাস পড়ে দেশকে জানা যাবে কী করে? তাই এখন লেখবার ধারাটা বদলে যাচ্ছে। স্বাধীন দেশের ছেলেরা এমন ইতিহাসই পড়তে চায় যার থেকে তারা দেশের যথার্থ পরিচয় পাবে। পুরনো দিনকে জেনে নতুন দিনের পথ চিনে নেবে।

সমাজবিদ্যার সঙ্গে ইতিহাসের অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ। সমাজকে কেন্দ্র করেই মানুষ, আর মানুষের বিচিত্র কর্মধারাকে কেন্দ্র করেই ইতিহাস।

ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ
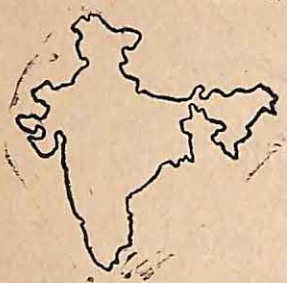
পরিবেশ কথাটির অর্থ ভৌগোলিক অবস্থা—ভূপ্রকৃতি, ভূসংস্থান, জলবায়ু, ইত্যাদি। মানুষের উপর তার পরিবেশের প্রভাব গড়বেই। তার স্বভাব, প্রবণতা, জীবন-যাত্রার পদ্ধতি সবই নির্ভর করে পরিবেশের উপর। পাহাড় অঞ্চলের লোকের সঙ্গে সমভূমি অঞ্চলের লোকের পার্থক্য এই জন্যই। কোন দেশের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই দেখতে হবে সে দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট কী। ভূগোলকে বলা হয়েছে সমস্ত ঐতিহাসিক জ্ঞানের ভিত্তি। অন্যান্য দেশের মতো ভারতের ইতিহাসকে জানতে হলেও তার ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে জানা জরকার।

ভারতে আমরা মোটামুটি **চারিটি প্রাকৃতিক বিভাগ** দেখতে পাই—উত্তরের পার্বত্য প্রদেশ, উত্তরের নদী-বিধৌত সমভূমি, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও দাক্ষিণাত্যের উপকূল ভাগ।

উত্তরের পার্বত্য প্রদেশ। ভারতের উত্তরে চীন ও তিব্বতকে পৃথক করে হিমালয় পর্বত পামীর গ্রন্থি থেকে নির্গত হয়ে ভারতের সমগ্র উত্তরসীমা বেষ্টন করে আছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হিন্দুকুশ ও স্থলেমান পর্বতশ্রেণী ভারতকে আফগানিস্থান রাশিয়া, ইরান ও বেলুচিস্থান থেকে পৃথক করে রেখেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্তে ভারত পাটকই, নাগা ও লুসাই পর্বতশ্রেণী দ্বারা ব্রহ্মদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন। কালিদাস 'কুমার সম্ভব'-এর গোড়ায় হিমালয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেল—"পূর্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য স্থিতা পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।" অর্থাৎ হিমালয় পাহাড় পূর্ব ও পশ্চিম সাগরে অবগাহন করে পৃথিবীর মানদণ্ডরূপে বিরাজিত। বিশাল পৃথিবীকে মাপতে হলে একটা প্রকাণ্ড গজকাঠি চাই, আর প্রায় দু'হাজার মাইল বিস্তৃত হিমালয়ই হল এমন গজকাঠি। বলা বাহুল্য কালিদাসের এই বর্ণনা নিছক কল্পনা নয়, ভৌগোলিক সত্য।

উত্তরের নদীবিধৌত সমভূমি॥ উত্তরের পার্বত্য প্রদেশের দক্ষিণে সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সমভূমির দৈর্ঘ্য ১,৫০০ মাইল এবং বিস্তার ১৫০ থেকে ২০০ মাইল। প্রকৃতপক্ষে সিন্ধু গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র এবং এদের বহু উপনদী ও শাখানদী বাহিত-পলিমাটি দিয়েই

এই সমভূমি তৈরি। উর্বর বলে এই সমভূমিতে লোকবসতি বেশি। উত্তর ভারতে নদীগুলি সারা বছর জলে পূর্ণ থাকে। এ জন্যেই প্রাচীনকাল থেকেই নদীর ধারে বড় বড় নগর গড়ে উঠেছিল; আর্যরা প্রথম বসতি স্থাপন করে বলে এই বিভাগের নাম আর্যাবর্ত।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি॥ উত্তরের সমভূমির দক্ষিণে কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি বিশাল মালভূমি। নর্মদা থেকে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত 'দক্ষিণাপথ' আর কৃষ্ণা নদী থেকে সমস্ত দক্ষিণ অংশের নাম 'সুদূর দক্ষিণ'। দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী ইত্যাদি নদী প্রবাহিত। এই নদীগুলিতে সারা বছর জল থাকে না। এখানে বৃষ্টিপাতও কম। এই জন্য দাক্ষিণাত্যের মালভূমি উত্তর ভারতের সমভূমির মতন উর্বর নয়।

দাক্ষিণাত্যের উপকূলভাগ॥ দাক্ষিণাত্যের মালভূমির পূর্বসীমা পূর্বঘাট পর্বত এবং পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বত। পূর্বঘাট পর্বত থেকে সমুদ্র পর্যন্ত এবং পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে সমুদ্র পর্যন্ত সঙ্কীর্ণ নিম্নভূমি বিস্তৃত। পূর্বদিকের নিম্নভূমি পশ্চিমদিকের নিম্নভূমির চেয়ে প্রশস্ত। পূর্বভাগে করমণ্ডল উপকূল আর পশ্চিমভাগে কোঙ্কণ, কানাড়া ও মালাবার উপকূল। এই দুই উপকূলভাগ পলিমাটিতে গঠিত এবং সমুদ্রের ধারে অবস্থিত বলে খুব উর্বর।

ভারতের ইতিহাসে প্রকৃতির প্রভাব

নীল সিন্ধুজল ধৌত চরণতল
অনিলবিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল
অম্বরচুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্র-তুষারকিরীটিনী।

এই আমাদের দেশ। এই সিন্ধুজল আর হিমাচল নানাভাবে ভারত-ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করেছে। সমুদ্র আর পর্বত ভারতকে অন্যান্য দেশ থেকে পৃথক করে একে দিয়েছে এককত্ব। এক বিশিষ্ট সভ্যতার পীঠভূমি এই ভারত।

কবির কথায় 'আকাশের প্রতিবেশী এই হিমালয় আমাদের সান্ত্রী, আমাদের দেহরক্ষী।' কিন্তু শুধু প্রহরী বললেই হিমালয়ের সঙ্গে আমাদের দেশের সম্পর্কটা ঠিক বোঝা যায় না। হিমালয় যথার্থই আমাদের স্নেহময় পিতার সঙ্গে উপমিত হতে পারে। হিমালয় শাশ্বতকাল ধরে ভারতভূমিকে

লালনপালন করে চলেছে। তার স্নেহ নদীরূপে উৎসারিত। হিমালয়জাত নদীর পলিতেই আর্যাবর্ত সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা।

ভারতের সম্পদ **হিমালয়েরই দান।** কিন্তু এই সম্পদই আবার বিপদের কারণ হয়েছে। বিদেশীরা এই সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে ভারত আক্রমণ করেছে বারবার। তাদের আক্রমণ রোধ করতে আমরা পারিনি। কারণ খাদ্য উৎপাদন সহজসাধ্য বলে পলিমাটির দেশের লোকেরা স্বভাবতই কোমল প্রকৃতির। জীবন-সংগ্রাম কঠোর হলে মানুষ কঠোর হয়ে ওঠে। প্রাচীন-কালে ভারতবাসীদের অন্নচিন্তা ছিল না বলে তারা কিন্তু অন্য চিন্তা করতে পেরেছে। 'ঘৃত-তৈল-তণ্ডুল-লবণ-চিন্তা' ছিল না বলেই তারা কাব্য দর্শন, চিকিৎসা-বিদ্যা, গণিত, জ্যোতিষ ইত্যাদি নানা বিষয়ে মাথা খাটাবার সময় পেয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশই যখন অর্ধসভ্য তখন ভারত চিন্তার ক্ষেত্রে অনেকদূর অগ্রসর হতে পেরেছে।

আর্যাবর্তের বিস্তৃত সমতল ভূমিতে জলপথে ও স্থলপথে যাতায়াত এবং সৈন্য চলাচলের সুবিধে বলে প্রাচীনকাল থেকেই রাজারা সেখানে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে। প্রচুর সম্পদের অধিকারী বলে যুদ্ধব্যয় বহন করা এঁদের পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। তাই গৌরব বাড়াবার জন্যে তাঁরা রাজ্য বাড়াবার চেষ্টা করেছেন বারংবার। প্রায় সারা ভারত জুড়ে মাঝে মাঝে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে, কিন্তু স্থায়ী হয়নি। বিশালতাই এই সব সাম্রাজ্যের পতনের কারণ।

ভারতের ইতিহাসে **বিন্ধ্যপর্বতের** যথেষ্ট **গুরুত্ব** আছে। এই পর্বত ভারতকে দু'ভাগে ভাগ করে রেখেছে। জাতীয় ঐক্য এতে অব্যাহত হয়েছে। উত্তর ভারতের রাজাদের পক্ষে দক্ষিণ ভারত জয় করাই কঠিন ছিল। জয় করে তা অধিকারে রাখা তো আরও কঠিন হত। এই বিন্ধ্য পর্বতের জন্যই আর্যরা দক্ষিণ ভারতে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। দ্রাবিড় সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য তাই রক্ষা পেয়েছে। পূর্বাপর সম্বন্ধ যদি ঐতিহাসিক গবেষণার আদর্শ বলে ধরা হয় তাহলে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি প্রথমে দাক্ষিণাত্য এবং সুদূর দক্ষিণেই পড়া উচিত। এ বিষয়ে অধ্যাপক সুন্দরম পিল্লাই অনেক দিন আগে যা বলেছিলেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ দিকের ভারত—উপদ্বীপ ভারত—এখনও আসল ভারত। এখানকার অধিবাসী তাদের প্রাক্-আর্য বৈশিষ্ট্য, তাদের প্রাক্-আর্য ভাষা, তাদের প্রাক্-আর্য সমাজ-সংস্থা এখনও বজায় রেখেছে।

এখানেও আর্যীকরণের ধারা এতদূর এসে পৌঁচেছে যে টানা-পোড়েনের পার্থক্য ধরা ঐতিহাসিকদের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু কোথাও যদি জট ছাড়ান সম্ভব হয়েই ওঠে তো দক্ষিণ ভারতেই তা হবে। আর যত দক্ষিণে যাব সে সম্ভাবনা ততই বাড়বে। ভারতের বিজ্ঞাননিষ্ঠ ঐতিহাসিকের গবেষণা শুরু হওয়া উচিত কৃষ্ণা কাবেরীর অববাহিকায়, গাঙ্গেয় উপত্যকায় নয়—যা কিনা চিরাচরিত রেওয়াজ।”

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভিন্সেট স্মিথ তাঁর ভারত-ইতিহাসের ভূমিকায় অধ্যাপক পিল্লাইয়ের এই উক্তিটি শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করে বলেছিলেন, যতদিন ঐতিহাসিক গবেষণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটে ততদিন পর্যন্ত চিরাচরিত প্রথা অবলম্বন না করে উপায় নেই।

ভারতের ইতিহাসে **সমুদ্রের ভূমিকা**ও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারত সমুদ্রপথে যাতায়াত করছে। সিংহল মালয় শ্যাম কম্বোজ ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারত উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। দক্ষিণ ভারতের তিন দিকেই সমুদ্র—দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর। এজন্যেই সমুদ্রযাত্রায় উত্তর ভারতের চেয়ে দক্ষিণ ভারতই অগ্রণী। উত্তর ভারত সমুদ্র থেকে দূরবর্তী, এখানকার লোকের সমুদ্রপ্রবণতা ততটা নেই। মৌর্য সাম্রাজ্য, গুপ্ত সাম্রাজ্য, বা মোগল সাম্রাজ্য শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তোলেনি। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের চোলরাজ্যের শক্তিশালী নৌবহর ছিল। চোল নৌবাহিনী আন্দামান নিকোবর সুমাত্রা ও ব্রহ্মদেশ জয় করেছিল। শিবাজীর সময়ে মারাঠাদের নৌবলও কম ছিল না। তখন আরব সাগরে আধিপত্য করেছে মারাঠারা। মোগলদের নৌবলের অভাবের দরুন আরব সাগরে আধিপত্য করেছে আরব বণিকেরা

প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্যের জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যেও নানান্ পার্থক্য দেখা যায়। পার্বত্য ও মরু অঞ্চলের লোকদের জীবনযাত্রা গাঙ্গেয় উপত্যকার লোকেদের মতন অত সহজ সরল নয়। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয় তাদের! পর্বতপ্রধান মহারাষ্ট্র দেশ এবং মরুপ্রধান রাজপুতানার লোকেরা স্বভাবতই কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী ও সাহসী, তাই এদের শৌর্যবীর্যের কাহিনী ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে।

বিদেশী আক্রমণকারী ভারতে এসেছে উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথ দিয়ে।

এদের বাধা দেবার জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসীদের যুদ্ধ করতে হয়েছে। তাই পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীরা কঠোর প্রকৃতির এবং যুদ্ধে পারদর্শী।

জাতি

পুরনো পাথরের যুগ থেকে নতুন পাথরের যুগ এবং তারপর ক্রমশ তামা আর পাথরের যুগ এবং লৌহযুগ—মানুষের সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে এই যে যুগবিভাগ এর সবগুলির নিদর্শনই ভারতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ভারতে গবেষণার সূত্রপাত করেন ভারত সরকারের জিওলজিক্যাল সার্ভেয়র ব্রুসফুট।

ঐতিহাসিকেরা অনেকেই অনুমান করছেন দ্রাবিড় নামে এক অর্ধসভ্য জাতি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে ভারতের আদিম অধিবাসী এক অসভ্য জাতিকে হটিয়ে দেয়। তারা গিয়ে আশ্রয় নেয় বনে-জঙ্গলে। এরপর উত্তর-পুর্বের পাহাড়ে-পথ বেয়ে মোঙ্গলীয় জাতীর অন্তর্গত একদল মানুষ ভারতে আসে। এখানকার নেপালী, ভুটিয়া, নাগা ইত্যাদি জাতি এদের বংশধর। এরও অনেকদিন পরে আর্যরা উত্তর পশ্চিমের গিরিপথ দিয়ে ভারতে আসে।

আর্যরাই শেষ নয়। তাদের পরও পারসিক, গ্রীক, শক কুষান, হূণ, গুর্জর, মুসলমান, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ কত জাতিই না ভারতে এসেছে। ভারতের সভ্যতার ইতিহাস এদের সকলকে নিয়েই।

ধর্ম

নানা জাতির নানা ধর্ম। কেবলমাত্র বৈদিক ধর্মকেই ভারতের হিন্দু ধর্ম বা ভারতীয় ধর্ম বলে চিহ্নিত করা যায় না। বৈদিক ধর্মের যেটা ক্রিয়াকর্মের দিক তাই নিয়ে সাধারণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, যেটা জ্ঞানের দিক তাই থেকেই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম যেটা ভক্তির দিক তাই থেকেই বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্ম। বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্ম ভক্তি থেকে ক্রমশ ভালবাসার দিকে এগিয়ে গেল। অর্থাৎ ভগবানকে ভালবাসার মধ্যে দিয়ে একেবারে কাছের মানুষ, আপনার জন করে নেওয়ার সাধনা। এর থেকে আরও কত লৌকিক ধর্মের উদ্ভব হল। তার ইতিহাস যেমন বিচিত্র তেমনি জটিল।

বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্তির পথে। জৈন ধর্মও টিম টিম করছে রাজপুতনা ও

গুজরাটে। শিখ ধর্ম শুধু পাঞ্জাবেই। ভারতের চার কোটি মুসলমানের ধর্ম ইসলাম। বেশ কিছু খ্রীষ্টানও ভারতে আছে। এই ধর্মকে কেন্দ্র করে নানা সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায় উঠেছে গড়ে।

ভাষা

ভারতে যেসব ভাষা প্রচলিত তারা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। **বৈদিক ভাষাই** প্রাচীন আর্য ভাষার সাহিত্যিক রূপ বা সাধুভাষা। ঋগ্বেদের প্রাচীনতম কবিতাগুলির রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের কিছু আগে বা পরে। এই ভাষাই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবর্গের সবচেয়ে পুরনো সাহিত্যিক নিদর্শন।

বৈদিক ভাষা ক্রমশ সরল হয়ে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। উপনিষদের ভাষাকে সংস্কৃতের জননীস্থানীয় বলা যেতে পারে। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ভারতীয় আর্য ভাষায় যে পরিবর্তন দেখা দিল তাতে তার রূপ কিছুটা বদলে গেল, আর্য ভাষা সংস্কৃত রূপ ছেড়ে **প্রাকৃতে** পরিণত হল। 'প্রকৃতি' কথাটি থেকে 'প্রাকৃত' কথাটি এসেছে 'প্রাকৃত' মানে, প্রকৃতি অর্থাৎ জনগণ যে ভাষায় কথা বলে বা ভাষা বোঝে।

প্রাকৃতের পরের স্তর হল **অপভ্রংশ**। এই অপভ্রংশই স্থান ও কাল ভেদে রূপান্তরিত হয়ে বাংলা হিন্দী পাঞ্জাবী সিন্ধী মারাঠী গুজরাটী ইত্যাদি আধুনিক ভাষায় পরিণত হয়েছে। উড়িয়া আর আসামীর সঙ্গে বাংলার মিল অনেকখানি। আদিতে এই তিনটি ভাষাই এক ছিল। ক্রমশ উড়িয়া আর আসামী মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কাশ্মীরী ভাষা ইরানী-প্রভাবিত। উর্দু স্বতন্ত্র ভাষা নয়, ফার্সী ও আরবী শব্দবহুল হিন্দী ভাষাই আসলে উর্দু। রাজস্থানের ভাষার মধ্যে পশ্চিমা রাজস্থানী বা মাড়োয়ারী ভাষাই প্রধান। এই ভাষার সঙ্গে গুজরাটীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। নেপাল রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতের বাহিরে হলেও নেপালী ভাষা ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীরই অন্তর্গত। হিন্দীর সঙ্গে এর সম্পর্ক নিকটতর।

দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যের তামিল-তেলেগু, কানাড়ী, মালয়ালম তুলুই প্রধান।

এ ছাড়া ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে আরও নানা ভাষা ছড়িয়ে আছে, এই সব ভাষার কেনো লিপি নেই। তবে লিপিবদ্ধ সাহিত্য না থাকলেও

ছড়া বা লোকগীতিগুলো থেকে এদের সমাজ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়।

ভারতে প্রায় ২২৫টি ভাষা ও উপভাষার *প্রচলন আছে। ইংরেজ আমলে সর্বভারতীয় শাসন সংক্রান্ত কাজকর্মে ইংরেজীই ছিল ভারতে সর্বেসর্বা। এখন হিন্দী ইংরেজীর স্থান নেবে, অর্থাৎ হিন্দীই আমাদের **রাষ্ট্রভাষা** হবে বলে ঠিক হয়েছে।

জাতিগত ধর্মগত ও ভাষাগত বৈচিত্র্য ভারতের ইতিহাসকে বিচিত্র করে তুলেছে। বৈচিত্র্য তো শুধু ধর্মসাধনায় বা কথাবার্তায় নয়, বৈচিত্র্য সাজ-পোশাকে, বৈচিত্র্য আহার-বিহারে, বৈচিত্র্য আচারে ব্যবহারে। কেউ রাঁধে ভাত, কেউ সেঁকে রুটি, কেউ পরে ধুতি, কেউ পায়জামা, কেউ বা টুপি। কেউ মাটীর মূর্তি গড়ে তারই পূজায় তন্ময়। কেউ বা মূর্তিহীন আরাধ্যের সেবায় রত। কত মত, কত পথ।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য

নানান্ বৈচিত্র্য বা বিভিন্নতার মধ্যেও ভারতের সভ্যতার একটী মূলগত ঐক্য আছে।

ভারতের ভূ-প্রকৃতি সর্বত্র একরকম নয়। কোথাও সমভূমি, কোথাও মালভূমি, কোথাও মরুভূমি, কোথাও বা দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত। কিন্তু তা হলেও ভারত উত্তরে ও দক্ষিণে পাহাড় আর সাগর দিয়ে অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন বলে তার স্বাতন্ত্র্য বা **ভৌগোলিক এককত্ব** বজায় রাখতে পেরেছে। সমগ্র দেশটি খ্যাত 'ভারত' নামে; আর অধিবাসীরা 'ভারতীয়' নামে। বিষ্ণুপুরাণে আছে :

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চ দক্ষিণম্
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ।

—অর্থাৎ সমুদ্রের (ভারত মহাসাগরের) উত্তরে এবং তুষারাচ্ছন্ন পর্বতের (হিমালয়ের) দক্ষিণে যে দেশটি তার নাম ভারত, সেখানে ভারতীয়েরা অর্থাৎ ভারতের সন্তানেরা বাস করে। এই শ্লোকটি নিঃসন্দেহে ভারতীয় ঐক্যের দ্যোতক।

প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে ভারতে **রাজনৈতিক ঐক্য** সর্বদা রক্ষিত

*উপভাষা—"কোনো ভাষার অন্তর্গত ছোট ছোট দল বা অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত রূপান্তরকে উপভাষা বলা হয়"—ভাষার ইতিবৃত্ত : সুকুমার সেন

হয়নি বটে, তবে সারা ভারত-জোড়া সাম্রাজ্য শাসনের চেষ্টা মাঝে মাঝেই হয়েছে। বৈদিক যুগে অধিরাজ, সম্রাট, একরাট ইত্যাদি শব্দ এই সাক্ষ্যই বহন করে। মহাভারতের যুগে যজ্ঞ-সমাগত রাজারা যুধিষ্ঠিরকে সার্বভৌম বলে মেনে নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক যুগে চন্দ্রগুপ্তই প্রথম সার্বভৌম সম্রাট। অশোকের সময়ের পরে তুঘলক ও মোগলদের আমলে ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা প্রায় সফল হয়েছিল। মারাঠাপতি শিবাজীও সর্ব-ভারতীয় রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন—

"এক ধর্মরাজ্য-পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি।"

বেদ পুরাণ রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ এবং এইসব গ্রন্থের **ভাষা** সকলের মধ্যে এক যোগসূত্র হয়ে আছে। উত্তর ভারতের প্রায় সব ভাষারই জননী সংস্কৃত। দক্ষিণ ভারতের ভাষা স্বতন্ত্র ভাষাগোষ্ঠীর হলেও সে ভাষায় ক্রমশই সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ বেড়েছে। দক্ষিণ ভারতের অনেক শব্দকেও উত্তর ভারতের ভাষা আত্মীয় করে নিয়েছে।

কিন্তু এহো বাহ্য। ভারতের আসল ঐক্য হল **সংস্কৃত সাধনার ঐক্য**। "ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় আর্যদের আসবার পূর্বে আর্যপূর্ব দ্রাবিড় সভ্যতাকে আর্যরা নষ্ট করেননি। দ্রাবিড়রা ও তৎপূর্ব সব সভ্যতার উচ্ছেদ সাধন করেননি; এইভাবে বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতির পলিমাটি দিয়ে স্তরে স্তরে ধীরে ধীরে ভারতের সংস্কৃতি-লোকটি গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি সবাই বসবাস করেছে। কেউ কাউকে নির্মূল করেনি।"

পরকে আপন করে নেওয়ায় প্রতিভার প্রয়োজন। ভারতের সে প্রতিভা আছে। মুসলমান সংস্কৃতিকেও ভারত অনায়াসে আপনার করে নিল। কে কার দ্বারা কতটা প্রভাবান্বিত হল কিছু বোঝবার উপায় নেই। মুসলমান রাজাদের গোঁড়ামি অনেক সময় তাদের অত্যাচারের পথে ঠেলে দিয়েছে। পণ্ডিতে মোল্লায় অনেক অনেক সময়েই মেলেনি কিন্তু সহজ-সাধনার সহজ লোকেরা—কি হিন্দু কি মুসলমান—অনায়াসে মিলেছে।

"ঈটা ঈটা আগ হৈ কাদো কাদো লাগ" অর্থাৎ দু'দিকের দুটো ইটের ঠোকাঠুকিতে শুধু আগুনই জ্বলে, কিন্তু কাদায় কাদায় সহজেই জোড়া লেগে যায়। পণ্ডিতেরা হলেন ইট আর সহজ মানুষ হল কাদা।

মধ্যযুগের সন্তসাধকদের বাণী হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার ইতিহাসে অবশ্য স্মরণীয়। কবীর বলতেন: "বেহ্না দীন্হী খেতকো বেহ্নাহী খেত

* ভারতের সংস্কৃতি ॥ ক্ষিতিমোহন সেন

খায়”—বাহিরের ছাগল গরুর ভয়ে খেতে লাগালাম বেড়া, শেষে বেড়াগুলোই খেত খেয়ে উজাড় করে দিল। অর্থাৎ সাধনাকে বাঁচাবার জন্যে সম্প্রদায় গড়লাম, এখন দেখি সেই সাম্প্রদায়িকতাই আমার সমস্ত সাধনা নষ্ট করে দিল। দাদু বলেন—“দুন্যু” হাথী হৈব রহে, মিলি রস পিয়া ন জাই।” হিন্দু-মুসলমান দুই হাত। দুইহাত এক না হলে অঞ্জলি রচিত হবে কী করে? অমৃত-রস পান করব কী করে? এমন বাণী সহস্র সাধকদের বচন থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

মধ্যযুগের চিত্রে, সঙ্গীতে, ভাস্কর্যে, সাহিত্যে—সর্বত্রই হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি-সমন্বয় ঘটেছে। মুসলমান যুগে হিন্দুদের অনেক ধর্মগ্রন্থের ফার্সী ও আরবী অনুবাদ হয়েছে।

রাজনৈতিক হানাহানিটাই একমাত্র সত্য নয়—সাধারণ মানুষের মধ্যে মিলনের ফল্গুধারা প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে প্রবাহিত।

ব্রিটিশের Divide and Rule নীতি ভারতীয় এই অন্তর্নিহিত ঐক্যকে ভাঙবার চেষ্টা করেছিল। ইংরেজকে আজ ভারত ছাড়তে হয়েছে, কিন্তু মানচিত্রে বিভাগের চিহ্ন এঁকে। স্বাধীন ভারতেও যেন আমরা ভারতীয় সাধনার ঐক্যকে না ভুলি। অনেক দুঃখ, অনেক ত্যাগের মধ্যে দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করেই আমাদের একত্ব-সাধনা সার্থক হবে, সম্ভব হবে দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার কাজ।

ইতিহাসের উপাদান

ইতিহাস পড়ছি আজ আমরা। কত যুগ যুগ আগে ইতিহাসের পথ চলা শুরু হয়েছে। কত উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে ইতিহাস চলেছে এগিয়ে। ইতিহাসেরও এক ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসের উপজীব্য কতগুলো এমন উপাদান যা থেকে ইতিহাসের দেহমন গড়ে উঠেছে এক ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে।

ইতিহাসের যুগ ছেড়ে একবার হাজার হাজার বছর পিছিয়ে গিয়ে সেই প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জন্তু ডাইনোসোরের চেহারাটা ভেবে নিতে হবে। পুরনো পাথরের গায়ে অনেকদিন আগেকার জীবজন্তুর ছবিকে বলে ফসিল। একে জীবজন্তুর ফোটোগ্রাফও বলতে পারি। এই ফোটো-গ্রাফের সাহায্যে অনেক প্রাচীন জন্তুর বিচিত্র সব চেহারার কথা আজ আমরা

জানতে পেরেছি। যাদুঘরে এমন অনেক জন্তুর ফসিল রয়েছে। ডাইনো-সোরের পূর্ণ চেহারার ফসিল কিন্তু প্রথম পাওয়া যায়নি। তার চেহারার অনেকখানি কল্পনা দিয়ে বিজ্ঞানীরা ভরাট করে নিয়েছিলেন। কী রকম? হয়ত কোনো পাথরের গায়ে এই জন্তুর মাথা আর পিছনের খানিকটা অংশ পাওয়া গেল। মাঝখানটা ফাঁকা। বিজ্ঞানীরা তখন অনুমান করলেন, যে জন্তুর মাথা বা পিছনের অংশের আকার এত বিরাট সেই জন্তুর সম্পূর্ণ দেহটি নিশ্চয়ই অতিকায় হবে। এইভাবে তাঁরা দেহের দুটো অংশের অনুপাত
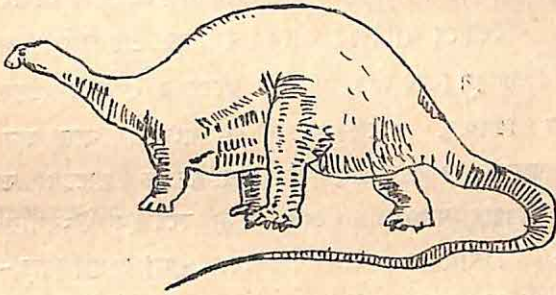
বিচার করে ডাইনোসোরের চেহারাটির আকার ও তার গঠন আঁচ করে নিলেন। এর পরে আরও কয়েকশ' বছর পরে ঘটল এক মজার ঘটনা। হঠাৎ একদিন কোনো এক পাথরের গায়ে পাওয়া গেল ডাইনোসোরের সম্পূর্ণ ছবিটি। আর সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, ডাইনোসোরের চেহারা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা অনুমান ও কল্পনার যে ছবি এঁকেছিলেন তার সঙ্গে এই পাথরে-পাওয়া ডাইনোসোরের পূর্ণাঙ্গ ছবির অদ্ভুত মিল দেখা গেল। বিজ্ঞানীদের কল্পনা তথ্যের আবিষ্কার সত্যে পরিণত হল। ইতিহাসের ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়ার ব্যাপারেও কিন্তু এই জাতের ঘটনাই ঘটে।

ধরা যাক্, দুটো যুগ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা নানান্ তথ্যের সাহায্যে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে এলেন। কিন্তু এই দুই যুগের মাঝের যুগটা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে। ও-যুগের কোন তথ্যই পাচ্ছেন না বিজ্ঞানীরা। বাধ্য হয়ে তাঁরা তখন কল্পনা আর অনুমানের সাহায্যে ও-যুগ সম্বন্ধে অনেক ছবি আঁকলেন। এর কিছুকাল পরে মাটির নিচে থেকে আবিষ্কার হল পুরনো সভ্যতার। এই সভ্যতা, ধরা যাক, সেই হারানো যুগটার। দেখা গেল, হারানো যুগ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা যে কল্পনার ছবি এঁকেছিলেন তার সঙ্গে এ যুগের বিস্ময়কর সাদৃশ্য। কাজেই দেখা যায় কল্পনা বা অনুমান আর তথ্যের মিলনেই

ইতিহাসের সত্যের জন্ম। জেগে ওঠে ইতিহাসের এক মানুষ। সেই ইতিহাসের মানুষটাই অতীতের সাক্ষী হয়ে কথা বলে অনর্গল।

যে সব উপাদানে ইতিহাসের দেহ-মন তৈরী হয়েছে সেগুলোর কথাই এবার বলা যাক।

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার

এ সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে কথাটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রত্নতাত্ত্বিক কারা? যাঁরা পুরনো দিনের জিনিসপত্র, পুরনো লিপি, পুরনো মুদ্রা বা প্রাচীন যুগের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরাই হলেন প্রত্নতাত্ত্বিক। এঁদের যে আবিষ্কার তাকেই বলা হয় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার। ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন সেইসব প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে জেমস প্রিন্সেস, আলেকজাণ্ডার কানিংহাম, সার জন মার্শাল, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের নাম করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ব্যাপারে এঁদের জীবন হয়েছিল উৎসর্গীকৃত। জন মার্শাল ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের **মোএঞ্জোদড়ো-হরপ্পার** আবিষ্কারের কথা জানবার সময় সেই সঙ্গে নিশ্চয়ই নাম শুনেছি সেই দু'ভাই জন ব্রাণ্টন আর উইলিয়াম ব্রাণ্টনের, যারা করাচী থেকে লাহোর পর্যন্ত ট্রেন লাইন পাততে গিয়ে অত বড় ছুটো প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার মাটি করে দিয়েছিল আর কি!

মনে হতে পারে, করুকগে মাটি, কী হয়েছে তাতে? সেই ভাঙা হাড়-গোড় বার-করা ইটের দেওয়াল, কতগুলো মরচে-ধরা তামার মুদ্রা আর ভাঙা কতগুলো হাঁড়ি-কুড়ি—কী হবে তা দিয়ে। কিন্তু ভারতবর্ষের আদিযুগের ইতিহাস আবিষ্কারের প্রথম এবং প্রধান সূত্রই তো হল ঐ আবিষ্কারটা ও-আবিষ্কার না হলে তো ভারতবর্ষের এক সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধেই অজ্ঞ থেকে যেতাম আমরা। মোএঞ্জোদড়ো-হরপ্পার যে নোনাধরা ভাঙা দালানগুলো দাঁত বার করে হি হি করে হাসছিল তারাই বলে দিল সে যুগে মানুষ কত সভ্য ছিল, মানুষের বুদ্ধি কত উন্নত ছিল, তারা কত সুন্দর বাড়ি তৈরি করতে পারত। শিল-মোহরগুলোর ওপরে আঁকা ছবি আর নক্সাগুলো বলে দিল কত সূক্ষ্ম ছিল তাদের শিল্পবোধ! সে যুগের রাস্তা-ঘাট আর নর্দমাব্যবস্থা তো এঁযুগের কর্পোরেশনকেও হারিয়ে দেয়!

গত শতাব্দীর গোড়ার দিকেই মহীশূর, দক্ষিণ ভারত, উত্তরবঙ্গ, বিহার

আর আসামেও খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়। ঐ যুগে অজন্তা, এলিফ্যাণ্টা, কান্‌হেরি গুহা আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব খননের ব্যাপারে প্রধানত বুকানন হ্যামিলটন উদ্যোগী ও পরিচালক ছিলেন।

অজন্তা গুহার আবিষ্কার তো একটা আকস্মিক ঘটনা। সেনা-বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী শিকার করতে গেছেন পাহাড়ে। হঠাৎ দূরে জঙ্গলের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন কত গুহা। সেখানে কী যেন ছবির মতন ঝলমল করছে। এগিয়ে গেলেন তিনি। এর পরের ইতিহাস তো সোজা। পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য শিল্পকর্মের খবর মিল্‌ল আর সেই সঙ্গে পাওয়া গেল এক বিস্মৃত যুগের সংস্কৃতি জীবনযাত্রার সংবাদ। অজন্তা গুহায় বিচিত্র ছবিগুলোর মধ্যে দিয়ে বৌদ্ধযুগের এক উজ্জ্বল দিক বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

ভূপালের কাছে **সাঁচীস্তূপ** আবিষ্কৃত হয়েছে। এই স্তূপের স্থাপত্য এবং লিপি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজা অশোক এই স্তূপ স্থাপন করেন। স্তূপের চারপাশে জাতকের গল্প ও বুদ্ধের জীবনের নানান্ ঘটনা খোদিত আছে। এখানকার লেখা যে লিপিতে খোদিত তা অশোকলিপি। সুবিখ্যাত প্রিন্সেপ সাহেব এই লিপির পাঠোদ্ধার করেন। সেটা হল ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে। লিপি পাঠোদ্ধার ব্যাপারে প্রিন্সেপ সাহেব এক মজার কথা বলেছিলেন। এ আবিষ্কার নিছক আকস্মিক ঘটনা। সাঁচীস্তূপের লিপি নিয়ে গবেষণা করেছেন প্রিন্সেপ সাহেব। লিপিগুলো পর পর সাজিয়ে ক্যামেরায় ছবি তুলছেন! হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন যে কতকগুলো ক্ষেত্রে শেষ অক্ষর দুটো সবখানেই একই, ঠিক এর আগের অক্ষরটি তাঁর আগেই জানা ছিল। সেটি হল "স্য"। ব্যস ইউরেকা! তিনি বুঝলেন শেষের তিনটি অক্ষর হল—স্য দানং। মানে, তিনি 'দ' আর 'ন' অক্ষর দুটো একরকম আন্দাজেই ঠিক করলেন। এরপর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অবশিষ্ট অক্ষরগুলো আবিষ্কার করে ফেললেন। পণ্ডিতদের মতে এই লিপিই হল **ব্রাহ্মীলিপি**।

ভারতবর্ষের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ইতিহাস মাত্র দেড়শ' বছরের। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ যে সব মুদ্রা শিলালিপি বা পুরনো ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছে তার মূল্য অপরিসীম।

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের গুরুত্ব সত্যিই অসীম। ইস্কুলের ফুটবল খেলার মাঠের নিচেই কোনো এক যুগের সভ্যতা ঘুমিয়ে আছে কিনা কে

জানে। এই তো কিছুকাল আগে, কলকাতা থেকে বেশি দূর নয়, মাত্র ত্রিশ মাইলের মধ্যেই বেড়াচাঁপায় মাটির নিচে থেকে পুরনো সভ্যতার খোঁজ পাওয়া গেল। আজ থেকে হাজার বছরেরও অনেক আগেরকার চন্দ্রকেতু রাজার রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ। সে যুগে এ জায়গাটার নাম ছিল চন্দ্রকেতুগড়। আজকে আমরা অবশ্য ও জায়গাটার নাম দিয়েছি বেড়াচাঁপা। আরও কিছুকাল আগে উড়িষ্যা প্রদেশের রত্নগিরি পাহাড় খোঁড়া হয়েছে। কঠিন পাথরের নিচে থেকে উড়িষ্যার কোন্ এক প্রাচীন যুগের সভ্যতা জেগে উঠল।

পোড়ামাটির (স্ত্রীমূর্তি তমলুকে প্রাপ্ত)

ইতিহাস। কত ইতিহাস। মাটির নিচে এখনো ইতিহাসের কত উপকরণ যে আত্মগোপন করে আছে তার-ইয়ত্তা নেই। আমরা ইতিহাস মাড়িয়েই চলেছি; ইতিহাসেই আমাদের বাস, ইতিহাসে বসে আমাদের ইতিহাস চর্চা। মাটির নিচের ভাঙা পেয়ালার টুকরো, হাঁড়ির টুকরো একখানা নোনাধরা ইট কিংবা মাটির ভাঙা মূর্তির একখানা হাত যুগ-যুগান্তের প্রতিনিধি। তুচ্ছ হলেও এরা ইতিহাসের খবরদারি করে।

তুলনামূলক গবেষণায় কত ইতিহাসের উপকরণ জুটে যায়। যেমন মিশরে কিংবা মেসোপটেমিয়াতেও মাটি খোঁড়া হল, আবিষ্কৃত হল অনেক পুরনো জিনিস। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা হয়ত দেখলেন সেখানে পাওয়া অনেক জিনিষের গড়নের সঙ্গে ভারতে পাওয়া জিনিসের আশ্চর্য মিল। ব্যস, তাঁরা বলে দিলেন আদিযুগের এসব দেশের মধ্যে জিনিস-পত্রের লেনদেন চলত। তা হলে জানা গেল, আদিযুগে ভারতবর্ষ এসব দেশের সঙ্গে ব্যাবসা বাণিজ্য করত। অবশ্য এ ক্ষেত্রে হলপ করে কিছু বলা যায় না, কেননা এ তো পাঁচ-দশ বছরের ব্যাপার নয়, পাঁচ-সাত

হাজার বছরের ব্যাপার। অনুমানে ভুল-ক্রটি তো থাকতেই পারে।

প্রত্নতাত্ত্বিক জগতের আর একটি সাফল্য হল **নালন্দার** আবিষ্কার। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে থেকেই এর খনন কাজ শুরু হয়েছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মহাযুদ্ধ শুরু হওয়াতে কাজ বন্ধ ছিল। তারপরে অবশ্য লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির টাকায় ডাক্তার স্পুনারের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে আবার খোঁড়া শুরু হল। দীর্ঘ কুড়ি বছর একটানা কাজ চলার পর নালন্দার নিদ্রিত সভ্যতা চোখ মেল্‌ল। স্তূপ, চৈত্য, বিহার আর ব্রোঞ্জ ও পাথরের নানান্ স্থাপত্যশিল্প আর লিপির সন্ধান পাওয়া গেল। এখান-কার লিপি, আর মন্দির ও শিল্পের গঠন বিচার করে জানা গিয়েছে কোন এক যুগে উত্তর ভারত ও পূর্ব ভারত বৌদ্ধ ধর্মের এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল।

মুদ্রা

ভিন্সেট স্মিথের মতে শিলালিপির তুলনায় মুদ্রাই ইতিহাস রচনার ব্যাপারে বেশি সাহায্য করে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক রাজার একদিন যে দ্বিভাষিক (Bi-lingual) মুদ্রা চালু করেছিলেন সেই মুদ্রার লিপিই অশোক-অনুশাসনের লিপির পাঠোদ্ধারে সাহায্য করেছিল, আর মুদ্রাগুলো বিচার করেই সেকালের ইতিহাসের দিন-ক্ষণ ঠিক করা সহজ হয়েছিল।

নানা জাতের ভারতীয় মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাদের সংখ্যাও প্রচুর। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এসব মুদ্রা দিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। অধ্যাপক র‍্যাপ্‌সনও তাঁর ছাত্রদের নিয়ে অনেকদিন ধরে মুদ্রা সংক্রান্ত গবেষণা করেছেন এবং ঐতিহাসিক রহস্য উদ্ঘাটনে সমর্থ হয়েছেন।

ভারতবর্ষে সম্ভবত গ্রীকেরাই প্রথম রাজার মাথা-ওয়ালা মুদ্রা চালু করে। এর আগে যে সব মুদ্রা চালু ছিল তা প্রধানত কতকগুলো বণিক-সংস্থার দ্বারা পরিচালিত। এসব মুদ্রায় কিন্তু কতগুলো কাটা দাগ ছাড়া আর কিছু লেখা-টেখা নেই। এ দাগগুলো কোনো সাংস্কৃতিক চিহ্নও হতে পারে। সে যাই হোক, এসব মুদ্রা ভারতের ইতিহাস রচনার ব্যাপারে কোনো সাহায্য করে না। প্রাচীন ভারতের ছবি-ওয়ালা

মুদ্রাগুলোর মধ্যে আলেকজান্দারের-ছবি আঁকা মুদ্রাগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা এরাই বলে দেয় কোন এক সুদূর যুগে গ্রীকেরা ভারতের বুকে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। আর ঐ পুরনো মুদ্রাগুলোই

গ্রীকবীর আলেকজান্দারের মুদ্রা ॥ হাইডাসপেসের যুদ্ধজয়ের স্মারক

আজ ইতিহাসের স্বাক্ষর হিসেবে জাদুঘরের কাচের বাক্সে বন্দী হয়ে আছে

হাউডাসপেসের যুদ্ধে আলেকজান্দার হলেন বিজয়ী। এই বিজয়ের সংবাদকে অমর করে রাখলেন তিনি তাঁরই প্রচলিত এক মুদ্রায়। এই মুদ্রার এক পিঠে দেখানো হয়েছে ঃ এক অশ্বারোহী বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করেছে অন্য এক আরোহীসুদ্ধ হাতীকে। অন্য পিঠে—আলেকজান্দারের শৌর্য-বীর্যের প্রতীক হিসেবে আঁকা হয়েছে এক বীরের ছবি, মাথায় তাঁর পারস্যের শিরস্ত্রাণ আর হাতে বজ্র। মুদ্রাটি ছোট, কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যময়।

গ্রীক আক্রমণের পরে যে সব মুদ্রা পাওয়া গেছে, ইতিহাস গঠনের উপকরণ হিসেবে তাদের ভূমিকা ছোট নয়। কেননা এসব মুদ্রাতে নানারকম ছবির সঙ্গে লিপি খোদিত আছে পাঞ্জাব আর উত্তর পশ্চিম সীমান্তে যে সব ব্যাকট্রীয় গ্রীক একদিন রাজত্ব করে গেছেন তাঁদের মুদ্রা বিচার করে তিরিশজন গ্রীক রাজা ও রাণীর নাম আবিষ্কার করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা।

ভারতের শক-পল্লবেরাও তাঁদের প্রচলিত মুদ্রায় নিজেদের রাজত্বের ছবি এঁকেছেন। কুষান যুগের মুদ্রা ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ রাজা কণিষ্ক বা অন্যান্য পরবর্তী রাজাদের কথা বলে। দক্ষিণ ভারতের সাতবাহন রাজাদের রাজত্বের পুরনো সংবাদের মুখপত্র হল তাঁদের মুদ্রাগুলো।

ভারতের অন্যান্য হিন্দু আর বৌদ্ধ রাজারাও অনেক মুদ্রা চালু করেছিলেন। তবে গুপ্ত রাজাদের পরে, বিশেষত চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, প্রতিহার বা বাংলার পাল আমলের কোনো মুদ্রা পাওয়া যায় না। তুর্কী রাজাদের কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে। মহম্মদ বিন তুঘলকের সেই তামার নোট এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

সারনাথের অশোকস্তম্ভের সিংহমূর্তি

আজ আমাদের মুদ্রায় অশোকস্তম্ভের ছবি আঁকা। মনে করা যাক্, আজ থেকে তিন হাজার বছর এগিয়ে গেছে পৃথিবী। এ যুগের সভ্যতা মাটির নিচে ঢাকা পড়েছে। তখন এ যুগের মুদ্রা-গুলো নিয়ে সে যুগের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কত মাথাই না ঘামাবেন, আজকের মুদ্রা বিচার করে তাঁরা এ যুগের কত ঐতি-হাসিক তথ্যই না জানাতে পারবেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, মুদ্রায় আঁকা অশোক-স্তম্ভের ছবি দেখেই তাঁরা বুঝবেন, ভারত একদিন শান্তির আদর্শে ছিল বিশ্বাসী।

শিল্পভাস্কর্যের নিদর্শন

প্রাচীন ভারতের রাজা-রাজড়াদের শিল্প-স্থাপত্য প্রীতি ছিল অসীম। যুগ-যুগের শিল্পে অনেক ইতিহাসের ছবি ছড়িয়ে রয়েছে। শিল্প আর ইতিহাসের দিক থেকে অজন্তা গুহার চিত্রগুলো তো বিস্ময়কর। ডিটস্-এর কথাতেই বলি—অজন্তার প্রাচীন-চিত্র ইউরোপের শ্রেষ্ঠ প্রাচীর-চিত্রগুলো গি-ও-ত্তো এবং সিনিওরেলির চিত্রের সমকক্ষ। এসব চিত্রে বাস্তবতার পরিপূর্ণ ও বিশদ রূপায়ণ আমাদের সে যুগের একটা সত্যিকারের ছবি ও গুপ্তযুগের উন্নত সভ্যতার পরিচয়। ভারতের অনেক প্রাচীন চিত্রেই ভারতের

মুদ্রাগুলোর মধ্যে আলেকজান্দারের-ছবি আঁকা মুদ্রাগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা এরাই বলে দেয় কোন এক সুদূর যুগে গ্রীকেরা ভারতের বুকে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। আর ঐ পুরনো মুদ্রাগুলোই

গ্রীকবীর আলেকজান্দারের মুদ্রা ॥ হাইডাসপেসের যুদ্ধজয়ের স্মারক

আজ ইতিহাসের স্বাক্ষর হিসেবে জাদুঘরের কাচের বাক্সে বন্দী হয়ে আছে

হাউডাসপেসের যুদ্ধে আলেকজান্দার হলেন বিজয়ী। এই বিজয়ের সংবাদকে অমর করে রাখলেন তিনি তাঁরই প্রচলিত এক মুদ্রায়। এই মুদ্রার এক পিঠে দেখানো হয়েছে : এক অশ্বারোহী বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করেছে অন্য এক আরোহীসুদ্ধ হাতীকে। অন্য পিঠে—আলেকজান্দারের শৌর্য-বীর্যের প্রতীক হিসেবে আঁকা হয়েছে এক বীরের ছবি, মাথায় তাঁর পারস্যের শিরস্ত্রাণ আর হাতে বজ্র। মুদ্রাটি ছোট, কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যময়।

গ্রীক আক্রমণের পরে যে সব মুদ্রা পাওয়া গেছে, ইতিহাস গঠনের উপকরণ হিসেবে তাদের ভূমিকা ছোট নয়। কেননা এসব মুদ্রাতে নানারকম ছবির সঙ্গে লিপি খোদিত আছে পাঞ্জাব আর উত্তর পশ্চিম সীমান্তে যে সব ব্যাকট্রীয় গ্রীক একদিন রাজত্ব করে গেছেন তাঁদের মুদ্রা বিচার করে তিরিশজন গ্রীক রাজা ও রাণীর নাম আবিষ্কার করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা।

ভারতের শক-পল্লবেরাও তাঁদের প্রচলিত মুদ্রায় নিজেদের রাজত্বের ছবি এঁকেছেন। কুষান যুগের মুদ্রা ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ রাজা কণিষ্ক বা অন্যান্য পরবর্তী রাজাদের কথা বলে। দক্ষিণ ভারতের সাতবাহন রাজাদের রাজত্বের পুরনো সংবাদের মুখপত্র হল তাঁদের মুদ্রাগুলো।

ভারতের অন্যান্য হিন্দু আর বৌদ্ধ রাজারাও অনেক মুদ্রা চালু করেছিলেন। তবে গুপ্ত রাজাদের পরে, বিশেষত চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, প্রতিহার বা বাংলার পাল আমলের কোনো মুদ্রা পাওয়া যায় না। তুর্কী রাজাদের কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে। মহম্মদ বিন তুঘলকের সেই তামার নোট এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

সারনাথের অশোকস্তম্ভের সিংহমূর্তি

আজ আমাদের মুদ্রায় অশোকস্তম্ভের ছবি আঁকা। মনে করা যাক্, আজ থেকে তিন হাজার বছর এগিয়ে গেছে পৃথিবী। এ যুগের সভ্যতা মাটির নিচে ঢাকা পড়েছে। তখন এ যুগের মুদ্রা-গুলো নিয়ে সে যুগের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কত মাথাই না ঘামাবেন, আজকের মুদ্রা বিচার করে তাঁরা এ যুগের কত ঐতি-হাসিক তথ্যই না জানাতে পারবেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, মুদ্রায় আঁকা অশোক-স্তম্ভের ছবি দেখেই তাঁরা বুঝবেন, ভারত একদিন শান্তির আদর্শে ছিল বিশ্বাসী।

শিল্পভাস্কর্যের নিদর্শন

প্রাচীন ভারতের রাজা-রাজড়াদের শিল্প-স্থাপত্য প্রীতি ছিল অসীম। যুগ-যুগের শিল্পে অনেক ইতিহাসের ছবি ছড়িয়ে রয়েছে। শিল্প আর ইতিহাসের দিক থেকে অজন্তা গুহার চিত্রগুলো তো বিস্ময়কর। ডিটস্-এর কথাতেই বলি—অজন্তার প্রাচীন-চিত্র ইউরোপের শ্রেষ্ঠ প্রাচীর-চিত্রগুলো গি-ও-ত্তো এবং সিনিওরেলির চিত্রের সমকক্ষ। এসব চিত্রে বাস্তবতার পরিপূর্ণ ও বিশদ রূপায়ণ আমাদের সে যুগের একটা সত্যিকারের ছবি ও গুপ্তযুগের উন্নত সভ্যতার পরিচয়। ভারতের অনেক প্রাচীন চিত্রেই ভারতের

আদিযুগ ভাস্বর হয়ে আছে। কোথাকার কোন্ দুর্ভেদ্য অরণ্যের গুহাচিত্র আজও পুরনো ভারতের কত রহস্য গোপন করে রেখেছে কে জানে

অজন্তার ১৬ ও ১৭ নম্বর গুহার এবং বাগের ছবিগুলোর বিষয়বস্তু পুরনো দিনের অনেক রূপকথা বলে। ১৭নং গুহার হল্-এর ডানদিকের প্রাচীরের গায়ে বিজয়সিংহের লঙ্কায় পৌঁছানো এবং লঙ্কা বিজয়ের এক সুন্দর ছবি দেখেই মনে পড়ে :

আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়

সিদ্ধার্থ বোধি লাভ করে বুদ্ধ হলেন। প্রব্রজ্যাধারী বুদ্ধ স্ত্রী আর পুত্রের সঙ্গে দেখা করার জন্য দেশে ফিরলেন। ঠিক এই সময়কার একটি অনবদ্য চিত্র অজন্তা গুহার এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। এ ছবির বিষয়বস্তু বিচার করলে বুদ্ধের সুমহান জীবন-বেদের অনেকখানি আলো পাওয়া যায়।

মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেল মোএঞ্জোদড়ো আর হরপ্পার সভ্যতা। অন্যান্য অনেক জিনিসের সঙ্গে পাওয়া গেল পাথরের ভাঙা শিবমূর্তি। সুন্দর তার গড়ন। ব্যস্ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এলেন এক সিদ্ধান্তে—মোএঞ্জোদড়ো-হরপ্পার লোকেরা ছিলেন পশুপতির উপাসক। এদের জীবন ইতিহাসের একটা দিকের পরিচয় মিলে গেল।

যে সব শিল্পকলা গুপ্তযুগের ইতিহাসের সন্ধান দেয় তার মধ্যে গোয়ালিয়রের বাগগুহার ছবিগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে সিংহলের সিগিরিয়ার (—সিংহগিরি) নাম করা যেতে পারে।

দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলাও বিশেষ উন্নত ছিল। গুপ্তযুগের শেষের দিকে দাক্ষিণাত্যে পল্লব বংশ প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠে। শিল্প সংস্কৃতি ও ঐশ্বর্যে একদিন মহেন্দ্রবর্মা (৬০০-৬২৫ খৃঃ) ও নরসিংহ বর্মার (৬২৫-৬৪৫ খৃঃ) যুগ যে উন্নত হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ ত্রিচিনপল্লী এবং মহাবল্লীপুরমের গুহামন্দির ও রথ।

পল্লবদের যুগ হল অস্তমিত, এল চোলদের যুগ। কোনো বিশেষ যুগের সংস্কৃতি-শিল্প ভাস্কর্য ঐ যুগের রাজবংশ ও সমাজেরই সুস্থ মনের লক্ষণ। এদিক থেকে বিচার করলে চোলযুগের মানসিক স্বাস্থ্য যে বলিষ্ঠ ছিল তা সহজেই বলা যায়। এর চরম নজির তাঞ্জোরের বিখ্যাত মন্দির।

চোলযুগের পিতল-ভাস্কর্যও কিন্তু উল্লেখযোগ্য। আপ্পাস্বামীর মূর্তি দেখে অনুমান করা যায় এই অঞ্চলে একদিন শৈবধর্মের প্রাবল্য ছিল।

আপ্পাস্বামী চলেছেন মন্দির থেকে মন্দিরে। হাতে তাঁর একটি নিড়ানি। ভক্তিভাবে দেহ অবনত। উদ্দেশ্য—মন্দিরের আগাছা দূর করা। ছবিটি গভীর ব্যঞ্জনাময়। ধর্মক্ষেত্রের কুসংস্কার বা অনাচারের আগাছা দূর করাই যে ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য একথা পরিষ্কার।
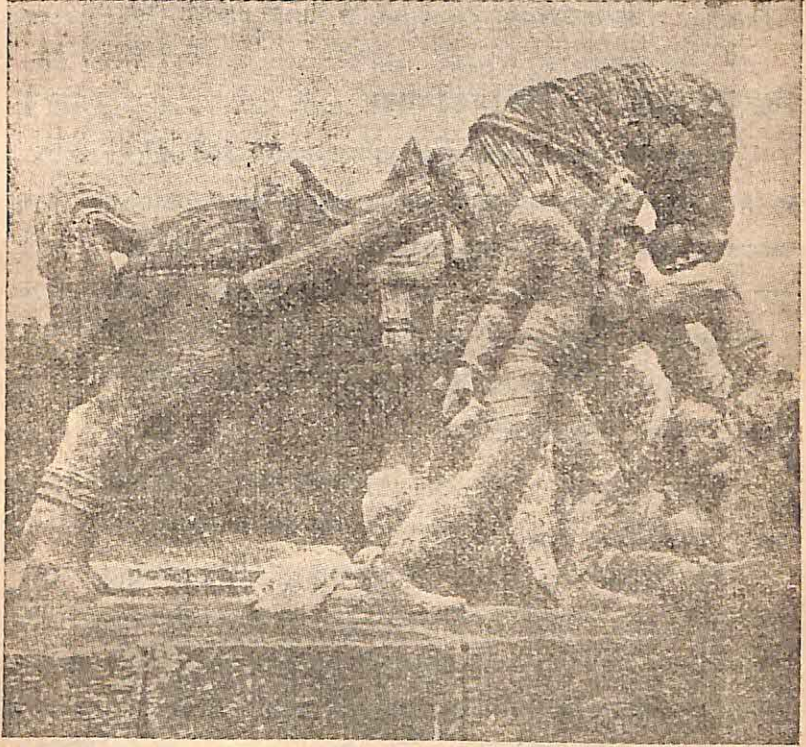
কোনারক সূর্যমন্দিরের অশ্বমূর্তির ভাস্কর্য

মহাভারতের চন্দেল্ল রাজাদের অনেক পরিচয় মেলে বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত খাজুরাহোর মন্দিরের স্থাপত্যে ও শিল্পে।

এ তো গেল মন্দির মসজিদের স্থাপত্য শিল্পের কথা। মুদ্রায় আঁকা যেসব ছবি দেখা যায় তার শিল্পগত মূল্যও নেহাৎ কম নয় কিন্তু। কিভাবে ধাতু কেটে কেটে কত সূক্ষ্ম ছবিই না ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পীরা! প্রাচীন যুগের

মুদ্রায় আঁকা ছবি বিচার করেও অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

বিদেশী লেখক ও পর্যটকদের বিবরণ

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাঁরা প্রথম মাথা ঘামিয়েছিলেন তাঁরা গ্রীসের লোক আলেকজান্দারের ভারত আগমনের আগে কিন্তু ইউরোপে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একরকম অজ্ঞই ছিল। আলেকজান্দারের সঙ্গে যে সব পার্ষদ ভারতে এসেছিলেন তাঁদের লেখা বা বিবরণী থেকেই ইউরোপ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা লাভ করে। আজ আবার আমরা ঐসব লেখা বিবরণী ভিত্তি করেই ইতিহাস খাড়া করবার চেষ্টা করছি। কাজেই গ্রীকদের কাছে আমরা ঋণী বৈকি।

ভারতের সুপ্রাচীন বিবরণী মেলে পারস্যদেশ দারায়ুসের শিলা-লিপিতে। এ লিপি যিশুখৃষ্টের জন্মেরও প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কিন্তু।

গ্রীসের ইতিহাসের জনক হেরোডোটাসও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন। পারস্য ও ভারতের মধ্যে সেকালে কী ধরনের সম্পর্ক ছিল তা-ও তিনি বর্ণনা করেছিলেন। ক্তেসিয়াস অর্থাৎ যিনি আরটা-জারাক্সাস-এর চিকিৎসক ছিলেন তাঁর টুকরো টুকরো দু-একটা লেখা থেকেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায়। তাঁর এক নেশা ছিল পর্যটকদের কাছ থেকে পূর্বদেশের নজার মজার গল্প সংগ্রহ করা।

আরিয়ান বলে একজন উচ্চপদস্থ গ্রাসিয়ো-রোমক কর্মচারী আলেক-জান্দারের ভারত আক্রমণ এবং ভারতের রাজাদের সম্বন্ধে এক সুন্দর সমালোচনামূলক বিবরণ রচনা করেছিলেন। এই বিবরণ ভিত্তি করে যিশুখৃষ্টের জন্মেরও চারশ' বছর' আগেকার ইতিহাসের একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়।

আলেকজান্দারের মৃত্যুর বছর কুড়ি বাদে সীরিয়া ও মিশরের রাজারা মৌর্য সম্রাটের সভায় ভারতীয় গ্রীকদূত পাঠিয়েছিলেন। এঁরা ভারতবর্ষের

নানান্ তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। গ্রীস ও রোমের অনেক লেখক আবার তাঁদের রচনায় এসব তথ্য ধরে রেখে দিয়েছেন সযত্নে। মেগাস্থিনিসের ভারত-বিবরণীর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। এই মেগাস্থিনিস গ্রীসের লোক। মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময়ে তিনি ভারত-ভ্রমণে এসেছিলেন।

গ্রীস ছাড়া চীনের ঐতিহাসিকেরাও কিন্তু দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন ভারতের দিকে। ভারতের ইতিহাস-বৈচিত্র্য তাঁদের মনেও জাদু সৃষ্টি করেছে। গ্রীসের যেমন হেরোডোটাস, চীনের তেমনি স্পিউ-ম-সিয়েন্। ভারতের প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছেন তিনি।

ভারতে গ্রীক প্রভুত্বের অবসানের পরে বহু চীনা পর্যটক আসতে লাগলেন ভারতের মাটিতে ধর্ম ও নতুন সংস্কৃতির সন্ধানে। গুপ্তযুগে এলেন ফা-হিয়েন। হর্ষবর্ধনের যুগে এলেন হিউয়েন সাঙ। এঁরা ভারতের যে কাহিনী রেখে গেছেন তার ইতিহাসগত মূল্য অশেষ।

এ তো গেল আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার দু'হাজার বছর আগেকার পর্যটকদের কথা। মুসলমান আমলে বিশেষত তুর্কীদের আমলে অনেক বিদেশী পর্যটক ভারতে এসেছিলেন। সার টমাস রো, তাভার্নিয়ে, বের্নিয়ে—এঁরা মোগল যুগের অনেক কথা লিখে গেছেন।

মহম্মদ বিন্ তুঘলকের সময়ে সুদূর মরক্কো থেকে এসেছিলেন ইবন বতুতা। ওটা কিন্তু তাঁর আসল নাম নয়, তাঁর বংশের নাম। পর্যটক হিসেবে তিনি নিজেকে ঐ নামেই পরিচয় দিতেন। ভারত ভ্রমণের এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তুঘলক রাজত্বের অনেক পরিচয় মেলে তাঁর লেখায়। তুঘলককে তো তিনি 'ইতিহাসের বিস্ময়' বলেছেন।

পুঁথিপত্তরের নিদর্শন

কোন্ সুদূর বৈদিক যুগের আর্যদের সম্বন্ধে কত কথা আজ আমরা জেনে ফেলেছি। **বেদই** বৈদিক যুগের মুখপত্র। বেদই আমাদের বলে দিয়েছে সে যুগের সমাজব্যবস্থার কথা, পূজাপার্বণের গল্প, জীবনযাত্রার খবর, আরও কত কী।

বেদের জ্ঞানবিষয়ক উপকরণ নিয়ে যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাদের নাম **উপনিষৎ**। এই উপনিষদে অনেক সুন্দর কাহিনী আছে। সে সব কাহিনী বৈদিক যুগের বিশেষ স্বাক্ষর বহন করে।

রামায়ণ-মহাভারতের ঐতিহাসিকতা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। তবে বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও একথা বলা যেতে পারে যে, এই দুই ধর্মগ্রন্থ বৈদিক যুগেরই বিশেষ একটি অধ্যায়ের পরিচয় দেয়।

ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে ভারতের ঐতিহ্যের এক সুশৃঙ্খল বিবরণ মেলে ভারতীয় **পুরাণে।** যে সব পুরাণে প্রাচীন রাজবংশের ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায় তাদের সংখ্যা হল পাঁচটি। এদের নাম বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড এবং ভাগবত। মৎস্যপুরাণ সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রামাণিক।

পুরাণের পরেই নাম করা যেতে পারে বিশেষ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের মতবাদের গ্রন্থগুলোর। জৈনদের পবিত্র গ্রন্থের অনেকগুলোতে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের কিছু কিছু উপাদান পাওয়া গিয়েছে। বৌদ্ধদের **জাতকের গল্প**গুলোর মধ্যে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর রাজনৈতিক অবস্থার খবর পাওয়া যায়।

পালিভাষায় লেখা সিংহলের দু-একটি গ্রন্থে ভারতের ঐতিহ্যের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। **দীপবংশ** (সম্ভবত চতুর্থ খৃষ্টাব্দের) এবং **মহাবংশ** গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের—প্রধানত মৌর্যভারতের অনেক খবর পাওয়া যায়। অবশ্য এ সব বই-পত্তর থেকে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে বিচারবুদ্ধিকে সজাগ রাখা খুবই দরকার। তা না হলেই ভুলভ্রান্তি থেকে যাবার বিশেষ সম্ভাবনা।

এ তো গেল ধর্মগ্রন্থ বা পুরাণের কথা। চন্দ্রগুপ্তের সুযোগ্য মন্ত্রী চাণক্য যে **অর্থশাস্ত্র** লিখেছেন তা অর্থনীতির বই হলেও তাতে সে যুগের সমাজের কিছু পরিচয় মেলে। **পঞ্চতন্ত্রের** আর **কথাসরিৎসাগরের** মজার গল্পগুলোর মধ্যেও দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

এরপর আসে সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের কথা। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অর্থাৎ কণিষ্কের আমলে অশ্বঘোষের লেখা **বুদ্ধচরিত** থেকে বুদ্ধদেবের জীবন ও সাধনা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। আর এর সঙ্গে কুষাণ-যুগের সমাজের একটা মোটামুটি ছবিও উপরি-পাওনা হিসেবে জুটে যায়।

গুপ্তযুগে কিন্তু পুরাণের মতো ঐতিহাসিক সাহিত্যের নিদর্শন মেলে না। তবে সে যুগের অনেক নাট্যে ও জীবনচরিতে ইতিহাসের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়।

হর্ষবর্ধনের আমলে সভাকবি বাণভট্ট লিখলেন **হর্ষচরিত**। বইটিতে

হর্ষবর্ধনের ছবি এঁকেছেন কবি। হর্ষের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সে যুগের সামাজিক পরিবেশ। এ বইটি সংস্কৃত সাহিত্যের দিক থেকে যেমন উল্লেখযোগ্য, ইতিহাসের দিক থেকে তেমনি মূল্যবান। প্রাচীন বা মধ্যযুগে ভারতের ইতিহাস লেখার প্রচেষ্টা যে একেবারেই হয়নি তা নয়। কাশ্মীরের ইতিহাস নিয়ে লিখেছিলেন কল্হন। সে গ্রন্থের নাম **রাজ-তরঙ্গিণী**। এতে কাশ্মীরের সুদূর দিনের ইতিহাস পাওয়া যায়।

বাক্‌পতিরাজ তাঁর **গৌরবহ** কাব্যে মহারাজ যশোবর্মনের গৌড়-বিজয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। আর বিল্হন তাঁর **বিক্রমাঙ্কদেব চরিতে** চালুক্য বংশের রাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের কথা বলেছেন। বাংলার পাল-বংশের রাজা রামপালের জীবন অবলম্বন করে সন্ধ্যাকর নন্দী লিখেছেন **রামচরিত**। বাংলার পালযুগের প্রচুর খবর মিলবে এই বইটিতে।

সুলতানী আমলের রত্ন আলবেরুনী **তহ্‌কীক-ই-হিন্দ্‌** বলে যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তাতে সে যুগের হিন্দুদের আচার-ব্যবহার, বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের অনেক তথ্যপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়।

আকবরের সময়ে আবুল ফজল লিখেছিলেন **আইন-ই-আকবরী**। বইটির ইতিহাসগত মূল্য যথেষ্ট।

ভারতবর্ষে ইতিহাস রচিত হয়েছে প্রধানত মুসলমানদের যুগে। এ যুগের অধিকাংশ সুলতান বাদশাহ্‌দেরই মোটামুটি ইতিবৃত্ত লেখা হয়েছে। তা ছাড়া এ যুগে আঞ্চলিক ভাষাগুলোও উন্নত হয়ে ওঠে। এসব ভাষায় সাহিত্যেও রচিত হতে থাকে। তুর্কী-কবলিত বাংলার **বৈষ্ণব** পদকর্তারা যে সব **পদাবলী** রচনা করেছেন সে সব সাহিত্যে বাংলার তৎকালীন সমাজচিত্রের অনেকখানি প্রতিফলিত হয়েছে।

সরকারী কাগজপত্র

ইংরেজ আমলের ইতিহাস রচনায় সরকারী দলিল দস্তাবেজ এবং চিঠিপত্র অপরিহার্য একথা বলাই বাহুল্য। নয়াদিল্লীর মহাফেজখানায় এসব নথিপত্র রক্ষিত আছে। এছাড়া কলকাতা, মাদ্রাজ ইত্যাদি অন্যান্য জায়গায় সরকারী দপ্তরেও তখনকার শাসনসংক্রান্ত কাগজপত্র সঞ্চিত আছে। আধাসরকারী বা বেসরকারী কাগজপত্র থেকেও ইতিহাসের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। মধ্য যুগে আমাদের দেশেও যে মানুষ বিক্রি হত (দাসপ্রথা) তার নজির মেলে এ-জাতীয় দলিলপত্রে।

ভাষাতত্ত্ব

ভাষার ক্রমবিকাশের ইতিহাস, শব্দের উৎপত্তি, শব্দার্থের পরিবর্তন এসব নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকেই বলা যেতে পারে ভাষাতত্ত্ব। ভাষাতত্ত্বও জাতির প্রাচীন ইতিহাসের অনেক সংবাদ দেয়। অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তি বা ইতিহাস আলোচনা করে নানান্ ঐতিহাসিক তথ্যে পৌছনো যেতে পারে। শব্দের অর্থ-পরিবর্তনের মধ্যে ভাষাসম্প্রদায়ের পুরনো ইতিহাসের ও ভাবধারার আভাস-ইঙ্গিত লুকানো থাকে। 'সন্দেশ' শব্দটাই ধরা যাক। 'সন্দেশ' মানে ? সবাই একসঙ্গে জিভের জল সামলে নিয়ে বলবে—'সন্দেশ মানে সন্দেশ, মানে মিষ্টি'। আগে কিন্তু সন্দেশ বলতে মিষ্টি বোঝাত না, সন্দেশের আসল অর্থ হল 'খবর'। তখন লোকে আত্মীয়-কুটুম্বের তত্ত্ব বা খবর (সন্দেশ) অর্থাৎ কুশলবার্তা নেবার জন্য মিষ্টান্ন উপহার পাঠাত ; সে যুগে সন্দেশ বা খবরের সঙ্গে মিষ্টির অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল বলেই আজ সন্দেশের অর্থ দাঁড়িয়েছে মিষ্টি। আর এই 'সন্দেশ' বিচার করেই আজ প্রাচীনযুগের এক সামাজিক রীতির পরিচয় পাই আমরা।

কথায় কথায় বোকা লোকের উদ্দেশে 'উজবুক' শব্দটা ব্যবহার করে থাকি। শব্দটার উৎপত্তির ইতিহাস বিচার করলে কিন্তু তুর্কী জাতির একটা পরিচয় মেলে। বাংলায় মধ্যযুগে মুসলমান সৈনিকদের অনেকে ছিল এই জাতির লোক। এদের বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে শারীরিক শক্তিটাই ছিল বেশি। 'উজবুক' বলতে আজ এই জন্যই 'বোকা' বোঝায়।

'তুরুক' (তুড়ুক) বা 'তুরুক সওয়ার' বলতে এখন বোঝায় 'অশ্বারোহী বা পদাতিক সৈনিক'। শব্দটি কিন্তু এসেছে জাতিবাচক 'তুর্ক' থেকে। এদেশে তুর্কী আগমনের প্রথম দিকে তুর্কী সৈনিক ছিল বিভীষিকার বস্তু। তাই কালক্রমে শব্দটি অর্থ দাঁড়াল লুণ্ঠনকারী বিদেশী সৈন্য বা অভিযানকারী সৈন্য।

এ-জাতীয় অসংখ্য শব্দ আছে যার ইতিহাস বিচার করলে পুরনো সমাজের অনেক সংবাদ বা প্রাচীন রীতিনীতির অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাস রচনায় শব্দতত্ত্ব কিভাবে সাহায্য করে পরবর্তী দু-একটি আলোচনায় তা দেখা যাবে।

অনুশালনী

১। 'ইতিহাস' কাকে বলব ? ইতিহাসের সঙ্গে সমাজবিদ্যার সম্পর্ক কী ? ইতিহাস প্রসঙ্গে ভূগোলের কথা আসে কেন ? ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী ?

২। ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগগুলির নাম কর। ভারতের ইতিহাসে হিমালয় এবং বিন্ধ্যপর্বতের গুরুত্ব কী ? সমুদ্রের ভূমিকাই বা কী ? 'ভারত-ইতিহাসে নদী'...এই বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনা কর।

৩। ভারতের প্রধান প্রধান জাতি ও ধর্মগুলির নাম কর। গুজরাটি, তামিল, মারাঠী, মালয়ালম, হিন্দী, ওড়িয়া, তেলেগু—এর মধ্যে কোন্‌গুলি উত্তর ভারতের এবং কোন্‌গুলি দক্ষিণ ভারতের ভাষা ?

৪। উপভাষা বলতে কী বোঝ ? উদাহরণ দাও।

৫। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি ঠিক করে একটি **বিতর্কসভা**র অনুষ্ঠান কর।

৬। ভারতের 'বৈচিত্র্য' বলতে কী বোঝায় ? কোন্ কোন্ বিষয় এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে সাহায্য করেছে ?

৭। ভারত-ইতিহাসের উপাদান কী কী ? এই সব উপাদানের কিছু কিছু নমুনা সংগ্রহ করে তোমাদের বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় (museum) সাজিয়ে রাখ। বড় বড় চার্টে এ সব নমুনার ছবি এঁকে সেগুলো নিয়ে একটি **প্রদর্শনী**র আয়োজন কর।

৮। প্রত্নতাত্ত্বিক কাদের বলা হয় ? প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ভারতের ইতিহাস গঠনে কিভাবে সাহায্য করেছে দু-একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাও। লিপি বা মুদ্রা ঐতিহাসিক গবেষণায় কিভাবে সহায়তা করে?

৯। হরপ্পা-মোএঞ্জোদড়োয় না গিয়েও কলকাতায় বা কলকাতার কাছাকাছি কোথায় কোথায় গেলে বহুদিন আগেকার জিনিসপত্র দেখতে পাবে ? বিষয়-শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এ সব **পরিদর্শনের** ব্যবস্থা কর। ফিরে এসে প্রত্যেকে একটি করে বিবরণী পেশ কর।

১০। ভারত-ইতিহাসের উপকরণ আছে এমন কতকগুলি গ্রন্থের নাম কর। একটা শব্দের মধ্যে সমাজ-সভ্যতার অনেক কথা লুকিয়ে থাকতে পারে--একথা দু-একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

১১। প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা বলতে কী বোঝ ? প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার ইতিহাস কোন্ কোন্ উপকরণ থেকে জানা যায় ?

১২। 'একটি পুরনো মুদ্রার আত্মকাহিনী'...লেখ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সিন্ধু-সভ্যতা

আগের পরিচ্ছেদে ইতিহাসের উপকরণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এবারে প্রাগৈতিহাসিক ভারতের যে পর্যায়টির আলোচনা করা হবে সে সম্বন্ধে আমাদের একমাত্র নির্ভর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। অবশ্য প্রত্নতাত্ত্বিকদের সাহায্য করেছেন নৃতত্ত্ববিদ্ এবং ভূতত্ত্ববিদেরা। এঁদের মিলিত চেষ্টায় আলোকিত হয়ে উঠল ভারত-ইতিহাসের একটি অজ্ঞাত অধ্যায়। যীশু-খৃষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে অর্থাৎ আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে সিন্ধু উপত্যকায় একটি উচ্চাঙ্গের **নগর-সভ্যতা** গড়ে উঠেছিল, এবং সভ্যতা ছিল মিশর এবং মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার সমসাময়িক। পণ্ডিতদের মতে এই সভ্যতার স্থিতিকাল খৃষ্টপূর্ব ৩২৫০-২৭৫০ অব্দ।

যে যুগে ভারতে এই সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল সেটা ছিল প্রস্তর-তাম্র-যুগের লক্ষণাক্রান্ত। এ সময়ে মানুষ তামা বা ব্রোঞ্জের জিনিস তৈরি করেছে, পাথরের জিনিসও কিছু কিছু চলেছে তার সঙ্গে। চাসবাসে লাঙল ব্যবহার চলেছে। উৎপাদন বেড়েছে প্রচুর। বাড়তি খাবার নগর গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে দৃঢ় করেছে। চাষ ও মাল বইবার কাজে পশুর ব্যবহার এবং চাকা, নৌকার পাল, ইট, বাটখারা, লিপি, পঞ্জিকা ইত্যাদি আবিষ্কার এ সময়ে নগর-সভ্যতার অগ্রগতিকে নিশ্চিন্ত করে তুলেছে।

এলাকা

সিন্ধু সভ্যতা বলতে সাধারণত হরপ্পা ও মোএঞ্জোদড়োকে কেন্দ্র করে যে সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল তাকেই বোঝায়। কিন্তু এ সভ্যতার পরিধি সত্যিই বিরাট। হরপ্পা থেকে মোএঞ্জোদড়োর দূরত্বই প্রায় ৪০০ মাইল। পাঞ্জাবের হরপ্পা ইরাবতীর তীরে, আর সিন্ধুপ্রদেশের মোএঞ্জোদড়ো মূল সিন্ধুনদের কোল ঘেঁষে। এই সভ্যতার পরিধি শুধু সিন্ধুনদের উপত্যকাতেই সীমাবদ্ধ নয়। পশ্চিমে বেলুচিস্তানের ঝোব্ নদী আর পূর্বদিকে সিন্ধু নদী—প্রধানত এই দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলেই গড়ে উঠেছিল এই সভ্যতা। সিমলা পাহাড়ের নিচে **রূপার** থেকে শুরু করে আরব সাগরের তীরে করাচী থেকে ৩০০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত **সুক্তাগেন-দর** পর্যন্ত ৬০টির বেশি জায়গা

হরপ্পা মোএঞ্জোদড়োর সঙ্গে সম্পর্কিত উচ্চতর সংস্কৃতির পরিচয় বহন করেছে। বস্তুত সমগ্র উত্তর ভারতেই এই সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছিল।
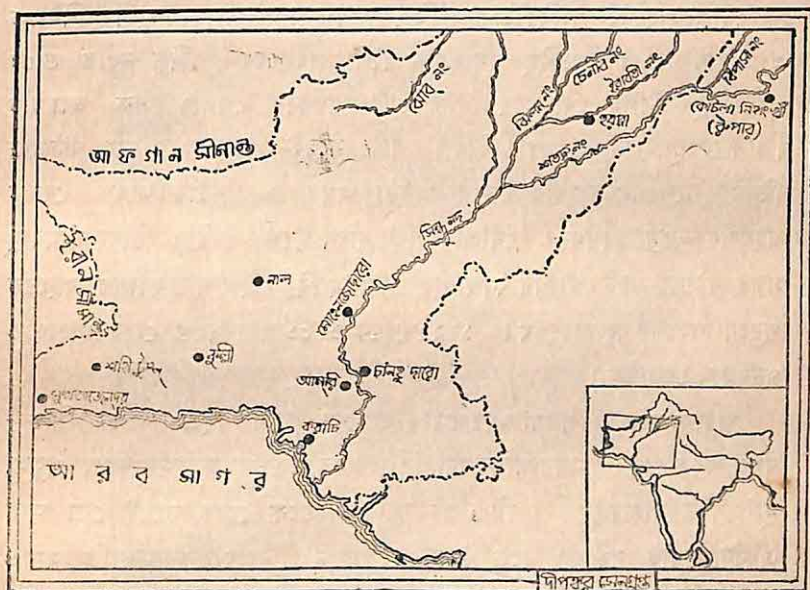
সিন্ধু-সভ্যতার এলাকা

আবিষ্কারের গল্প

১৮৫৬। করাচী থেকে লাহোর অবধি রেললাইন পাতবার ভার পড়ল জন ব্রান্টন আর উইলিয়ম ব্রান্টন নামে দু'ভাইয়ের উপর। রেল লাইন পাতবার জন্য চাই শক্ত ইট বা পাথরের কুঁচি। পাওয়া যাবে কোথায়? দু'ভাই কাজে লাগালেন দুটো প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষকে। দক্ষিণ দিকে জন লুঠ করলেন ব্রাহ্মণবাদ নামে একটা পুরনো শহরের ইট, আর উইলিয়ম উত্তরে মূলতান থেকে লাহোর পর্যন্ত একশ মাইল রেলপথ গড়লেন কাছাকাছি আরেক পুরনো শহরের ধ্বংসস্তূপ থেকে ইট সংগ্রহ করে। এই হল আমাদের পাঁচ হাজার বছর আগেকার হরপ্পা। কথাটা প্রত্নতাত্ত্বিক জেনারেল কানিংহামের কানে যেতেই তিনি তৎক্ষণাৎ এলেন হরপ্পায় এবং প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া দু-চারটে নমুনা থেকে বুঝলেন এগুলো খুবই প্রাচীন। ১৯২১ সালে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা জন মার্শালের উদ্যোগে প্রত্নতাত্ত্বিক দয়ারাম সাহনীর পরিচালনায় হরপ্পার

মাটি খোঁড়বার কাজ শুরু হয়, এরপর দীর্ঘ দিন ধরে এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কাজ চলে।

মোএঞ্জোদড়ো আবিষ্কারের কৃতিত্ব জন মার্শালের সহকারী বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সিন্ধু নদীর তীরে তিনি খুঁজছিলেন বৌদ্ধযুগের নিদর্শন। লারকানা জেলার এক জায়গায় তিনি দেখলেন বিরাট একটি ঢিবি। সঙ্গে সঙ্গেই অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠলেন তিনি। পেলেন তামার তৈরি একটা অস্ত্র। জায়গাটার নামও কেমন রহস্যঘন—পুরাতনগন্ধী। মোএঞ্জোদড়ো মানে 'মৃতের ভূমি'। রাখালদাসবাবু পরম আগ্রহে মাটি খোঁড়ার কাজ চালালেন, আবিষ্কৃত হল পাঁচ হাজার বছরের পুরনো শহরের ধ্বংসাবশেষ। ১৯২২ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত মোএঞ্জোদড়োর খননকার্য চলেছিল।

অবাক কাণ্ড। হরপ্পা আর মোএঞ্জোদড়ো দুটো শহরে আশ্চর্য মিল—যমজ শহর যেন। নগর পরিকল্পনা, শিলমোহর, তৈজসপত্র, অলংকার, পুতুল, মূর্তি সর্বত্র আশ্চর্য মিল। কিন্তু শুধু দুটো শহরকে কেন্দ্র করেই তো আর একটা পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না, নিশ্চয়ই কাছাকাছি আরও অনেক জায়গায় এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যাবে। চলল্ গবেষণার কাজ। উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং গোটা বেলুচিস্থান জুড়ে আরও অনেক প্রাচীন বসতির চিহ্ন পাওয়া গেল। এই গবেষণায় যাঁরা অগ্রণী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অরিয়ল স্টাইন এবং ননীগোপাল মজুমদারের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৮ সালে কীর্থার পাহাড় অঞ্চলে গবেষণা করার সময় হঠাৎ দস্যুর আক্রমণে নিহত হলেন ননীগোপালবাবু। ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তিনি।

নগর পরিকল্পনা

নগর নির্মাণে হরপ্পা ও মোএঞ্জোদড়োর বাসিন্দারা একটি মূল নীতি অনুসরণ করেছে। দুটো জায়গাতেই একই স্থাপত্যকর্ম। শহরের পশ্চিম দিকটায় ঢিবি। ঢিবির উপর দুর্গ। ঢিবি বোধ হয় বন্যা প্রতিরোধের জন্য আর দুর্গ শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য। ঢিবির আশেপাশেই বড় বড় ঘরবাড়ি সবই পাকা। রোদে পোড়া এবং ভাটিতে পোড়ানো দুরকম ইটই ব্যবহৃত হয়েছে। নগরের রাজপথ উত্তর-দক্ষিণ আর পূর্ব-পশ্চিমে আড়াআড়ি বিস্তৃত। গলিপথই বেশি। বাড়ির সদর দরজা সদর

রাস্তার দিকে নয়, গলির দিকে। রাস্তাগুলো আলোকিত করার ব্যবস্থা ছিল বলে মনে হয়। কতগুলো স্তম্ভ পাওয়া গেছে, সেগুলোকে ল্যাম্পপোষ্ট বলেই মনে হয়। সমস্ত নগর কতগুলো পাড়ায় বিভক্ত ছিল। সাধারণ
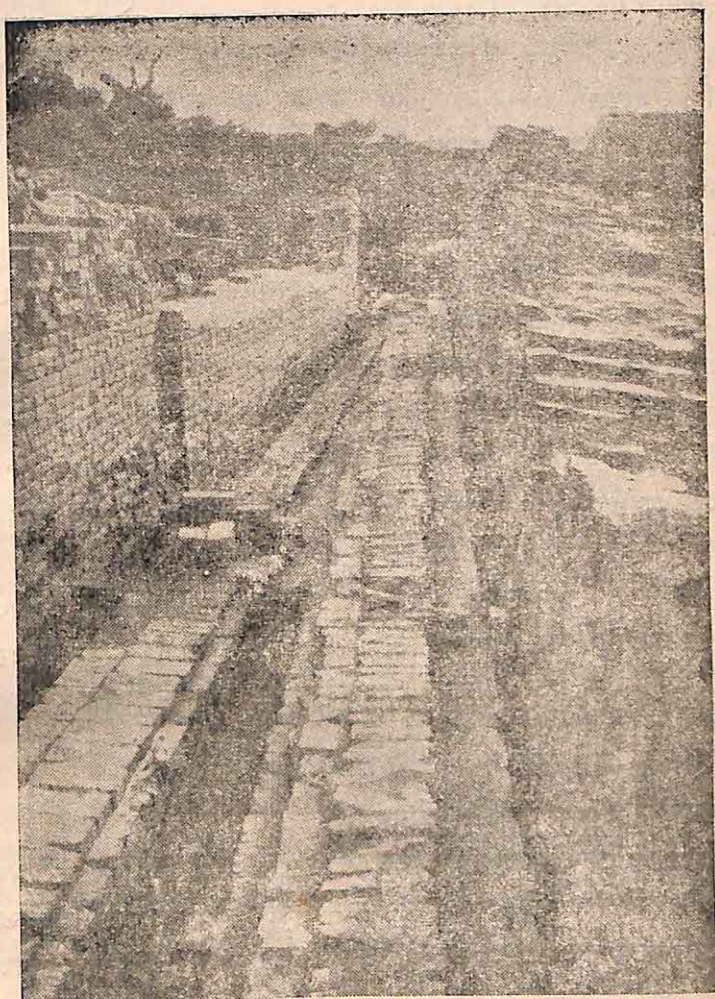
মোএঞ্জোদড়োর পয়ঃপ্রণালীযুক্ত পথ

নাগরিকদের ঘরবাড়ি দোকানপাট ছিল পাড়াগুলির মধ্যে। দোতালা বাড়িরও সন্ধান মেলে। সিঁড়ির চিহ্নও স্পষ্ট। নগরের একটি নির্দিষ্ট অংশে ছোট ছোট এক সারি বাড়ি দেখা যায়—বস্তি বা ব্যারাকের মতন। গরীব লোকেরা বা মজুরেরা এইসব বাড়িতে থাকত বলে মনে হয়।

হরপ্পার সবচেয়ে বড় বাড়ি যেটা (১৬৯´×১৩৫´) সেটাকে পণ্ডিতেরা বলেছেন 'সাধারণ শস্যভাণ্ডার' (The Great Granary) আর মোএঞ্জোদড়োর এমনি একটা বড় বাড়ি (১৮০´×১০৮´) হল, সাধারণের স্নানাগার (The Great Bath)। সাঁতারের প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা, বারান্দা, গ্যালারী—সে এক এলাহী কাণ্ড। এই রকম 'সাধারণ সভাগৃহ'ও আবিষ্কৃত হয়েছে।

সবচেয়ে বিস্ময়কর হল শহরের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা। বড় রাস্তার দুই পাশে পাথর-ঢাকা পাকা ড্রেন। এই ড্রেনগুলোর সঙ্গে প্রত্যেক বাড়ির নালাগুলি যুক্ত ছিল। ড্রেন পরিষ্কার আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য কিছু দূর অন্তর অন্তর 'ম্যানহোল্'। একেবারে অতি-আধুনিক শহরের মতন। সমস্ত ময়লা জল শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলা হত। আবর্জনা ফেলবার জন্য রাস্তার মাঝে মাঝে থাকত ডাষ্টবিন্।

স্বাস্থ্যরক্ষার সুবন্দোবস্তের সঙ্গে ছিল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সব রকম ব্যবস্থা। তাই একজন ইংরেজ এই প্রাচীন শহরের ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে বলেছিলেন, মনে হচ্ছে ল্যাংকাশায়ারের মতন কোনো আধুনিক শিল্পনগরীর ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে চলেছি।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে দেখা গিয়েছে দুটো শহরই বারবার ধ্বংস হয়েছে, পুরনো শহরের ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে নতুন শহর। বন্যার জন্যও এমন হতে পারে। শেষ দিককার স্তরের নগর-বিন্যাসে একটা শৈথিল্যের ভাব লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন

হরপ্পা ও মোএঞ্জোদড়োর **কৃষিজাত** দ্রব্যের মধ্যে গম, যব ও খেজুর প্রধান। কী করে জানা গেল? যে সব উদূখলে শস্য ভাঙানো হত তার ফাটলের মধ্যে পাওয়া গেছে গম ও যবের কণা। আর প্রস্তরীভূত অবস্থায় পাওয়া গেছে খেজুরের অসংখ্য বিচি। কেউ কেউ বলেন ধান মটর আর তিলের চাষও হত। এ ছাড়া হত তুলার চাষ।

একটা প্রশ্ন। হরপ্পা না-হয় পাঞ্জাবের উর্বর মাটিতে। প্রচুর শস্য হওয়া সেখানে সম্ভব। কিন্তু মরুকল্প সিন্ধুর অন্তর্গত মোএঞ্জোদড়োতে কী করে অত শস্য উৎপন্ন হত? এখন ও-এলাকায় গরমের দিনে উত্তাপ ওঠে ১২০° পর্যন্ত আর শীতের দিনে জল জমে যায়। তবে কি সেই পুরনো দিনে

এখানকার আবহাওয়া অন্যরকম ছিল? প্রমাণ কী? প্রমাণ পোড়া ইট। কোটি কোটি ইট পোড়াতে প্রচুর জ্বালানি দরকার। জ্বালানি আসে কোত্থেকে? বন থেকে। তা ছাড়া শিলমোহরে হাতী, মোষ, বাঘ ইত্যাদি জন্তুজানোয়ারদের ছবি পাওয়া যাচ্ছে, তারা নিশ্চয়ই বনে থাকত। তা হলে বোঝা যাচ্ছে নানারকম গাছপালা জন্মানোর উপযুক্ত আবহাওয়া তখন ছিল। মৌসুমীবায়ুর গতি পরিবর্তনের জন্যই ওখানকার আবহাওয়া আজ এমন রুক্ষ।

চাষবাস ছাড়াও হরপ্পা মোএঞ্জোদড়োর বাসিন্দারা গরু ভেড়া গাধা কুকুর শূয়োর মুরগী ইত্যাদি **পশু পালন** করত। গরু ভেড়া শূয়োর ঘড়িয়াল এবং কাছিমের মাংস এদের প্রিয় খাদ্য ছিল। এসব পশুর হাড়-গোড় প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। নদী থেকে এরা **মাছ** ধরে খেত। আর সমুদ্রের মাছ খেত শুকিয়ে নিয়ে। আধ-পোড়া মাছের আঁশ আর কাঁটা বাড়ির মধ্যে এবং গলিতে অনেক পাওয়া গিয়েছে।

সাজসজ্জা কেমন ছিল? সূতী আর পশমী দু'রকমের কাপড়ই পরত হরপ্পা মোএঞ্জোদড়োর লোকেরা। পুরুষদের পরিচ্ছদ বলতে ছিল উত্তরীয় আর অধোবাস। মেয়েদেরও অনেকটা তাই। সেলাই করা পরিচ্ছদ হয়ত এরা ব্যবহার করত, কারণ স্ঁচ পাওয়া গিয়েছে অনেক ঘরেই। মেয়েরা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে খোঁপা বাঁধত, খোঁপা বাঁধার নানান্ কায়দা। গলায়, হাতে নানা রকমের অলংকার ব্যবহার করত মেয়েরা। আংটি পুরুষেরাও পরত। নানা অঙ্গরাগের প্রচলন ছিল। সিঁদুরের ব্যবহার ছিল। মেয়েরা নাকি লিপ্‌ষ্টিক পর্যন্ত ব্যবহার করেছে। ভ্যানিটিব্যাগও অজ্ঞাত ছিল না সেই প্রাচীনাদের কাছে।

বড়রা বা বুড়োরা খেলত পাশা আর ছোটরা খেলত বল বা মার্বেল। অন্যান্য **আমোদ-প্রমোদের** মধ্যে ছিল শিকার আর ষাঁড়ের লড়াই। পাখি পোষা এবং মাছধরাও ছিল একরকম সৌখীনতা। নানারকম পুতুল ছোটদের আনন্দ দিত। ছোটরা নাকি নিজেরাও মাটির খেলনা গড়তে ভালবাসত।

বাড়িঘরে কোনো সূক্ষ্ম কারুকার্য ছিল না, সৌন্দর্যপিপাসার চেয়ে প্রয়োজনসিদ্ধির দিকেই যেন বেশি নজর। কিন্তু এদের **শিল্পকুশলতার** সাক্ষ্য আছে অসংখ্য শিলমোহরে, মৃৎ-মূর্তি বা ধাতু মূর্তিতে, খেলনায় সোনারূপার অলংকারে, মৃৎপাত্র বা ধাতুপাত্রে। শিল-মোহরে আঁকা ছবি-

হরপ্পা-মোএঞ্জোদড়ো : পোড়ামাটির স্ত্রীমূর্তি
ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে খোঁপা বাঁধবার ধরন লক্ষণীয়
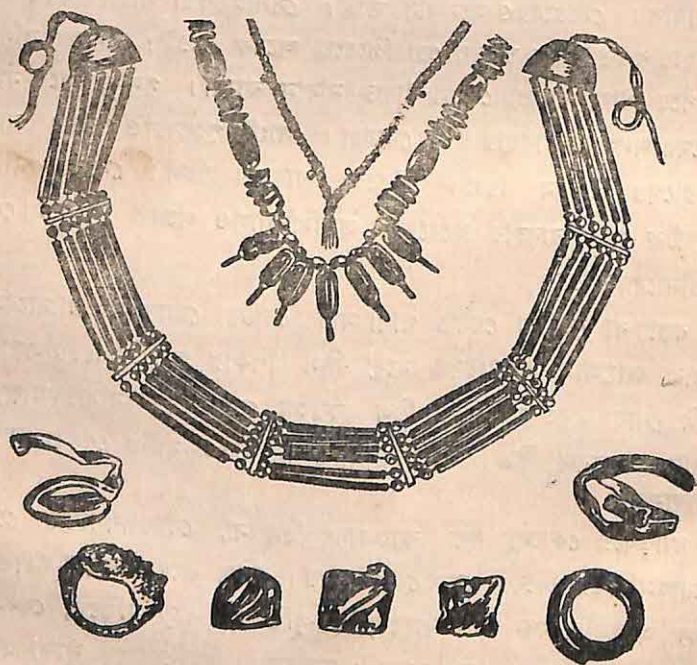
অলংকার

গুলোর শিল্পগত নৈপুণ্য বিস্ময়কর। নারীমূর্তিগুলোও অদ্ভুত সুন্দর। হাতীর দাঁতের তৈরি চিরুনি, পাশা ইত্যাদি নানা জিনিসেও এদের শিল্পদক্ষতার পরিচয় মেলে। ব্রোঞ্জের একটি নর্তকী-মূর্তি ঢালাই কাজের চমকপ্রদ নমুনা।

হরপ্পা মোএঞ্জোদড়ো : খেলনা

যানবাহনের মধ্যে ছিল স্থলপথে গরুর-গাড়ি আর জলপথে নৌকা। গরুর-গাড়ি তখন দেখতে কেমন ছিল তা বোঝা যায় তখনকার একটি খেলনা থেকে। ওপরে ছাদ বা ছাউনি-দেওয়া এখনকার এক্কা যেমন, তামার তৈরি ঠিক তেমনি একটি নমুনা হরপ্পায় পাওয়া গেছে। ও থেকে অনুমান করা যায় খোলা-গাড়ি এবং ঢাকনা-দেওয়া গাড়ি—দুই রকম গাড়িরই প্রচলন ছিল।

নকশা কাটা মৃৎপাত্র

যন্ত্রপাতির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে ছুঁচ, ছুরি, কাস্তে, ছেনি, বঁড়শি, কুড়ুল, করাত ইত্যাদি। এগুলো তামা বা ব্রোঞ্জের তৈরি। **যুদ্ধাস্ত্রের** মধ্যে পাওয়া গিয়েছে কুড়ুল, বর্শা, তীর, ধনুক আর ঢাল। এগুলোও বেশির ভাগই ব্রোঞ্জের তৈরি। ব্রোঞ্জ তামার চেয়ে অনেক শক্ত। মোএঞ্জোদড়োতে তামার তৈরি দুটো তয়োয়াল পাওয়া গিয়েছে, বড়টির দৈর্ঘ্য ১৮½ ইঞ্চি।

গাড়ির আবিষ্কার, চাষে আর মালবহনে পশুর ব্যবহার, নির্দিষ্ট ওজন বা বাটখারার ব্যবহার **ব্যবসাবাণিজ্যে** যুগান্তর এনেছিল। হরপ্পা-মোএঞ্জোদড়োর অধিবাসীরা ছিল মূলত ব্যাবসায়ী। হরপ্পা-মোএঞ্জোদড়োকে আধুনিক ভাষায় **শিল্পনগরী** বলা যেতে পারে। পথেঘাটে দোকানপাটের ছড়াছড়ি। শ্রমিকদের থাকবার জন্য আলাদা ব্যারাক, প্রচুর যন্ত্রপাতি ও ধাতুপাত্রাদির উৎপাদন এবং অসংখ্য শিলমোহর এ কথারই সাক্ষ্য দেয়। এখানকার তৈরি তুলোর কাপড় অন্যান্য দেশে রপ্তানি হত। তখন আর কোথাও তুলোর কাপড় তৈরি হত না। তার মানে এ ব্যাবসাটা ছিল এদের একচেটে। প্রাচীন সুমেরের সঙ্গে হরপ্পা-মোএঞ্জোদড়োর বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলত।

নানারকম ধাতু, মূল্যবান্ পাথর ইত্যাদি আমদানির জন্য উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের নানা দেশ এবং মধ্য এশিয়ার সঙ্গে এদের সম্পর্ক রাখতে হত। ক্রীট এবং মিশরের সঙ্গেও এদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, এ বিষয়েও কিছু কিছু প্রমাণ আছে। একটি শিলমোহরে মাস্তুলহীন জাহাজের ছবি দেখে ডাঃ ম্যাকে অনুমান করেছেন সুমের এবং এলামের সঙ্গে সমুদ্রপথেও এদের যোগাযোগ ছিল।

শাসনব্যবস্থা

হরপ্পা আর মোএঞ্জোদড়োর মধ্যে সর্ববিষয়ে সাদৃশ্য দেখে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন এ দুটো শহর ছিল একই শাসনব্যবস্থার অধীনে দুটো রাজধানী। কিন্তু এখানে মিশরের মতো রাজতন্ত্র, না সুমেরের মতো পুরুততন্ত্র ছিল, সে বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা মুশকিল। সুমেরে যেমন মন্দিরের ছড়াছড়ি এখানে মোটেই তেমন নয়। তবে স্নানঘরটা যদি আসলে মন্দিরই হয়? কিন্তু কেবলমাত্র একটি উপকরণ থেকেই তো আর পাকাপাকি কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না। তবে সব কিছুর ওপর ব্যাবসা—বাণিজ্যের একটা প্রবল প্রভাব দেখে অনুমান করা চলতে পারে,

রাষ্ট্রব্যবস্থাটা ছিল সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীরের হাতেই ভাল আর মন্দ দুই ধরনের বাড়ি যদি শ্রমিক ও মালিক এই দুই শ্রেণীর নির্দেশক হয় তবে এ অনুমান আর একটু জোর পায় নিশ্চয়ই।

লিপি

হরপ্পা-মোএঞ্জোদড়োর লিপি চিত্র-লিপি আর ধ্বনি-লিপির মাঝামাঝি ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লেখা কখনও বা বাঁদিক থেকে ডান দিকে। এ
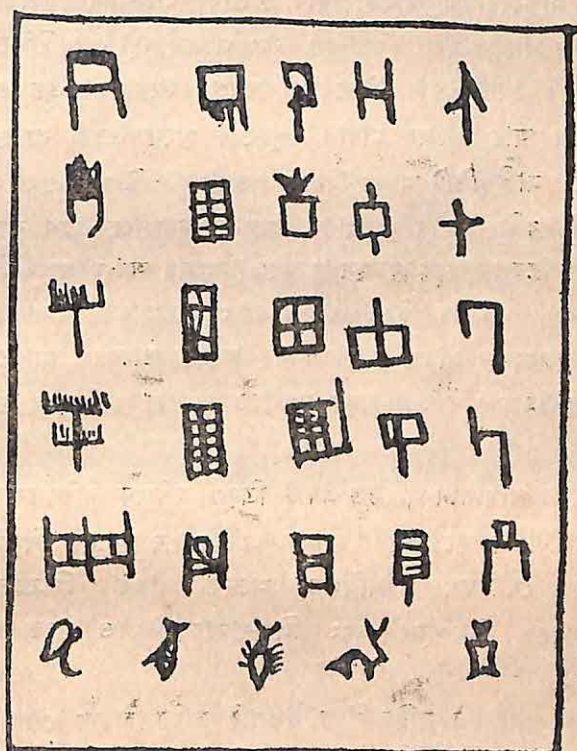
সিন্ধু-সভ্যতার লিপি

লিপি যত দিন না পড়া যাচ্ছে তত দিন সিন্ধুসভ্যতার অনেক রহস্যই থাকবে অনুদ্ঘাটিত।

মৃতের সৎকার

হরপ্পা-মোএঞ্জোদড়োর অধিবাসীরা সাধারণত মৃতদেহ দাহ করত; কখনও বা সমাধিস্থও করত। কবরের মধ্যে জীবিত মানুষের ব্যবহার্য

জিনিসপত্র দিয়ে দেওয়া হত। এ থেকে মনে হয় এখানকার অধিবাসীরা মৃত্যুর পরেও একধরনের জীবনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল।

ধর্ম

এদের ধর্ম সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে কিছু অনুমান করতে গেলে নির্ভর করতে হবে শিলমোহর, স্ত্রীমূর্তি আর পাথুরে মূর্তিগুলোর উপর। অর্ধনগ্ন একটি স্ত্রীমূর্তি দেখে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এটা হচ্ছে মাতৃদেবী বা ধরিত্রীদেবীর প্রতীক, যাকে অম্বা, অম্মা, কালী, করালী বলে ভারতে পূজো করা হয় এবং ঋগ্বেদে পৃথ্বী বা অদিতিদেবী বলে যিনি স্বীকৃত। আর একটা শিলমোহর অবশ্যই উল্লেখ্য। এর এক পিঠে একজন পুরুষ আর একজন নারী। পুরুষের হাতে একটি কাস্তে ধরনের হাতিয়ার আর নারীমূর্তিটি অনুনয়-বিনয়ের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। প্রথম মূর্তিটিকে শস্যপ্রদায়িনী ধরিত্রীদেবীর প্রতীক হিসেবে অনায়াসে গ্রহণ করা চলে। চণ্ডীতে দুর্গা নিজের পরিচয় দিচ্ছেন 'শাকম্ভরী' বলে (অর্থাৎ শস্য দিয়ে যিনি পালন করেন)। দ্বিতীয় চিত্রটির ইঙ্গিত এই : স্ত্রীলোকটিকে দেবীর কাছে বলি দেওয়া হচ্ছে, সে জীবন ভিক্ষা করছে কাতর ভাবে। আমাদের দেশে **বলিপ্রথার উৎস** যদি এই সুদূর অতীতে অন্বেষণ করি, খুব অন্যায় হবে না।

পশুপরিবৃত যোগাসনে অধিষ্ঠিত একটি ত্রিমুণ্ড মূর্তিকে পণ্ডিতেরা পশুপতি শিব বলে নির্দেশিত করেছেন। আমরা এখনও যে ধরনের শিবলিঙ্গ পূজা করি ঠিক সেইরকম শিবলিঙ্গও অনেক পাওয়া গিয়েছে হরপ্পা-মোএঞ্জোদড়োয়। শিব-পূজা এবং লিঙ্গ-পূজার উৎসও হয়ত তা হলে সিন্ধুসভ্যতায়।

শিলমোহরগুলোতে মহিষ ষাঁড় ইত্যাদি ছবির বাহুল্য দেখে মনে হয় এইসব পশুকেও এরা পূজা করত। শিবমূর্তির সঙ্গে ষাঁড়ের সান্নিধ্য দেখে অনুমান করা যায় ষাঁড় হল শিবের বাহন। এই রকম অন্য পশুও মাতৃদেবীর বাহন হতে পারে।

এ ছাড়া আগুন, নদী আর গাছের পূজাও নাকি তারা করত। অনেক শিলমোহরে গাছপালার চিত্র আছে। কেউ কেউ বৃহৎ স্নানাগারটিকে নদীদেবতার বা জলদেবতার মন্দির বলে কল্পনা করেছেন। এই রকম আর একটি শিলমোহরের সাপের মূর্তি দেখে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন হয়ত

সাপের পূজাও এরা করত। অবশ্য শিলমোহরে কোন মূর্তি থাকলেই যে তা পূজাপাত্র হবে এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

মোএঞ্জোদড়ো ঃ শিলমোহর
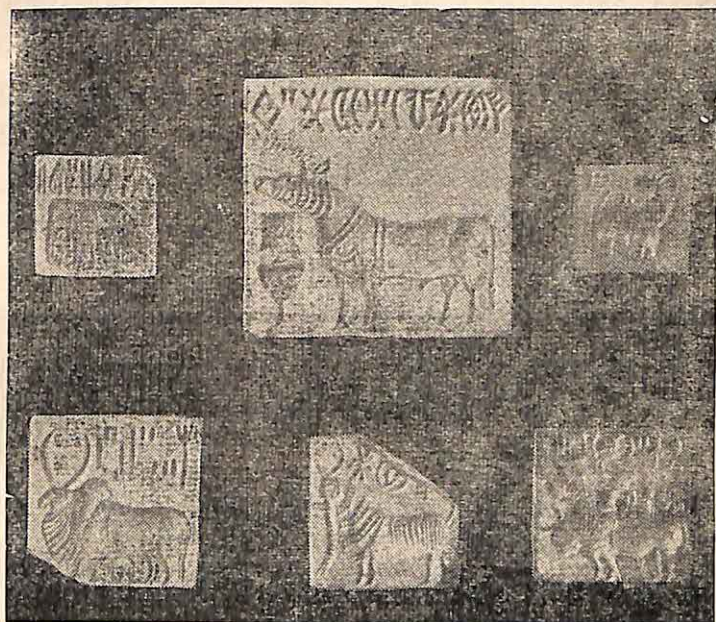
এরা কারা

সিন্ধু উপত্যকায় এই সভ্যতা যারা গড়ে তুলেছিল তারা কারা? এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। আর, একজাতের লোকেরাই এখানে ছিল এমন নয়। পণ্ডিতেরা মৃত মানুষের মাথার খুলি ও কঙ্কাল পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করেছেন এখানে তিন চার রকমের লোক ছিল। এদের বংশধর ভারতে এখনও অনেক আছে। দক্ষিণ ভারতে এখন যে দ্রাবিড়ভাষী জাতি আছে, অনেকে বলেন তাদেরই পূর্বপুরুষ সিন্ধুসভ্যতা গড়ে তুলেছিল। আবার অনেকে বলেন বৈদিক আর্যদের আগে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীরই আরেকটি শাখা ভারতে এসেছিল। এ সভ্যতা তাদেরই।

যতদিন হরপ্পা মোএঞ্জোদড়োর লিপির পাঠোদ্ধার না হচ্ছে ততদিন এর মীমাংসা হওয়া অসম্ভব।

সভ্যতার বিলুপ্তি

বন্যা বা প্রাকৃতিক কোনো প্রচণ্ড দুর্যোগের ফলে এ সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটে থাকবে। বন্যায় যে মোএঞ্জোদড়ো শহরটি বারবার বিধ্বস্ত হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। মৌসুমী বায়ুর গতি পরিবর্তনের কথাও আগে বলা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়া অন্য কারণও কল্পনা করা যেতে পারে। বহিরাগতদের আক্রমণেও এ সভ্যতা বিলুপ্ত হতে পারে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন এই বহিরাগত আক্রমণকারী হচ্ছে বৈদিক আর্যেরা। এ অনুমানের পিছনে সঙ্গত কারণ আছে। মোএঞ্জোদড়ো শহরের শেষ স্তরে পথেঘাটে নানারকমের নরনারীর কঙ্কাল একত্র যেভাবে পড়ে থাকতে দেখা যায় তাতে মনে হয় হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে তারা নিহত হয়েছে। অনেকের খুলিতে ধারাল অস্ত্রের আঘাতের চিহ্নও আছে। এ থেকে মনে হয় বাহিরের আক্রমণেই বিলুপ্ত হয়েছে এ সভ্যতা। এ যুক্তির সমর্থন বৈদিক মন্ত্রেও মেলে। বেদে ইন্দ্রকে পুরন্দর বলে বন্দনা করা হয়েছে। পুরন্দর কথার তাৎপর্য হল: শত্রুনগর-বিধ্বংসকারী। তাহলে বোঝা যাচ্ছে বৈদিক আর্যেরা যে সভ্যতার উপর চড়াও হয়েছিল সেটা ছিল নাগরিক সভ্যতা, আর সিন্ধু সভ্যতাই সেই নাগরিক সভ্যতা।

উপসংহার

এই আলোচনা থেকে একটা জিনিস লক্ষণীয় এই যে, আমাদের বহু বোধ এবং সংস্কারের মূলে রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক এই সিন্ধু সভ্যতা। বাঙালী লোকসংস্কৃতির অনেক বিষয়ে ব্যাখ্যার জন্যে পণ্ডিতেরা মাথা খুঁড়ে মরছিলেন। সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারে অনেক জটিল বিষয়েরই সমাধান হয়ে গেল, অন্তত সমাধানের সূত্র পাওয়া গেল। লিপির পাঠোদ্ধার হলে আও কত রহস্যই যে উদ্‌ঘাটিত হবে তার ঠিক নেই। হয়ত প্রাচীন ইতিহাসের কতকগুলি পর্যায়কে ঢেলে সাজতে হবে। সুমের, মিশর ইত্যাদি যেসব সভ্যদেশের সঙ্গে সিন্ধুসভ্যতার যোগাযোগ ঘটেছিল সেখানে যদি দ্বিভাষিক কোনা লেখা পাওয়া যায়, অর্থাৎ একই বিষয়বস্তু যদি সিন্ধুসভ্যতার লিপি এবং সুমের বা মিশরের লিপির সঙ্গে একত্র পাওয়া যায়, তবে হয়ত এই লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হতে পারে।

সিন্ধুসভ্যতার আলোচনায় আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। মিশরের সভ্যতা যেমন নীলনদকে আশ্রয় করে, সুমেরের সভ্যতা যেমন তাইগ্রিস ইউফ্রেতিস

বহির্ভারতীয় অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ

নদীকে কেন্দ্র করে, হরপ্পা-মোএঞ্জোদড়োর সভ্যতা তেমনি সিন্ধু নদীকে কেন্দ্র করে। প্রাচীন সভ্যতাগুলিকে এজন্যই বলা যেতে পারে **নদীমাতৃক** (Riverine)। চীনের প্রাচীন সভ্যতাও বিকশিত হয়েছিল হোয়াং নদীকে আশ্রয় করে। নদীকে কেন্দ্র করেই যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতাগুলি বিকশিত হয়েছিল, এর পিছনে সমাজতাত্ত্বিক কারণ আছে।

অনুশীলনী

১। সিন্ধুসভ্যতা কোন্ যুগের? সিন্ধুসভ্যতার এলাকা নির্দেশ করে একটি **মানচিত্র** আঁক।

২। নগর-সভ্যতা গড়ে তোলবার ব্যাপারে কোন্ কোন আবিষ্কার সহায়ক হয়েছিল?

৩। হরপ্পা-মোএঞ্জোদড়োর আবিষ্কারের কাহিনী লেখ। এ দুটিকে যমজ-শহর বলবার তাৎপর্য কী?

৪। 'হরপ্পা-মোএঞ্জোদড়োর নগর পরিকল্পনা'—এই বিষয়ে একটি নিবন্ধ লেখ।

সভ্যতার বিলুপ্তি

বন্যা বা প্রাকৃতিক কোনো প্রচণ্ড দুর্যোগের ফলে এ সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটে থাকবে। বন্যায় যে মোএঞ্জোদড়ো শহরটি বারবার বিধ্বস্ত হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। মৌসুমী বায়ুর গতি পরিবর্তনের কথাও আগে বলা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়া অন্য কারণও কল্পনা করা যেতে পারে। বহিরাগতদের আক্রমণেও এ সভ্যতা বিলুপ্ত হতে পারে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন এই বহিরাগত আক্রমণকারী হচ্ছে বৈদিক আর্যেরা। এ অনুমানের পিছনে সঙ্গত কারণ আছে। মোএঞ্জোদড়ো শহরের শেষ স্তরে পথেঘাটে নানারকমের নরনারীর কঙ্কাল একত্র যেভাবে পড়ে থাকতে দেখা যায় তাতে মনে হয় হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে তারা নিহত হয়েছে। অনেকের খুলিতে ধারাল অস্ত্রের আঘাতের চিহ্নও আছে। এ থেকে মনে হয় বাহিরের আক্রমণেই বিলুপ্ত হয়েছে এ সভ্যতা। এ যুক্তির সমর্থন বৈদিক মন্ত্রেও মেলে। বেদে ইন্দ্রকে পুরন্দর বলে বন্দনা করা হয়েছে। পুরন্দর কথার তাৎপর্য হল: শত্রুনগর-বিধ্বংসকারী। তাহলে বোঝা যাচ্ছে বৈদিক আর্যেরা যে সভ্যতার উপর চড়াও হয়েছিল সেটা ছিল নাগরিক সভ্যতা, আর সিন্ধু সভ্যতাই সেই নাগরিক সভ্যতা।

উপসংহার

এই আলোচনা থেকে একটা জিনিস লক্ষণীয় এই যে, আমাদের বহু বোধ এবং সংস্কারের মূলে রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক এই সিন্ধু সভ্যতা। বাঙালী লোকসংস্কৃতির অনেক বিষয়ে ব্যাখ্যার জন্যে পণ্ডিতেরা মাথা খুঁড়ে মরছিলেন। সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারে অনেক জটিল বিষয়েরই সমাধান হয়ে গেল, অন্তত সমাধানের সূত্র পাওয়া গেল। লিপির পাঠোদ্ধার হলে আও কত রহস্যই যে উদ্‌ঘাটিত হবে তার ঠিক নেই। হয়ত প্রাচীন ইতিহাসের কতকগুলি পর্যায়কে ঢেলে সাজতে হবে। সুমের, মিশর ইত্যাদি যেসব সভ্যদেশের সঙ্গে সিন্ধুসভ্যতার যোগাযোগ ঘটেছিল সেখানে যদি দ্বিভাষিক কোনা লেখা পাওয়া যায়, অর্থাৎ একই বিষয়বস্তু যদি সিন্ধুসভ্যতার লিপি এবং সুমের বা মিশরের লিপির সঙ্গে একত্র পাওয়া যায়, তবে হয়ত এই লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হতে পারে।

সিন্ধুসভ্যতার আলোচনায় আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। মিশরের সভ্যতা যেমন নীলনদকে আশ্রয় করে, সুমেরের সভ্যতা যেমন তাইগ্রিস ইউফ্রেতিস

বহির্ভারতীয় অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ

নদীকে কেন্দ্র করে, হরপ্পা-মোএঞ্জোদড়োর সভ্যতা তেমনি সিন্ধু নদীকে কেন্দ্র করে। প্রাচীন সভ্যতাগুলিকে এজন্যই বলা যেতে পারে **নদীমাতৃক** (Riverine)। চীনের প্রাচীন সভ্যতাও বিকশিত হয়েছিল হোয়াং নদীকে আশ্রয় করে। নদীকে কেন্দ্র করেই যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতাগুলি বিকশিত হয়েছিল, এর পিছনে সমাজতাত্ত্বিক কারণ আছে।

অনুশীলনী

১। সিন্ধুসভ্যতা কোন্ যুগের? সিন্ধুসভ্যতার এলাকা নির্দেশ করে একটি **মানচিত্র** আঁক।

২। নগর-সভ্যতা গড়ে তোলবার ব্যাপারে কোন্ কোন আবিষ্কার সহায়ক হয়েছিল?

৩। হরপ্পা-মোএঞ্জোদড়োর আবিষ্কারের কাহিনী লেখ। এ দুটিকে যমজ-শহর বলবার তাৎপর্য কী?

৪। 'হরপ্পা-মোএঞ্জোদড়োর নগর পরিকল্পনা'—এই বিষয়ে একটি নিবন্ধ লেখ।

৫। হরপ্পা-মোএঞ্জোদড়োর বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক জীবনের পরিচয় দাও। ভারতের বাহিরে কোন্ কোন্ দেশের সঙ্গে সিন্ধুসভ্যতার যোগাযোগ ছিল? পণ্ডিতেরা কিসের ভিত্তিতে এবিষয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন?

৬। মোএঞ্জোদড়ো যে অঞ্চলে অবস্থিত তার জলবায়ু যে আগে অন্যরকম ছিল তার প্রমাণ কী?

৭। সিন্ধুসভ্যতার রাষ্ট্রব্যবস্থাটা ছিল সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীদের হাতে—এ অনুমানের ভিত্তি কী? এ অনুমান যদি সত্য হয় তবে সিন্ধুসভ্যতার শাসন ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন পরিভাষায় চিহ্নিত করা যায় কি? মিশর এবং সুমেরের শাসন-ব্যবস্থাকেই বা কী বলা যাবে।

৮। সিন্ধুসভ্যতার ধর্ম সম্বন্ধে পণ্ডিতদের অনুমান কী? এই অনুমানের ভিত্তিই বা কী?

৯। আমাদের অনেক সংস্কার বা রীতিনীতির মূলে আছে সিন্ধুসভ্যতা—উদাহরণ সহ আলোচনা কর।

১০। যানবাহন থেকে কোনো সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের আভাস পাওয়া যায়। সিন্ধুসভ্যতার যানবাহনকে কেন্দ্র করে এই উক্তিটি পর্যালোচনা কর।

১১। সিন্ধুসভ্যতা গড়ে তুলেছিল করা? এই সভ্যতাকে প্রাগৈতিহাসিক বলা হয় কেন?

১২। পৃথিবীর আদিম সভ্যতাগুলি নদীকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে—এর কারণ কী?

১৩। শিক্ষামূলক সফর॥ কলকাতার জাদুঘরের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ।

[সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে আরও জানতে হলে পড়:

(ক) হরপ্পা চল হরপ্পা পার হয়ে॥ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

(খ) পৃথিবীর ইতিহাস॥ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও রামকৃষ্ণ মৈত্র]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৈদিক সভ্যতা

'প্রথম প্রভাতে উদয় তব গগনে
প্রথম সাম-রব তব তপোবনে'—

সুদূর অতীতে ভারতের অরণ্যগর্ভ থেকে সামগান ধ্বনিত হয়েছিল আকাশে বাতাসে :

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।
হোতারাং রত্নধাতম্॥

এই মন্ত্র-উদ্‌গাতা ভারতীয় আর্যেরা। ভারতীয় আর্য কাদের বলব? আর্যরা ভারতের লোক নয়—এরা বাহির থেকে এসেছে। আর্যদের যে শাখাটি ভারতে এসেছিল তাদেরকেই ভারতীয় আর্য বলা হয়।

আর্যদের ভারতে আগমন

আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল মধ্য এশিয়ায়। সেখান থেকে কোন এক সময়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে, সম্ভবত খাদ্য আর বসতির প্রয়োজনে। এক দল যায় গ্রীস ইতালীর দিকে। আরেকটি দল যায় ঈরান আর পশ্চিম এশিয়ার দিকে। সেখান থেকে অনেকে এল ভারতের উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথ দিয়ে। এরা যে আগে একই মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল তা জানা গেল **তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের** গবেষণার ফলে। ভাষাতাত্ত্বিকেরা প্রমাণ করেছেন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবার আগে এরা একই ভাষায় কথা বলত। বিচ্ছিন্ন হবার পর দলগুলো স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে গড়ে ওঠে। মূল ভাষাটিও ক্রমশ ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয় : গ্রীক, লাতিন, ঈরানী (প্রাচীন পারসিক), সংস্কৃত। এই সব ভাষার শব্দবিশ্লেষণ করে এদের মধ্যে আত্মীয়তার সূত্র আবিষ্কার করেছেন ভাষাতাত্ত্বিকেরা। একটা দৃষ্টান্ত—সংস্কৃত : অস্+লট্ তি=অস্তি; গ্রীক : এস্তি; লাতিন : এস্ত্; প্রাচীন পারসিক : অস্তী, আধুনিক ফার্সী : অস্ত।

ভাষার মধ্যে এই সাদৃশ্য দেখে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করলেন এই সব ভাষাভাষীরা আগে একটি সাধারণ ভাষায় কথা বলত। অর্থাৎ তারা একটি অঞ্চলে একই মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। শুধু ভাষা নয়, এই সব জাতির আগেকার জীবনের রীতিনীতিতেও মিল পাওয়া গিয়াছে। ঈরানের বোঘাজ্‌কুই নাকে একটি জায়গায় মাটি খুঁড়ে এখানকার প্রাচীন একটি জাতি মিতানীদের বিষয়ে অনেক খবর পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে বৈদিক দেবতা **ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ** এদেরও প্রিয় দেবতা ছিল। ভারতের এবং ঈরানের এ জাতিরা নিজেরদের আর্য বলেছে। ঈরান শব্দটিই নাকি 'আর্যাণাম্'-শব্দজাত।

খৃষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে অর্থাৎ আজ থেকে চার হাজার বছর আগে আর্যরা ভারতে এসেছে। একবারেই আসেনি, ক্রমশ এসেছে। প্রথমে তারা যেখানে বসতি স্থাপন করে তার বৈদিক নাম **সপ্তসিন্ধু** প্রাচীন পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তাতে 'হপ্তহিন্দু' নাম পাওয়া গিয়াছে। (সংস্কৃত 'স' পারসিক উচ্চারণে 'হ' হয়ে যায়, যেমন সপ্তাহ>হপ্তাহ্)। আফগানিস্থানের কিছুটা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আর পাঞ্জাব—এই নিয়ে ছিল 'সপ্তসিন্ধু'। কিন্তু এই উপনিবেশ স্থাপন করতে আর্যদের বেগ পেতে হয়েছে, কারণ আদিবাসীরা তো আর ভাল মানুষের মতন জায়গা ছেড়ে দেয়নি। লড়াই করেছে প্রাণপণে। কাজেই আর্যদের কাছ থেকে তারা আখ্যা পেয়েছে 'দস্যু'। বৈদিক যাগযজ্ঞ তারা সুযোগ পেলেই ভণ্ডুল করে দিয়েছে। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে এরাই 'অনার্য' আখ্যা পেয়েছে।

বসতি বিস্তার

উত্তর-পশ্চিম ভারতে নিজেদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে আর্যরা পূর্ব-ভারতে উপনিবেশ বিস্তারে মন দেয়। ক্রমশ মধ্যদেশ, কাশী-কোশল, মগধ-বিদেহ-অঙ্গ, রাঢ়-বরেন্দ্র-কামরূপে আর্যদের বসতি বিস্তৃত হয়, মনুর সময়ের (খৃষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ) কিছু আগে সমগ্র উত্তরাপথে আর্যেরা প্রভাব বিস্তার করে। মনু দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উত্তর ভারতকে আর্যাবর্ত বলেছেন ঃ

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্বাদাসমুদ্রাচ্চ পশ্চিমাৎ
তয়োরেবান্তরং গির্যোঃ আর্যাবর্তং বিদুর্বুধাঃ॥

দক্ষিণ ভারতেও আর্য-বসতি বিস্তারের চেষ্টা হয়েছিল। বৈদিক যুগের শেষদিকে আর্যরা বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করতে শুরু করে। সাত্বতবংশ

আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দে বিদর্ভরাজ্য (বেরার প্রদেশে) স্থাপন করে। এদেরই আর এক শাখা দণ্ডকরাজ্য (নাসিকের কাছে) স্থাপন করে। অগস্ত্য যাত্রা এবং রামায়ণের গল্প আর্যদের দক্ষিণ ভারত অভিযানেরই ইঙ্গিত বহন করে। দক্ষিণ ভারতের পুলিন্দ, নিষাদ, শবর, কলিঙ্গ, অন্ধ্র প্রভৃতি অনার্য জাতিরা প্রবল ছিল বলে এখানে আর্যেরা বাধা পেয়েছে বেশি। শত্রু জয়ের জন্য নানাভাবে প্রার্থনা জানিয়েছে এরা। পূষন্-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ "আমাদের যাত্রা শেষ করতে সাহায্য কর। সমস্ত বিপদ দূর কর। যে সব ধূর্ত দস্যুরা আমাদের পথের বাধা হয়ে আছে তাদের বিতাড়িত কর।" আর্যদের সংগ্রাম তীব্রতর হবার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রও পুরোপুরি যুদ্ধের দেবতা হয়ে উঠেছে ঃ "ইন্দ্র তাঁর বজ্র আর বীর্য দিয়ে দস্যুদের নগর ধ্বংস করেছেন এবং ইচ্ছামত এগিয়ে চলেছেন। হে বজ্রধারি, তুমি আমাদের প্রার্থনামন্ত্র গ্রহণ কর, দস্যুদের উপর হানো তোমার অস্ত্র, শক্তিবৃদ্ধি কর আর্যদের।"

কিন্তু আর্যদের বসতি বিস্তারের ইতিহাস শুধু আর্য-অনার্য যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস নয়, আর্য-অনার্য সংস্কৃতি-সমন্বয়েরও ইতিহাস। আজ যে ভারতীয় সভ্যতা নিয়ে আমরা গর্ব করি তা আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিলনের ফলেই গড়ে উঠেছে।

সাহিত্য

আর্যদের প্রধান সম্পদ ছিল তাদের উন্নত ভাষা এবং গীতিমূলক সাহিত্য। বৈদিক সাহিত্যের (১৫০০-৬০০ খৃঃ পূঃ) কালানুক্রমিক বিভাগ তিনটি ঃ (ক) **বেদ** বা **সংহিতা** (খ) **ব্রাহ্মণ** (গ) **আরণ্যক** ও **উপনিষদ।** যজ্ঞীয় **ঋক্, সাম, যজু** ও অযজ্ঞীয় **অথর্ব**—এই নিয়ে বেদ বা সংহিতা চারটি ঋগ্বেদ অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ইত্যাদি দেবতাদের উদ্দেশ্যে রচিত মন্ত্রের সমষ্টি। সামবেদ নতুন কিছু নয়, ঋগ্বেদের কবিতাগুলোই এতে এমনভাবে সাজানো আছে যাতে যজ্ঞে গান করবার সুবিধা হয়। যজুর্বেদ হচ্ছে যজ্ঞ-বেদ বা যজ্ঞবিজ্ঞান। কখন কোন্ যজ্ঞ কিভাবে করতে হবে, কোন্ যজ্ঞের কী ফল, কী তাৎপর্য এসব বলেছে যজুর্বেদ।

প্রত্যেক বেদেরই আবার একাধিক ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ আছে। ঋগ্বেদের প্রধান ব্রাহ্মণ হচ্ছে **ঐতরেয় ব্রাহ্মণ**। ঐতরেয় ব্রাহ্মণই সবচেয়ে প্রাচীন

(আনুমানিক ১০০০ খৃঃ পূঃ)। সামবেদের প্রধান ব্রাহ্মণের নাম **পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ**। যজুর্বেদের ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য **তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ** আর **শতপথ ব্রাহ্মণ**। এইসব ব্রাহ্মণের মধ্যে ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ গল্প আছে।

ব্রাহ্মণের পর আরণ্যক আর উপনিষদের সৃষ্টি। যাঁরা বানপ্রস্থ অবলম্বন করতেন, বনে বসে জটিল যাগযজ্ঞ করা সম্ভব হত না বলে তাঁদের জন্যে সৃষ্টি হয়েছিল **আরণ্যক** নামে দার্শনিক গ্রন্থ। 'অরণ্যেহধ্যয়নাদেব আরণ্যকমুদাহৃতম।' আরণ্যকের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা **উপনিষদে** পরিণতি লাভ করে। উপনিষদের মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, এবং শ্বেতাশ্বতর—এই এগারোখানাই গুরুত্বপূর্ণ। উপনিষদগুলির রচনাকাল সম্ভবত ৮০০ থেকে ৫০০ খৃঃ পূঃ। ভাষা বিচার করেই পণ্ডিতেরা বৈদিক গ্রন্থগুলির পৌর্বাপর্য অনুমান করেছেন।

'ত্রয়ী' বলতে যে অথর্বকে বাদ দিয়ে শুধু ঋক্, সাম আর যজুঃকেই বোঝাত তার কারণ যজ্ঞে অথর্ববেদের ব্যবহার ছিল না। অথর্ববেদকে বৈদিক যুগে বলা হত **অথর্বাঙ্গিরসঃ**। অথর্ব আর অঙ্গিরস দুটো শব্দের অর্থই যাদুমন্ত্র। অথর্ব হচ্ছে 'সু-মন্ত্র'—সুখ শান্তি নিরাময় ইত্যাদির প্রার্থনামন্ত্র। আর অঙ্গিরস হচ্ছে 'কু-মন্ত্র—শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীর অমঙ্গল কামনায় উচ্চারিত অভিশাপমন্ত্র। অথর্ববেদের ৭২১টী স্তোত্রে প্রায় ৬০০০ শ্লোক আছে। অথর্ববেদকে শুধু যাদুমন্ত্রের সমষ্টি মনে করলে ভুল হবে। উচ্চভাবের কবিতাও এতে অনেক আছে। বরুণস্তোত্রটি উল্লেখযোগ্য :

"দুজন একত্র হয়ে যখন ষড়যন্ত্র করে এবং ভাবে, মাত্র তারাই আছে, তখন তাদের মধ্যে তৃতীয় হিসাবে বরুণ উপস্থিত এবং তাদের সমস্ত পরিকল্পনাই তাঁর নিকট জ্ঞাত। এই পৃথিবী তাঁরই, ঐ দিগন্তব্যাপী অনন্ত আকাশও তাঁর। উভয় সমুদ্র তাঁর মধ্যে অবস্থিত; অথচ ঐ সামান্য জলটুকুর মধ্যেও তিনি রয়েছেন। আকাশে, পৃথিবীতে এবং আকাশের ওপারে যা কিছু বর্তমান সে সমস্তই বরুণের দৃষ্টির কাছে উন্মুক্ত।"*

আর্য-অনার্য সংস্কৃতি সমন্বয়ের অনেক স্বাক্ষর অথর্ববেদে আছে; ঐতিহাসিক বা সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় অথর্ববেদের গুরুত্ব অনেকখানি।

---

* প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস॥ ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

বৈদিক সাহিত্য ক্রমশ বিশাল আয় জটিল হয়ে পড়ল; তখন দরকার হল অল্পের মধ্যে মূল কথাগুলো বলবার। এই প্রয়োজন থেকেই **'সূত্র'** সাহিত্যের জন্ম। **ষড়্‌দর্শন** এবং **ষড়্‌বেদাঙ্গ** এই সূত্র-সাহিত্যের অন্তর্গত। ষড়্‌দর্শন বলতে কপিলের সাংখ্য, পতঞ্জলির যোগ, গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক, জৈমিনির পূর্বমীমাংসা এবং ব্যাসের উত্তর-মীমাংসা (বেদান্ত)। বেদাঙ্গ হচ্ছে বেদ-অধ্যয়নের সহায়ক শাস্ত্র। ছয় বেদাঙ্গ বলতে বুঝায়, শিক্ষা (উচ্চারণ), ছন্দঃ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়), জ্যোতিষ ও কল্প। নিরুক্ত ও ব্যাকরণ রচনায় যথাক্রমে যাস্ক ও পাণিনি দুর্লভ মনীষার পরিচয় দিয়েছেন। **'কল্প'** প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত: শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র। শ্রৌতসূত্র যাগযজ্ঞের নিয়মকানুন নিয়ে, গৃহ্যসূত্র সংসারধর্ম-সম্বন্ধীয় এবং ধর্মসূত্র ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রশাসন-বিষয়ক। এইসব সূত্র-সাহিত্য আমাদের দেশের নানা শাস্ত্রের জনক।

ধর্ম

প্রাচীন জাতিগুলির ধর্মবিশ্বাসের মূলে ছিল ভয় বা বিস্ময়। আর্যেরাও প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে অর্ঘ দিয়েছে ভয়ে বা বিস্ময়ে। প্রাকৃতিক শক্তিগুলোই পরে ব্যক্তিত্বে মণ্ডিত হয়ে দেবদেবী হয়ে উঠেছে। আর্যদের প্রধান উপাস্যদের মধ্যে ছিল অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য (মিত্র), মরুৎ, উষা, পৃথিবী, নাসত্য, যম ইত্যাদি দেবতা। কিন্তু বহুত্বের মধ্যেও একত্বের ধারণা ঋগ্বেদের যুগেই লক্ষ্য করা যায় পুরুষসূক্তেঃ 'পুরুষ এবেদং সর্বম্ যদ্ ভূতম্ যশ্চ ভব্যম্'—বর্তমানে যা আছে, অতীত যা ছিল, এবং ভবিষ্যতে যা হবে সবই পুরুষ। দীর্ঘতমা ঋষির মন্ত্র 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' (একই সত্তাকে বিপ্রগণ বহু বলেন)—এটাকে উপনিষদের অধ্যাত্মচর্চার বীজ বলা যায়। এই ঐক্যবুদ্ধি কী কার আর্যদের মনে এল? পণ্ডিতেরা মনে করেন প্রকৃতি-উপাসনার মধ্যেই এই ঐক্যবুদ্ধির রহস্য লুকানো আছে। সূর্যে অগ্নি বিদ্যুতে অগ্নি, যজ্ঞবেদীতে প্রজ্বলিত অগ্নি, একই অগ্নির বিভিন্ন প্রকাশ দেখে আর্যরা বিভিন্ন দেবতার একই মহাশক্তির প্রকাশ কল্পনা করে থাকবে।

প্রথম দিকে আর্যদের ধর্মাচারণে বিশেষ জটিলতা ছিল না। দেবতাদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠ এবং অগ্নিতে আহুতিদান, প্রধানত এই ছিল ধর্মানুষ্ঠান। কিন্তু ক্রমশ যাগযজ্ঞাদির জটিলতা বেড়ে যাওয়ায় যাজক বা পুরোহিত শ্রেণীর

উদ্ভব হল, তারাই হয়ে উঠল ধর্মের ধারক। কালক্রমে অনার্যদের মূর্তিপূজা পশুবলিও আর্যদের পূজার মধ্যে আসতে লাগল। পরবর্তী কালে, আর্যদের যজ্ঞ আর অনার্যদের পূজার মধ্যে হল সন্ধি (পূজা কথাটিও অনার্যদের ভাষা থেকেই আর্যেরা গ্রহণ করেছিল) হিন্দুধর্ম আর্য-অনার্য সংস্কৃত-সমন্বয়ের ফল।

আর্য সমাজ

বৈদিক যুগের প্রথম দিকে আর্য সমাজে **বর্ণভেদ** ছিল না। কিন্তু যাগযজ্ঞে জটিলতা বাড়বার ফলে ব্রাহ্মণশ্রেণীর প্রাধান্য হল। ব্রাহ্মণদের যেমন যাগযজ্ঞটা একচেটে, রাজরাজড়াদের তেমনি যুদ্ধবিগ্রহ। তারা হল ক্ষত্রিয় (ক্ষত থেকে ত্রাণ করে যারা)। ক্রমশ বৈশ্য ও শূদ্র নামে আরও দুটি বর্ণের সৃষ্টি হল। যারা পশুপালন কৃষিকাজ ও ব্যাবসাবাণিজ্য করত তারা হল বৈশ্য। যারা এই উচ্চ তিন বর্ণের সেবক, তারাই হল শূদ্র। শূদ্র আর কারা হবে? যাদের আর্যেরা বারবার দস্যু বা অনার্য বলেছে তারাই। সম্ভবত 'ক্ষুদ্র' থেকে 'শূদ্র' কথাটির সৃষ্টি হয়েছে [ক্ষুদ্র=কৃষুদ্র>ষুদ্র (ক-লোপ)>শূদ্র]। ঋগ্বেদে এই চারিটি বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে তখনও জাতিভেদ প্রথা পুরোপুরি চালু হয়নি। বৈদিক যুগের শেষ দিকে জাতিভেদের কঠোরতা বাড়ে। শূদ্ররা সমস্ত সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

আর্যদের জীবন **চতুরাশ্রমে** বিভক্ত ছিল: ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। ছোটবেলায় সকলে গুরুর কাছে থেকে পড়াশোনা করত, আর গুরুর সেবা করত। এই জীবন হল ব্রহ্মচর্য-আশ্রম। তারপর বড় হয়ে, বিয়ে-থা করে সংসারী হত লোকে। এ হল গার্হস্থ্যাশ্রম। সংসারজীবন শেষ করে বনে গিয়ে তপস্যা করত তারা। একে বলা হত বানপ্রস্থ। তারপর সর্বত্যাগী বা সন্ন্যাসী হয়ে তারা পরমার্থ চিন্তায় মন দিত। এই হল সন্ন্যাস।

আর্যদের বৃত্তি ছিল পশুপালন, কৃষিকাজ আর ব্যাবসা-বাণিজ্য। মাটির কাজ, ধাতুর কাজ, কাঠের কাজে দক্ষ ছিল তারা। কাপড় বুনতে এবং কাপড় রাঙাতে তারা পারত। ধন বলতে ছিল গোধন। **বিনিময়ের মাধ্যমও** ছিল গোধন। 'নিষ্ক' শব্দের ব্যবহার দেখে মনে হয় বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বর্ণখণ্ডের প্রচলন ছিল কিন্তু একে ঠিক মুদ্রা বলা যায় না। এদের **গৃহপালিত পশু** ছিল গরু, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল, গাধা এবং

কুকুর। প্রথমদিকে প্রধানত পশুপালক ছিল আর্যরা, পরে চাষবাসে মন দিয়েছে তারা।

ঋগ্বেদে বৃষ্টির জন্যে আর ফসলের জন্যে অজস্র প্রার্থনা আছে। আর্যেরা যথেষ্ট পরিশ্রমী ছিল। **কৃষিকাজ** তারা খুব উৎসাহ নিয়ে করত। 'মাঠের দেবতার সঙ্গে মাঠকে জয় করে নেব আমরা। আনন্দে কাজ কর। লাঙল চলুক আনন্দে।' 'লাঙল বেঁধে রাখ, বলদ জোড়া খুলে দাও। তৈরী বীজ বোনো। আমাদের স্তোত্রগানের সঙ্গে সঙ্গে ফসল বাড়ুক। ঐ মাঠের পাকা ফসলে কাস্তে পড়ুক।'

গাড়িতে করে ফসল স্থানান্তর করবার রেওয়াজ ছিল: 'ঘোড়াদের দানাপানি দাও, মাঠের স্তূপাকার ফসল নাও, গাড়ি তৈরি কর,, যা অনায়াসে ফসল বয়ে নিতে পারে।'

আর্যদের প্রধান খাদ্য ছিল যবাদি শস্য, ফলমূল, দুধ, মাছ আর মাংস। তাদের প্রিয় পানীয় ছিল সোমরস। যজ্ঞ তো সোমরস ছাড়া অচল, দেবতাদের খুশি করতে হলেও লাগত সোমরস। বেদে সোমস্তোত্রের ছড়াছড়ি: 'যঃ কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ সমুদ্র ইব পিন্বতে।'—যে কুক্ষি (উদর বা অভ্যন্তরভাগ) সোমপানশীল, সেই কুক্ষি সমুদ্রের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দেবতাদের পেটে সোমের সমুদ্র ধরত বলেই তাদের অত শক্তি। দেবতারা যদি শক্তিমান না হয় তবে ভক্তজনের জন্যে অসাধ্যসাধন করবে কী করে? সোমরস সেই শক্তির যোগান দিত।

এই সোমরস বস্তুটি কী? কেউ বলেন সোমলতার রস এক রকমের মাদক দ্রব্য। কেউ বলেন এটা যৌগিক পদার্থ। কেউ বলেন বেদের 'সোম' হচ্ছে আবেস্তার 'হোম' এবং বাইবেলের জীবনবৃক্ষ (Tree of life) —জীবনসঞ্চারক বৃক্ষ। আরও কত জল্পনাকল্পনা!

আর্যদের **সাজপোশাক** ছিল সাদাসিধে! নীবি (কটিবাস), পরিধান (বস্ত্র) আর অধিবাস (উত্তরীয়)—এই ছিল তাদের পরিধেয়। তুলা আর পশম দু-রকমের পরিচ্ছদই পরত তারা। মেয়েরা গয়নাগাটি ভালবাসত। মণিমুক্তা এবং সোনারূপার অলংকার তৈরি হত। **আমোদ-প্রমোদের** মধ্যে ছিল রথচালনা, পাশাখেলা, শিকার আর নাচগান। বাজী বা পণ রেখে রথের দৌড় বা পাশা খেলা চলত। দ্যূত-ক্রীড়া বা জুয়াখেলা ব্যাপকভাবে চলত। জুয়ায় হেরে গিয়ে একজন জুয়ারী খেদ করছে: 'উত্তেজক পাশায় গুটি যখন ছকের উপর গড়িয়ে চলে তখন তা আমার কাছে 'মুজাবন্ত' পাহাড়ে জন্মানো

সোমলতার মতই প্রীতিকর মনে হয়। আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে কখনও ঝগড়া করত না। আমার উপর আর আমার বন্ধুদের (স্বজনদের) উপর সে সদয় ছিল। কিন্তু সর্বনেশে পাশার জন্যে আমি আমার সাধ্বী স্ত্রীকে পায়ে ঠেলেছি।'

জুয়াখেলা একরকম অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল বটে, কিন্তু সদ্‌গুণের কোনো অভাব ছিল না আর্যদের চরিত্রে। তারা পরের দুঃখে সমবেদনা বোধ করত। গরীব দুঃখীকে সাহায্য করত। অতিথিদের খুবই আদর করত।

মৃতদেহ সৎকারে সমাধি এবং দাহ দুই-ই চলত। মাটিকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে: 'মাটি, ওপরে ওঠো, ওকে ব্যথা দিও না। ওকে ঢেকে নাও যেমন করে মা তাঁর আঁচল দিয়ে ঢেকে নেয় শিশুকে।'

এই অনুচ্ছেদটি যেমন সমাধি-প্রথার সাক্ষ্য দেয়, তেমনি দাহ-প্রথার সাক্ষ্য দেয় এই উদ্ধৃতি: 'হে অগ্নি, তুমি ওকে ছাই করে ফেলোনা, ব্যথা দিও না।....ওর ত্বক্‌ আর দেহকে ক্ষতবিক্ষত করো না। হে অগ্নি, তোমার উত্তাপে ওর দেহ দগ্ধ হবামাত্র ওকে আমাদের পিতৃপুরুষের আবাসে পৌঁছে দিও।'

সমাজে সকলের অবস্থা সমান ছিল না, ধনী-দরিদ্র ভেদ ছিল। দারিদ্র্য এবং দুর্ভিক্ষের উল্লেখ আছে। সংহিতার যুগে গ্রামবাসী ছিল আর্যেরা। ব্রাহ্মণের যুগে অবশ্য কাশী কৌশাম্বী ইত্যাদি নগরের উল্লেখ আছে। ভারতের বাহিরে নানা দেশের সঙ্গে এদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। সম্ভবত সমুদ্রপথেও এরা যাতায়াত করত।

সমাজে **নারীর সম্মান** ছিল। ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্র মেয়েরা রচনা করেছে। এদের মধ্যে লোপামুদ্রা মমতা, ঘোষা এবং বিশ্ববারার নাম উল্লেখযোগ্য। মেয়েরা স্বামীর সহধর্মিণী হিসেবে যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগ দিত। অনেক মেয়ে বেশি বয়স পর্যন্ত বাবার কাছে থেকে পড়াশোনা করত। তারপর অধ্যাপনা করত। শুধু ঘরের কাজ নয়, দরকার হলে পুরুষের অনেক কাজই মেয়েদের করতে হত, বিশেষত যুদ্ধবিগ্রহের সময়। পিতৃপ্রধান হলেও বৈদিক সমাজে নারীর স্থান উঁচুতেই ছিল, কিন্তু পরবর্তী যুগে সমাজে নারীর মর্যাদা ক্রমশই কমতে থাকে।

বৈদিক যুগে রাষ্ট্রশাসন

পরিবারই বৈদিক যুগের সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি। পরিবারে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বা কর্তা তিনি হলেন 'গৃহপতি'। কয়েকটি পরিবারের

সমবায়ে গড়ে উঠত একটি গ্রাম। গ্রামের যিনি কর্তা তাঁকে বলা হত গ্রামণী। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে আবার একটি 'বিশ্' বা 'জন' গঠিত হত। বিশ্ বা জনের অধিপতির নাম বিশপতি বা রাজা।

পরিবার > গ্রাম > বিশ্ (জন)

গৃহপতি > গ্রামণী > বিশ্পতি

বৈদিক যুগের শাসনযন্ত্র পরিচালিত হত রাজতন্ত্রের ভিত্তিতে অর্থাৎ রাজাই ছিলেন সে যুগের শাসনব্যবস্থার পরিচালক। রাজারা স্বেচ্ছাচারী হতেন না, অযোগ্য রাজাদের প্রজারা সিংহাসনচ্যুত করতে পারত। ঠিক গণতন্ত্র বলতে যা বোঝায় বৈদিক যুগে তার অস্তিত্ব না থাকলেও অনেক রাজাই কিন্তু প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। আর গ্রামণী, সেনানী (সেনাবিভাগের অধ্যক্ষ) এবং পুরোহিত রাজাকে রাজ্যশাসন সংক্রান্ত নানারকম পরামর্শ দিত। জনসাধারণ সভা ও সমিতি নামে দুটো সংস্থার সাহায্যে রাজাদের কাজ-কর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে পারত।

আর্যেরা যে শুধু অনার্যদের সঙ্গেই যুদ্ধ করত তা নয়, অনার্যদের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর (Tribe) মধ্যেও ক্ষমতা বিস্তারের লড়াই চলত। তুর্বশ, যদু, পুরু এই সব উপজাতিগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন 'ভরত-রাজ' দিবোদাস। দিবোদাসের পুত্র বা পৌত্র সুদাসও পশ্চিমের আর্যবসতিগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছেন। এই যুদ্ধ 'দশ রাজার যুদ্ধ' নামে খ্যাত। এই ভাবে অন্যান্য রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করে রাজারা একচ্ছত্র হবার চেষ্টা করতেন। সাম্রাজ্য-ধারণার মূল এইখানেই। বিবদমান রাজারা দস্যুদের (অনার্যদের) সাহায্য নিতেন, ফলে আর্যদের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় অনার্যদের স্বীকৃতি বাড়তে থাকে।

মহাকাব্যের যুগ

রামায়ণ-মহাভারত আমাদের 'সব পেয়েছির দেশ'। রাজনীতিবিদ্ থেকে শুরু করে সমাজনীতিবিদ্, অধ্যাত্মবাদী, ঐতিহাসিক সকলেই চিন্তার খোরাক পাবেন এই দেশে। এইজন্যেই গ্রাম্য প্রবাদে শোনা যায়—যা নেই ভারতে (মহাভারতে) তা নেই ভারতে।

বৈদিক যুগেরই এক বিস্তৃত অধ্যায়ের ছবি এই রামায়ণ-মহাভারত। বৈদিক সাহিত্যে 'ইতিহাস' আর গাথা নারাশংসী (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জয়গান) সে যুগের কবিদের হাতে পড়ে মহাকাব্যে (Epic) পরিণত

হয়েছিল। পাশ্চাত্য মনীষীরাই রামায়ণ-মহাভারতের নাম দিয়েছেন 'মহাকাব্য'।

রামায়ণের রচনাকাল সম্পর্কে ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেছেন রামায়ণের বেশির ভাগ অংশই খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতকে রচিত হয়েছে, আর মহাভারত—যাকে তিনি ঠিক মহাকাব্য না বলে 'নীতিশিক্ষার বিশ্বকোষ' বলে উল্লেখ করেছেন তার রচনা খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতক থেকে ৪র্থ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে রামায়ণ কাব্যখানি মহাভারতের আগে রচিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে মতান্তর আছে।

বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও বলা যেতে পারে যে রামায়ণ-মহাভারতে চিত্রিত সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক বা অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই।

রামায়ণ-মহাভারতের যুগে রাজতন্ত্রই ছিল প্রচলিত শাসনপ্রণালী। জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকাজে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও শাসন পরিচালনার ব্যাপারে তাদের ভূমিকা নেহাৎ কম ছিল না। স্বৈরাচারী রাজাকে প্রজারা কখনই সহ্য করত না। অনুপযুক্ত রাজাকে সিংহাসন-চ্যুত করার নজির মহাভারতে আছে। অনেক উপজাতি অবস্থাবিশেষে রাজা নির্বাচন করত। দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখবার জন্যে রাজারা সব সময়েই সচেষ্ট থাকতেন। প্রজাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের প্রতিও রাজাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। রাজধানী প্রাচীর আর পরিখায় বেষ্টিত থাকত। সামরিক বিভাগেও যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। শাসন পরিচালনার মূল উদ্দেশ্যই ছিল প্রজাদের মঙ্গল বিধান করা। রামায়ণের রাজা রামচন্দ্রের প্রজাবৎসলতার তো কোনো তুলনাই মেলে না।

বৈদিক যুগের যে চারিটি বর্ণের কথা আগে বলা হয়েছে তাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় বর্ণই রামায়ণ-মহাভারতের যুগে প্রাধান্য পেয়েছে। গ্রাম্য অধিবাসীদের ওপরে স্বায়ত্তশাসনের ভার অর্পিত ছিল। বৈদিক যুগের প্রথম দিকটায় জাতিভেদ প্রথা ছিল বটে কিন্তু সে যুগের মানুষেরা বর্ণ বৈষম্যের ব্যাপারে অনেক উদার ছিল। তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের মধ্যে পরস্পর সামাজিক ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের আমলে জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণবৈষম্য অনেক বেশি তীব্র অ ার ধারণ করে।

রামায়ণ-মহাভারতের সভ্যতাকে এক হিসেবে 'কৃষিসভ্যতা' বলা যেতে পারে, কেন না এই যুগে জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন ছিল কৃষি। যারা পশুপালন বা পশু শিকার করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত এমন লোকের সংখ্যা ছিল অল্প। কৃষিব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে ব্যাবসা-বাণিজ্যেরও উন্নতি ঘটেছিল যথেষ্ট। নানা দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানিরও প্রচলন ছিল। সেই সঙ্গে ছিল শুল্ক ব্যবস্থা। প্রজারা ফসল অথবা অন্য কোন উৎপন্ন দ্রব্যের সাহায্যে তাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দিত।

রামায়ণ-মহাভারতে দীর্ঘায়ত **সমাজবিপ্লবের চিত্র** পরিস্ফুট। সে বিপ্লব একদিকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় অপরদিকে আর্য-অনার্য বিরোধ ও মিলনের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে। বিপ্লবের ফলশ্রুতি হল সমন্বয়। তাই জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির 'সংহত দীপ্তিরশ্মি' হল ভগবদ্‌গীতা। রামচন্দ্র হলেন চণ্ডালের মিতা, বানরের দেবতা, বিভীষণের বন্ধু'।

আর্য-অনার্য সংস্কৃতি-সমন্বয়

আর্য-অনার্য সংস্কৃতি-সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই ভারতীয় সভ্যতা বিবর্তিত হয়ে চলেছে। "একথা কেউ যেন মনে না করেন যে অনার্যরা আমাদিগকে দেবার মতো কোনো জিনিস দেয় নাই। বস্তুত প্রাচীন দ্রাবিড়গণ সভ্যতায় হীন ছিল না। তাহাদের সহযোগে হিন্দুসভ্যতা রূপে বিচিত্র ও রসে গভীর হইয়াছে। দ্রাবিড় তত্ত্বজ্ঞানী ছিল না কিন্তু কল্পনা করিতে, গান করিতে এবং গড়িতে পারিত। কলাবিদ্যায় তাহারা নিপুণ ছিল এবং তাহাদের গণেশ-দেবতার বধূ ছিল কলাবধূ। আর্যদের বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে দ্রাবিড়ের রসপ্রবণতা ও রূপোদ্ভাবনী শক্তির সংমিশ্রণ চেষ্টায় একটি বিচিত্র সামগ্রী গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা সম্পূর্ণ আর্যও নহে, সম্পূর্ণ অনার্যও নহে, তাহাই হিন্দু। এই দুই বিরুদ্ধের নিরন্তর সমন্বয় প্রয়াসে ভারতবর্ষ একটি আশ্চর্য সামগ্রী পাইয়াছে।" (ইতিহাস॥ রবীন্দ্রনাথ)

আর্য-অনার্য সংস্কৃতির ফল কী অপূর্ব হতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন 'ভারতের সংস্কৃতি' গ্রন্থে।

'এক ঋষির দুই পত্নী ছিলেন—ব্রাহ্মণী ও শূদ্রা। ব্রাহ্মণীর সন্তানকে আদর্শ শিক্ষা দিলেন ঋষি, কিন্তু শূদ্রার সন্তানকে উপেক্ষা করলেন যজ্ঞস্থলে।

ছেলে এসে মার কাছে কেঁদে পড়ল ঃ মা, বাবা আমাকে যেন চিনতেই পারলেন না। মা বললেন ঃ আচ্ছা, আমি তো শূদ্র-কন্যা অর্থাৎ পৃথিবীর সন্তান, আমার মা পৃথিবীকে ডেকে দেখি। মাতা বসুন্ধরা এলেন। ছেলেকে সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত করে তুললেন। এবারে শূদ্র পণ্ডিত তার অপমানের শোধ নিলেন ঋগ্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ লিখে। আর এটা যে ইতরার (শূদ্রার) ছেলের রচনা তা বোঝাবার জন্য ব্রাহ্মণটির নাম রাখলেন 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'। ঋগ্বেদ পড়তে গেলে এই ব্রাহ্মণখানি অপরিহার্য। এই গ্রন্থের বহু বাণী উন্নতভাবে মহীয়ান্।

চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণঃ যো ন তন্দ্রয়তে চরন্।
চরৈবেতি, চরৈবেতি ॥

চলাটাই হল অমৃতলাভ, চলাটাই তার স্বাদুফল, চেয়ে দেখ ঐ সূর্যের আলোকসম্পদ, যে সৃষ্টির আদি হতে চলতে চলতে একদিনের জন্যেও ঘুমিয়ে পড়েনি। অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

গতির বাণী কি অপূর্ব সুরে বেজেছে এই উক্তিটিতে। এমনি শিল্প সম্বন্ধেও ঐতরেয়ের বাণী অবিস্মরণীয় ঃ

ওঁ শিল্পানি শংসতি দেবশিল্পানি। এতেষাং বৈ শিল্পানাম অনুকৃতীহ শিল্পম্ অধিগম্যতে ···। শিল্পং, হাস্মিন্নধিগম্যতে য এবং বেদ যদেব শিল্পানি। আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানাং সংস্কুরুতে।

শিল্পীরা তাঁহাদের শিল্পসৃষ্টির দ্বারাই দেবতার স্তব করছেন। সৃষ্টিতে যে দেবশিল্প তারই অনুপ্রেরণায় শিল্পীদের যে এই সব শিল্প তাই বুঝতে হবে। যিনি এভাবে শিল্পকে দেখেছেন তিনিই শিল্পের মর্ম বুঝতে পেরেছেন। শিল্পের দ্বারাই শিল্পীর যে উপাসনা, তাতে স্বর্গ বা মুক্তি মেলে না। তার ফল হল শিল্পের দ্বারা আপনার আত্মাকে সংস্কৃত করে তোলা। শিল্প-সাধনার দ্বারা বিশ্বের দেবশিল্পের ছন্দে শিল্পী আপনাকে ছন্দোময় করে তোলেন।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে মহর্ষি ঐতরেয়ের এই বাণী-অবদান আর্য-অনার্য সংস্কৃতি সমন্বয়েরই অপূর্ব ফল।

বৈদিক সভ্যতা ও সিন্ধু সভ্যতার সম্পর্ক

সিন্ধু সভ্যতাকে বৈদিক সভ্যতার পূর্ববর্তী বলা হয়েছে। সিন্ধু-সভ্যতার স্থিতিকাল খৃষ্টপূর্ব ৩২৫০—২৭৫০ অব্দ। আর্যেরা ভারতে আসতে শুরু করে। খৃষ্টপূর্ব ২০০০—১৫০০ অব্দে। এই সময়-নিরূপণ নিতান্ত আনুমানিক। দুটি সভ্যতার কোন একটির কাল নিরূপণে ভুল হলেই এদের পৌর্বাপর্য সম্বন্ধেও সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হবে। লোকমান্য তিলকের মতে ঋগ্বেদের রচনা-কাল খৃষ্টপূর্ব ৪৫০০ অব্দেরও আগে। অনেক গবেষকও তিলককে সমর্থন করেছেন। মোট কথা সিন্ধুসভ্যতা যে বৈদিক সভ্যতার অঙ্গ নয় একথা জোর করে বলা যায় না। দুটো সভ্যতাই তাম্রপ্রস্তর যুগের। পাথরের অস্ত্রের (তীরের) উল্লেখ আছে বেদে। বেদে 'অয়স্' শব্দের উল্লেখ আছে বটে, তবে এ 'অয়স্' যে লোহা-ই এমন কথা জোর করে বলা যায় না। জার্মান পণ্ডিত টিসমার 'অয়স্' শব্দ ব্রোঞ্জ অর্থে নিয়েছেন। সোনারূপার ব্যবহার, মৃৎপাত্র তৈরী, মাছ মাংস খাওয়া, তীর ধনুক কুঠার ইত্যাদি অস্ত্রের ব্যবহার, মৃতদাহ প্রথা ইত্যাদি নানা বিষয়ে এই দুই সভ্যতার মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বৈদিক সভ্যতার প্রথম যুগে অবশ্য মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। সিন্ধু সভ্যতায় প্রচুর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু এইসব মূর্তি যে পুজো করা হত এমন কথা জোর করে বলা যায় না। মন্দিরও তো পাওয়া যায়নি সিন্ধুসভ্যতায়।

পার্থক্যও অবশ্য উপেক্ষণীয় নয়। সিন্ধুসভ্যতায় বৈদিক যুগের অশ্ব, রথ, কবচ, শিরস্ত্রাণ নেই। বৈদিক যুগে পুরুষ-দেবতার প্রাধান্য দেখে বৈদিক সমাজকে পিতৃপ্রধান, এবং সিন্ধুসভ্যতায় নারী মূর্তির ছড়াছড়ি দেখে এ সমাজকে মাতৃপ্রধান বলেই মনে হয়। কিন্তু এসব গরমিলও দুই সভ্যতার সম্পর্কশূন্যতা প্রমাণ করে না। অনেকে মনে করেন সিন্ধুসভ্যতা আর্য সভ্যতারই একাংশ বা একাঙ্গ। সহাবস্থানেও গরমিল থাকা অসম্ভব নয়, সেটা ক্রম-পরিণতির লক্ষণও হতে পারে। আর্যেরা একেবারে ভারতে আসেনি। বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন সময়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। সিন্ধুসভ্যতা যারা গড়ে তুলেছিল তারা আর্যদেরই একটি শাখা—এমন কল্পনা একেবারে অমূলক নয়।

অনুশীলনী

১। আর্যদের আদি বাসভূমি এবং ভারতে আসবার সম্ভাব্য পথ মানচিত্র এঁকে দেখাও।

২। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব আর্যসভ্যতার ইতিহাস গঠনে কিভাবে সাহায্য করেছে উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৩। ছক কেটে আর্যসাহিত্যের বিভাগ দেখাও।

৪। বৈদিক যুগে অথর্ব বেদের কৌলিন্য ছিল না কেন?

৫। একংসদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি—আর্যদের মনে এই ঐক্যবুদ্ধি জাগবার কারণ অনুধাবন কর।

৬। আর্য সমাজে ক্রমশঃ বর্ণভেদ দেখা দিল কেন?

৭। 'চতুরাশ্রম' কি? আধুনিক মানব সমাজে চতুরাশ্রমের পুনঃ প্রচলন সম্ভব কি?

৮। "আর্যদের সমাজ জীবন"—এই বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনা কর। শ্রেষ্ঠ রচনাটি বিদ্যালয়ের পত্রিকায় প্রকাশ করবার ব্যবস্থা হোক।

৯। "পিতৃপ্রধান হলেও বৈদিক সমাজে নারীর স্থান উঁচুতে ছিল"—এর কারণ কী?

১০। রামায়ণ ও মহাভারত থেকে এমন কতকগুলি ঘটনা বেছে বার কর যা থেকে সেকালের সমাজ বা রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান লাভ করা যায়।

১১। মহাভারতকে নীতি-শিক্ষার বিশ্বকোষ বলা হয়েছে।—মহাভারত থেকে নীতিশিক্ষামূলক কিছু শ্লোক সংগ্রহের চেষ্টা কর।

১২। আর্য-অনার্য সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ফল একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

১৩। "সিন্ধুসভ্যতা বৈদিক সভ্যতার পূর্ববর্তী"—এবিষয়ে একটি বিতর্কানুষ্ঠানের আয়োজন কর।

১৪। বিদ্যালয়ের নানা অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে বৈদিক মন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য ও মাধুর্য বাড়বে। বিষয়-শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের সংস্কৃত-শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সংস্কৃতানুরাগী ছাত্রদের নিয়ে একটি স্কোয়াড তৈরি কর। বিদ্যামন্দিরে গাইবার উপযোগী মন্ত্র নির্বাচন করে সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তির অভ্যাস কর। সামান্য স্বরসংযোগে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে বৈদিক মন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে নানা অনুষ্ঠানে গাইবার জন্য কয়েকটি মন্ত্রে স্বর দিয়েছেন। তার স্বরলিপিও প্রকাশিত হয়েছে। সংগ্রহ করতে পার রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপির বই থেকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম

বৈদিক যুগের শেষ দিকে চতুর্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা হয়ে উঠল প্রবল। যাগযজ্ঞের বিধিনিষেধে, পশুবধের নিষ্ঠুরতায় সমাজজীবন হারাল স্বাচ্ছন্দ্য, যজ্ঞের ধোঁয়ার দৃষ্টি হল রুদ্ধ। সমাজ হয়ে দাঁড়াল এক অচলায়তন।

প্রতিটি বেদ-সংহিতার সঙ্গেই একাধিক 'ব্রাহ্মণ' ভাগ যুক্ত হয়েছিল 'ব্রাহ্মণ' হল ক্রিয়াকাণ্ডের নির্দেশক, যার অনুষ্ঠাতা হিসেবে ব্রাহ্মণেরা পেল প্রাধান্য। গড়ে উঠল হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্যু ব্রহ্মা ইত্যাদি পুরোহিত সম্প্রদায়। সূত্র-সাহিত্যের প্রাধান্যের ফলে শ্রুতির চেয়ে স্মৃতিই হল বড়। কল্পসূত্রের সব শাখাতেই যাগযজ্ঞ এবং গৃহস্থের জাতকর্ম এ সবের ওপর স্মৃতিবিধানের খবরদারি হল সুরু। এর ফলশ্রুতি—সমাজে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, বর্ণবৈষম্য আর জাতি-ভেদের কঠোরতা।

কিন্তু পুরোহিতের আধিপত্য আর নয়। যজ্ঞের বিপুল ব্যয়ভার আর বহন করবে না রাজা কিংবা বণিকেরা। তাদের অর্থে ব্রাহ্মণের উদর-পূর্তির দিন ফুরোল। জনসাধারণ চাইল সহজ পথে চলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে। সমাজের অচলায়তন ভেঙে ফেলতে।

এই ধর্মবিপ্লবের প্রেরণা কিন্তু এল উপনিষদের ঋষিদের কাছে থেকেই। সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা উপনিষদের মাধ্যমে যে সত্য ঘোষণা করলেন তার ফলে মানুষ পেল কর্মকাণ্ডের জটিলতা ছেড়ে জ্ঞানের পথে চলবার ইঙ্গিত। নূতন জীবনের বাণী বয়ে আনলেন দুজন ক্ষত্রিয় রাজ-ভিখারী—মহাবীর আর সিদ্ধার্থ।

জৈনধর্ম ও মহাবীর

কথিত আছে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর বা মুক্তিপ্রদর্শক ধর্মপ্রচারকের চেষ্টাতেই জৈন ধর্মমত গড়ে ওঠে। এই তীর্থঙ্করদের মধ্যে প্রথম যিনি তাঁর নাম ঋষভ আর শেষ দুজনের নাম পার্শ্বনাথ ও বর্ধমান মহাবীর। কিন্তু ঋষভ বা পার্শ্বনাথের তুলনায় জৈনধর্ম বলতে মহাবীরের নামই বেশি মনে পড়ে, কেননা মহাবীরই এ ধর্মমতকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

খৃষ্টপূর্ব ৫৪০ অব্দের কিছু আগে বৈশালীর (বিহারের মজঃফরপুর অঞ্চল) লিচ্ছবি বংশে বর্ধমানের (পরে সিদ্ধি লাভ করে ইনি মহাবীর আখ্যা পান)

জন্ম হয়। ত্রিশ বছর বয়সে সংসার ছেড়ে ইনি সুদীর্ঘ বারো বছর কঠোর তপস্যা করে সিদ্ধ হন। জৈনদের ভাষায় তিনি 'জিন' (জয়ী বা জিতেন্দ্রিয়)। 'জিন' শব্দটি থেকে 'জৈন' শব্দের উৎপত্তি। ত্রিশ বছর ধরে ধর্মপ্রচার করার পর ৭২ বছর বয়সে মহাবীর রাজগিরের কাছে পাবাতে দেহরক্ষা করেন।

মহাবীরের আগেই পার্শ্বনাথ উপদেশ দিয়েছিলেন— হিংসা করবে না, মিথ্যা বলবে না, চুরি করবে না, কোনো দ্রব্য পরিগ্রহ করবে না। পার্শ্বনাথ-প্রবর্তিত এই **চতুর্যামের** সঙ্গে মহাবীর ব্রহ্মচর্য বা জিতেন্দ্রিয়তার আদর্শ যোগ করে দিলেন।

জৈনধর্মের সারমর্ম হল, মুক্তিই মানুষের শেষ উদ্দেশ্য। কিসের থেকে মুক্তি? এ মুক্তি হল জাগতিক দুঃখকষ্ট থেকে একেবারে অব্যাহতি লাভ করা। এ মুক্তির জন্যে চাই আত্মবিশ্বাস, চাই গুরুবাক্যের প্রতি অবিচল আস্থা, আর চাই পার্শ্বনাথ-মহাবীর প্রচারিত নীতি অনুসারে জীবন-নিয়ন্ত্রণ। আর প্রয়োজন কঠিনভাবে অহিংসধর্ম পালন করা। প্রতিটি প্রাণীর প্রতি হতে হবে সহানুভূতিশীল। এমনকি অচেতন বস্তুর প্রতিও হতে হবে কৃপাপরবশ। এ ছাড়া সাধনার ক্ষেত্রে ধ্যান, উপবাস ও তপস্যাও অবশ্য প্রয়োজনীয়।

জৈনধর্মের সম্প্রদায়

জৈনধর্মের প্রথম প্রতিষ্ঠাভূমি এবং প্রচারভূমি ছিল পূর্বভারত। পরে ভারতের নানা অঞ্চলে এই ধর্মমত ছড়িয়ে পড়ে। জৈনধর্মে দুটি সম্প্রদায় দেখা দিল—**শ্বেতাম্বর** আর **দিগম্বর**। যাঁরা সাদা বস্ত্র ব্যবহার করতেন তাঁরা হলেন শ্বেতাম্বর আর যাঁরা বস্ত্রাদি ব্যবহার না করে নগ্ন থাকতেন তাঁরা দিগম্বর। এই ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভবের মূলে ছিল দু-ধরনের ধর্মবিশ্বাস। শ্বেতাম্বররা শান্তির প্রতীক হিসেবে শ্বেত বস্ত্র পছন্দ করতেন আর দিগম্বররা সর্বস্বত্যাগের প্রতীক হিসেবে নগ্ন থাকাটাই আদর্শ বলে বিবেচনা করতেন। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কিন্তু কোনো মৌলিক ব্যবধান ছিল না।

জৈনধর্মের পুঁথিপত্র

মহাবীর মুখে মুখে যে ধর্মমত প্রচার করে গিয়েছেন পরবর্তী যুগে তার ভক্তেরা তা প্রাকৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। মহাবীরের উপদেশ বারোটি ভাগে বা অঙ্গে সঙ্কলিত হয়। এই অঙ্গ প্রাকৃত ভাষায় লিখিত হয়েছিল;

পরবর্তী যুগে অবশ্য জৈনদের ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। বারোটি অঙ্গ ছাড়াও উপাঙ্গ, মুলসূত্র প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র আছে।

জৈনধর্ম ভারতের বাহিরে কোথাও প্রচারিত হয়নি বটে, কিন্তু ভারতের মধ্যেই এর প্রসার অনেকখানি। আজও রাজপুতানা এবং গুজরাটের অনেক লোকের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে এই ধর্মমত।

বুদ্ধের জীবন ও সাধনা

বৌদ্ধধর্মের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তাঁর প্রকৃত নাম শাক্য গৌতম। মহাবীরের মতো ইনিও ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজার সন্তান। এঁর জন্মতারিখ নিয়ে নানা মত প্রচলিত। তবে সম্ভবত তিনি খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের লোক। বুদ্ধদেব পূর্বভারত বা নেপালের কপিলাবস্তু রাজ্যে জন্মেছিলেন আর পশ্চিম ভারত অর্থাৎ বিহারের অন্তর্গত গোরখপুর জেলার কুশীনগরে (বর্তমান কসিয়া) দেহত্যাগ করেন। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত তাই বলেছিলেন, বুদ্ধ হলেন
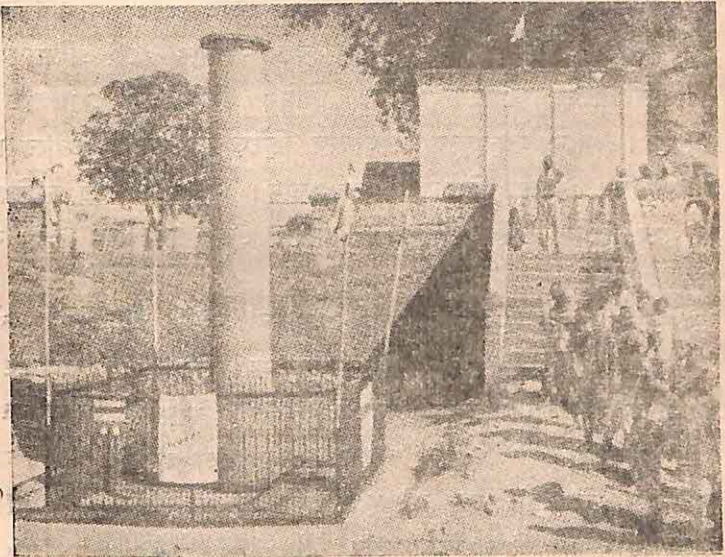
বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী

সূর্যের প্রতীক। বুদ্ধ পূর্ব দেশে জন্মে পশ্চিমদেশে দেহত্যাগ করেছিলেন—এর মানে আর কিছুই নয়, এ হল পুব-আকাশে সূর্যোদয় এবং পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের চিরন্তন ঘটনা।

এমনতর অনেক কল্পনা গড়ে উঠেছে বুদ্ধকে নিয়ে। প্রথম জীবনে তিনি সাধারণ রাজপুত্রের মতন বিলাস-ব্যসনে হয়েছিলেন মগ্ন। কিন্তু জীবনের চারটে অবস্থা—জরা, বার্ধক্য, পীড়া, মৃত্যু তাঁকে করে তুল্‌ল বৈরাগী। উনত্রিশ বছর বয়সে এক গভীর রাত্রে গৃহত্যাগী হলেন গৌতম। তারপর কঠিন সাধনার মধ্যে দিয়ে গঙ্গার কাছে নিরঞ্জনা নদীর তীরে 'বোধিবৃক্ষ' তলে 'বোধি' বা দিব্যজ্ঞান লাভ করলেন তিনি।

বুদ্ধের ধর্মমত

'বোধি' বৃক্ষের তলে বুদ্ধদেব ধ্যানালোকে উদ্ভাসিত যে সত্য পেয়ে গেলেন তা সংখ্যার দিক থেকে চারটি। এক, দুঃখ আছে। দুই, দুঃখের কারণ আছে। তিন, দুঃখের সমাপ্তি আছে। চার, দুঃখের সমাপ্তি বিধানের পথ আছে। দুঃখনিবৃত্তির পথ আছে আটটি—**অষ্টাঙ্গিক মার্গ:** সম্যক্‌দৃষ্টি, সদ্বাক্য, সৎকর্ম, সৎসঙ্কল্প, সৎজীবন, সৎচেষ্টা, সৎস্মৃতি আর সম্যক্ সমাধি। নিজের ওপর গভীর বিশ্বাস রেখে আর সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা রেখে যে এই আটটি রক্ষাকবচ ধারণ করে সাধনার পথে এগিয়ে চলবে তার সিদ্ধি হাতের মুঠোয়। কিসের সিদ্ধি? সিদ্ধি হল মোক্ষলাভ বা নির্বাণলাভ। মানে জন্ম-মৃত্যুর বেড়াজাল ছিঁড়ে দুঃখ-সুখের ওপারে চলে যাওয়ার সিদ্ধি। বুদ্ধদেব দিলেন সিদ্ধির সন্ধান। সাধনা-জগতের চাবিকাঠি তিনি তুলে দিলেন ভক্তের হাতে। অগণিত ভক্ত সাড়া দিল এই নব-ধর্মের আহ্বানে।

দুঃখমুক্তির জন্যে কৃচ্ছ্রসাধনার কোন প্রয়োজন নেই। শরীর-নিগ্রহ করে কিংবা মনকে উপবাসী রেখে সাধনা সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে ভোগ-সুখের স্রোতে গা ভাসিয়ে চল্‌ব? না, তাও নাও। মধ্যপথ অবলম্বন করতে হবে। তপশ্চর্যার কাঁটাপথ নয়, আবার নিছক ভোগবাসনার পথও নয়। কোন বিষয়ে চরমপন্থী হলে কী আর সিদ্ধ হওয়া যায়? এই প্রসঙ্গে একটা সুন্দর ঘটনা পণ্ডিত নেহেরু তাঁর Glimpses of World History বইতে বর্ণনা করেছেন:

বুদ্ধদেবের এক শিষ্য শরীরকে নানাভাবে কষ্ট দিয়ে সাধনভজন করত। শিষ্যটি আবার বীণা বাজাত অবসর সময়ে। বুদ্ধদেব একদিন তাকে ডেকে বললেন: তুমি এত কৃচ্ছ্রসাধন কর কেন? শিষ্য সসঙ্কোচে মাথা নিচু করল।

তথাগত বললেনঃ তুমি তো বীণা বাজাও, আচ্ছা বীণার তার যদি খুব চড়িয়া বাঁধ তা হলে কি বীণা স্বরে বাজে?

শিষ্য অসম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

বুদ্ধদেব আবার বললেনঃ বীণার তার যদি খুব ঢিলে করে বাঁধ তা হলে কি বীণা স্বরে বাজে? শিষ্যটি আবার অসম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

তথাগত এবার বললেনঃ তা হলে দেখ বীণার তার খুব চড়িয়ে বাঁধলেও বীণা স্বরে বাজে না, আবার খুব ঢিলে করে বাঁধলেও স্বরে বাজে না। মাঝামাঝি অবস্থায় তার বাঁধতে হয়। সাধনার ব্যাপারেও ঠিক তাই। শরীরকে খুব কষ্ট দিয়ে তপস্যা করলে সিদ্ধিলাভ হয় না। আবার খুব ভোগসুখের পথে চললেও সিদ্ধ হওয়া যায় না। মাঝামাঝি পথ ধরে এগিয়ে চলতে হয়।

গল্পটি ছোট্ট। কিন্তু খুবই মূল্যবান্। কেমন সুন্দর উদাহরণের সাহায্যে বুদ্ধদেব তার মধ্যে পথের সাধনতত্ত্ব বুঝিয়ে দিলেন।

জৈনদের মতন বৌদ্ধরাও বেদের অপৌরুষেয়তা বা তার মহিমা মেনে নেয়নি। তারা যাগযজ্ঞে বিশ্বাস করে না, আর বিশেষভাবে অহিংসা নীতি পালন করে। বৌদ্ধরা হিন্দুদের মতো কর্মবাদে এবং জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে। কিন্তু তাই বলে তারা 'আত্মা' মানে না।

মহাসঙ্গীতি

বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মমত মুখে মুখেই প্রচার করেছিলেন। তিনি তা লিপিবদ্ধ করে রাখেননি। তাঁর দেহাবসানের পর তাঁর প্রধান শিষ্যেরা চারটি অধিবেশনে মিলিত হয়ে তাঁর ধর্মমত ও আদর্শের সঙ্কলন তৈরি করেন। এই অধিবেশনকেই বলা হয়েছে মহাসঙ্গীতি। বুদ্ধের মতামত নিয়ে পরবর্তী যুগে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। মহাসঙ্গীতিতে এই মতভেদের সমাধানের চেষ্টাও করা হয়েছে।

বুদ্ধের দেহরক্ষার কয়েক সপ্তাহ পরে রাজগৃহে প্রথম এবং একশ' বছর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধমহাসঙ্গীতির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অশোকের রাজত্বের সময়ে পাটলিপুত্রে তৃতীয় আর খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কণিষ্কের রাজত্বকালে কাশ্মীরে (বা পাঞ্জাবের জলন্ধরে) চতুর্থ মহাসঙ্গীতির সভা হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমপরিণতির ইতিহাসে এই চারটি অধিবেশনের গুরুত্ব অনেক।

বৌদ্ধধর্মের সম্প্রদায়

বুদ্ধের সম্বন্ধে ভক্তদের বিভিন্ন ধারণা থেকে সৃষ্টি হয়েছে দুটি পৃথক সম্প্রদায়—**মহাযান** সম্প্রদায় আর **হীনযান** সম্প্রদায়। মহাযানী কারা? যারা বুদ্ধদেবকে কেবলমাত্র দার্শনিক সিদ্ধপুরুষ না ভেবে তাঁকে একেবারে খোদ ভগবানের আসনে বসিয়াছেন তাঁরা হলেন মহাযানী] মহাযানীদের মতে বুদ্ধ হলেন সমগ্র মানুষ জাতির রক্ষক। মহাযানীরা অনেকাংশে পৌত্তলিক। এ হিসেবে হিন্দুধর্মের সঙ্গে তাঁদের আত্মীয়তা খানিকটা আছে বলে মনে করা যেতে পারে। অন্যদিকে হীনযানীরা পৌত্তলিকতার বিশেষ বিরোধী তাঁরা বুদ্ধের উপর দেবত্ব আরোপ করতেও নারাজ।

মহাযানীদের 'মহা' আখ্যা দেবার পিছনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল যে এঁদের আদর্শ শুধু অর্হত্ব বা বৌদ্ধ ধর্মের বিনয়-ব্যবহার মেনে জপতপ করে পূজনীয় হওয়া নয়, একেবারে বুদ্ধত্ব লাভ করা। তবে মহাযানপন্থী সাধকেরা শুধুমাত্র বুদ্ধত্ব লাভ করাটাকেই যে একমাত্র কাম্য বলে মনে করেছেন তা নয়। তাঁদের মত, বুদ্ধত্ব লাভে 'সকলের সহায় হওয়া'টাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় আদর্শ। আর তার জন্যে যদি নিজের বুদ্ধত্বলাভের বাধা আসে তাও স্বীকার। এই সাধকেরা ধর্মের ব্যাপারে অনেক বেশি উদার-নৈতিক মত পোষণ করেন এবং এঁদের আদর্শের গণ্ডি অনেক বেশি প্রশস্ত। তাই তাঁরা নিজেদের মতবাদের আখ্যা দিলেন মহাযান আর যাঁদের আদর্শ কেবলমাত্র অর্হত্ব পর্যন্ত পৌঁছে থমকে দাঁড়াল, তাঁদের মতবাদের আখ্যা দিলেন হীনযান। হীনযানপন্থীরা নিজেদের 'মোক্ষ' বা 'নির্বাণ' নিয়েই ব্যস্ত।

হীনযান ও মহাযান এ দুয়ের মধ্যে কোনটি বেশি প্রাচীন একথা বলা কঠিন। তবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে পরবর্তী যুগে এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মমতই যথেষ্ট পরিপুষ্টি লাভ করেছে।

বৌদ্ধধর্মের পুঁথিপত্র

সাধারণ মানুষ যাতে বুদ্ধের ধর্মমতের মর্ম বুঝতে পারে তার জন্যে সংস্কৃত ভাষার বদলে পালিতে তাঁর ধর্মমত গ্রথিত হয়েছিল।

বৌদ্ধধর্মের বিপুল শাস্ত্র বুদ্ধের জীবদ্দশায় বা তাঁর দেহাবসানের কয়েক শ' বছরের মধ্যেই যে রচিত হয়েছে তা নয়। বহু শতাব্দী ধরে চলেছে এর রচনা। বৌদ্ধশাস্ত্রের নানা দিক নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা

করলে বোঝা যায়, অশোকের আগে বা খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের আগে যে বৌদ্ধশাস্ত্র রচিত হয়েছিল তার সংখ্যা খুব বেশি নয়। ত্রিপিটক তো দূরের কথা, একটি পিটকও রচিত হয়নি। অশোকের একশ' বছর পরেও ত্রিপিটকের কোনো নজির পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় শুধু পিটক কথাটি। ত্রিপিটকের দেহ গড়ে উঠেছে আরও পরে।

বৌদ্ধশাস্ত্র তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। এই তিন ভাগকে তিন পিটক বা **ত্রিপিটক** * বলা হয়। এই তিন পিটক হল—সূত্রপিটক, বিনয়পিটক আর অভিধর্মপিটক। সূত্রপিটকে বুদ্ধ কথা-প্রসঙ্গে নানান ধর্মোপদেশ দিয়েছেন, বিনয়পিটককে তিনি শিষ্যদের বিনয় আচার শিখিয়েছেন, আর অভিধর্মে আছে প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম আর দর্শনের তত্ত্বকথা। ত্রিপিটকের বাইরে যে সব বইপত্তর আছে সেগুলোর বেশির ভাগই টীকা-টিপ্পনী। মহাযানের প্রাচীন সাহিত্য কিন্তু কতকগুলো সূত্র নিয়ে গঠিত। তার সবচেয়ে প্রাচীন হল প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র। প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র প্রথমে লেখা হয়েছিল সংস্কৃতে। পরে তা নানান ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। প্রজ্ঞাপারমিতার রচনাকাল এখনও জানা যায়নি। অনেকে মনে করেন কণিষ্কের আগেই এই সূত্র রচিত হয়েছিল। অবশ্য পরে এর পরিবর্ধন ঘটেছে।

দর্শনের পুঁথিপত্তর ছাড়া মহাযান শাস্ত্রের কতগুলো কাব্যের সন্ধানও মিলেছে, যেমন 'ললিতবিস্তর' আর অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত'। অশ্বঘোষের লেখা কতগুলো ছোট ছোট বইও পাওয়া গেছে। শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতারকে কাব্য হিসাবেই ধরা যেতে পারে। অশ্বঘোষের 'সারিপুত্র প্রকরণ' নাটকও বুদ্ধদেবের জীবন-চরিত অবলম্বনে রচিত। এ ছাড়া কতগুলো বৌদ্ধস্তোত্র, যেমন সর্বজ্ঞমিত্রের স্রগ্ধরাস্তোত্র, বজ্রদত্তের লোকেশ্বর-শতক বা রাজা হর্ষদেবের সুপ্রভাতস্তোত্রও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই সব সূত্র বা পুঁথিপত্রের রচনাকাল সম্বন্ধে কিন্তু সঠিক কিছুই জানা যায়নি। বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের উপাখ্যান নিয়ে রচিত হয়েছে **জাতক**। এই জাতকের গল্পে বুদ্ধের সময় এবং তার আগেকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। আধুনিক যুগেও বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের ওপর অনেক বই লেখা হয়েছে।

---

* পিটক শব্দটির মানে ঝুড়ি বা বাক্স। বুদ্ধদেবের বাণী এই তিনটি পিটকের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত হয় বলে এর নাম **ত্রিপিটক**।

বৌদ্ধ শিল্প

ভারতবর্ষের শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রে বৌদ্ধদের অবদান অনেকখানি। বৌদ্ধ শিল্প তো শিল্প-জগতের বিস্ময়। বৌদ্ধভিক্ষুদের বসবাস ও উপাসনার জন্য নির্মিত হয়েছে কত বিহার, কত চৈত্য। এক যুগে এসব বিহার ও চৈত্য গঠনের উপকরণ ছিল প্রধানত কাঠ। পরবর্তী কালে বৌদ্ধশিল্পীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও শিল্পকুশলতায় পাহাড় বা পাথর থেকে জেগে ওঠে হাজার হাজার সঙ্ঘারাম আর চৈত্য। স্থাপত্যসৌন্দর্যে সে সবের তুলনা মেলাই ভার। বুদ্ধভক্ত অশোকের প্রতিষ্ঠিত সাঁচীস্তূপের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই স্তূপের অপূর্ব তোরণ তো এক অনবদ্য শিল্পকারু। অজন্তার গুহামন্দির শিল্পকর্ম আর সৌন্দর্যের দিক থেকে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গুহার সমকক্ষ এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আর অজন্তার দেয়াল-চিত্রের শিল্পশৈলী সম্বন্ধে বিদেশীরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

ভারতবর্ষের নানান্ জায়গায় পাহাড় কেটে যে কত চৈত্য-বিহার তৈরি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। পুণা, বিহার আর বোম্বাই-এর কার্লিতে অসংখ্য গুহামন্দির দেখা যায়। যেমন তাদের শিল্প-ভাস্কর্য তেমনি সুন্দর গঠন।

বৌদ্ধশিল্প ও তার প্রভাব ভারতের অঙ্গন ছেড়ে বিদেশের প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সিংহল, চীন, তিব্বত, ইন্দোচীন, মধ্যে এশিয়ার মূর্তিশিল্প এবং গুহামন্দির। যবদ্বীপের বোরোবুদুরের মন্দির বৌদ্ধশিল্পের এক বিস্ময়কর রূপায়ণ; মন্দিরের গায়ে ভারতবর্ষের অজন্তা বা অন্যান্য ইতিহাস-পরিচিত গুহার দেয়ালচিত্রের অনুকরণে অনেক ছবি বা কথা খোদাই করা হয়েছে। এসব ছবি—বুদ্ধের জীবনের বিচিত্র ঘটনার; আর কথা—বুদ্ধদেবের দর্শন ও ধর্মমতের।

বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব

সিংহল ব্রহ্মদেশ চীন জাপান শ্যাম জাভা মঙ্গোলিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি ঘটেছিল। অশোক, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, শীলভদ্র এঁরা সকলেই বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির দীপ জালিয়েছেন দেশে বিদেশে। অস্ত্র নয়, শান্তি ও মৈত্রীর বাণীই ভারতের অভিযানকে জয়যুক্ত করেছে।

ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব যথেষ্ট। বৌদ্ধধর্মের বাস্তবতা ও সরলতা আকর্ষণ করেছে ভারতবাসীর মন-প্রাণকে। যে শঙ্করাচার্য একদিন বৌদ্ধধর্ম নির্মূল করে হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন

এবং আজীবন তার জন্য চেষ্টা করে গিয়েছিলেন সেই শঙ্করাচার্যকে পর্যন্ত হিন্দুরা একদিন 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলেছে।

আজকে ভারতরাষ্ট্র বুদ্ধদেবের শান্তির আদর্শকে গ্রহণ করেছে। ভারত দেশবিদেশে যে 'পঞ্চশীল' প্রচার করেছে তা বৌদ্ধনীতির অনুসরণেই।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের তুলনা

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস এক। এই দুই ধর্মমতের মধ্যে তাই সাদৃশ্যই বেশি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাই বলে যে এদের মধ্যে পার্থক্য নেই তা নয়। জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ঘটেছে বেদবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে উভয় ধর্মমতই বেদের কর্মফলবাদে অবিশ্বাসী এবং অহিংসা নীতির সমর্থক। দুই ধর্মমতই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মৌন, কিন্তু বেদের কর্মফলবাদ কিংবা বর্ণভেদ খণ্ডনের ব্যাপারে মুখর। কিন্তু সাধন-ভজনের ক্ষেত্রে জৈনরা বৌদ্ধদের চেয়ে অনেক বেশি চরমপন্থী অর্থাৎ এঁরা বিশেষভাবে কৃচ্ছ্রসাধনের পক্ষপাতী। অহিংসা নীতি পালনেও এঁদের কড়াকড়ি অনেক বেশি। পোকা-মাকড় বা কীট-পতঙ্গ মরতে পারে বলে এঁরা কৃষিকাজ পর্যন্ত করতে কুণ্ঠিত, এমনকি রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া করতেও নারাজ। বৌদ্ধরা আত্মা মানেননি, কিন্তু জৈনরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছন। তবে এ জাতীয় পার্থক্যের ওপরে গুরুত্ব আরোপ না করাই সঙ্গত। জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কোন মৌলিক প্রভেদ নেই।

অন্য দিকে বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের তুলনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে এই দুই ধর্মমতের মধ্যেও মৌল পার্থক্য তেমন নেই। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অতিরিক্ত কোন নতুন ধর্মমত কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। অনেকে বৌদ্ধযুগকেই স্বীকার করেননি। তাঁদের মতে 'বৌদ্ধযুগ' একটি অপনাম। বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির উৎস কিন্তু বৈদিকধর্মের মধ্যেই নিহিত। বুদ্ধের যে চারটে "আর্যসত্য' তার নিদর্শন মেলে আয়ুর্বেদে। বুদ্ধদেব যেমন বলেছেন, দুঃখ, দুঃখ-কারণ, দুঃখমুক্তি আর দুঃখমুক্তির উপায়, আয়ুর্বেদে তেমনি আছে—রোগ, রোগের কারণ, রোগমুক্তি আর ঔষধ। বুদ্ধদেবের অষ্টাঙ্গিক মার্গের উৎসও হিন্দুদের সাংখ্য-দর্শনে। আর বুদ্ধদেব মধ্যপথ অবলম্বনের যে আদর্শ প্রচার করেছেন তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় গীতায়। তথাগতের অহিংসানীতির কথাও তো বৈদিক যুগে শোনা গিয়েছে।

অনেক পণ্ডিত বলেছেন বুদ্ধদেব নাকি বৈদিক ধর্মের বিরোধিতা আদৌ করেননি, তিনি শুধু যাগ-যজ্ঞে আর অনাচারের বিরোধিতা করেছেন। কবি জয়দেবও বুদ্ধ-অবতারের স্তবে বলেছেন:

নিন্দসি যজ্ঞবিধেঃ শ্রুতিজাতম্
সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্।

এর মানে দাঁড়াচ্ছে, তিনি (বুদ্ধদেব) মাত্র যজ্ঞবিধির শ্রুতিগুলোর নিন্দা করেছেন, অন্য শ্রুতির নিন্দা করেননি।

হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের যেটুকু পার্থক্য তা হল ধর্মের অনুশাসন ও ধর্মীয় ব্যবস্থা সংক্রান্ত। হিন্দুদের বর্ণাশ্রম ধর্মকে বুদ্ধদেব মেনে নেননি। আত্মাকে তিনি অবিশ্বাস করেছেন। হিন্দুদের কর্মফলবাদেরও বিরোধিতা করেছেন তিনি। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে আত্মিক মিল ছিল বলেই শঙ্করাচার্য একদিন তাঁর যুগান্তকারী প্রতিভাবলে সে যুগের হিন্দুধর্মকে যে সুসংস্কৃত রূপ দিয়েছিলেন তার সঙ্গে মিলে মিশে এক হতে পেরেছিল বৌদ্ধধর্ম। যে হিন্দুধর্ম একদিন বৌদ্ধধর্মের জন্ম দিয়েছিল সেই হিন্দুধর্মই আজ আশ্রয় দিয়েছে তাকে।

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের পরিণতি

জৈনধর্ম তুলনায় অনেক অবাস্তব ও সঙ্কীর্ণ, তবু এই ধর্মমত তার ক্ষীণ দীপশিখাটি আজও বাঁচিয়ে রেখেছে, অথচ বৌদ্ধধর্ম অনেক বেশি বাস্তব ও উদার হলেও ভারতবর্ষে তার শিখাটি নিবু-নিবু।

এর প্রধান কারণ হল জৈনরা বেদ-বিরোধী হলেও তাঁরা বৌদ্ধদের মতো হিন্দুধর্মের বিরোধিতা অত তীব্রভাবে করেননি। জৈনধর্ম হিন্দুদের অনেক আচার-অনুষ্ঠান, দেবতা মেনে নিয়েছে। এমনকি জৈনরা তাঁদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হিন্দু-ব্রাহ্মণদের পৌরহিত্য পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা হিন্দুদের সঙ্গে একটা আপোষ-মীমাংসা করে নিয়েছেন।

কিন্তু বৌদ্ধধর্ম পরস্পরবিরোধী নানান্ মতবাদ আর নৈষ্ঠিক আচরণের ভারে নিজেকে করেছে দুর্বল। তান্ত্রিক অভিচারও বৌদ্ধধর্মের অবনতির জন্যে দায়ী। তা ছাড়া যে বৌদ্ধধর্ম একদিন রাজানুগ্রহে পরিপুষ্টি লাভ করেছিল তা পরবর্তী যুগে রাজন্যদের পতনের ফলে অসহায় হয়ে দাঁড়াল। তারপর, তুর্কী-নিপীড়িত দুর্বল বৌদ্ধধর্ম শেষ আশ্রয় খুঁজেছে হিন্দুধর্মের বুকে।

রাজকৃপালাভে বঞ্চিত হয়েও কিন্তু জৈনরা বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পূর্ণ অবলুপ্তির হাত থেকে বেঁচেছে।

অনুশীলনী

১। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তির কারণ কী? মহাবীর ও সিদ্ধার্থ দুজনেই ক্ষত্রিয়। এটা কি নিতান্ত আকস্মিক, না এর কোনো সমাজতাত্ত্বিক কারণ আছে?

২। বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনী নিয়ে একটি নাটিকা রচনা কর।

৩। কয়েকজন ছাত্র তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে একটি আলোচনা বৈঠক বসাও। মনে কর তোমাদের মধ্যে একদল বৌদ্ধ, একদল জৈন, আর একদল হিন্দু। তোমাদের মধ্যে যেন ধর্মগত ঐক্য বা অনৈক্য নিয়ে বাদানুবাদ হচ্ছে। প্রথমে বিরোধের মধ্যে দিয়ে আলোচনা শুরু, পরে ঐক্যের সূত্র খুঁজে পেয়ে আলোচনার সমাপ্তি।

৪। ভারতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমবিলোপের কারণ কী?

৫। অনেক ঐতিহাসিক 'বৌদ্ধ যুগ' বলে স্বতন্ত্র যুগবিভাগ স্বীকার করেন না। এবিষয়ে তোমার মত কী?

৬। বুদ্ধদেবের বাণী সংগ্রহ করে 'বুদ্ধবাণী' নাম দিয়ে একটি পুস্তিকা সংকলন কর।

৭। বুদ্ধদেরের বিভিন্ন প্রতিকৃতি সংগ্রহ করে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন কর। এই প্রদর্শনীতে 'বুদ্ধবাণী' সমাবেশ করলে আরও ভাল হয়।

৮। ভারতের সংস্কৃতিতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব—এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মৌর্য যুগ

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র দুই ধরনের শাসনব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতাদখলের লড়াই চলত। এই সময়ে অবন্তী, বৎস্য, কোশল ও মগধ রাজ্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি মগধের রাজা ছিলেন বুদ্ধ-ভক্ত বিম্বিসার। বিম্বিসারের বংশ কয়েক পুরুষ রাজত্ব করার পর জনমত এই রাজবংশের বিরুদ্ধে যায়। জনসাধারণ শিশুনাগ নামে মগধের এক মন্ত্রীকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের প্রথম দিকে মহাপদ্ম নন্দ শিশুনাগ বংশের শেষ রাজাকে হত্যা করে মগধের সিংহাসন দখল করলেন। এরপর বেশ কিছুদিন মগধে নন্দ বংশের রাজত্ব চল্‌ল। আলেকজান্দার যখন ভারতে প্রবেশ করেন (৩২৭ খৃঃ পূঃ), তখন মগধে রাজত্ব করছিলেন নন্দবংশের শেষ রাজা ধননন্দ। এই সময়ে মগধ দরবার থেকে বিতাড়িত হয়ে চন্দ্রগুপ্ত নামে এক যুবক গ্রীক শিবিরে আসেন যুদ্ধবিদ্যা শিখতে। আলেকজান্দার ভারত ছেড়ে চলে গেলে তিনি গ্রীক সেনাপতিকে পরাস্ত করে পাঞ্জাব অধিকার করলেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

চন্দ্রগুপ্তের সঠিক বংশপরিচয় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতান্তর আছে। কেউ বলেন, তিনি নন্দবংশের সন্তান। তাঁর মাতা বা পিতামহীর নাম ছিল মুরা; 'মুরা' নাম থেকেই মৌর্য' বংশের উৎপত্তি বলে শোনা যায়। কিন্তু বৌদ্ধরা 'মৌর্যবংশ'কে নন্দবংশ থেকে স্বতন্ত্র এক ক্ষত্রিয়বংশ বলে উল্লেখ করেন। উত্তর ভারতে পিপ্পলীবন নামে এক ক্ষত্রিয় রাজ্য ছিল। এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন চন্দ্রগুপ্ত। পাঞ্জাব থেকে গ্রীকদের বিতাড়িত করে চন্দ্রগুপ্ত তক্ষশীলার এক কূট-ব্রাহ্মণ চাণক্য বা কৌটিল্যকে সঙ্গে নিয়ে মগধের নন্দবংশকে পরাভূত করেন। মগধের সিংহাসনের অধিকারী হয়ে (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৩২৪) চন্দ্রগুপ্ত স্বীয় বুদ্ধিবল, কূটনৈতিক চাতুর্য এবং প্রখর রাজনৈতিক প্রতিভা দিয়ে ভারতের এক শ্রেষ্ঠ রাজবংশ 'মৌর্যবংশের' প্রতিষ্ঠা করে যান।

উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত। পাটলিপুত্র তাঁর রাজধানী ছিল। গ্রীক দূত

মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্রে দীর্ঘকাল ছিলেন। শোনা যায়, শেষ বয়সে তিনি জৈনধর্মে দীক্ষিত হন এবং মহীশূরের অন্তর্গত শ্রবণবেলগোলায় অনশনে দেহত্যাগ করেন।

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **বিন্দুসার** মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন (খৃঃ পূঃ ৩০০)। মগধের রাজা রূপে তিনি 'অমিত্রঘাত' উপাধি গ্রহণ করলেন। বিন্দুসারের দূরদর্শিতা তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও রাজনীতিজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় ছিল। তাঁর রাজত্বকালে গ্রীকদের সঙ্গে মৌর্যদের প্রীতির সম্পর্ক ছিল। গ্রীক রাজদূত দায়িমাখোস্ (Daimachos) তাঁর সভা অলঙ্কৃত করেন। বিন্দুসারের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যোগাযোগের কথা ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করেছেন।

রাজর্ষি অশোক

এই পৃথিবীতে মাঝে মাঝে এমন একজন নরপতির আবির্ভাব হয় যারা তাঁদের বুদ্ধি, শিক্ষা ও জ্ঞান দিয়ে এক নূতন ইতিহাস রচনা করে যান। ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজর্ষি অশোক তেমনি এক নরপতি। চিন্তাশীল কর্মবীর-রূপেও তিনি স্মরণীয়।

বিন্দুসারের মৃত্যুর পর মগধের সিংহাসন নিয়ে তাঁর পুত্রদের মধ্যে মতভেদ ঘটে। কিন্তু অশোক স্বীয় শক্তিবলে সিংহাসন অধিকার করেন (২৭৩ বা ২৭১ খৃঃ পূঃ)।

প্রথম জীবনে অশোক পূর্বতন রাজাদের মতোই রাজ্যবৃদ্ধির দিকে মন দেন। আক্রমণ করেন পার্শ্ববর্তী কলিঙ্গদেশ। কলিঙ্গবাসীরা স্বদেশের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করেও জয়লাভ করতে পারেনি।

বিজয়ী হয়েও অশোক সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন জয়ী তিনি হয়েছেন সন্দেহ নেই—কিন্তু কিভাবে জয়ী হয়েছেন? হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেই তবেই এসেছে তাঁর সেই ঈপ্সিত জয়। অশোক অনুতপ্ত হলেন। তিনি বৌদ্ধভিক্ষু উপগুপ্তের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলেন। এরপর শুরু হল তাঁর 'ধর্ম-যাত্রা', যার জন্য ভারত তথা পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী হয়ে আছেন তিনি।

অশোকের ধর্মোপদেশ

রাজ্যে ধর্মপ্রচারের জন্যে অশোক বহু স্তম্ভ, স্তূপ প্রভৃতি নির্মাণ করেছিলেন। বিভিন্ন শিলাফলকে তিনি নানা মূল্যবান্ উপদেশ খোদাই করে রেখেছিলেন

এগুলি অশোকের অনুশাসন নামে খ্যাত। এই সব শিলালিপিতে অশোক 'দেবতাদের প্রিয় রাজা' রূপে উল্লিখিত আছেন। তাঁর অনুশাসনগুলিতে বারোটি গুণের ব্যবহারের উল্লেখ আছেঃ ধর্মে ভক্তি, আত্মসংযম, নম্রতা, দয়া, দানশীলতা, সত্যপ্রীতি, স্বল্পব্যয় ও স্বল্পসঞ্চয়, অচলভক্তি, সাধুতা, কৃতজ্ঞতাবোধ, শুচিতা, ভাবশুদ্ধি।

অশোকের একটি অনুশাসন লক্ষ্য করবার মতোঃ রুম্মিনদেঈ শিলাস্তম্ভ।
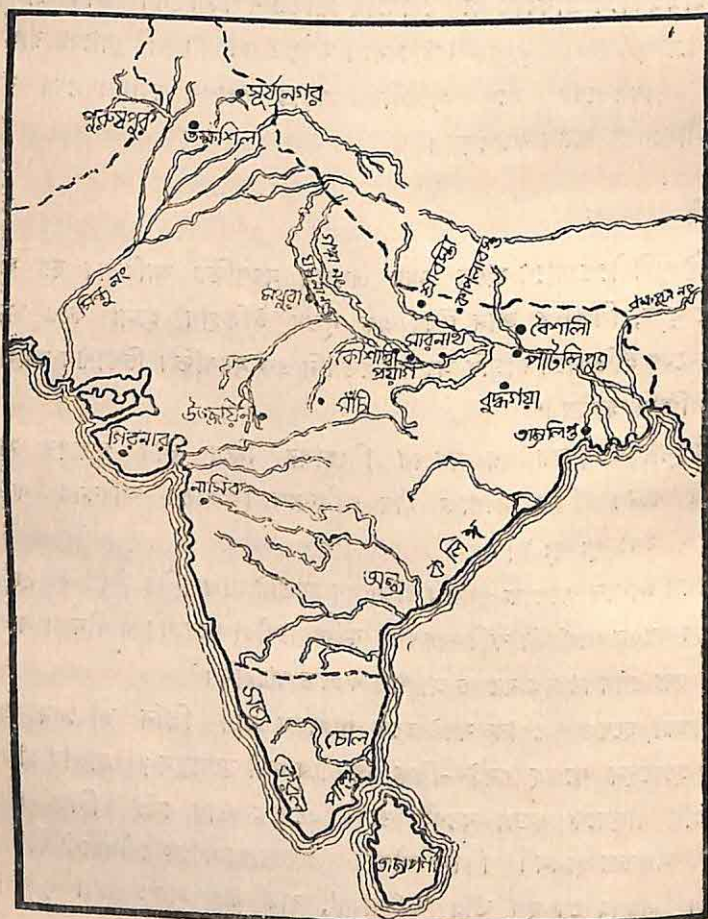
অশোকের রাজ্যসীমা। সেকালের রাজ্য ও নগরগুলির নাম লক্ষণীয়।

নেপালের তরাই অঞ্চলে পড়ারিয়ার নিকট রুম্মিনদেঈ মন্দির। পুরীর ভুবনেশ্বরের নিকট এই শিলালেখের একটি নকল অনুলিপি আবিষ্কৃত

হয়েছে। রুম্মিন্‌দেঈ = লুম্বিনীদেবী। হিউয়েনসাঙের বিবরণীতে বলা হয়েছে অশোক লুম্বিনী-উদ্যানে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেন।
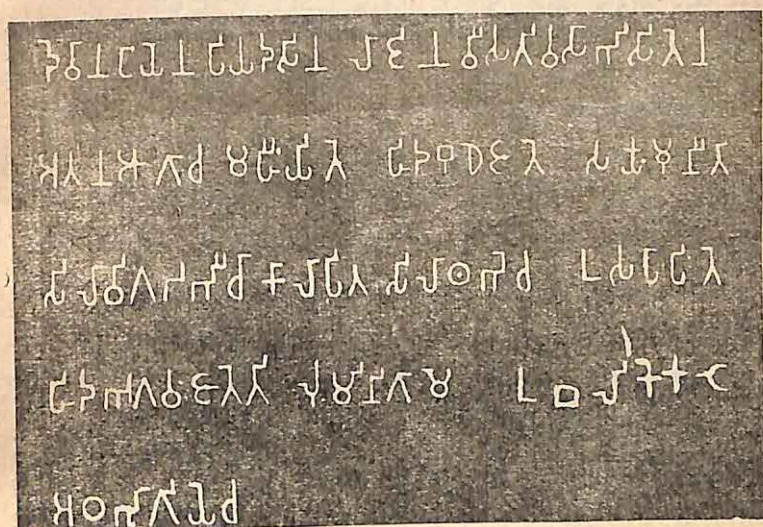
রুম্মিন্‌দেঈ শিলালিপি

অনুবাদঃ দেবতাদের প্রিয় বিশ বৎসরের অভিষিক্ত রাজা স্বয়ং এসে (এখানে) পূজা দিয়েছিলেন। এখানে শাক্যমুনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। (রাজা) এখানে প্রস্তরনির্মিত ইষ্টকপ্রাকার সমূহ নির্মাণ করিয়েছিলেন। শিলাস্তম্ভও তুলেছিলেন। এখানে ভগবান্ (বুদ্ধ) জন্মগ্রহণ করেছেন বলে লুম্বিনী গ্রামকে তীর্থকর-রহিত করা হয়, এবং উৎপন্ন শস্যের এক-অষ্টমাংশ কররূপে ধার্য হয় (অন্যত্র এক ষষ্ঠাংশের স্থলে)।

অশোকের অন্যান্য শিলালিপিতে জানা যায় তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর পশুবলি বন্ধ করেন, ধর্মপ্রচারের জন্য রাজপুরুষদের নিয়োগ করেন এবং নিজে ধর্মপ্রচারের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তিনি রাজ-কর্মচারীদের সব সময় উপদেশ দিতেন প্রজাদের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি দিতে—কোন অসৎ কাজ যেন তাঁর রাজ্যে না ঘটে।*

* অশোকের দু'টি অনুশাসন ঃ

১। দেবানাং পিয়ে পিয়দসি রাজা হেবং আহা মগেসু পি মে নিগোহানি লোপাপিতানি ছায়োপগানি হোসংতি পসুমুনিসানং অংবাবডিক্যা লোপাপিতা অঢকোসিক্যানি পি মে উড়ুপানানি খানাপিতানি নিংসিধয়া চ কলাপিতা

তিনি ধর্মপ্রচারের জন্যে নিজ পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) মহেন্দ্র এবং কন্যা (মতান্তরে ভগ্নী) সঙ্ঘমিত্রাকে ভারতবর্ষের বাইরে পাঠান। এগুলি থেকে তাঁর ধর্মের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধর্মকে আমরা বলতে পারি 'কল্যাণ ধর্ম'।

মৌর্যযুগের সমাজ-জীবন

প্রাচীন ভারতের মৌর্যযুগ বিভিন্ন কারণে উল্লেখযোগ্য। এযুগের নরপতিরা তাঁদের রাষ্ট্রশাসন, সমাজনীতি ও ধর্মনীতির জন্য ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। সমাজ ও রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা অর্থনীতি প্রভৃতিতে তাঁরা যে সংস্কার সাধন করেন পরবর্তী নরপতিরা সেগুলিকে যথাযোগ্য অনুসরণ করেছিলেন। সে যুগের সমাজ-জীবনের কথা জানা যায় (ক) মেগাস্থিনিসের বিবরণ (খ) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও (গ) অশোকের শিলালিপি থেকে।

(ক) মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে সেলুকসের দূতরূপে মেগাস্থিনিস আসেন। তিনি ভারতবর্ষ পরিক্রমা করে একটি গ্রন্থ লেখেন—'To Indika'. সে যুগের ভারত সম্পর্কে এই গ্রন্থটির একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। কিন্তু 'To Indika' গ্রন্থখানি বর্তমানে নেই। তবে আরিয়ান

আপানানি মে বহুকানি তত তত কলাপিতানি পটীভোগায়ে পসুমুনিসানং।
(দিল্লী তোপ্‌রা স্তম্ভলিপির সপ্তম অনুশাসন থেকে)

অনুবাদ: দেবতার প্রিয়দর্শী রাজা এই কথা বলিতেছেন,—পশুর ও মানুষের ছায়াপ্রদ হইবে বলিয়া আমি পথে ন্যগ্রোধ রোপণ করাইয়াছি, আম-বাগান বসাইয়াছি, আধ ক্রোশ অন্তরে আমি ইঁদারা করাইয়াছি, ঘাটবাঁধানো জলাশয় করাইয়াছি—এখানে সেখানে আমি অনেক কিছু করাইয়াছি, পশুর ও মানুষের সুখ শান্তির জন্য।

২। সবে মুনিসে পজা মমা। অথা পজায়ে ইছামি হকং কিংতি সবেন হিতসুখেন হিদলোকিক-পাললোকিকেন যুজেবুতি। তথা সবমুনিসেসু পি ইছাসি হকং। (ধৌলীলিপির অতিরিক্ত প্রথম অনুশাসন)

অনুবাদ: সব মানুষ আমার সন্তান। যেমন আমি সন্তানের বিষয়ে চাই তারা যেন ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সকল হিতসুখ পায়, তেমনি সব মানুষের বিষয়েও আমি ইচ্ছা করি।

ষ্ট্রাবো, ডায়াডোরস প্রমুখ প্রাচীন ঐতিহাসিকেরা তাঁদের গ্রন্থে মেগাস্থিনিসের 'To Indika'র কিছু কিছু অংশের উল্লেখ করেন। বিখ্যাত জার্মান অধ্যাপক ই. এ. শোয়েন্‌বেক প্রচুর পরিশ্রম করে প্রাচীন গ্রন্থগুলি থেকে মেগাস্থিনিস লিখিত অংশগুলি জুড়ে 'Megasthenis indica' প্রকাশ করেন।

মেগাস্থিনিসের বিবরণে জানা যায়, ভারতবর্ষ সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা। বৎসরে দুবাব ফল-শস্য উৎপন্ন হয়। বৃক্ষে যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে অসংখ্য নদনদী থেকে বাষ্প উত্থিত হয় এবং সংবৎসর বায়ু প্রবাহিত হয়। বর্ষাকালে শণ, তিসি, চীনা, জোয়ার, তিল, ধান প্রভৃতি উৎপন্ন হয় এবং শীতকালে গোধূম, যব, ডাল প্রভৃতি আহার্য শস্য উৎপন্ন হয়। ভারতের খনিজ দ্রব্যের প্রাচুর্যের কথাও উল্লিখিত আছে।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে মেগাস্থিনিস বলেন, ভারতবাসীরা সাতটি জাতিতে বিভক্ত : পণ্ডিত ; কৃষক ; পশুপালক ; শিল্পী ও পণ্যজীবী ; যোদ্ধা ; পর্যবেক্ষক এবং রাজসচিব ও মন্ত্রী। **পণ্ডিতেরা** মানমর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা কম। যাগযজ্ঞ করা এঁদের কাজ, এঁরা গণনার দ্বারা জনসাধারণকে বিভিন্ন বিষয়ের নির্দেশ দেন। যদি কারো গণনা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তবে সারাজীবন মৌনব্রত অবলম্বন করতে হত। **কৃষকেরা** চাষবাস দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। গ্রামে তাদের বাস। তারা রাজাকে ভূমিরাজস্ব দিতে বাধ্য থাকত। **পশুপালক ও ব্যাধেরা** শিকার, পশুপালন এবং ভারবাহী পশু ক্রয়-বিক্রয় করিত। এরা দেশকে বন্যপশু ও বীজভোজী পাখি থেকে মুক্ত রাখে এবং তার জন্য রাজার কাছ থেকে শস্য পায়। এরা যাযাবর এবং শিবিরবাসী। **শিল্পী ও পণ্য-জীবীরা** দৈনিক শ্রমে নিযুক্ত। এদের মধ্যে যারা অস্ত্রশস্ত্র ও নৌকা নির্মাণ করে তারা রাজকোষ থেকে বেতন ও আহার্য পায়, কারণ এরা কেবল রাজার জন্যই পরিশ্রম করে। **যোদ্ধারা** যুদ্ধ ছাড়া অন্যসময়ে আলস্যে মদ্যপান করে জীবন কাটায়। রাজকোষ থেকে এদের ভরণপোষণের ব্যয় নির্বাহ হয় সুতরাং এরা দরকার হলেই যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে প্রস্তুত থাকে। **পর্যবেক্ষকদের** কাজ রাজাকে রাজ্যের সমস্ত ঘটনা গোপনে অনুসন্ধান করে জানানো। দক্ষ ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিরাই এ কাজে নিযুক্ত হয়ে থাকে। **রাজসচীব ও মন্ত্রী** রাজ্যের সর্বোচ্চ পদসমূহের অধিকর্তা। দেশশাসনের গুরুভার এঁদের উপরই ন্যস্ত।

(খ) **কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের** রচনাকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এটি খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের রচনা।* প্রাচীন ভারতের সমাজ-বিবর্তনের ধারার এক উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় অর্থশাস্ত্রে। অর্থশাস্ত্রে **নগর পরিকল্পনার** (town planing) বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। প্রথমে স্থান নির্বাচন করা হত। তারপর চারদিকে গভীর পরিখা নির্মাণ করে তা থেকে 'বপ্র' প্রস্তুত করা হত। উঁচু ইট বা পাথরের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টনের ব্যবস্থা ছিল। নগরমধ্যে যাতায়াতের জন্য দরজা ছিল, তা ছাড়া একটি 'মহাদ্বার' (Main Gate) থাকত। রাজকর্মচারীদের থাকার ব্যবস্থাও করা হত। দ্বারপাল বা দ্বাররক্ষী নগরের ভিতরে বা বাইরে যাবার জন্য প্রত্যেকের উপর নজর রাখত। নবাগতদের 'মুদ্রা' (Passport) দেখাতে হত। নগরের মধ্যে দীর্ঘ রাজপথ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজপথের উল্লেখ পাওয়া যায়। পণ্যাধ্যক্ষের অনুমতি অনুযায়ী ব্যাবসা-বাণিজ্য করতে হত।

ভারতবর্ষে রাজ্যশাসন কেন্দ্র, বাণিজ্যকেন্দ্র বা তীর্থস্থানে নগর-অঞ্চল গড়ে ওঠে। সেযুগের বিভিন্ন নগর তৈরির বৈশিষ্ট্যের কথা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে।

(গ) সে যুগের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে অশোকের **শিলালিপিতে** অনেক কিছুই জানা যায়। প্রাদেশিক শাসনের জন্য 'কুমার' নামক কর্মচারীদের কথা উল্লিখিত আছে। মহামাত্র, রাজুক, প্রাদেশিক, যুত, পুরুষ ও প্রতিবেদক নামে আরও অন্যান্য রাজকর্মচারীদের কথা জানা যায়। এরা কেউ বা মন্ত্রী, কেউ বা রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী, কেউ বা গুপ্তচর, কেউ বা রাজ-অনুচর।

সে যুগে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। শাসনব্যবস্থায় রাজা ছিলেন প্রধান। তাঁর অধীনে অন্যান্য কর্মচারীরা তাদের নিজেদের কাজকর্ম পরিচালনা করত।

শিল্প

মৌর্যযুগ ভারতীয় শিল্প-সাধনার এক উজ্জ্বল অধ্যায়। সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় এই শিল্পের সৃষ্টি এবং প্রসার। অজানা কালের স্মৃতি-

* অর্থশাস্ত্রে চীনে রেশমের উল্লেখ আছে। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক বলেন মৌর্যযুগে চীন দেশ ভারতের অজ্ঞাত ছিল। অতএব অর্থশাস্ত্র মৌর্যযুগের রচনা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অবশ্য অর্থশাস্ত্রের অনেক অংশ পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে এমন অনুমান করা চলে।

বিজড়িত অশোকের স্তূপ এবং স্তম্ভগুলো ভারতের নানা স্থান থেকে আজ আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি। এগুলি মৌর্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি এক সময় মৌর্য রাজারা কাষ্ঠময় প্রাসাদ নির্মাণে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। অশোক নির্মাণ করেছিলেন পাথরের রাজপ্রাসাদ। পাটলিপুত্রের রাজ-প্রাসাদের কিছু কিছু নিদর্শন পাটনার কুমারহার নামক স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত এই প্রাসাদটির চারুকলার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হতে হয়। এ ছাড়াও আমরা পেয়েছি ঐ যুগে নির্মিত ভূপাল রাজ্যের অনবদ্য সাঁচী স্তূপ। এই স্তূপ অশোকের সময় নির্মিত হয়। পরবর্তী মৌর্যরাজারা এর সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন।

এক কথায় মৌর্য যুগে বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রচার এবং পৃথিবীর বহু দূর প্রান্তে শান্তি ও মৈত্রীর যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল তারই পরিণতি দেখা দিয়েছিল ভারতীয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের মধ্যে।

ভারতের সঙ্গে বিদেশের যোগাযোগ

মৌর্য-পূর্ব যুগেও ভারতের সঙ্গে পারস্য ও মধ্য এশিয়ার বহু সুসভ্য জাতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন। তারপর পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গেছে, গ্রীক বীরের শাণিত তরবারির আঁচড় পড়েছে পারস্য আর ভারতের বুকে। তবুও ভারতের সঙ্গে পারস্যের পুরনো সম্বন্ধ এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সেলুকস এবং বিন্দুসারের সময় দায়িমাখোস্ নামে গ্রীক রাজদূত ভারতে এসেছিলেন। দূত বিনিময়ের ফলেও ভারতের সঙ্গে বৈদেশিক যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছিল এবং বিদেশের বহু স্থানে মগধের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ কথা অস্বীকার করবার নয়।

সম্রাট অশোক ভারতের বাহিরে বুদ্ধদেবের অমর অহিংস বাণী প্রচার করে পৃথিবীর মানুষকে প্রেম ও মৈত্রীর পথে চালিত করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। সিংহলরাজ তাঁর প্রজাদের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন।

তারপর অশোকের প্রেরিত প্রচারকেরা একে একে সীরিয়ার রাজা এ্যান্টিয়োকস থিয়স, ম্যাসিডনের রাজা এ্যান্টিগোনাস গোনেটাস, এপিরাসের রাজা আলেকজান্দার ও মিশরের গ্রীকরাজা টলেমি ফিলাডেলফসকে বৌদ্ধধর্ম

দীক্ষিত করে তাঁদের রাজ্যে সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। অশোকের ঐকান্তিক সাধনায় বুদ্ধের অহিংস বাণী এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকার বহু স্থানে প্রচারিত হয়েছিল।

মৌর্য-পূর্ব যুগে ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যে যোগসূত্রটি স্থাপিত হয়েছিল সম্রাট অশোকের আমলে তাই ক্রমে স্থায়ী মৈত্রীর বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সূচনা করেছিল।

অনুশীলনী

১। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? অনেক ঐতিহাসিক বলেছেন: চন্দ্রগুপ্ত ভারতের প্রথম সম্রাট। এ উক্তির তাৎপর্য কী?

২। কোন্ কোন্ উপাদান থেকে মৌর্যযুগের সমাজ-জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়?

৩। মেগাস্থিনিস কর্ম বা পেশা অনুসারে ভারতের অধিবাসীদের পণ্ডিত কৃষক ইত্যাদি সাতটি জাতিতে ভাগ করেছিলেন। আমরা যদি আধুনিক ভরতবাসীদের বেলায় এই বিভাজন-নীতি প্রয়োগ করি, তবে বিভাগগুলি কী কী হতে পারে বল।

৪। বাহুবলে দেশ জয় বা রাজ্যবিস্তার না করেও অশোক ইতিহাসের এক শ্রেষ্ঠ চরিত্র—কেন?

৫। 'অশোকের অনুশাসনগুলি কোন্ ভাষা এবং কোন্ লিপিতে লেখা? এই লিপির পাঠোদ্ধার করেন কে? অশোকের কয়েকটি অনু-শাসন ও তার অনুবাদ সংকলন কর।

৬। মৌর্যযুগে ভারত ও বহির্জগতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয় কিভাবে? মৌর্যযুগে অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ নির্দেশ করে একটি মানচিত্র আঁক।

৭। মৌর্য শিল্পকলার নিদর্শন চিত্রাবলী সংগ্রহ কর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পারসিক ও গ্রীক সংস্পর্শ

বিম্বিসার যখন মগধের রাজা তখন, অর্থাৎ ৫৫৮-৫৩০ খৃষ্টপূর্বাব্দে সাইরাস (Cyrus)-এর নেতৃত্বে পারস্যে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। সাইরাস ছিলেন একজন নামজাদা বীর। তাঁর প্রভাব পূর্বাঞ্চলে ভারতের সীমান্তদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। আফগানিস্থানের অন্তর্গত কপিশা নগরীর তিনি ধ্বংসসাধন করেন এবং কাবুল নদী ও সিন্ধুনদের অন্তর্বর্তী অঞ্চল তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

ভারতবর্ষে পারসিক আধিপত্যের যথার্থ বিস্তার ঘটালেন দারায়ুস। তিনি গান্ধার (বর্তমান পেশোয়ার ও রাওয়ালপিণ্ডির চারদিকার অঞ্চল) দখল করলেন, সিন্ধুনদের মোহনা থেকে পারস্য পর্যন্ত সমুদ্রপথে এক নৌ-অভিযাত্রী বাহিনী পাঠালেন এবং রাজপুতানার উষর মরুপ্রান্তর পর্যন্ত সিন্ধুনদের বিস্তীর্ণ উপত্যকা জয় করে নিলেন। তিনি যে সব লিপিমালা খোদাই করে রেখে গেছেন তাতে গান্ধারকে সপ্তম ছত্রপ (Satrap) এবং সিন্ধু উপত্যকাকে (অর্থাৎ কিনা ভারতবর্ষের যে অংশ তিনি দখল করে নিয়েছিলেন) বিংশতিতম ছত্রপ বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর 'বেহিস্তন লিপি'তে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে। সে সময়ে ভারতবর্ষ ছিল পারসিক সাম্রাজ্যের সবচেয়ে জনবহুল এবং ঐশ্বর্যশালী প্রদেশ। ভারতবর্ষ থেকে প্রায় দশ লক্ষ স্টার্লিংএর সমান মূল্যের স্বর্ণরেণু কররূপে আদায় হত।

দারায়ুসের পুত্র জারেক্সেস যে তাঁর ভারতীয় প্রদেশগুলোর ওপর আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন, তার একটি প্রমাণ এই যে গ্রীকদের বিরুদ্ধে তিনি যে সৈন্যদল নিয়োজিত করেছিলেন তাতে অনেক ভারতীয় তীরন্দাজ ছিল। কিন্তু জারেক্সেস্-এর পরবর্তী পারসিক নৃপতিদের প্রভাব ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকের মাঝামাঝি একেবারেই মিলিয়ে গেল। ফলে এককালে যা পারসিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল ভারতবর্ষের সে সব অঞ্চলে এবার অনেক ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠল। ৩২৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে আলেকজান্দার যখন ভারত

আক্রমণ করলেন তখন ভারতবর্ষে পারসিক আধিপত্যের কোনো চিহ্ন ছিল না।

পারসিক প্রভাবের নিদর্শন

সিন্ধু উপত্যকায় পারসিক অধিকারের একমাত্র নিদর্শন হল **খরোষ্ঠীলিপি**। পারসিকরা এই লিপির প্রচলন করেন বলে মনে হয় এবং এর ব্যবহার ৪র্থ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে অব্যাহত ছিল। এছাড়া মৌর্য স্থাপত্যে, অশোকের অনুশাসনে এবং অশোকস্তম্ভের ঘণ্টার-মতো-অংশটির গঠনেও পারসিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিছুদিন আগে পাটলিপুত্রে যে খননকার্য করা হয়েছে তার ফলে দারায়ুসের রাজ-প্রাসাদের স্তম্ভের-আকারে-সাজানো প্রাসাদস্তম্ভের নিদর্শন পাওয়া গেছে। রাজার জন্মদিনে মাথার চুল ধোয়া (কেশধৌত) উপলক্ষে যে উৎসব পারস্যে অনুষ্ঠিত হত তার প্রভাব চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায়ও কিন্তু দেখা যায়। তা ছাড়া কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে একটা বিধান ছিল যে রাজা যখন চিকিৎসক কিংবা সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কোন বিষয়ে পরামর্শ করবেন, তখন তাঁকে ভিন্ন একটা ঘরে বসতে হবে এবং সে ঘরে আগুনের শিখা জ্বলতে থাকবে। এই আগুনের শিখাকে বলা হত 'পবিত্র অগ্নিশিখা'। অনেকের মতে এও পারসিক প্রভাবের একটি নিদর্শন।

কিন্তু ঐতিহাসিক হাভেলের মত আবর ভিন্ন। তাঁর মত, পারসিক প্রভাবের এসকল নিদর্শন দেখে একথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই যে ভারতবর্ষ পারস্যকে অন্ধভাবে অনুকরণ করেছে। বরং ভারত এবং ঈরানের লোকের একই আর্য-বংশোদ্ভব বলে দুই দেশের বধ্যে কিছু কিছু ঐতিহ্যের মিল থাকাটা আশ্চর্য নয়।

আলেকজান্দারের আক্রমণের পূর্বে ভারতের অবস্থা

আলেকজান্দার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন সিন্ধুনদ ছিল পারসিক সাম্রাজ্যের সীমারেখা, কিন্তু সে সময়ে পাঞ্জাবের কোনখানে পারসিক শাসনের চিহ্নমাত্রও ছিল না। বরং উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রদেশ-গুলি তখন ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এসব রাষ্ট্রের কোন-কোনটিতে রাজতন্ত্র, আবার কোন-কোনটিতে উপজাতি-অধ্যুষিত প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এদের নিজেদের মধ্যে কোনো ঐক্যবোধ কিংবা পরস্পর সম্মিলিত হবার আদৌ কোনো ইচ্ছা ছিল না। বরং

নিজেদের মধ্যে এরা হামেশাই যুদ্ধ-বিগ্রহ করত। ফলে আলেকজান্দারের খুব সুবিধে হল। দুর্বার গতিতে তাঁর বিজয়-অভিযান এগিয়ে চল্‌ল, কোনোখানে কোনো সম্মিলিত বাঁধা তাঁকে পেতে হল না।

তবে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের অবস্থা ছিল কিছুটা স্বতন্ত্র। মগধ তখন শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল এবং গঙ্গা ও চম্বল উপত্যকাস্থিত সমস্ত রাষ্ট্রকে তার আয়ত্তে এনেছিল।

আলেকজান্দাররে ভারত অভিযানের স্বরূপ কী? তাঁকে সাধারণ একজন সামরিক ভাগ্যান্বেষী কিংব লুণ্ঠনকারী বললে ভুল করা হবে। প্রথম থেকেই তাঁর চেষ্টা ছিল সিন্ধুনদের অববাহিকায় অবস্থিত ভারতীয় প্রদেশগুলিকে তাঁর সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া। তিনি শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, যে সকল নগরের পত্তন করেন, পোতাশ্রয় নির্মান করান এবং জল ও স্থলপথে যে-পরিবহন ব্যবস্থা করেন তার দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে তিনি তাঁর অধিকৃত অঞ্চলগুলিকে স্থায়িভাবেই তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুর ফলেই তাঁর সে পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারেনি।

'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'

আলেকজান্দারের ভারত অভিযানের প্রত্যক্ষ ফল বলতে তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা মনে পড়ে না, কেবল উত্তর-পশ্চিম ভারতে কিছু গ্রীক উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা ছাড়া। অশোকের শিলালিপিতে এসব যবন ঔপনিবেশিকদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে তাঁর এই অভিযান পরোক্ষভাবে ভারতের ইতিহাসে খুবই সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল :—

(১) ভারতবর্ষ এই প্রথম স্থল এবং জলপথে ইউরোপের সঙ্গে যুক্ত হল। ফলে পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হল।

(২) পশ্চিম এশিয়ায় যে সব গ্রীক উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা হল তাদের সঙ্গে ভারতের ভাবের আদান প্রদান, অর্থাৎ কিনা **'মানস-বাণিজ্য'** বৃদ্ধি পেল।

(৩) এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে গান্ধার অঞ্চলে এক নতুন ভাস্কর্যশিল্পের উদ্ভব হল। এই শিল্পরীতি **গান্ধার শিল্প** নামে পরিচিত। গ্রীকদেবতা অ্যাপোলোর অনুকরণে গঠিত বুদ্ধদেবের মূর্তিতে গান্ধার শিল্পের প্রভাব দেখা যায়। বৌদ্ধ ভাস্কররা এতদিন নানাবিধ প্রতীক—যেমন চক্র,

ছত্র কিংবা বুদ্ধদেবের চরণচিহ্ন খোদাই করে তাঁর উপস্থিতি জ্ঞাপন করতেন, তার কারণ তাঁরা পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন। গান্ধার রীতির শিল্পীরাই প্রথম বুদ্ধকে তাদের শিল্পকলার মধ্যে দিয়ে মানুষ হিসেবে ফুটিয়ে তুললেন।

(৪) অনেকের ধারণা বৌদ্ধধর্মে মূর্তিপূজার প্রচলন গ্রীক ভাবাদর্শের প্রভাবেরই ফল। কারণ বৌদ্ধধর্মের আদিম অবস্থায় মূর্তিপূজার কোন নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় না।

বুদ্ধদেব॥ গান্ধার শিল্প

আমরা আগেই দেখেছি যে আলেকজান্দারের ভারত-অভিযানের ফলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কিছু গ্রীক উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই সব ঔপনিবেশিকদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যাঁর নাম, তিনি সম্ভবত বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ 'মিলিন্দ্ পণ্হ বা 'মিলিন্দের প্রশ্নে' এঁরই কথা উল্লিখিত হয়েছে। এই গ্রন্থে যবনরাজের ধর্মজিজ্ঞাসা এবং বৌদ্ধ দার্শনিকের উত্তর সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে।

তক্ষশীলার গ্রীকরাজা অ্যান্টিয়ালকিডাস (Antialkidas) সুঙ্গ বংশের রাজা ভগভদ্রের বিদিশার রাজসভায় হেলিওডোরসকে দূতরূপে প্রেরণ করেছিলেন। এই হেলিওডোরস বাসুদেব তথা বিষ্ণুর উদ্দেশে বেসনগরে এক গরুরস্তম্ভ নির্মান করান। এই সুবিখ্যাত গরুড়স্তম্ভ ভারতের ভাগবত ধর্মের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন বলে পরিগণিত হয়।

* রাজা বললেন মহাশয় নাগসেন, আপনারা বলে থাকেন যে এই দুঃকে বিনাশ করতে পারলে অন্য দুঃখ আর আসে না।

—মহারাজ, আমাদের সন্ন্যাসগ্রহণ এই জন্যই।

—এত আগে থেকেই এত কষ্ট করার দরকার কী? সংকটকালে করলেই ত চলে।

—মহারাজ, সংকটকালের উদ্যম ব্যর্থ হয়। আপনি কি মনে করেন, যখন আপনি পিপাসায় কাতর হবেন তখন আপনি কুয়ো খুঁড়বেন? 'আমি জল খাব' বলে পুকুর কাটবেন?

(মিলিন্দ পণ্হ থেকে অনুবাদ)

এ ছাড়াও আরও অনেক ঘটনার মধ্যে দিয়ে দেখা যায় যে আলেকজান্দারের ভারত-অভিযানের পরোক্ষ ফল স্বরূপ ভারত ও গ্রীসের মধ্যে এক সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। উভয় দেশের এই দেওয়া নেওয়ার মধ্যে দিয়ে উভয় দেশেই চিত্ত ও বিত্তের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধি লাভ করেছে।
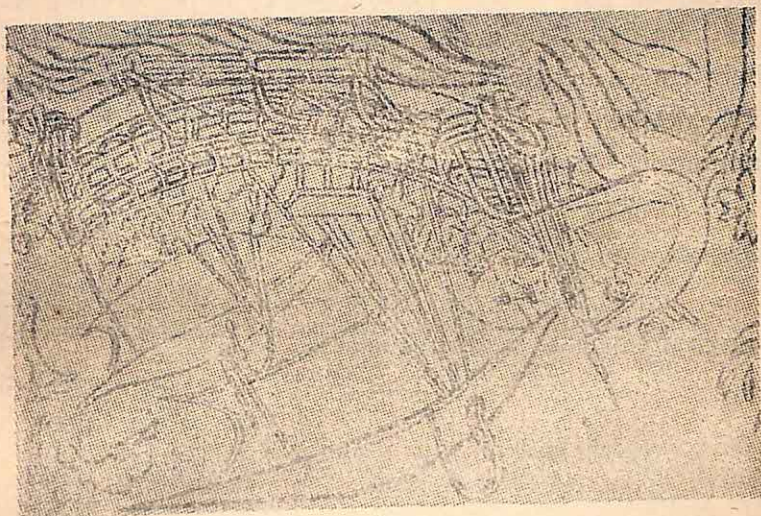
ভারতবর্ষের প্রাচীন বাণিজ্যতরী

খৃষ্টপূর্ব ২য় বা ১ম শতাব্দী থেকে রোমের সঙ্গে ও ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ভারত আমদানি করত টিন, সীসা কাঁচ ইত্যাদি আর রপ্তানি করত কার্পাসের কাপড়, সূক্ষ্ম মসলিন, রেশমী কাপড়, নীল মশলা ও নানারকম দামী পাথর। ভারত থেকে এই সব জিনিস আনতে রোমের বছরে প্রায় সাত কোটি টাকা লাগত। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনি এ কথা আমাদের সখেদে জানিয়েছেন। এই বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ রোমের সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটে॥

অনুশীলনী

১। ভারতে পারসিক প্রভাবের নিদর্শন কী কী? এই প্রভাব কি অনুকরণ-জাত

২। আলেকজান্দারের ভারত-আক্রমনের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? তিনি কি নিছক আক্রমণ-কারী?

৩। আলেকজান্দারের ভারত-আগমনের পথনির্দেশ করে মানচিত্র আঁক।

৪। ভারতে গ্রীক প্রভাব কোন্‌খানে কতটুকু পড়েছে আলোচনা কর। 'India and Greek world only touched each other on their fringes and there never was a chance for the elements of the Hellenistic tradition to strike deep roots in Indian soil'—একথা কি তুমি সমর্থন কর?

৫। 'বৌদ্ধধর্মের মূর্তিপূজার প্রচলন গ্রীক ভাবাদর্শের প্রভাবের ফল'—এই উক্তিটি কতদূর যুক্তিসঙ্গত আলোচনা কর।

৬। রোমের সঙ্গে ভারতে যোগাযোগ কখন কী সূত্রে ঘটেছিল? কোন কোন্ উপাদান এই যোগাযোগের সাক্ষ্য বহন করছে?

সমাজবিত্তার অব্জেকটিভ প্রশ্নাবলী

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীর ভাগ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরূপিত হয় পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মর্জি বা বিচারের ওপর। রচনাপ্রধান প্রশ্নোত্তরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরীক্ষক একই উত্তরপত্রে বিভিন্ন রকমের মার্কস্ দিয়ে থাকেন। সেই ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কারকল্পে 'Objective tests'-এর প্রচলন হয়েছে নানান্ দেশে। সমাজবিত্তা শিক্ষণে দেশ-বিদেশের যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁদের অভিমত হল, পরীক্ষা গ্রহণকালে অন্ততপক্ষে ২০% মার্কস্ 'অব্জেকটিভ' প্রশ্নাবলীর জন্য রাখতে হবে, যার মাধ্যমে সমাজবিত্তার অনেক বিষয়েই ছাত্র-ছাত্রীদের সম্যক্ জ্ঞানের পরিচয় লাভ করা সম্ভব। অতি সংক্ষিপ্ত আকারে বহু খুঁটিনাটি সামাজিক প্রশ্নের উত্তর খুব দ্রুত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে এই 'অব্জেকটিভ' প্রশ্নগুলোর মধ্যে দিয়ে।

এখান সাত রকমের প্রশ্নাবলীর সাহায্য নিয়ে সমাজবিত্তার এক অভীক্ষাপত্র প্রস্তুত করা হল। এর পরের দায়িত্ব বিষয়-শিক্ষকগণের। এই নমুনাগুলো অনুসরণে বিভিন্ন পরিচ্ছেদেব ওপর তাঁরা 'অব্জেকটিভ' প্রশ্ন তৈরী করতে পারবেন। প্রশ্নোত্তরের যে নির্দেশ দেওয়া থাকবে তা যেন পরীক্ষার্থীরা সহজেই বুঝতে পারে।

[ক]

নিচের শূন্যস্থানগুলো যথাযথ ভৌগোলিক / ঐতিহাসিক শব্দদ্বারা পূরণ কর :—

(১) স্পেনের ——গুহার চিত্ররাজি হাজার হাজার বছর আগেকার শিল্পনৈপুণ্যের স্বাক্ষর।

(২) ভোটীয়াদের বর্ষা-উৎসবের নাম——।

(৩) দামোদর নদকে বাংলার——বলা হয়।

(৪) গ্রীক রাজদূত——রাজা বিন্দুসারের সভা অলঙ্কৃত করেন।

(৫) পালিগ্রন্থ—তে মিনান্দারের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কথা লেখা আছে।

[খ]

বন্ধনীমধ্যে একাধিক উত্তর দেওয়া আছে ; সঠিক উত্তর বার কর ঃ—

(১) তূলা উৎপাদন বেশি হয় [মাদ্রাজ / কেরালা / বোম্বাই / পশ্চিমবঙ্গ] রাজ্যে।

(২) সাচীস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে [এলাহাবাদের / ভূপালের / পাটলিপুত্রের/সারনাথের] নিকটে।

(৩) তীর্থঙ্করদের মধ্যে প্রথম ছিলেন [মহাবীর / পার্শ্বনাথ / শঙ্করাচার্য / ঋষভ]।

[গ]

নিচের বিবৃতিগুলোর মধ্যে যেটি তোমার কাছে সত্য বলে মনে হয় তার ডানপাশে 'স' আর যেটি মিথ্যা তার ডান্‌পাশে 'মি' লেখ ঃ—

(১) কলকাতা এশিয়ার বৃহত্তম শহর।

(২) ম্যাঙ্গানীজ প্রধানতঃ ইস্পাত উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

(৩) কণিষ্কের রাজত্বকালে মহাসঙ্গীতির অধিবেশন হয়।

ফা-হিয়েনের বিবরণীতে মৌর্যযুগের নগর-পরিকল্পনার উল্লেখ আছে।

[ঘ]

নিচের ঘটনাগুলোকে সময়ের প্রাচীনতা অনুযায়ী পর পর সাজাও ঃ—

(১) অশ্বঘোষের 'সারিপুত্র প্রকরণ' নাটক।

(২) আর্যদের দাক্ষিণাত্য-আগমন শুরু।

(৩) মহাপদ্ম নন্দের মগধের সিংহাসন প্রাপ্তি।

(৪) মোএঞ্জোদড়োর খননকার্য চালান রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

[ঙ]

বাঁ দিকের সারির প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি করে বিষয় ডান দিকের সারিতে রয়েছে। ডান সারি থেকে বিষয়গুলো খুঁজে বাঁ সারির বিষয়গুলোর সঙ্গে মেলাও ঃ—

(১) টোডা	ভাবরের জঙ্গলে মজুরের কাজ করে
(২) পুলগা	পশুর রক্ষাকর্তা দেবতা
(৩) রুনিয়া	হেরোডোটাস
(৪) ঘনতাপ্পা	নীলগিরির উপজাতি

(৫) বুদ্ধের জন্ম — জেনারেল কানিংহাম
খৃঃ পূঃ ৪৮৯

(৬) গ্রীক ইতিহাসের জনক — ঝড় ও বিদ্যুতের দেবতা
খৃঃ পূঃ ৫৬৭

[চ]

নিচে প্রথম কথাটির সঙ্গে দ্বিতীয় কথাটির যে সম্বন্ধ, তৃতীয় কথাটির সঙ্গে ঠিক সেইরকম সম্বন্ধ আছে প্রথম চতুর্থ কথাটি বসাও :—

(১) নীলগিরি : টোডা : : আন্দামান :—

(২) বেদ : হিন্দু : : আবেস্তা :—

[ছ]

বন্ধনীমধ্যস্থ উত্তরগুলো থেকে সঠিক উত্তরটি বার কর :—

(১) কৃষিবিদ্যার প্রথম আবিষ্কারক মেয়েরা, কারণ :—

[পুরষেরা ব্যস্ত থাকত শিকারে বা যুদ্ধবিগ্রহে।
কৃষিকাজ পুরুষদের পছন্দ হত না।
কৃষি কাজে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের পারিশ্রমিক বেশি ছিল।
সেকালের সমাজ খুব উদার মতাবলম্বী ছিল।]

(২) জৈনদের আজও ভারতবর্ষে টিঁকে থাকবার কারণ :—

[কোটি কোটি ভারতবাসীর জৈনধর্ম গ্রহণ।
যুগে যুগে রাজকৃপা লাভ।
ব্যাবসাবাণিজ্যকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ।
অন্যান্য ধর্মের লোকদের চেয়ে এরা বেশি ধর্মপরায়ণ।]

বোধিসত্ত্ব

গান্ধারশিল্প অর্থাৎ গ্রীকপ্রভাবিত ভারতীয় ভাস্কর্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক ॥ তক্ষশিলা
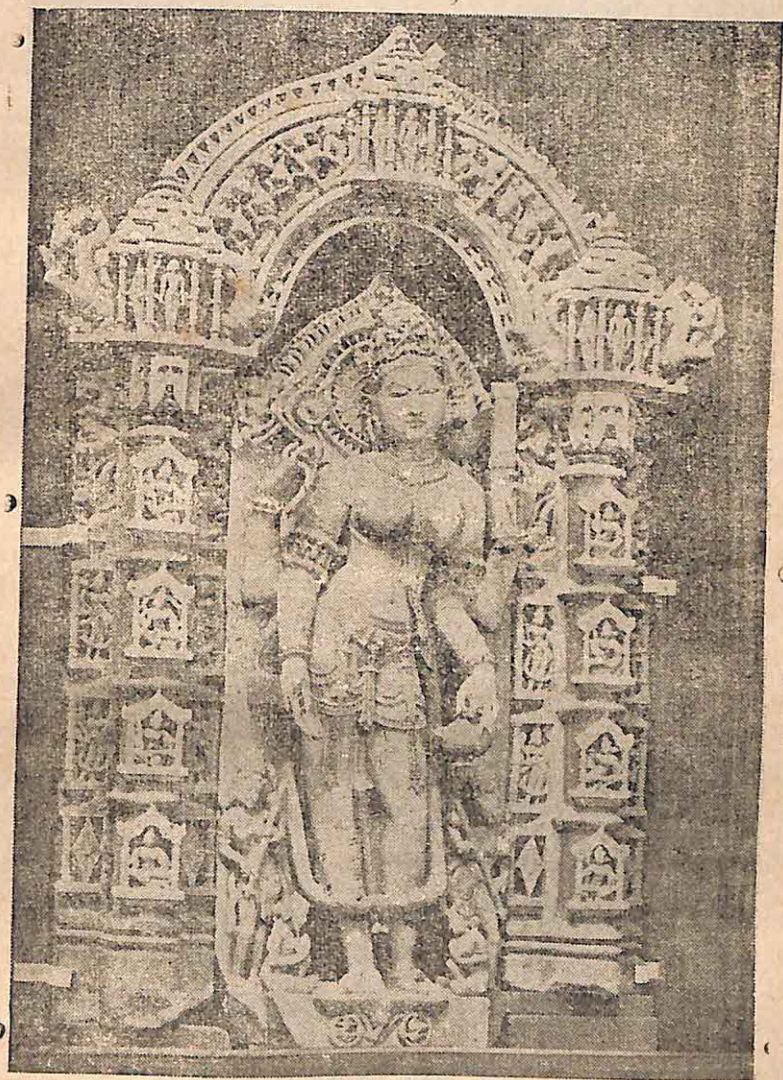
'বীণারঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী কমল-কুঞ্জাসনা'
বিকানীর : সরস্বতীর মর্মর-মূর্তি
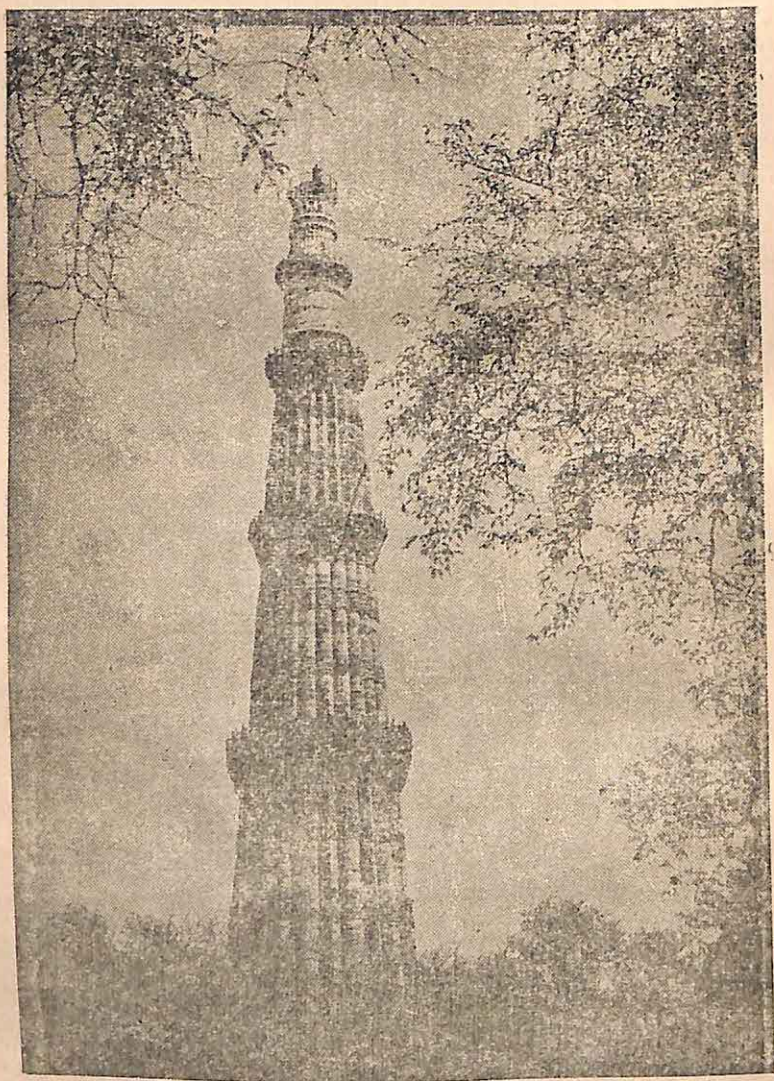
কুতুব মিনার

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ কালান্তরের উদ্যোগ ॥

মৌর্যোত্তর ৪৫০-৫০০ বছরের ইতিহাস কিছুটা ম্লান। সময়টা সমস্যাসঙ্কুল এবং বিশৃঙ্খলাময়। মৌর্য রাজশক্তি স্তিমিত হওয়ায় নিত্য নূতন রাজবংশের পতন ও অভ্যুদয়ে এই বিশৃঙ্খলা। এই আপাত-শৃঙ্খলাহীনতাই আসন্ন পরিবর্তনের প্রস্তুতি পর্ব। রাজনৈতিক দুর্যোগের ঘনঘটা কেটে যাবার পর দেখা গেল ভারতের সমাজ এবং সংস্কৃতি এক নতুন পথের যাত্রী ঃ সামনে গুপ্তযুগের জয়তোরণ। মৌর্য এবং গুপ্তযুগের অন্তর্বতী গোধূলি লগ্নে ভারতের সমাজ-সংস্কৃতি যে সুষুপ্ত ছিল না তার প্রমাণ গুপ্তযুগের সমৃদ্ধি। এ লগ্নকে আমরা **যুগসন্ধি** বলব। যুগসন্ধির ইতিহাস অনালোচিত রেখে গুপ্তযুগের তাৎপর্য উপলব্ধির চেষ্টা নিষ্ফল।

রাষ্ট্রিক সংহতির বিনষ্টি

অশোকের মৃত্যুর পর তাঁর একচ্ছত্র ধর্মরাজ্য ফাটল ধরতে দেরী হল না। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশগুলি একে একে মৌর্য রাজশক্তির বাঁধন ছিঁড়ল। অশোকের উত্তরপুরুষেরা সবসুদ্ধ ৫০ বছর রাজত্ব করেন। শেষ মৌর্যসম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে তাঁর ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র খৃঃ পূঃ ১৮৭ অব্দে মগধের রাজতক্ত অধিকার করেন।

পুষ্যমিত্র প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম **শুঙ্গ** বংশ। পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে কলিঙ্গরাজ মগধ আক্রমণ করে। পশ্চিম এশিয়ার (ব্যাক্ট্রিয়ার) গ্রীকরা যে মগধরাজ্য আক্রমণ করে সাকেত (অযোধ্যা), পাঞ্চাল, মথুরা ও পাটলিপুত্র অবধি এসেছিল গার্গী-সংহিতায় তার উল্লেখ আছে। কিন্তু পুষ্যমিত্র বাহুবলে সকলকে পরাস্ত করেন। তিনি শকদের প্রতিহত করেছিলেন।

শুঙ্গবংশীয় রাজা দেবভূমিকে হত্যা করে তাঁর ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বাসুদেব (৭৫ খৃঃ পূঃ) মগধের সিংহাসনে স্ব-প্রতিষ্ঠিত কান্ব রাজবংশের অধিকার কায়েম করেন। আনুমানিক ২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র বা সাতবাহন রাজাদের আক্রমণে কান্ব বংশের বিলুপ্তি ঘটে।

দক্ষিণ-পূর্বে কলিঙ্গদেশে খারবেলও এ সুযোগে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করল। রাষ্ট্রিক সংহতির শিথিল বন্ধন আর টিঁকল না।

'ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত এসেছিল সবে'

রাজনৈতিক অনৈক্যের বিষময় ফল ফল্‌ল। জাতীয় চেতনার অভাবের দরুন বৈদেশিকদের পক্ষে স্বল্প আয়াসে ভারত অধিকার করা সম্ভব হল। ক্ষমতার প্রতিযোগিতা যখন পুরোদমে চলছে তখন গ্রীক শক কুষান প্রভৃতি বৈদেশিক জাতি ভারত অভিযান শুরু করল।

প্রথমে উল্লেখযোগ্য হিন্দুকুশের পরপারে অবস্থিত সিরিয়া-বাহ্লীক (ব্যাক্‌ট্রিয়া বা বাল্‌খ)-এর গ্রীকদের ভারত আক্রমণ। সিরিয়ার অধীশ্বর তৃতীয় অ্যান্টিয়োকস্‌-এর জামাতা ডেমট্রিয়স্‌ খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দের কিছু পরে পাঞ্জাব ও সিন্ধু-প্রদেশের বহু জনপদ আয়ত্তে আনেন। মিনান্দার বা মিলিন্দ নামে পরবর্তী একজন গ্রীকরাজা পাঞ্জাবের শাকল (বর্তমান শিয়ালকোট) নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি কাবুলেরও অধিপতি ছিলেন। বর্তমান উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশ তাঁর অধিকারে ছিল।

ভারতবর্ষে গ্রীক শাসনের স্থায়িত্বকাল এক শতাব্দীর কিছু বেশি। শক-পহ্লব জাতির আক্রমণে ভারত-সীমান্তের গ্রীক রাজ্যগুলি ধ্বংস হয়।

পহ্লবদের বাসস্থান ছিল কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণ-পূর্বস্থিত পার্থিয়ায়। শকরা এসেছিল অক্সাস নদীর উত্তর তীরবর্তী সিস্তান বা শকস্থান থেকে। পহ্লবরা উত্তর-পশ্চিম ভারতে ক্রমশ অধিকার বিস্তার করল। শকদের শাসন সিন্ধু উপত্যকায় ও পশ্চিম ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়। পহ্লববংশীয় রাজাদের মধ্যে গণ্ডোফারনিসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শোনা যায় সেণ্ট টমাস নামে এক খৃষ্টধর্ম প্রচারক তাঁর সময়ে ভারতবর্ষে আসেন।

সবশেষে এসেছিল উত্তর-পশ্চিম চীনের যাযাবর ইউচি জাতির **কুষান** নামে এক শাখা। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে ভারতে কুষান অধিকারের গোড়াপত্তন। রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম কদ্‌ফিস। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কদ্‌ফিসের পর কুষান জাতির শ্রেষ্ঠ নরপতি কণিষ্কের শাসনকাল।

কণিষ্কের রাজত্বকালে কুষান সাম্রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হয়। রাজনৈতিক ইতিহাসের দিক দিয়ে দেখতে গেলে কণিষ্ক এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন নিঃসন্দেহে। কণিষ্কের রাজধানী ছিল পুরুষপুর (পেশোয়ার)। কাবুল ও কাশ্মীর থেকে বারানসী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ তাঁর অধীনস্থ ছিল। পূর্ব তুর্কীস্থানের কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান প্রভৃতি স্থানেও তিনি কুষান সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত করেন। তিনি পার্থিয়ার রাজাকে পরাস্ত করেন। পাটলিপুত্ররাজের সঙ্গে সংঘর্ষে কণিষ্কেরই জয় হয়। চীন সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধেও

কণিষ্ক সাফল্য অর্জন করেন। সেকালের আর কোন বিদেশী রাজা এতটা বাহুবলের পরিচয় দিতে পারেননি।

কণিষ্কের রাজত্বকাল সম্বন্ধে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ আছে। অনেকে বলেন, তিনি ৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ সময়ে শকাব্দের প্রচলন করেন।

'একের অনলে বহুর আহুতি'

এযুগের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা দেখেছি নিজেদের মধ্যে হানাহানি দলাদলির ফলে দেশ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। ভারতবর্ষ পরিত্রাণ পেত না যদি রাজনৈতিক বৈষম্যের উর্ধ্বে থেকে বিদেশীদের আলিঙ্গন করার মত ঔদার্য তার না থাকত।

এই স্বীকরণ শক্তি (Power of assimilation) ভারতের নিজস্ব শক্তি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ইতিহাস' গ্রন্থে ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন: 'পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপন করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসঙ্কোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে।' ভারতের এই আত্মসাৎ করার ক্ষমতার বলে গ্রীক-শক-পহ্লব-কুষান—কোন বিদেশী জাতিই শেষ পর্যন্ত ফিরে যেতে পারেনি, সকলেই ভারতীয় বনে' গিয়েছে। বহুবিধ জাতির সংস্কৃতির মিলনে ভারতবর্ষ বিপুলা পৃথিবীর প্রতিরূপ বলে পরিগণিত হয়েছে। 'হেথায় নিত্য হের পবিত্র ধরিত্রীরে।'

অন্যের সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করে ভারতসংস্কৃতি লাভবান এবং সমৃদ্ধই হয়েছে: 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতিগত ঐক্যের ধ্রুবকেন্দ্র গড়ে উঠতে দেরী হয়নি।

সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ

হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন॥ শুঙ্গ ও কাণ্ব বংশের রাজত্বকালে সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটেছিল। পুষ্যমিত্র শুঙ্গ দু'দুবার অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করে প্রাচীন হিন্দুধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রতিষ্ঠা করলেন।

বৌদ্ধধর্মের অপ্রতিহত গতি॥ কিন্তু বৌদ্ধধর্ম যে তখন পর্যন্ত অপ্রতিহত গতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছিল তার প্রমাণ পুষ্যমিত্রের সমকালীন বিদেশী রাজা মিনান্দারের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ। পালিভাষায় লিখিত বিখ্যাত বৌদ্ধগ্রন্থ

মিলিন্দ্ পঞ্‌হো' (মিলিন্দের প্রশ্ন)-তে বলা হয়েছে তিনি ধার্মিকদের মত তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছিলেন। তর্কযুদ্ধে তাঁকে পরাস্ত করা দুঃসাধ্য ছিল; কিন্তু ভিক্ষু নাগসেনের কাছে তর্কযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন।

হিন্দুধর্ম ও বিদেশী রাজারা ॥ হিন্দুধর্মের দিক দিয়েও এমন প্রমাণের অভাব নেই। বহু গ্রীক রাজা 'ধার্মিক' উপাধি গ্রহণ করেন। মালবের অন্তঃপাতী বিদিশা বা বেসনগরে (গোয়ালিয়র) খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের এক শিলালেখ থেকে জানা যায় হেলিওডেরাস্ নামে এক গ্রীক রাজদূত বিষ্ণুর সম্মানার্থ গরুড়ধ্বজ নির্মাণ করেছিলেন। কুষানরাজ প্রথম কদ্‌ফিসের মুদ্রায় ত্রিশূলধারী শিবমূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। অনুমান হয় কণিষ্কের পূর্বগামী কুষান রাজারা শৈব ছিলেন। কণিষ্কের এক বংশধর বাসুদেব উপাধি ধারণ করে ব্রাহ্মণ্যধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। রুদ্রদামন নামে এক শকরাজারও উল্লেখ আমরা পাই। এ নাম এতদ্দেশীয়। বিদেশী রাজাদের ব্রাহ্মণ-ভোজন করানো, ব্রাহ্মণদের গ্রাম দান করা ইত্যাদি নানাবিষয়ে হিন্দুধর্ম-প্রীতির পরিচয় অনেক শিলালেখে, বিশেষত নাসিক গুহা-লিপিতে পাওয়া যায়।

সমন্বয় প্রক্রিয়ার ফলে সমাজ-ব্যবস্থা ॥ ভারতীয় সমাজে বিদেশীদের অঙ্গীকৃত হওয়ার প্রমাণসমূহ তৎকালীন সমাজব্যবস্থার উপর আলোকসম্পাত করে। ভারতের সামাজিক নিয়মকানুন আচার-ব্যবহার এ যুগে এক সমস্যার সম্মুখীন হয়। একালের একজন বৌদ্ধপণ্ডিত অশ্বঘোষ বলেছেন: 'ব্রাহ্মণের আর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করার কোন হেতু নেই; কারণ এখন শূদ্র ব্রাহ্মণের সমান পণ্ডিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ শূদ্র এখন এক।' শকরাও খাঁটি শূদ্র হিসেবে ভারতীয় সমাজে স্থান করে নিয়েছে—পতঞ্জলির ব্যাকরণের মহাভাষ্যে তা উল্লিখিত আছে। মনুসংহিতায় এঁরা 'পতিত ক্ষত্রিয়' রূপে স্বীকৃত। নীচকুলোদ্ভব সাতবাহন রাজাদের ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের মর্যাদা অর্জন, ব্রাহ্মণ শাতকর্ণী রাজাদের সঙ্গে শক রাজন্যদের পরিণয় তৎকালীন সমাজের ঔদার্যের কথা ঘোষণা করে।

ধর্ম-সমন্বয়ের সাধনায় বিদেশী রাজা কণিষ্ক ॥ বিদেশী রাজারা ভারতীয় ধর্মমন্দিরে প্রবেশাধিকার পেয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেননি। রাজনীতির মল্লভূমিতে তাঁরা যেমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, ধর্মের যজ্ঞভূমিতে তার চেয়ে কম কৃতিত্বের পরিচয় দেননি। বিভিন্ন ভারতীয় ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় একজন বিদেশী রাজা সিদ্ধ হয়েছিলেন, এ-কথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। তবু ধর্মজগতের ইতিহাসে মহারাজ অশোকের পরই কুষানরাজ কণিষ্কের স্থান, একথা মিথ্যা নয়।

প্রচলিত মতানুসারে অশোকের মত যুদ্ধের বীভৎসতা দেখে কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু এও শোনা যায় অনবরত যুদ্ধে লিপ্ত থাকার ফলে প্রজাদের বিরুদ্ধভাজন হওয়ায় কণিষ্ককে অসুস্থ অবস্থায় লেপ চাপা দিয়ে মেরে ফেলা হয়। এসমস্ত জনশ্রুতির কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু ইতিহাস্ সাক্ষ্য দেয় যে কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। রাজধানী পুরুষপুরে বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর তিনি এক বিশাল চৈত্য নির্মাণ করান। কিন্তু নিজে বৌদ্ধ হয়ে থাকলেও তিনি যে ধর্মবিষয়ে উদারমতাবলম্বী ছিলেন তার প্রথম প্রমাণ তাঁর মুদ্রায় ভারতীয় অভারতীয় দেব-দেবীর মূর্তি। আর এক প্রমাণ জরাথুস্ত্র-ধর্মবাদীদের জন্য তক্ষশিলায় পারসিক সূর্যমন্দির নির্মাণ।

ধর্মমতের সমন্বয় সাধনায় কণিষ্কের অন্যতম কীর্তিচিহ্ন বৌদ্ধদের মতভেদ মীমাংসার জন্য কাশ্মীরে এক বৌদ্ধ সভার আহ্বান। এই সভা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে চতুর্থ বৌদ্ধসঙ্গীতি (council) নামে প্রসিদ্ধ।

স্বয়ং বুদ্ধ এবং মহারাজ অশোকও মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বৈদেশিক রাজারা বুদ্ধদেবের মূর্তিপূজা প্রচলন করেন। কণিষ্কের বৌদ্ধসঙ্গীতিতে মূর্তিপূজার পক্ষে মত প্রাধান্য পায়। এ মতাবলম্বীদের নাম হয় 'মহাযান'। মহাযান মতবাদীরা পূর্বতন বৌদ্ধধর্মকে 'হীনযান' নামে অভিহিত করল।

মহাযান মতবাদ দ্রুত আপন প্রাধান্য বিস্তার করল। বৌদ্ধধর্মে বহু দেব-দেবীর পূজা স্বীকৃত হওয়ার ফলে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের সীমা-প্রাকার ধ্বসে পড়ল। বুদ্ধদেব বিষ্ণুর মত ত্রাণকর্তারূপে পূজিত হলেন। পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মে বিষ্ণুর অবতাররূপে তাঁর উল্লেখ পাই। উভয় ধর্মের অদ্বয়গ্রন্থনে মানুষে মানুষে মিলনের পথ আরও সুগম হল।

শিল্পে-সমন্বয়॥ কণিষ্কের কালে শিল্পকলার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাঁর শিল্পরসজ্ঞ মন এবং ধর্মগত মনোভাবের যুগপৎ পরিচয় পরবর্তীকালের চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন সাঙ্ দু'জনেরই বিবরণীতে উল্লিখিত একটি গল্প থেকে পাওয়া যায়। কণিষ্ক নাকি একদিন রাজধানীতে কৃষকের ছদ্মবেশে বেড়াতে বেড়াতে খেলার-ঢিবি-তৈরির-খেলায়-মত্ত একটি ছেলেকে দেখতে পান। কৌতূহলী রাজা ছেলেটা কা করছে জানতে চাওয়ায় সে উত্তর দিল, শাক্যবুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এ দেশের একজন দিগ্বিজয়ী রাজা তাঁর দেহাবশেষের উপর স্তূপ নির্মাণ করবেন। একথা শুনে কণিষ্ক পরে ৪০০ ফুটের বেশি উঁচু তেরো-তলা বিখ্যাত চৈত্য নির্মাণ করেন। পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এটিকে জম্বুদ্বীপের 'সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে ভাল' স্তূপ বলে উল্লেখ করেছেন।

পশ্চিমী দেশগুলোর সঙ্গে কুষান রাজাদের নিকট যোগাযোগ ছিল। তাঁরা স্তূপ নির্মাণের জন্য এশিয়া মাইনর থেকে বহু সংখ্যক কারিগর আমদানি করেন। জাতকের কাহিনীর চিত্ররূপ স্তূপগুলির অঙ্গসজ্জা ছিল। তাঁরাই প্রথম পাথরের বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করেন।

আফগানিস্থানে হিন্দুকুশ পর্বতে অবস্থিত বামিয়েন গিরিপথের বিস্তৃত উপত্যকায় প্রাচীনকালে একটি সমৃদ্ধ রাজ্যের রাজধানী ছিল। **বামিয়েন** ছিল বৌদ্ধধর্মের এক প্রধান কেন্দ্র। এখানে হিন্দুকুশ পর্বতের গা' কেটে একশ-দেড়শ ফুট উঁচু বিরাট বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়েছিল। অজন্তার অনুকরণে তৈরি এখানকার গুহামন্দির-গুলিতে নানা যুগের সংস্কৃত পুঁথির খণ্ডিতাংশ পাওয়া গিয়াছে। এসব পুঁথি বৌদ্ধশাস্ত্রের, লিপি ও ভাষা ভারতীয়। সবচেয়ে পুরানো পুঁথিটি কুষান আমলের বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন। ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক আক্যাঁ (Hackin) বামিয়েনের পুনরাবিষ্কার করেছেন।

বৌদ্ধধর্মে পৌত্তলিকতা অনুপ্রবেশের ফলে বুদ্ধদেবের ধ্যানী মূর্তি কল্পিত হয়। ব্যাক্ট্রিয়ার গ্রীকদের পরিকল্পিত বুদ্ধমূর্তিতে আগেই গ্রীক শিল্পকলার ছায়াপাত ঘটেছে। উপরন্তু আরও যবন ভাস্করদের শিল্পপ্রতিভার স্বাক্ষর বুদ্ধমূর্তিগুলিতে অবিরত পড়তে থাকায় ভারতে গ্রীকো-রোমীয় শিল্পকলার পত্তন হয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল গান্ধারে এই শিল্পকলার বিশেষ প্রসার ঘটে। **গান্ধার শিল্পের** দেহ গ্রীক, এযুগের বুদ্ধমূর্তির পোশাক-আশাকে গ্রীক ঢঙ; কিন্তু তার আত্মা সম্পূর্ণ ভারতীয়।

শুধু ভাস্কর্যে নয়, স্থাপত্য শিল্পেও তখন স্থপতিরা বিশেষ স্থান অধিকার করে। কণিষ্কের বৌদ্ধ চৈত্যের স্থপতিরা যে যবন এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। বুদ্ধগয়া, মথুরা, অমরাবতী, সাঁচি এযুগের শিল্পকলার ধারক।

গান্ধার শিল্পের স্থায়িত্বের একমাত্র কারণ পাথর; গান্ধারে পাথর ছিল কাঠের থেকেও শস্তা। গান্ধার শিল্প পত্তনের আগে ও পরে ভারতবর্ষের বহু জায়গায় সম্পূর্ণ ভারতীয় রীতিতে কাঠের স্থাপত্য শিল্পের উল্লেখ আমরা পাই। কিন্তু কালের কবল থেকে তারা রক্ষা পায়নি।

গ্রীক সভ্যতার মতই শিল্পেও ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে কোন স্থায়ী অবদান রেখে যেতে পারেনি। তাই গান্ধার শিল্পের পুনরাবৃত্তি আর ঘটেনি। গ্রীকরা ভারতের শিল্পগুরুরূপে স্থান পেতে পারে না। কারণ, তার বহু আগে থেকেই ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ নিজস্ব শিল্পাদর্শকে আয়ত্ত করেছে। গ্রীকদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়ার মত বিশেষ কিছু ছিল না। সাঁচি স্তূপের শিল্পগুলিতে হেলেনীয়

ভাবাদর্শের চেয়ে 'রিয়ালিজম্'-এর প্রকাশই বেশি। গান্ধার শিল্পকলাকে তাই 'ক্ষণিকের উদ্ভাস' বলা চলে।

শিক্ষায় সমন্বয়॥ পশ্চিম পাঞ্জাবে রাওলপিণ্ডির অনতিদূরে অবস্থিত ছিল তক্ষশিলা নগর। কেবল ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকেই নয়—গ্রীক, মিশর, পারস্য, চীন, ও মধ্য এশিয়ার নানা অঞ্চল থেকে বহু শিক্ষার্থী এখানে শিক্ষালাভের জন্যে আসত। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে প্রায় এক হাজার বছর ধরে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র রূপে পরিগণিত ছিল। এখানে তিন বেদ ও আঠার রকম শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

যুগসন্ধির সাহিত্যকৃতি

সাহিত্য ও দর্শনচর্চার দিক থেকেও এযুগের গুরুত্ব যথেষ্ট। শুঙ্গ ও কান্ব রাজবংশের আমলে সনাতন হিন্দুধর্মের ক্ষণিক অভ্যুদয়ে **সংস্কৃত** চর্চার সূচনা হয়। পতঞ্জলি তাঁর পাণিনি-ব্যাকরণের মহাভাষ্য এই সময়েই রচনা করেন। তাঁর মহাভাষ্য থেকে প্রমাণিত হয় তিনি পুষ্যমিত্র শুঙ্গের অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। হিন্দুধর্মগ্রন্থগুলিও এ-কালে সংগৃহীত হয়। রামায়ণ-মহাভারতের নূতন সংস্করণও তৈরি হয়।

এ কালের একজন খ্যাতনামা নাট্যকার ভাস। রামায়ণ-মহাভারতের পর সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর নাটকগুলিই প্রাচীন। মহাকবি কালিদাসও ভাসের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য হওয়ায় তাঁর নাটকগুলি সেকালে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ভাসের শ্রেষ্ঠ নাটক 'স্বপ্নবাসবদত্তা'। কাহিনী-বিন্যাসের দিক দিয়ে প্রাচীন ভারতে এর তুলনা বিরল।

এরপর নাম করতে হয় কণিষ্কের সমসাময়িক কবি অশ্বঘোষের। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' কাব্য ও 'সারিপুত্র প্রকরণ' নাটক বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'বুদ্ধচরিত' কাব্য মহাকাব্যের আকারে লেখা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাব্যটির অধিকাংশ লুপ্ত।

দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে দার্শনিক কাত্যায়নীপুত্রের 'বিভাষা' 'মহাবিভাষা' ও মহাযানী দার্শনিক নাগার্জুনের 'মাধ্যমিক সূত্র' ও 'সুহৃল্লেখা' উল্লেখযোগ্য।

লোকভাষা **পালি-প্রাকৃত**ও সংস্কৃতের পাশাপাশি চলতে থাকে। গ্রীকরাজ মিনান্দারের কালে পালিতে 'মিলিন্দ পঞ্‌হো' নামে বিখ্যাত গ্রন্থ রচিত হয়। মারাঠী ভাষায় 'গাথা সপ্তশতী' এ-যুগের রচনা। পৈশাচী-প্রাকৃতে গুণাঢ্য 'বড্ডকহা' (বৃহৎ কথা) রচনা করেন। বেতালপঞ্চবিংশতির মত বহু মজার গল্পের ভাণ্ডার এই বইটি।

আর্থনীতিক বনিয়াদ

এই সময়ের আর্থনীতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক বন্ধনের দৃঢ়তা থেকে। জাতকের গল্পে শ্রেষ্ঠীদের (<শেঠ) সম্বন্ধে বহু সুন্দর সুন্দর কাহিনী আছে। ব্যাবিলন পর্যন্ত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যতরী গমনাগমনের সংবাদ সেখান থেকে পাওয়া যায়। পশ্চিম ভারতের ভৃগুকচ্ছ (ব্রোচ), কল্যাণ এবং অন্যান্য বন্দরসমূহ থেকে প্রচুর জিনিসের, বিশেষত মশলা, রেশম, মুক্তা, হাতির দাঁত, সূক্ষ্ম বস্ত্রের পশরা এশিয়া মাইনরে, মিশরে এবং পরবর্তীকালে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর হয়ে রোম সাম্রাজ্যে যেত। বিদেশ থেকে ভারতবর্ষও তামা, টিন, প্রবাল, কাচ আমদানি করত। জনৈক মিশরবাসী গ্রীক নাবিকের 'পেরিপ্লাস অফ দি এরিথ্রিয়ান সী' গ্রন্থে ভারতীয় বন্দরসমূহের বিবরণ প্রসঙ্গে আমদানি-রপ্তানির এমনই ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে।

৪৫ খৃষ্টাব্দে মিশরনিবাসী গ্রীক নাবিক হিপ্পলাস (Hippalus) মৌসুমী বায়ুর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। আগে জাহাজ তীর ধরে আঁকাবাঁকা ভাবে যেত। তাতে সমুদ্রযাত্রায় পথ অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ হয়ে পড়ত। কিন্তু হিপ্পলাসের আবিষ্কারের ফলে জাহাজগুলি সোজাসুজি ভাবে ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে যেতে লাগল, ভারতীয় বাণিজ্যদ্রব্য পশ্চিমের বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র আলেকজান্দ্রিয়াতে তিন মাসেরও কম সময়ে পৌছুল। জল-দস্যুদের উৎপাতও কিছুটা কম হল। মৌসুমী বায়ু আবিষ্কারের আগে যেখানে বছরে ২০টি জাহাজ সমুদ্রযাত্রা করত, সেখানে মিশর থেকে দিনে একটি করে জাহাজ ভারত মহাসাগর হয়ে যাতায়াত করতে লাগল।

এ ছাড়া রোম সাম্রাজ্যের পতনের ফলে বাণিজ্যে ভারতের আধিপত্য আরও বৃদ্ধি পেল। রোমের বাজারে ভারতের বিলাসদ্রব্যের খুব চাহিদা ছিল। ১২৫ খৃষ্টাব্দে সিরিয়ার রোমান প্রদেশের চৈনিক বিবরণী থেকে জানা যায় পার্থিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যে ভারতের লাভের অনুপাত ছিল ১০ : ১। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের রোমের ঐতিহাসিক প্লিনি (Pliny) বলেছেন যে প্রায় সাত কোটির মত টাকা প্রতি বছর রোম থেকে ভারতে বেরিয়ে যায়। এজন্য তিনি প্রকাশ্যে আক্ষেপও করেছেন। এগুলো যে অতিশয়োক্তি নয় তার প্রমাণ ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রচুর রোমক মুদ্রা প্রাপ্তি, বিশেষত দক্ষিণ ভারত থেকে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলি অর্থাৎ মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, বলী, সুমাত্রা বোর্ণিও প্রভৃতির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ বহু প্রাচীন কাল থেকেই

ছিল। এই সব দেশে বাণিজ্য করতে গিয়ে ভারতীয়রা প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে দেশে ফিরতেন বলে ঐ স্থানগুলিকে 'সুবর্ণভূমি' বলা হত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সুবর্ণভূমির উল্লেখ আছে। জাতক, বৃহৎ কথা ইত্যাদি থেকেও জানা যায় কী ভাবে ভারতীয় রাজপুরুষ এবং শ্রেষ্ঠীরা ভৃগুকচ্ছ এবং তাম্রলিপ্ত থেকে যাত্রা করতেন, ফিরে আসতেন সুবর্ণ নিয়ে॥

অনুশীলনী

১। মৌর্যোত্তর যুগে রাষ্ট্রিক সংহতি নষ্ট হল কেন? এই বিনষ্টির ফলে কোন কোন্ জাতি ভারত আক্রমণ করেছিল? এই আক্রমণের হিতাহিত বিচার কর।

২। শকাব্দের প্রতিষ্ঠা হয় কখন? 'রবীন্দ্রাব্দ' অর্থ কী? বর্তমান বৎসরটি কত রবীন্দ্রাব্দ এবং কত শকাব্দ?

৩। এ-যুগে বিদেশীদের ভারতে আসবার ফলে যে সংস্কৃতি সমন্বয় ঘটেছিল, কোন্ কোন্ বিষয়ে তা প্রত্যক্ষ?

৪। অন্যের যা ভাল, তা গ্রহণ করার লজ্জা তো কিছু নেই-ই বরং সেটা মনের উদারতারই লক্ষণ, উপরন্তু, সমাজ ও সভ্যতার উন্নতির সূচক।—ভারতের ইতিহাসের যুগসন্ধি আলোচনা করে এই উক্তিটিকে বিশদ কর।

৫। ধর্মজগতের ইতিহাসে কণিষ্কের স্থান কী? কী দেখে আমরা অনুমান করিতে পারি যে কণিষ্কের পূর্বগামী রাজারা শৈব ছিলেন?

৬। সম্রাট কণিষ্ক ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে কোন নগরীকে রাজধানী না করে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত পেশোয়ারকে কেন রাজধানী করেছিলেন?

৭। এ-যুগের সাহিত্য-অবদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৮। গান্ধার শিল্পকলাকে 'ক্ষণিকের উদ্ভাস' বলার তাৎপর্য্য কী?

৯। বিতর্কের আসর॥ বিষয়ঃ "পরের অনুকরণ করলে নিজের চিন্তার ও শক্তির দৈন্যকেই প্রকাশ করা হয়।" [বিতর্ককালে ৪নং প্রশ্নের আলোচনার কথা স্মরণ রাখবে।]

১০। চার্ট-মানচিত্র॥ (ক) "যুগসন্ধির সাহিত্যকৃতি" নাম দিয়ে একটা চার্ট প্রস্তুত কর। এতে ঐযুগের লেখকবৃন্দ এবং তাঁদের গ্রন্থাবলীর নাম উল্লিখিত থাকবে।

(খ) এই সময়ে বহির্বিশ্বে ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ নির্দেশ করে একটি মানচিত্র আঁক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

॥ পালা বদল ॥

শক-পহ্লব-কুষাণ রাজশক্তির হাতের মুঠোও একদিন শিথিল হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সুযোগ-সন্ধানী রাজারা স্বাধিকার বিস্তারে উদ্যোগী হলেন। দক্ষিণাপথের সাতবাহন রাজারা উত্তরাপথ থেকে বিদেশী প্রভুত্বের অবসান ঘটানোর জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে এসেছেন। কিন্তু সাতবাহন বংশের অবক্ষয়ের পর দীর্ঘকাল ভারতের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন।

সময়টাকে (খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক) ঐতিহাসিকেরা **তামসিক যুগ** বলে চিহ্নিত করেছেন। এ কালের সংবাদ বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি। কিন্তু ভাগবত পুরাণ থেকে যতটুকু জানা যায় তাতে মনে হয় সাম্রাজ্যলোভীদের নখরাঘাতে উত্তরভারত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। চম্পাবতী ও মথুরায় নাগবংশের শাসনাধিকার ছিল। সৌরাষ্ট্র ও অবন্তীতে রাজত্ব করতেন আভীর রাজারা। চন্দ্রভাগা-তীরবর্তী সিন্ধুরাজ্য ও কাশ্মীরের কুন্তীতে শূদ্র, ব্রাত্য ও ম্লেচ্ছদের রাজত্ব ছিল।

কিন্তু চতুর্থ শতকের শুরুতে নৈরাজ্যের অবসান হল। দক্ষিণাপথে পহ্লবরাজা শিবস্কন্দবর্মণ অশ্বমেধযজ্ঞ সমাধা করলেন। উত্তরাপথের বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলিকে ঐক্যবন্ধনে বাঁধলেন চন্দ্রগুপ্ত।

গুপ্ত-রাজকাহিনী

ইউচি জাতিদের আগমনের পর থেকেই মগধের কুললক্ষ্মী হলেন অন্তর্হিত। গুপ্তরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা **চন্দ্রগুপ্ত** মগধের গৌরব পুনরুদ্ধার করলেন। পাটলিপুত্র আবার ভারতের রাজধানী হল। চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবী বংশের রাজকন্যা কুমারদেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে নিজের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করলেন। গুপ্তরাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা সমুদ্রগুপ্ত (৩৫৫-৩৮০ খৃষ্টাব্দ) ছিলেন এই 'লিচ্ছবী-তনয়াসুত'।

শুধু গুপ্তরাজবংশের নয়, প্রাচীন ভারতের স্বল্পসংখ্যক শ্রেষ্ঠ রাজাদের মধ্যেও **সমুদ্রগুপ্ত** অন্যতম। সমুদ্রগুপ্তের কীর্তিকাহিনী তাঁর সভাকবি হরিষেণের লিপি থেকে পাওয়া যায়। সেখানে থেকে জানা যায় তিনি তাঁর বৃহৎ স্থলবাহিনীর সাহায্যে ভারতের দুর্বল রাজবংশের মূলোচ্ছেদ করেন।

পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। হিমালয় থেকে দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত ভূখণ্ড তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। দক্ষিণাপথের রাজাদের পরাস্ত করে সমুদ্রগুপ্ত শুধুমাত্র রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাঁদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। সুদূর সিংহলরাজ্যের রাজা মেঘবর্ণ পর্যন্ত তাঁকে সমীহ করে চলতেন। আন্দাজ করা যায় সমুদ্রগুপ্তের সমৃদ্ধ নৌবাহিনী ছিল। যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করলেন তখন সমুদ্রগুপ্ত ভারতের সার্বভৌম অধিপতি। ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ-এর কথায়—'His empire was far greater than any that India had seen since the day of Asoka six centuries earlier.'

তিন শতাব্দীরও পরে সমুদ্রগুপ্ত ভাঙা ভারতকে জুড়লেন। নেপোলিয়নের সমতুল্য সমরনায়ক, দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ, অনন্য শিল্পরসিক এই রাজা ছিলেন সে-যুগের সাংস্কৃতিক জীবনেরই প্রতিমূর্তি।

সমুদ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র **দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত** (৩৭৫-৪১৩ খৃষ্টাব্দ) রাজা হলেন। তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্য রক্ষা করে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সাম্রাজ্যের আয়তনও বৃদ্ধি করেন তিনি। সৌরাষ্ট্রের শকদের বিতাড়িত করে তিনি পশ্চিমে আরবসাগর অবধি তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করলেন। বিক্রমাদিত্য নামেই তাঁর প্রসিদ্ধি। আনুমানিক ৩৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি উজ্জয়িনী জয় করেন। উজ্জয়িনীর রাজা রূপেই কাহিনীতে তাঁর প্রতিষ্ঠা।

পরবর্তী রাজা কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষভাগে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এরপর রাজপদে অভিষিক্ত হন **স্কন্দগুপ্ত** (৪৫৫-৪৬৭ খৃষ্টাব্দ)। তাঁর আমলেই মধ্য এশিয়া থেকে আগত হূন নামে এক শ্বেতজাতি ক্রমাগত আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্য বিপর্যস্ত করে তোলে। স্কন্দগুপ্ত তাদের হটিয়ে দিলেও হূন আক্রমণের অবসান ঘটেনি। ক্রমে গুপ্তসাম্রাজ্য খর্বাকৃতি হয়ে এল।

গুপ্ত রাজশক্তির গোড়াপত্তন থেকে কনৌজের রাজা যশোবর্মণের মৃত্যু পর্যন্ত সময় (৭৪০ খৃষ্টাব্দ) ভারতের ইতিহাসে **'ধ্রুপদী যুগ'** নামে চিহ্নিত। এই সময়ে ভারতের সর্বদেহে পরিবর্তনের চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সভ্যতা-সংস্কৃতি সুপরিণত রূপ পেয়েছিল।

ধর্ম ও সমাজ

গুপ্তযুগের সভ্যতা সংস্কৃতি ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্যেরই প্রত্যক্ষ ফল। মহাযান বৌদ্ধমতের প্রসারে বৌদ্ধধর্ম ততদিনে হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে, তার মহিমার অবসান হয়েছে।

গুপ্তসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে ক্ষত্রিয় নাগবংশীয় ব্রাহ্মণ রাজারা হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আরও আগে শুঙ্গ ও কান্ব আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম দাঁড়ানোর চেষ্টায় ছিল। দক্ষিণ ভারতের কান্ব ও সাতবাহন রাজারা ব্রাহ্মণ্যাভিমানী ছিলেন। সাতবাহনের পর অবশ্য আভীর নামে এক শূদ্রজাতি স্বল্পকালের জন্য দক্ষিণ ভারতের সিংহাসন অধিকার করে। কিন্তু অতঃপর পল্লব কদম্ব নামে ব্রাহ্মণজাতীয় রাজারা ব্রাহ্মণ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

এইভাবে ধর্মের ক্রমায়ত পতন ও অভ্যুদয়ে, বৌদ্ধধর্মের দৌর্বল্যের সুযোগে গুপ্তরাজারা প্রভাব বিস্তার করলেন। সমুদ্রগুপ্ত এবং কুমারগুপ্ত বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করলেও গুপ্তরাজারা বিশেষভাবে ভাগবতের ভক্তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই এ-যুগে ভক্তিবাদ বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে। বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের রূপ পরিশীলিত হওয়ায় হিন্দুধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেল। একচ্ছত্র বৌদ্ধসাম্রাজ্য উত্তর ভারত এ-ধর্মের বাইরে বেশিদিন থাকতে পারল না। অন্যান্য হিন্দুসম্প্রদায়েরও প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। শাক্ত সাধনার যথেষ্ট চল ছিল। শিব ও সূর্যও অবহেলিত হননি। বুদ্ধ অবতাররূপে পূজা পেলেন। জৈন তীর্থঙ্করেরাও হিন্দুদের কাছ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি পেতেন। সকলকে কাছে টেনে নেওয়ার এই ঔদার্যের ফলে অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়কে আত্মসাৎ করে হিন্দুধর্ম পরিপুষ্ট হল। লক্ষ্মী, গণেশ, দুর্গা ও কার্তিকের পূজা এখন থেকেই প্রচলিত হয়। তবে, বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের কাছ থেকে লাঞ্ছিত হয়নি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক **ফা-হিয়েন** এসেছিলেন। তাঁর বিবরণী থেকে জানা যায় তখন পর্যন্ত অনেক রাজা বৌদ্ধশ্রমণদের আহারের ব্যয়ভার বহন করতেন, শ্রমণদের শ্রদ্ধা করতেন, তাঁদের উপস্থিতিতে উচ্চাসনে বসতেন না। একমাত্র মথুরাতেই যমুনা নদীর দক্ষিণ ও বাম তীরে তিনি কুড়িটি মঠ দেখেছেন। সবসুদ্ধ ৩০০০ শ্রমণ সেখানে থাকতেন।

সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে যা জানা যায় তাতে মনে হয় যে, তখন জাতিভেদপ্রথা এবং শ্রেণীচেতনা স্পষ্ট ছিল। তবে রাজা-রাজড়া ও ধনী ব্যক্তিদের বেলায় এ প্রথার শৈথিল্য দেখতে পাই। কারণ এই ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের যুগে পুরোহিতরা তাঁদের পৃষ্ঠপোষক রাজাদের হয়ে যথেষ্ট ওকালতি করেছেন। স্মৃতিকার নারদ তো স্পষ্টই রাজপদকে নেতৃত্ব থেকে উৎপন্ন বলে প্রশংসা করেছেন এবং দুর্বল ও অযোগ্য রাজাকেও মান্য করতে ও তাঁর আদেশ পালন করতে জনসাধারণের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। গুপ্তযুগে ব্যাবসা-বাণিজ্য

প্রসার লাভ করায় শ্রেষ্ঠীসম্প্রদায় শাসনব্যাপারে উচ্চক্ষমতা পেয়েছিল। ক্রীতদাস প্রথার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। স্মৃতিকার নারদ পনেরো রকম গোলামের উল্লেখ করেছেন। জাতিভেদ প্রথার উল্লেখ ফা-হিয়েন একরকম ভাবে করেছেন। তিনি বলেছেন গুপ্তরাজারা অহিংস ছিলেন, মধ্যরাজ্যের (মথুরার দক্ষিণের) লোকেরা কোন জীবিত প্রাণী হত্যা করতেন না—এর একমাত্র ব্যতিক্রম চণ্ডালেরা। তারা প্রাণিহত্যা করত বলে নগরের বাইরে থাকত; নগরের মধ্যে স্বীয় উপস্থিতি জ্ঞাপনের জন্য তারা কাঠি বাজাত, যাতে জনসাধারণ তাদের কাছ থেকে তফাৎ থাকতে পারে। ব্যাপারটি ছুঁৎমার্গী হিন্দুয়ানীর পরিচয়। বৌদ্ধ আমলেও নিশ্চয়ই এটা অংশতঃ ভাবে ছিল, নয়ত একদিনে তার অভ্যুদয় সম্ভব নয়, ব্রাহ্মণ্যধর্ম তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে মাত্র। ধনীর সঙ্গে তুলনায় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট নিচু স্তরের ছিল। কিন্তু মোটামুটিভাবে জীবনযাত্রা সচ্ছল ছিল।

সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান

হিন্দুধর্মের নবজাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা চর্চার প্রসার ঘটল। আগেকার শিলালেখগুলি ছিল সাধারণত প্রাকৃত ভাষায়। এ-যুগেরগুলি সংস্কৃত ভাষায়। রামায়ণ মহাভারত এ সময়েই সংস্কারপ্রাপ্ত হয়। পুরাণ-গুলিরও বর্তমান আকার গুপ্তযুগে দেওয়া হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুশাসন বা স্মৃতিসমূহের অনেকগুলি (যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, নারদস্মৃতি, বৃহস্পতিস্মৃতি,) সম্ভবত একালের।

গুপ্তরাজারা ছিলেন কলারসিক। সমুদ্রগুপ্ত স্বয়ং শিল্পী ছিলেন। তাঁর সভাকবি বিখ্যাত হরিষেণ—এলাহাবাদ স্তম্ভের প্রশস্তি তাঁর লেখা। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মহাকবি কালিদাস বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার এক দুর্লভ রত্ন। অনেকের মতে তিনি অগ্নিমিত্রের আমলের লোক; যেহেতু 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক রচনা করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস অনন্য, বিশ্বসাহিত্যে শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম। তাঁর অভিজ্ঞানশকুন্তল, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশী নাটক, ঋতুসংহার, কুমারসম্ভব, মেঘদূত ও রঘুবংশ কাব্যজগতের অমূল্য সম্পদ। দেশ-দেশান্তরগামী বণিকদের (সার্থবাহ) কিভাবে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বাণিজ্য করতে হত তার অতি সুন্দর বর্ণনা পাই 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে।

শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক', বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক এবং ভারবির

'কিরাতার্জুনীয় সম্ভবত এ-যুগের রচনা। অভিধান-প্রণেতা অমর সিংহ বৌদ্ধপণ্ডিত দিঙ্‌নাগ, বসুবন্ধু ও কুমারজীব একালের লোক।

শুধু সাহিত্য ও দর্শন নয়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ এই সময়ে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। হিন্দু বিজ্ঞানীরা বহুকাল যাবৎ বিজ্ঞানের যে সাধনা করে এসেছেন তারও সিদ্ধি গুপ্তরাজাদের আমলে। গ্রীকদের আগমনের পর ভারতীয়রা তাদের কাছ থেকে বিজ্ঞানের, বিশেষত জ্যোতিষশাস্ত্রের দীক্ষা নেয়। গুপ্তযুগের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট (৪৭৬ খৃষ্টাব্দ) গ্রীক বিজ্ঞানীদের গ্রন্থের ভিত্তিতে পাটলিপুত্রের শিক্ষণকেন্দ্রে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। পৃথিবীর আবর্তনের জন্যে যে দিনরাত্রির ভেদ হয় য়ুরোপীয় জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাসের এক হাজার বছর আগে আর্যভট্টই তার প্রমাণ দিয়েছেন। সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণের সঠিক কারণও তিনি জানতেন। এ-যুগের আর একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী বরাহমিহির জ্যোতিষ সম্বন্ধে 'বৃহৎ সংহিতা' 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' প্রভৃতি বই লিখে নাম করেন। জ্যোতিষী ব্রহ্মগুপ্ত এ-কালের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু গণিতশাস্ত্র বিনা জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করা যায় না বলে এই জ্যোতির্বিদ্‌রাই গণিতশাস্ত্রের চর্চা করে প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। আর্যভট্টই গণিতের প্রাচীনতম প্রামাণ্য রচয়িতা—কোলব্রুক সমসাময়িক আলেকজান্দ্রিয়ার গণিতবিদ্ ডায়াএন্‌টাসের সঙ্গে তুলনায় তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। পাটীগণিত, জ্যামিতি, বীজগণিত এই তিনি শাস্ত্রেই হিন্দু বিজ্ঞানীরা ব্যুৎপত্তির পরিচয় দেন। গ্রীকদের আগমনের বহু আগে থেকেই হিন্দুরা গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন; ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা ও শূন্য (০) আবিষ্কারের কৃতিত্ব ভারতীয়দের।

চিকিৎসাবিজ্ঞান স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষে প্রচলিত। ঋগ্বেদে চিকিৎসাজীবী সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। গুপ্তযুগের বহুপূর্বেই চরক ও সুশ্রুত চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির পথ প্রশস্ত করেন। কায়চিকিৎসায় হিন্দু কবিরাজদের কৃতিত্বের পরিচয় হল সম্রাট আলেকজান্দারের শিবিরে তাঁদের প্রতিপত্তি। অষ্টম শতাব্দীতেও বাগদাদের খলিফা হারুন-অল-রশীদের চিকিৎসার জন্য ভারতবর্ষ থেকে চিকিৎসক বাগদাদে গিয়েছিলেন। গুপ্তযুগে আয়ুর্বেদবিদ্যা ও শরীরবিদ্যার উৎকর্ষ ঘটে। শিক্ষানবীশরা পশুর শবব্যবচ্ছেদ এবং মোমের মূর্তির উপর অস্ত্রোপচার করে শরীরবিদ্যার পাঠ নিতেন।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রসায়নের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। গুপ্তযুগও তার ব্যতিক্রম নয়। রসায়নে উন্নতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিল্লীতে

গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্তি ॥ খৃষ্টীয় ৫ম শতক ॥ সারনাথ

গুপ্তরাজের নামাঙ্কিত লৌহস্তম্ভ। আজও কেন এটাতে মরচে পড়েনি তা বিস্ময়ের ব্যাপার। সুশ্রুত অস্ত্রোপচারের জন্য যে সমস্ত অস্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মনে করা ভুল নয় যে হিন্দুরা ধাতুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। শুধু লোহা নয়, এযুগের মূর্তিগুলো থেকে তামা ব্রোঞ্জের উৎকর্ষও প্রমাণিত হয়!

স্থাপত্য—ভাস্কর্য—শিল্পকলা

গুপ্তযুগের বহু শিল্প-কীর্তি বৈদেশিক আক্রমণে বিধ্বস্ত। খুব অল্পই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু তা থেকেই দেশী বিদেশী বুধমণ্ডলীর ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে।

ভারত-শিল্পের ইতিহাসে গুপ্তযুগ ধ্রুপদী (classical age) নামে

চিহ্নিত। এ কালের শিল্পরীতি গান্ধার কিংবা মথুরা রীতির নয়, ভারতের নিজস্ব : দেহে ও আত্মায়। ভাবগাম্ভীর্যে, সংযম সৌন্দর্যে এবং অবয়ব-সংস্থানে গুপ্তযুগের শিল্পরীতির তুলনা মেলা ভার। কোন কোন রচনায় 'উদ্ভিদ, জান্তব ও মানবিক প্রাণশক্তি একছন্দে প্রবাহিত।'* গুপ্তসম্রাটের মুদ্রাগুলোই হিন্দুরাজাদের শিল্পকৃতিত্বের চিহ্নবহ একমাত্র মুদ্রা।

ভাস্কর্যের দিক থেকে সারনাথের নাম করা যায়। পাথর ছাড়া মূর্তি নির্মাণে তামা এবং ব্রোঞ্জ ব্যবহৃত হয়। পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ নালন্দায় আশি ফুট উঁচু এক তামার বুদ্ধমূর্তি দেখেছিলেন।

স্থাপত্যকলার একটি নিদর্শন ষষ্ঠশতকে নির্মিত ইলোরার বিশ্বকর্মা চৈত্য। এখানে শিল্পীরা একত্র হয়ে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার উদ্দেশে অঞ্জলি দিতেন। উপাসনাগৃহ ও বৌদ্ধশ্রমণদের বাসগৃহ হিসেবে পাহাড় কেটে যে সমস্ত গুহা নির্মিত হয়েছে তা স্থপতিদের কৃতিত্বের পরিচয়বাহী। মধ্যপ্রদেশের ভুম্‌রাতে শিবমন্দির, দেবগড়ের দশাবতার মন্দির এ-যুগের স্থাপত্যকলার নিদর্শন।

হায়দ্রাবাদের অজন্তা গুহায় গুপ্তযুগের চিত্রশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যাবে। গুপ্তযুগের আগে থেকেই ছবিগুলোর কাজ চলছিল। গুপ্তযুগের পরেও তার চর্চা চলছিল। বিশেষ ভাবে ফ্রেস্কোর (Fresco) জন্যে অজন্তার খ্যাতি। এ ছাড়া বহু বড় বড় বুদ্ধমূর্তি আছে। হাজার বছরের শিল্পসংগ্রহশালা অজন্তা। তার মধ্যে গুপ্তশিল্প স্বমহিমায় সমুজ্জল। অজন্তা ছাড়া গোয়ালিয়রের অন্তর্গত বাগ গুহার চিত্রাবলীও গুপ্ত আমলের। ভারতীয় সাধনা সঙ্ঘ-সংযুক্ত বলে এত বড় শিল্পনিদর্শনগুলির শিল্পীদের নাম আমাদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেল। লিওনার্দো দ্য-ভিঞ্চি, রাফাএল, মাইকেল আঞ্জেলোর চেয়ে এ শিল্পীদের কৃতিত্ব কোন অংশে কম নয়।

রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনীতি

পূর্ববর্তী যুগের মত গুপ্তযুগেও শাসনব্যাপারে রাজা ছিলেন সর্বেসর্বা। মন্ত্রি-পরিষদ এবং বিভিন্ন সরকারী কর্মচারী থাকলেও রাজা পরামর্শ গ্রহণের জন্য তাদের ধার ধারতেন না। এ যুগের স্মৃতিশাস্ত্র সমূহে রাজাকে দেববংশজাত বলে অভিহিত করা হয়েছে। হরিষেণের শিলালেখেও সমুদ্রগুপ্তকে ইন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। নৃপতিদের পরই পদমর্যাদায় যুবরাজেরা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। রাজপদ বংশানুক্রমিক হলেও স্বীয় ক্ষমতাবলে রাজা নিজের ইচ্ছামত রাজ-পদের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করতেন।

* প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বৃহৎ সাম্রাজ্যকে কয়েকটি 'ভুক্তি' বা প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রত্যেক 'ভুক্তি' 'কয়েকটি বিষয়' বা জেলায় বিভক্ত ছিল। কতকগুলি 'গ্রাম' নিয়ে একটি বিষয় গঠিত হত। ভুক্তির শাসনকর্তা 'উপরিক', বিষয়ের শাসনকর্তা 'কুমারামাত্য' বা বিষয়পতি ও গ্রামের শাসনকর্তা হলেন 'গ্রামিক'। নির্বাচন রাজার হাতে ছিল। পৌর প্রতিষ্ঠানের পরিচালক চার জন—শ্রেষ্ঠীদের প্রতিনিধি নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম কুলিক বা প্রধান কারিগর, প্রথম কায়স্থ বা রাষ্ট্রদফ্‌তরের চীফ সেক্রেটারী এবং রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের প্রতিনিধি। রাজকর্মচারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মন্ত্রী, সন্ধি-বিগ্রহিক (যুদ্ধমন্ত্রী), মহাবলাধিকৃত (বিচারপতি), মহাদণ্ডনায়ক (সেনাপতি)। যে কোন ধর্মসম্প্রদায়ের লোক রাজকার্যে নিযুক্ত হতে পারত।

সাম্রাজ্যে অপরাধীর সংখ্যা খুবই কম ছিল। কিন্তু মৌর্যযুগের কঠোরতা এখানে ছিল না। সাধারণভাবে শাস্তি ছিল অর্থদণ্ড। মৃত্যুদণ্ড ছিল রাজদ্রোহিতার জন্য। জমি জরিপ করার পর উৎপন্ন দ্রব্যের এক ষষ্ঠাংশ রাজকররূপে নির্দিষ্ট হত। প্রজারা খাজনা মিটিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে পারত? আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভাবে সচ্ছল ছিল।

এ-কালে শ্রেষ্ঠীসম্প্রদায়ের প্রতিপত্তির অন্যতম কারণ ব্যাবসাবাণিজ্যের প্রসার। রোমের সঙ্গে বাণিজ্য এ যুগে অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। বাংলার তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও চীনদেশে বাণিজ্য-তরীর যাতায়াত ছিল। পশ্চিম এশিয়া ও মিশরের সঙ্গেও বাণিজ্য চল্‌ত।

হর্ষবর্ধনের আমল

গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্তের আমলে মধ্য এশিয়ায় হূন জাতির ক্রমাগত আক্রমণে মগধের কুললক্ষ্মী শেষপর্যন্ত অন্তর্হিত হলেন। উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত কনৌজ বা কান্যকুব্জের মৌখরীরাজ ঈশানবর্মন হূননেতা মিহিরকুলকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করেন। কিন্তু যশোবর্মনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্য বিনষ্ট হল। মৌখরীরাজত্বের ধ্বংসাবশেষের উপরে থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধন (৬০৬—৬৪৭ খৃষ্টাব্দ) এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এদিকে গৌড়ের রাজা শশাঙ্কও প্রবল পরাক্রম দেখাতে লাগলেন। হর্ষবর্ধন কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে গৌড়ের রাজা শশাঙ্ককে পরাস্ত করেন। প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত হর্ষের করতলগত ছিল। **গৌড় ও থানেশ্বরের বিরোধ** নিয়ে ইতিহাসের **নবযুগের সূচনা।**

ধর্ম ॥ একালে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে, রাজা হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও। পঞ্চম শতকের পরিব্রাজক ফাহিয়েন ও এযুগের পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণী তুলনা করলে তা বোঝা যাবে। বৌদ্ধধর্মের এই দুরবস্থার কারণ একাধিক। হর্ষের প্রপিতামহ ছিলেন বর্ণাশ্রম ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। মালবের রাজা যশোবর্মণ ছিলেন শৈব। বল্লভীরাজারা মহেশ্বরের উপাসক ছিলেন, উত্তরপুরুষরা হিন্দু। কর্ণসুবর্ণর (গৌড়) রাজারা তো রীতিমত বৌদ্ধধর্ম-বিদ্বেষী। চতুর্দিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের জয়-জয়কার। বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণ ধ্বংস না হলেও মহাযান বৌদ্ধধর্মের ক্রমপ্রসারতা বৌদ্ধধর্ম ধ্বংসেরই নামান্তর। হর্ষবর্ধন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও সূর্য শিব ও অন্যান্য দেবতার পূজায়ও অবহেলা করেননি। অর্থাৎ তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনায় যতটা উৎসাহের পরিচয় দিয়েছেন, বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ততটা মনোযোগ দেননি।

শিক্ষা ॥ শিক্ষাব্যবস্থা একালে যথেষ্ট সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। পাটলিপুত্রের দক্ষিণে নালন্দা নামে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার ছাত্র এখানে অধ্যয়নের জন্যে সমবেত হতেন। রাস্তার দুইধারে বড় মঠ ছিল। সেখানে সন্ন্যাসীরা থাকতেন। রাজারা সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন। নালন্দায় বহু প্রখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, প্রভামিত্র, জিনমিত্র, শীলভদ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। হিউয়েন সাঙ ধর্মপাল ও বাঙালী পণ্ডিত শীলভদ্রের কাছে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

জনশিক্ষা সম্বন্ধে হিউয়েন সাঙ ও ই-সিঙের কথা প্রণিধানযোগ্য। তাঁদের বিবরণী থেকে জানা যায় যে শিশুদের প্রথমে দ্বাদশ অধ্যায়ের একটি পাঠ নিতে হত। সাত বৎসর বয়স থেকে ব্যাকরণ থেকে শুরু করে পাঁচটি বিদ্যার পাঠ নিতে হত। এই বিদ্যাগুলির নাম যথাক্রমে, (ক) প্রাথমিক বিজ্ঞান : ব্যাকরণ বা শব্দতত্ত্ব (খ) কারিগরি বিদ্যা, হেতুবিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র (গ) চিকিৎসাবিদ্যা (ঘ) ন্যায়শাস্ত্র ও (ঙ) অধ্যাত্মবিদ্যা। এখানে ভর্তির পরীক্ষা খুব কঠিন রকমের ছিল।

শিক্ষা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। যে কোনো সম্প্রদায়ের লোক শিক্ষা লাভ করতে পারত। শ্রমণরা নানা উপদেশবাণীর মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিতরণ করত।

সাহিত্য ॥ হর্ষবর্ধন স্বয়ং সাহিত্যচর্চা করতেন। হর্ষবর্ধনের রত্নাবলী, নাগানন্দ, প্রিয়দর্শিকা ইত্যাদি নাটক সংস্কৃত সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ

করেছে। হর্ষের সভাকবি বাণভট্ট রচিত 'হর্ষ চরিত তৎকালীন ইতিহাসের আকর হিসেবে যথেষ্ট মূল্যবান। বাণভট্টের 'হর্ষ চরিত' ও 'কাদম্বরী' সংস্কৃত গদ্যকাব্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

প্রাকৃতভাষা এ যুগেই সাহিত্যের ভাষারূপে মর্যাদা পায়। সাহিত্যিক হিন্দী ভাষার সন্ধান সম্ভবত এ যুগেই পাওয়া যাবে। হর্ষবর্ধনের মত পরাক্রমশালী সংস্কৃতিবান্ রাজার আমলে স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলার চর্চা কিন্তু নামমাত্র।

রাষ্ট্রব্যবস্থা ॥ শুক্রাচার্য বলেছেন রাজা জনগণের দাস মাত্র। দুর্বলকে রক্ষা এবং দুর্জনকে শাসন করবার জন্য ঈশ্বর তাঁকে সার্বভৌম অধিকার দিয়েছেন। শ্রীহর্ষ ছিলেন এই নীতির অনুসারী।

তাঁর শাসনপ্রণালী ছিল আমলাতান্ত্রিক অর্থাৎ শাসন পরিষদের সকলেই ছিলেন বেতনভুক কর্মচারী। বাণভট্ট তাঁর চরিতগ্রন্থে রাজ-কর্মচারীদের উপাধি ও তাঁদের কার্যবিবরণী প্রদান করেছেন।

হিউয়েন সাঙের কথায় হর্ষের শাসনপ্রণালী ছিল উদাব, প্রগতিশীল। করভার যথাসম্ভব লঘু ছিল। অপরাধীদের দণ্ড কঠোর ছিল। সামান্য অপরাধেরও ক্ষমা ছিল না। সেনাবাহিনী ছিল ক্ষুদ্র কিন্তু যোগ্য।

ব্যাবসা বাণিজ্য ॥ এ যুগে আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট সচ্ছল ছিল। মানুষ সাদাসিধা জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত ছিল। ব্যাবসা-বাণিজ্যও বেশ প্রসার লাভ করেছিল। ফা-হিয়েন বাণিজ্যতরীতে করে বাংলা থেকে সিংহলে গিয়েছিলেন। ৭ম শতাব্দীতে বহির্বিশ্বে বসতিবিস্তার এবং বাণিজ্যবিস্তার হয়েছিল। সুমাত্রা, জাভা ও অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জে অবশ্য প্রথম শতক থেকেই বসতিস্থাপন শুরু হয়েছিল; কিন্তু হর্ষের আমল থেকেই সৌরাষ্ট্র থেকে জাভা ও কাম্বোডিয়ায় ভারতীয়রা দলে দলে যেতে থাকে। শোনা যায় রাজ্যের আসন্ন ধ্বংসের সম্ভাবনায় সৌরাষ্ট্রের জনৈক শাসনকর্তা পুত্র-পরিবার ও পাঁচহাজার অনুচর (তাদের মধ্যে চাষী, শিল্পী, যোদ্ধা ও চিকিৎসক সম্প্রদায় ছিল) সহ একশ'টি ছোট তরী ও ছয়টি বড় জাহাজে জাভার দিকে যাত্রা করেন। বঙ্গোপসাগর ছিল বাণিজ্যতরীর যাতায়াত পথ। ই-সিঙ তাম্রলিপ্তকে বড় বাণিজ্যকেন্দ্র বলেছেন। অনুমান করা যায়, চীন জাপান ও অন্যান্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে ভারতের ব্যাবসা বাণিজ্যের যোগাযোগ ছিল। কৃষিতে যথেষ্ট উন্নত ছিল ভারতবর্ষ।

ফা-হিয়েন

গৌতম বুদ্ধের দেশ এই ভারতবর্ষ। চীনদেশের সঙ্গে ভারতের প্রথম সংযোগ বাণিজ্যসূত্রে এবং সেই সূত্রেই চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার।

হান-বংশের রাজা সিঙ-এর রাজত্বকালে (৫৮—৭৫ খৃষ্টাব্দ) চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রচার শুরু হয়। তার পর থেকে বহু ভারতীয় শ্রমণ চীনে গিয়ে চীনা ভাষায় বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ করেছেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টায় চৈনিক বৌদ্ধপণ্ডিতদের জ্ঞান-পিপাসা মেটেনি। সেই জন্য বিনয়পিটক এবং অন্যান্য বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ফা-হিয়েন ভারতের দিকে যাত্রা করলেন। ফা-হিয়েন এসেছিলেন গুপ্তবংশীয় নৃপতি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের কালে। তিনি প্রায় ছয় বৎসর (৪০৫—৪১১ খৃঃ) গুপ্ত রাজধানীতে অবস্থান করেছিলেন। তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। তৎকালীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও লিপিবদ্ধ করে যান।

বিভিন্ন বৌদ্ধতীর্থ পরিদর্শন ও পর্যটন কালে ফা-হিয়েন ভারতের বহু প্রাচীন **জনপদের** সঙ্গে পরিচিত হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তক্ষশিলা, পাটলিপুত্র, তাম্রলিপ্ত ও সারনাথের নাম করা যায়। কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, বৈশালী প্রভৃতি স্থানের মহিমা তখন লুপ্তপ্রায়। পাটলিপুত্র নগর দর্শনে ফা-হিয়েন বিস্মিত ও অভিভূত হয়েছিলেন। ফা-হিয়েনের মতে শহরের প্রাসাদগুলির নির্মাতা দৈত্য ও অশরীরী আত্মারা—মানুষ এমন অপূর্ব বস্তু নির্মাণ করতে পারে বলে বিশ্বাস হয় না। ফা-হিয়েন উজ্জয়িনী নগরীরও প্রশংসা করেছেন।

ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকেই বোঝা যায়; এ সময়ে ব্রাহ্মণ্য **ধর্ম** খুব প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। তবে গুপ্তরাজারা যথেষ্ট উদার ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম চর্চায় কোনরূপ বাধাই তাঁরা দেননি। রাজারা ছিলেন নিষ্ঠাবান; পরমতসহিষ্ণু, শিল্পসাহিত্য-দর্শনের একান্ত অনুরাগী।

সমাজে এসময়ে জাতিভেদ প্রথা ততটা কঠোর ছিল না। অধিবাসীরা প্রাণিহত্যা করত না, মদ্যপান করত না। শূকর, হাঁস, মুরগী পালিত হত না। মাংস ও মদের দোকান ছিল না। মুদ্রা হিসাবে 'কড়ি'র ব্যবহার ছিল। চণ্ডালেরা মাংস বিক্রী করত বলে তাদের নগরের বাহিরে পৃথক জীবনযাপন করতে হত। তিনি মগধরাজ্য সম্বন্ধে বলেছেন যে অধিবাসীরা ধনী ও সম্ভ্রান্তশালী। দেশে অনেক ধর্মশালা ছিল। চুরি ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধের সংখ্যা কম ছিল।

ব্যাবসা বাণিজ্যে তাম্রলিপ্ত ছিল বিখ্যাত কেন্দ্র! সিংহল, ব্রহ্মদেশ কম্বোজ প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যতরীর যাতায়াত ছিল।

হিউয়েন সাঙ

চীনদেশী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হিউয়েন সাঙ বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং বৌদ্ধতীর্থগুলি পরিদর্শনের জন্য হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে এ দেশে আসেন। তিনি দীর্ঘকাল কনৌজে অবস্থান করেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল তিনি পর্যটন করেন। তাঁর লিখিত বিবরণী থেকে আমরা তৎকালীন ভারতের রীতিনীতি, শিক্ষা এবং ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারি।

তখন প্রাচীন ভারতীয় **নগরসমূহ** প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত, তবুও চৈনিক পরিব্রাজকের ভূয়সী প্রশংসা থেকে তারা বঞ্চিত হয়নি। এসময়ে শ্রাবস্তী, সাঁচী ও সারনাথ প্রভৃতি প্রাচীন নগরসমূহের ধ্বংসের ফলে এদের পরিবর্তে নতুন নগর উজ্জয়িনী, কনৌজ, গৌড় প্রভৃতি গড়ে ওঠে। পাটলিপুত্রের পরিবর্তে ভারতের রাজনীতির কেন্দ্রস্থল হয়েছিল কনৌজ।

এ সময়ে বৌদ্ধ **ধর্ম** খুব প্রবল ছিল, কিন্তু হিন্দু ধর্মও পাশাপাশি চলছিল। হর্ষ সমস্ত ভারতীয় ধর্মকেই সমর্থন করেছিলেন। তিনি প্রথমে শিবের উপাসনা করতেন, তারপর সূর্যের ও বুদ্ধের। তাঁর রাজত্বকালের শেষদিকে তিনি ক্রমে ক্রমে বুদ্ধের অনুরক্ত হয়ে পড়ছিলেন। দেশের লোকেরা হিন্দু ও বৌদ্ধ এই দুই ধর্মের সমর্থক ছিল। হর্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর প্রয়াগে এক **বৌদ্ধ মেলা** হত। এই উৎসবে হর্ষ বহু দান করতেন। হিউয়েন সাঙ এই উৎসব পরিদর্শন করেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় হর্ষের রাজত্বকালে **সাংস্কৃতিক উন্নতির** সাক্ষ্য দান করে। নালন্দা ছিল এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কোনরূপ খরচ দিতে হত না। একশ গ্রামের রাজস্ব থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ নির্বাহ হত। ছাত্রসংখ্যা ছিল দশ হাজার।

সমাজে মোটামুটি শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। তবে সম্ভবত অপরাধের সংখ্যা বিশেষ কম ছিল না। সাম্রাজ্যে চোর-ডাকাতের দৌরাত্ম্য ছিল। স্বয়ং হিউয়েন সাঙ একবার দুর্বৃত্তের হাতে লাঞ্ছিত হন।

বিচার ব্যবস্থা কঠোর ছিল, লঘুপাপেও গুরুদণ্ড দেওয়া হত। সাধারণ অপরাধে বিকলাঙ্গ করে দেওয়ারও নজীর পাওয়া যায়। পিতামাতার

প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করলে সন্তানের হাত কেটে দেওয়া হত। মৃত্যুদণ্ডও খুব বেশি দেওয়া হত ॥

অনুশীলনী

১। গুপ্তরাজবংশের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস কী? আধুনিক কালে পৃথিবীর কোনো দেশে চরম অরাজকতার পর বহু বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে তোমার জানা আছে কি? শিক্ষক মহাশয়ের সহযোগিতায় তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা কর।

২। অনেক ঐতিহাসিক সমুদ্রগুপ্তকে ভারতের অন্যতম সম্রাট বলেছেন—এর কারণ কী?

৩। গুপ্তরাজাদের ধর্মমত কী ছিল? অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের উপর তাঁরা সহানুভূতিশীল ছিলেন—দু'একটি উদাহরণ দিয়ে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ কর।

৪। এক একটি দলে বিভক্ত হয়ে যাদুঘরে যাও। যারা ছবি আঁকতে পার তারা গুপ্তযুগের দু'একটি প্রস্তরমূর্তির স্কেচ করে আন।

৫। 'ধ্রুপদী যুগ' বলতে ভারত-ইতিহাসের কোন্ সময়টি বোঝায়? এই যুগকে 'সমন্বয়ের যুগ' বলবার তাৎপর্য কী? এযুগের সাহিত্যগ্রন্থগুলি রচয়িতার নাম সুদ্ধ কালানুক্রমিক ভাবে সাজাও। এযুগের ইতিহাস রচনায় কোন্ কোন্ উপকরণ ঐতিহাসিকদের সাহায্য করেছে?

৬। হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও ৭ম শতকের প্রথম ভাগে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যাটির কয়েকটি কারণ অনুসন্ধান কর।

৭। সপ্তম শতকে গৌড় ও থানেশ্বরের বিরোধ নিয়ে ইতিহাসের নবযুগের সূচনা—উক্তিটির সত্যতা নিরূপণ কর।

৮। হর্ষের আমলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কি রকম ছিল?

৯। ব্যবহারিক সংকলন গ্রন্থে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত করে নাম দাও: "সাহিত্যে নদী-নগর"। প্রথমে ধর, উজ্জয়িনী। যে যে কাব্যে বা সাহিত্যে এই নগরীর উল্লেখ পাও সেগুলির নাম সংগ্রহ করে তোমার সংকলন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ কর:—

নাম	লেখক	গ্রন্থ	পংক্তি, সর্গ বা অধ্যায়	বৈশিষ্ট্য

নবম পরিচ্ছেদ

॥ প্রাচীন বাংলা ॥

প্রাচীন বাংলার নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের একান্ত অভাব। প্রথমত, যুগে যুগে বাংলার ভৌগোলিক সীমানার পরিবর্তন ঘটেছে, নির্দিষ্ট সীমামা পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, বাঙালী বলে স্বতন্ত্র একটি জাতি তখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। বাংলাদেশ ছিল নানা উপজাতির বাসভূমি। তৃতীয়ত, উপজাতিগুলির ভাষাগত প্রভেদও ছিল। ভাষা একটি সামাজিক বন্ধন; সেই বন্ধনের অভাবে বাংলা ও বাঙালীর অখণ্ড ইতিহাসের অভাব।

ভৌগোলিক অবস্থান

প্রাচীনকাল থেকে খৃষ্টীয় ৬।৭ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশ বিভিন্ন স্বতন্ত্র জনপদে বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন রাজশক্তির উত্থান-পতনে জনপদের সীমানার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটলেও মোটামুটি ভাবে বিভিন্ন জনপদ ও তাদের সীমারেখা নির্দেশ করা যেতে পারে।

বঙ্গ : এই দেশের প্রাচীনতম অংশ। ঐতরেয় আরণ্যকে, প্রাচীন মহাকাব্য ও ধর্মসূত্রগুলিতে, পাণিনিতে এর উল্লেখ আছে। মনে হয় পূর্ব ও মধ্য বাংলার নাম ছিল বঙ্গ। ভাগীরথী এর পশ্চিম সীমা। বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলের দু'টি ভাগ : সমতট ও হরিকেল।

রাঢ় : মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গ। এই জনপদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 'আচারাঙ্গ সূত্র' নামে জৈন পুঁথিতে। এখানকার লোকেরা ছিল নিষ্ঠুর ও রূঢ় প্রকৃতির। জৈন সন্ন্যাসীরা ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে স্থানীয় লোকদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন।

পুণ্ড্র : উত্তর বাংলা। প্রধান জেলা বরেন্দ্র। আজকের রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর ও পাবনা পুণ্ড্র নামে অভিহিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আর্যসংস্কৃতির বহির্ভূত দেশগুলির মধ্যে এর নাম আছে।

গৌড় : কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এখানকার পণ্যের উল্লেখ আছে। মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, মালদহ গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তাম্রলিপ্ত : মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক বন্দর। মহাভারতে, জাতকের গল্পে, টলেমি ও পেরিপ্লাস গ্রন্থে, ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে এর উল্লেখ আছে।

রাষ্ট্রের প্রাথমিক অবস্থা

গ্রীক ও বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের প্রথম পর্যায় সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা জানা যায়। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা গঙ্গারায়ের সামরিক শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলার পুণ্ড্রদেশ খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতকে মৌর্য অধিকারে ছিল। টলেমির গ্রন্থ থেকে জানা যায় খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে 'গঙ্গারিদই' নামে এক জাতি পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। গঙ্গার নিম্ন অঞ্চল ও তার শাখা-প্রশাখা অঞ্চল এই জাতির বাসভূমি ছিল। গঙ্গাতীরবর্তী গঙ্গে ছিল রাজধানী। এ-কালের বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস বলে কিছু পাওয়া যায় না। কয়েকটি ছিন্নপত্র ও অনুমানের উপর নির্ভর করে এ যুগের ইতিহাস রচিত।

বাংলায় গুপ্ত আধিপত্য

গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত বাংলাদেশ জয় করতে এসেছিলেন। অনেকের মতে 'রঘুবংশ' কাব্যে কালিদাস প্রকারান্তরে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের কথা বলেছেন। রঘুবংশ থেকে জানা যায় বাংলা দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব নিম্ন অঞ্চলের নৌবাহিনীর বিশেষ খ্যাতি ছিল।

সমুদ্রগুপ্ত সমগ্র বাংলাদেশ জয় করলেও তা সম্পূর্ণভাবে নিজের শাসনাধিকারভুক্ত করতে পারেননি। সমুদ্রগুপ্তের সময়ের অনুশাসন থেকে জানা যায় তখন পশ্চিমবঙ্গে এক স্বাধীন নৃপতি ছিলেন ইনি পুষ্করণার অধিপতি চন্দ্রবর্মা। এঁর রাজধানী ছিল বাঁকুড়া জেলার 'পোখারনা' গ্রাম। চন্দ্রবর্মার লিপি বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে উৎকীর্ণ আছে। পুষ্করণা ইত্যাদি জায়গার নাম থেকে বেশ বোঝা যায় যে প্রাচীন মহাকাব্যে বর্ণিত রাজ্যগুলির জায়গায় বাংলাদেশে নূতন রাজ্য গড়ে উঠেছে।

গুপ্তসম্রাটদের আমলে একমাত্র সমতট ছাড়া বাংলাদেশের অন্য সব ক্ষুদ্র রাজ্য তাঁদের অধিকারভুক্ত হয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশে গুপ্ত রাজাদের সবগুলি তাম্রপট্টলিপিই উত্তরবঙ্গে রাজসাহী দিনাজপুর বগুড়াতে পাওয়া গিয়াছে।

স্বাধীন বঙ্গ ও গৌড়রাজ শশাঙ্ক

স্কন্দগুপ্তের পর থেকে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের ফলে কোন কোন প্রদেশের 'উপরিক' (শাসনকর্তা) স্বাধীন হয়ে 'মহারাজ' উপাধি গ্রহণ করলেন। উত্তরবঙ্গ এর পরও বহুকাল গুপ্তসম্রাটদের অধীনে ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড়

ও বঙ্গ নামে দু'টি সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তম শতকের প্রথম দিকে (৬০৬ খৃষ্টাব্দে) গৌড়ের রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণপুরে (মুর্শিদাবাদ জেলায়)। যতদূর জানা যায় শশাঙ্কই বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন পরাক্রান্ত নৃপতি। পশ্চিমে মগধ থেকে দক্ষিণে উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনিই এদেশে প্রথম **রাষ্ট্রীয় সংহতি** আনেন। রাষ্ট্রীয় সংহতির ফলস্বরূপ এদেশের ক্ষুদ্র জনপদগুলি ধীরে ধীরে একত্রিত হয়ে বৃহৎ জনপদে পরিণত হয়। শশাঙ্কের পরে বাংলায় গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড্র এই তিনটি জনপদই প্রধান ছিল। তাঁর সময় থেকে শুরু করে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাংলাদেশের নাম ছিল গৌড়। তুর্কীদের আমল থেকে এ দেশ প্রথম 'বঙ্গ' নামে আখ্যাত হয়।

শশাঙ্ক শৈব ছিলেন। তাঁর **বৌদ্ধ-বিদ্বেষ** সম্বন্ধে অনেক কাহিনী আছে। এগুলির ভিত্তি হিউয়েন সাঙের বিবৃতি, বাণভট্টের হর্ষচরিত, সমসাময়িক শিলালেখ। শোনা যায় শশাঙ্ক অত্যাচারী ছিলেন; হর্ষবর্ধনের জেষ্ঠ্য ভ্রাতা রাজ্যবর্ধনকে নাকি তিনি অন্যায়ভাবে হত্যা করেন। শিলালিপিতে এ উক্তির প্রমাণের অভাব আছে। হর্ষবর্ধনের লিপি থেকে জানা যায় সত্যানুরোধে রাজ্যবর্ধন শত্রুগৃহে প্রাণত্যাগ করেন। এ থেকে বিশ্বাস-ঘাতকতার কোন ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হয় না। বাণভট্টের হর্ষচরিতে যে সমস্ত জিনিস পাওয়া যায় তা শশাঙ্কের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত। বাণভট্ট সভাকবি ছিলেন। হর্ষবর্ধনের মনস্তুটি করাই ছিল তাঁর কাজ। প্রশস্তির মধ্যে **ইতিহাসের সত্য পরিচয় পাওয়া যায় না।**

হিউয়েন সাঙও এ সমস্ত মতের দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর উক্তিতে কিছু পরস্পরবিরোধিতা এবং অতিরঞ্জন আছে। **হিউয়েন সাঙের অভিযোগ** এই যে শশাঙ্ক কুশীনগরে এক বিহারের ভিক্ষুদের বহিষ্কৃত করেন, পাটলিপুত্রে বুদ্ধপদাঙ্কিত একখণ্ড প্রস্তর গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করেন, বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম পুড়িয়ে, তিনি বুদ্ধমূর্তি সরিয়ে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এসমস্ত কারণে শেষ পর্যন্ত শশাঙ্ক পক্ষাঘাত রোগে মারা যান। এই হিউয়েন সাঙই আবার শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণপুরে অনেক বৌদ্ধশ্রমণ দেখেছেন, বৌদ্ধস্তূপ ও বিহারও কম দেখেননি। শশাঙ্ক এ ধরনের বৌদ্ধবিদ্বেষী হলে হিউয়েন সাঙও নিশ্চয়ই শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে নির্বিঘ্নে গৌড়, রাঢ় ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করতে পারতেন না। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের জোয়ার দেখে মনে

হয় না যে তিনি বৌদ্ধধর্মের খুব বড় রকমের ক্ষতি করতে পেরেছেন। তবে একথা ঠিক যে শশাঙ্ক তাঁর রাষ্ট্রের নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ পক্ষপাত প্রদর্শন করেছিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী অবদমিত বাংলাদেশের পক্ষে এ ভাবের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। এজন্যই শশাঙ্কের অপবাদ অতিরঞ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে বাধা পায়নি, তাছাড়া হর্ষবর্ধন বাণভট্টের মতো সভাকবি ও হিউয়েন সাঙের মত সুহৃৎ পেয়েছিলেন বলেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শশাঙ্ক এতটা ম্লান হয়ে গিয়েছেন।

মাৎস্যন্যায় ও পালবংশের প্রতিষ্ঠা

৬৩৭ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তার বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হল। তখন চারিদিকে অরাজকতা। রাজ্যগুলি পরস্পর হানাহানি শুরু করেছে, রাজ্যের মধ্যেও চক্রান্তের বেড়াজাল সৃষ্টি হয়েছে। পুকুরের বড় বড় মাছেরা যেমন ছোট মাছকে মেরে ফেলে এযুগেও সবল দুর্বলকে তেমন আঘাত করছিল। মোটামুটি ভাবে সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টম শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত .এই মাৎস্যনায় কালের ব্যাপ্তি। রাষ্ট্রের কোন ঐক্যবন্ধনই ছিল না।

অবশেষে দেশের প্রজারা ও রাষ্ট্রনেতারা একত্র হয়ে **গোপালদেব** নামে এক ব্যক্তিকে আনুমানিক ৭৫০ খৃষ্টাব্দে রাজপদে নির্বাচিত করেন। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে জনসাধারণের ক্ষমতার এতবড় প্রমাণ ভারতের ইতিহাসে আর নেই। গোপালের পুত্র **ধর্মপাল** কান্যকুব্জ পর্যন্ত আপন অধিকার বিস্তৃত করেন। তীরভুক্তি, **মগধ** ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর আবিষ্কার করে উত্তরভারতের 'দণ্ডনায়ক' **হন**। ধর্মপালের পুত্র **দেবপাল** সুদূর দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত অভিযান করেন, সমগ্র আর্যাবর্তের অধীশ্বর রূপে গণ্য হন। সুমাত্রা, জাভার শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা মঠ নির্মাণের জন্য তাঁর কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। ভারত মহাসাগরের অনেক দ্বীপপুঞ্জে তাঁর খ্যাতি ছিল। দেবপালের পর পাল রাজশক্তি দুর্বল হয়ে ৪০০ বৎসর পর্যন্ত টিঁকে থাকে। এই সময়ে আর্য ও আর্যেতর সংস্কৃতির মিলনে **বাঙালী জাতির গোড়াপত্তন** হয়।

দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকাল বিদ্রোহ ও চক্রান্তের জন্য কুখ্যাত। **কৈবর্ত বিদ্রোহের** জন্য বাংলাদেশের ইতিহাসে সময়টা বিশেষ উল্লেখ্য।

দ্বিতীয় মহীপাল অত্যাচারী রাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে তাঁর দুই ভাই বিদ্রোহী হন অবশেষে বন্দী হন। ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগ নিয়ে বারেন্দ্রীয় কৈবর্তদের নায়ক দিব্য বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন—অবশেষে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করলেন। মহীপালের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে।

কিন্তু দ্বিতীয় মহীপালের ভাই রামপালদেব কৈবর্তরাজ ভীমকে হত্যা করে পিতৃভূমির পুনরুদ্ধার সাধন করলেন। এর পর ধীরে ধীরে পালবংশের অবস্থার অবনতি হতে থাকে। আবার অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ দেখা গেল। বাংলায় কর্ণাটদেশীয় সেন রাজাদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

সেন রাজশক্তি

সেন রাজাদের পূর্বপুরুষেরা ব্যবসায়সূত্রে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট থেকে এসেছিলেন। আরেক মতে এঁরা ছিলেন পাল রাজাদের অধীন সামন্তশ্রেণীর লোক; বিশৃঙ্খলার সুযোগে তাঁরা ক্ষমতা দখল করেছিলেন। সেন রাজারা নিজেদের 'কর্ণাটক্ষত্রিয়' বলে পরিচয় দিয়েছেন। এই শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণরা শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

আনুমানিক ১১২৫ খৃষ্টাব্দে এই রাজ বংশের প্রথম রাজা বিজয়সেন সিংহাসন আরোহন করলেন। বিজয়সেন রাঢ় দেশে আপন প্রাধান্য বিস্তৃত করেছিলেন। তিনি বাংলার বিভিন্ন জনপদকে একীভূত করার চেষ্টা করেন। বিজয়সেনের পুত্র **বল্লালসেনের** রাজত্বকাল ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি চর্চার জন্যে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু-আচারের পুনরভ্যুদয় হল এ সময়ে।

১১৭৯ খৃষ্টাব্দে **লক্ষ্মণসেন** ৬০ বৎসর বয়সে রাজা হন। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল সংস্কৃতির ইতিহাসে বিশেষ মূল্যবান। কিন্তু তাঁর সময়েই অকস্মাৎ সেন রাজবংশের সূর্য অস্তমিত হল। আনুমানিক ১২০২ খৃষ্টাব্দে তুর্কী সেনাপতি বখতিয়ার খিলজী তৎকালীন বাংলার রাজধানী নদীয়া আক্রমণ করে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ অধিকার করলেন। লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গে চলে গেলেন। পূর্ববঙ্গে সেন রাজারা আরও প্রায় শতবর্ষকাল কোনক্রমে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখেন। অতঃপর বাংলায় রাজনীতিক ইতিাসের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে।

প্রাচীন বাংলার ধর্ম ও সমাজ

প্রাচীন বাংলার গোষ্ঠীগুলিকে আর্যেরা বলত বর্বর। বাংলাদেশে আর্যীকরণের শুরু মৌর্যযুগে। গুপ্তসম্রাটদের আমলের আগে থেকেই বাংলাদেশে জৈন ও বৌদ্ধ মতের প্রসার ছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে শাস্ত্রজ্ঞ

ব্রাহ্মণদের আগমনের পরে ব্রাহ্মণ্য মতেরও প্রসার ঘটে। সব ধর্মই পাশাপাশি চলছিল। পালরাজারা বৌদ্ধমতাবলম্বী হলেও ব্রাহ্মণ্য মতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ক্রমে ব্রাহ্মণরা সমাজে প্রতিপত্তি অর্জন করে সমাজের উচ্চতম বর্ণ রূপে পরিগণিত হয়। দশম শতাব্দী থেকেই কুল-গর্বে, পাণ্ডিত্য-প্রকর্ষে ব্রাহ্মণরা প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সেকালের দাম্ভিক ব্রাহ্মণের ব্যঙ্গচিত্র পাওয়া যায় কৃষ্ণমিত্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকে। দেবল ব্রাহ্মণ বা পূজারী বামুনরা সমাজে নিন্দিত হত। এদের বলা হত 'ভোজনক'।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিক্রিয়া **সতীদাহ প্রথা।** পাল আমলের শেষ দিকে তার বিকাশ ও সেন আমলে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রথার প্রসার। গোঁড়া হিন্দু আচারের আর একটি নমুনা **কৌলিন্য প্রথা**—বল্লালসেনের পৃষ্ঠপোষকতায় যার জন্ম।

কিন্তু পূর্ববঙ্গ বহুকাল যাবৎ এ সমস্ত পরিবর্তনের বাইরে ছিল বলে মনে হয়। চর্যাগীতি (৯৫০-১২০০ খৃষ্টাব্দ) থেকে বেশ বোঝা যায় পূর্ববঙ্গ (বঙ্গ) বহুদিন পর্যন্ত নীচ জাতীর আবাসস্থল ছিল। সেখানে বিবাহ প্রশস্ত ছিল না একটি চর্যার চরণে আছে :

'বঙ্গে জায়া নিলেমি পরে ভাগেল তোহার বিণানা।'

(বঙ্গে জায়া নিলি, পরে তোর বিজ্ঞান গেল ভেঙে)

আর একটি পদে আছে :

'আজি ভুসুক বাঙ্গালী ভৈলি
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলি।"

(ভুসুক, আজ তুই বাঙালী হলি, তুই চণ্ডালীকে নিজের ঘরণী করলি)

স্পষ্টই বোঝা যায় ব্রাত্য বা পতিত রূপে খাঁটি বঙ্গের লোকদের কলঙ্ক তখন পর্যন্ত অপনোদিত হয়নি।

সাধারণ জীবনযাত্রা

প্রাচীন সাহিত্য, বিশেষত অবহট্ঠ (অপভ্রংশ) ভাষায় রচিত ছোট ছোট কবিতায়, চর্যাপদে, সদুক্তিকর্ণামৃতের শ্লোকে সেকালের জীবনযাত্রার ছবি পাই। জীবনযাত্রা এখনকার মতই ছিল। সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি শ্লোকে আছে : 'কাঠের খুঁটি নড়বড় করছে, মাটির দেওয়াল ধ্বসে পড়ছে, চালে খড় নেই, আমার ভাঙা ঘরে ব্যাঙ কেঁচোর খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে

গ্রামের তুলনায় শহরে বিলাস-ব্যসন বেশি ছিল—স্বভাবত যা হয়ে থাকে কবিরা দারিদ্র্যের যে মর্মান্তিক ছবি এঁকেছেন তা অতি বাস্তব।

অপভ্রংশ ভাষায় লেখা প্রাকৃত-পৈঙ্গল নামে ছন্দোগ্রন্থের একটি শ্লোকে বাঙালীর ভোজনবিলাসের বর্ণনা পাই।

'ওগ্গর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা দুগ্ধসজুত্তা
মোইলি মচ্ছা নালিচ গচ্ছা দিজুই কান্তা খাই পুনবন্তা॥

(ওগরা ভাত, রম্ভা বা কলার পাত, গাওয়া ঘি, দুগ্ধ সংযুক্ত, মোরলা মাছ, নাল্‌তে শাক—কান্তা দিচ্ছে, পুণ্যবান্ খাচ্ছে।)

নিম্নবঙ্গের দরিদ্র অধিবাসীদের কাছে 'সিহুল্লী' বা শুট্‌কী মাছ খুব প্রিয় খাদ্য ছিল। চর্যাপদে হরিণের-মাংস খাওয়ার উল্লেখ আছে, জাল ফেলে মাছ ধরার কথা আছে। বিয়ের ভোজে এখনকার মতই অপচয় লক্ষ্য করেছেন ই-সিঙ।

বেশভূষা ও লোকপ্রকৃতি

পোশাকের মধ্যে ছিল ধুতি আর শাড়ি। দশম-একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরে গৌড়ীয় বিদ্যার্থীদের বর্ণনাপ্রসঙ্গে পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র বাঙালীর বেশবাস এবং বাংলার লোকপ্রকৃতি সম্বন্ধে যা বলেছেন তা চিত্তাকর্ষক :

'এঁদের প্রকৃত ব্যবহার ছিল রূঢ় ও অমার্জিত। এঁরা ছিলেন অত্যন্ত ছুঁৎমার্গী ; এঁদের দেহ ক্ষীণ, কঙ্কালমাত্র সার, একটু ধাক্কা লাগলেই ভেঙে পড়বেন, এই আশঙ্কায় সকলে তাঁদের কাছ থেকে দূরে থাকতেন।···হাঁটার সময় তাঁর ময়ূরপঙ্খী জুতোয় মচ্ মচ্ শব্দ হয়···কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতদন্তপঙক্তিতে তাঁদের দেখায় ঠিক বাঁদরের মত। তাঁর দুই কানে তিন তিনটি করে স্বর্ণ কর্ণভূষণ, হাতে যষ্টি, দেখে মনে হয় সাক্ষাৎ কুবের।'

ব্যঙ্গচিত্রটি সত্যিই চমৎকার। কিন্তু এ থেকে সাধারণ মানুষের যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাতে এঁরা নিঃসন্দেহে অভিজাতশ্রেণীর লোক।

হিউয়েন সাঙের মতে বাংলাদেশের কজঙ্গলের লোকেরা স্পষ্টবাদী, গুণবান ও কৃষ্টিবান্ ; পুণ্ড্রদেশের লোক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ; কামরূপের লোকেরা সদাচারী হওয়া সত্ত্বেও হিংস্র ; তাম্রলিপ্তির অধিবাসীরা চট্‌পটে, শক্তসমর্থ, সাহসী,—অবশ্য রূঢ় ; কর্ণসুবর্ণতে যাঁরা থাকতেন তাঁরা ছিলেন ভদ্র সচ্চরিত্র, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপাসক; সমতটের লোকেরা ছিল কর্মঠ।

অর্থনীতি

বাংলাদেশের **কৃষিকাজ** বেশ প্রশস্ত ছিল। একাদশ শতকে 'বঙ্গাল

নামে একটি পৃথক জনপদ ছিল। 'আইন-ই-আকবরী'তে বঙ্গাল শব্দে ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'বঙ্গ' শব্দের উত্তর 'আল' প্রত্যয় যোগ করে। অর্থাৎ বঙ্গদেশে প্রচুর আল ছিল। ক্ষেত্রকর, কর্ষক, কৃষক, নামে আখ্যাত কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের লোক বাংলায় অনেক ছিল। কৃষকদের খাতির যথেষ্ট ছিল। তাদের অবস্থাও ছিল মোটামুটি সচ্ছল।

খনিজ দ্রব্য॥ বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে পৌণ্ড্রদেশের হীরার উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বাংলার হীরার উল্লেখ পাওয়া যায়। নিম্নবঙ্গে স্বর্ণরেখা নদীতে, ঢাকা ফরিদপুরের সোনারং, সোনারগাঁ, স্বর্ণবীথি, সোনাপুরের নদীগুলির মাটিতে গুঁড়ো সোনা পাওয়া যেত। অবশ্য সে সোনা খুব উঁচুদরের ছিল না। রূপাও পাওয়া যেত।

অন্তর্বানিজ্য॥ বাংলা দেশে উৎপন্ন সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র ও সূতির কাপড় উত্তর ভারতের সর্বত্র আদৃত হত। চতুর্দশ শতাব্দীতে জ্যোতিরীশ্বর গ্রন্থে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকার নেত বস্ত্রের উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের উক্তি থেকে জানতে পারি তাঁর সময়ে বাংলাদেশের চার রকমের কাপড় তৈরী হত। চিনি, ধাতুদ্রব্য পাথরের কাজ, কাঠের কাজ, মাটির কাজ ও হাতীর দাঁতের কাজের জন্য বাংলাদেশের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল।

বহির্বাণিজ্য॥ গ্রীক ঐতিহাসিকদের লেখা, জাতকের গল্প ইত্যাদি থেকে জানতে পারি যে খৃষ্টজন্মের চার-পাঁচ শতাব্দী আগে থেকে বিদেশের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। বাংলার তাম্রলিপ্ত, গঙ্গে প্রভৃতি বন্দর বিখ্যাত ছিল। এ সমস্ত বন্দর থেকে সূক্ষ্ম মসলিন, মুক্তা ও অন্যান্য বিলাস-সামগ্রী নানা দেশে চালান যেত। যবদ্বীপ, সিংহল, স্বর্ণদ্বীপের সঙ্গে বাংলা-দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকে রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বাংলার বণিকেরা বিত্তশালী ছিলেন।

পাল রাজত্বের মাঝামাঝি সময়ে সম্ভবত বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্য কিছুটা নিম্নগামী হয়। দেশ তখন একান্তভাবে কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে। সে সময়ে পণ্যদ্রব্যের বিনিময় প্রথা (Barter system) প্রশস্ত ছিল। আদান প্রদান কড়ি দিয়েই চলত। সম্ভবত এই কারণেই পাল ও সেন আমলে বাংলার এত সমৃদ্ধি সত্ত্বেও এই দুই কালের দু'চারটি তাম্রমুদ্রা ছাড়া আর কোন মুদ্রাই পাওয়া যায় না।

রাষ্ট্রব্যবস্থা

বাংলায় **মৌর্য** শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হত একজন রাজপ্রতিনিধির নেতৃত্বে। **গুপ্ত আমলে** বাংলাদেশের অধিকাংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন হয়ে পড়ে। শাসনকার্যের সুবিধার জন্যে বাংলাদেশকে কতকগুলি সংস্থায় বিভক্ত করা হয়। এর অনেকগুলি অংশ সম্রাটের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা শাসন করতেন; কতকগুলি অংশ সামন্ত রাজাদের অধীনে থাকত। শাসনব্যাপারে ধনিক শ্রেণী, সামন্ত সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণদেরও যথেষ্ট আধিপত্য ছিল।

পাল রাজাদের আমলেও সামন্ততন্ত্র বেশ প্রাধান্য বিস্তার করে। সে যুগেও গুপ্তযুগের মত বিভক্ত করে দেশ শাসিত হত। এযুগে রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হল তার ক্রমপ্রসারমানতা। অর্থাৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাগের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্র ক্রমশ গ্রাম পাড়া ইত্যাদিকেও বেঁধে ফেল্‌লে। এতে সমস্যা দেখা দিল এই যে, রাষ্টযন্ত্রের সঙ্গে জনসাধারণের সংযোগ ক্রমেই ছিন্ন হতে লাগল। এই সুযোগে মুষ্টিমেয় ক্ষমতালিপ্সুর দল শাসনব্যাপারে নিজেদের অধিকার কায়েম করতে তৎপর হল।

সেন রাজাদের আমলে আমলাতন্ত্র আরও প্রবল আকার ধারণ করল। ব্রাহ্মণ রাজশক্তির প্রশ্রয়ে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিততন্ত্র বেশ জাঁকিয়ে বসল। সামন্তদের প্রাবল্য ছিল। মন্ত্রীদের সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না। এযুগে নিম্নতম রাষ্ট্রীয় বিভাগ ছিল পাটক বা পাড়া। ২৭টি রথ, ২৭টি হস্তী, ৮১টি অশ্ব ও ১৩৫টি পদাতিক নিয়ে যে চতুরঙ্গ গঠিত হত তাকে বলা হত 'গণ'।

সাহিত্য—দর্শন—শিল্পকলা

আর্যপূর্ব বাংলার আদিবাসীদের কোন লিপি না থাকায় আদিবাসীদের শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান-জ্ঞান চর্চার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বাংলাদেশে আর্যসংস্কৃতি প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অনার্য ভাষাগুলি ধীরে ধীরে আর্য-ভাষার কুক্ষিগত হওয়ায় 'বাংলা' নামে এক পৃথক ভাষা সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিল। তখন সংস্কৃত মাত্র ভাঙতে সুরু করেছে অর্থাৎ অপভ্রংশে পরিণত হয়েছে। আনুমানিক ৮০০ খৃষ্টাব্দে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। পালযুগের চর্যাপদগুলি অপভ্রংশের পরবর্তী স্তরের ভাষায় রচিত—**প্রাচীনতম বাংলাভাষার নিদর্শন** রূপে যথেষ্ট মূল্যবান।

পাল আমলে সংস্কৃত ভাষায় **সাহিত্য-চর্চায়** বাঙালী কবিরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কাব্যটি দ্ব্যর্থক : এক অর্থে রামচন্দ্রের কাহিনী, অন্য অর্থে পালরাজা রামপালদেবের

কাহিনী। এর কাব্যমূল্য বিশেষ না থাকলেও ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। একাদশ-দ্বাদশ শতকের পুরনো বাংলা হরফে লেখা 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' নামে একটি সংস্কৃত কবিতা সংগ্রহগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নেপালে পাওয়া গিয়েছে। শ্লোকগুলির রচয়িতার মধ্যে অনেক বাঙালী কবির নাম পাওয়া যায়।

সেনরাজাদের আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যুত্থানের ফলে সংস্কৃত ভাষার চর্চা-ও প্রসার ঘটে। এখন সাহিত্য হল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের,—'জনসভার সাহিত্য' আবার অনেকটা ম্লান হয়ে এল। বল্লালসেন স্বয়ং বিদগ্ধ কলারসিক ছিলেন। দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর নামে দু'টি গ্রন্থের রচয়িতা রূপে তাঁর খ্যাতি আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থটি শেষ করেন তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেন। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীধরদাস সঙ্কলিত সদুক্তিকর্ণামৃত নামক সংস্কৃত গ্রন্থে বাংলাদেশের জীবনচর্যার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটির শ্লোককর্তাদের মধ্যে বহু বাঙালী কবি আছেন। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার রাজ-সভার পঞ্চরত্ন ছিলেন কবি শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপতি ধর ও জয়দেব। লক্ষ্মণসেনদেবের উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁতী ধোয়ীকে রাজ-সভায় স্থান দেওয়ার মধ্যে। মেঘদূতের অনুকরণে যতগুলি দূতকাব্য রচিত হয়েছে তাদের মধ্যে ধোয়ীর পবনদূত কাব্য বিশিষ্ট। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য সংস্কৃতে রচিত ; কিন্তু তার ছন্দ ভঙ্গি ও প্রাণ বাংলা ; অর্থাৎ এ-কাব্যের সংস্কৃতভাষা বাংলার প্রায় কাছাকাছি।

দর্শনশাস্ত্র চর্চায়ও বহু বাঙালী পণ্ডিতের নাম শোনা যায়। গৌড়পাদ বা গৌড়াচার্য শ্রীধর ভট্ট, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, শীলভদ্র, ভবদেব ভট্ট, হলায়ুধ, জীমূত-বাহন—এঁরা ছিলেন সব সেরা পণ্ডিত। জীমূতবাহনের খ্যাতি বাঙালী হিন্দুর সম্পত্তি-বিভাগ ও উত্তরাধিকার আইন নিয়ে 'দায়ভাগ' নামক গ্রন্থ লিখে।

ব্যাকরণ অভিধান ও ভাষাতত্ত্বের পুস্তক রচনায়ও অনেক পণ্ডিত খ্যাতি অর্জন করেন। মৈত্রেয়-রক্ষিত, জীবেন্দ্রবুদ্ধি, পুরুষোত্তম ও সর্বানন্দের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সর্বানন্দের টিকাসর্বস্ব গ্রন্থে প্রচুর বাংলা দেশী শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়।

শিল্পকলার দিক থেকে পাল রাজাদের আমলে মগধ ও গৌড় প্রস্তরশিল্পের জন্য খ্যাতি লাভ করে। পাল যুগের আগেও বাংলার উন্নত শিল্পকলার প্রমাণ পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত শিল্প। বাংলাদেশে প্রাচীনতম ভাস্কর্যের চিহ্ন পোখারনা (বাঁকুড়া) ও তমলুকে প্রাপ্ত দু'টি বেলে মাটির মূর্তি। স্থাপত্যেরও নিদর্শন বহু।

ঢাকাতে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের একটি স্তূপ প্রাপ্ত স্তূপগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। রাজশাহীতে এক অতি প্রাচীন বিহার এবং পাহাড়পুরে একটি অভিনব মন্দির পাওয়া গেছে!

বাংলাদেশে আঁকা ছবির প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় পালযুগে। চতুর্থ শতকে তাম্রলিপ্তে যে চিত্রাঙ্কন বিদ্যার চল ছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ফা-হিয়েনের বিবরণীতে। একাদশ-দ্বাদশ শতকের যে কয়টি ছবি পাওয়া গিয়েছে তার একটি ছাড়া বাদবাকি সব বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয়। বাংলাদেশের ভাস্কর্যের মত এই চিত্রগুলিও লালিত্যে অনবদ্য॥

অনুশীলনী

১। (ক) বাংলার বিভিন্ন উপজাতির ভাষাও বিভিন্ন ছিল ফলে প্রাচীন বাংলার অখণ্ড ইতিহাস আমরা পাইনে। (খ) আধুনিক কালেও বাংলাদেশে বহু ভাষা—উপভাষা প্রচলিত আছে, অথচ সেজন্যে ইতিহাসে কোথাও ফাঁক থেকে যাচ্ছে না।

—উপরের সমস্যাটি সম্পর্কে তোমার চিন্তাধারা প্রকাশ কর।

২। ইতিহাসের উপাদান হিসেবে (ক) রাজাদের আত্মচরিত, (খ) রাজকবিদের রচিত রাজ-জীবনচরিত এবং (গ) বিদেশী পর্যটকদের বিবরণগুলি কতটা পরিমাণে নির্ভরযোগ্য? এই তিনটি ক্ষেত্রে গ্রন্থরচনায় কী কী ত্রুটি দেখা দিতে পারে?

৩। সতীদাহ প্রথা কৌলিন্য প্রথার দোষগুণ বিচার কর। পাল রাজত্বের বহুকাল পরে ব্রিটিশ আমলে সতীদাহ প্রথার বিপক্ষে যে আন্দোলন হয়েছিল তার ইতিহাস সংগ্রহ কর।

৪। প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন চর্যাগীতি থেকে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করে প্রাচীন বাংলার সমাজ চিত্রের নমুনা দেখাও। পরে এই নমুনাগুলি এবং তাদের সহজ বাংলা অর্থ পাশে পাশে লিখে বড় চার্ট তৈরি কর প্রদর্শনীর জন্যে। [বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তোমাদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত ; এ কাজটি সে ইতিহাসের সম্যক পরিচয় লাভেও সাহায্য করবে তোমাদের।]

৫। সেন রাজাদের আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যুত্থানের ফলে সংস্কৃত ভাষার চর্চা বাড়ল ; কিন্তু এতে সাধারণ মানুষের দিক থেকে কী ক্ষতি হল?

৬। 'পাল ও সেন আমলের সংস্কৃতি'—এই বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ রচনা কর।

———

দশম পরিচ্ছেদ

॥ দক্ষিণ ভারত ॥

সাতবাহন বংশ

উত্তর ভারতে যখন মৌর্যসাম্রাজ্যে ফাটল দেখা দিল দক্ষিণ ভারতে তখন **অন্ধ্র** বা **সাতবাহন সাম্রাজ্য** স্থাপনের উদ্যোগপর্ব সমাপ্ত হয়েছে। যদিও এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল খৃঃ পূঃ ৩৭ অব্দ (অবশ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে) তথাপি মৌর্য-চন্দ্রগুপ্ত এবং অশোকের সময়েও তাদের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। মেগাস্থিনিসের বিবরণ এবং অশোকের শিলালেখে এঁদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই বংশের রাজাদের নামের ব্যাপারে একটা ব্যতিক্রম আমরা লক্ষ্য করেছি। মাতার নামানুসারে তাঁদের নামকরণ হত। যেমন গৌতমীপুত্র শাতকর্ণী, বশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ী।

শ্রীশাতকর্ণীর সময়ে সাতবাহন রাজ্যের রাজধানী ছিল গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান নগরে। তিনি অশ্বমেধযজ্ঞ করে আপন শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। গৌতমীপুত্র শাতকর্ণী এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকেই বিশাল সাতবাহন সাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক মিলনসাধন এই যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যদিও মৌর্যরাজাদের আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমেই আর্যসংস্কৃতি দক্ষিণ ভারতে পরিচিত হয়েছিল তথাপি তা স্থায়ী প্রভাব রেখে যেতে পারেনি। সাতবাহন যুগেই আর্যসংস্কৃতি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ভাষা সংস্কৃতি দক্ষিণ ভারতে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পেল।

পল্লব-চালুক্য-রাষ্ট্রকূট-চোল বংশ

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে সাতবাহন বংশের পতন হয়। তার কিছুকাল পরেই দক্ষিণভারতে **পল্লব** রাজবংশের উদ্ভব। পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ 'মত্তবিলাস' নামক একখানা প্রহসন লেখেন। স্থাপত্যশিল্পে তিনি উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁর পুত্র নরসিংহবর্মণ (৬২৫—৬৪৫ খৃঃ) এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। পল্লব-রাজাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন চালুক্য পাণ্ড্য এবং চোল রাজারা। তাঁদের

আক্রমণের ফলে অষ্টম শতাব্দীতে পল্লবরাজ্যে ভাঙন দেখা দেয়। নবম শতাব্দীতে পল্লবরাজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি মহারাষ্ট্রে **চালুক্য** রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজধানীর নাম ছিল বাতাপী বা বাদামী। প্রথম পুলকেশী চালুক্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পৌত্র ২য় পুলকেশী (৬০৯—৬৪২ খৃঃ) এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণস্থ প্রায় সমস্ত ভূভাগ তিনি তাঁর রাজ্যভুক্ত করেন! সভাকবি রবিকীর্তি রচিত শিলালিপিতে এঁর বিজয় কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরু তাঁর দরবারে দূত পাঠিয়েছিলেন।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে বাতাপীর চালুক্য রাজ্যের অবসান ঘটিয়ে সামন্তরাজ দন্তিদুর্গ **রাষ্ট্রকূট** রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে এই বংশের রাজাদের অবদান অনস্বীকার্য। আরবীয় লেখকদের মতে তৎ-কালীন বিশ্বের চারজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন: চীনের সম্রাট, কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের সম্রাট, বাগদাদের খলিফা, এবং রাষ্ট্রকূটরাজ (১ম অমোঘবর্ষ: ৮১৫—৮৭৮ খৃঃ)।
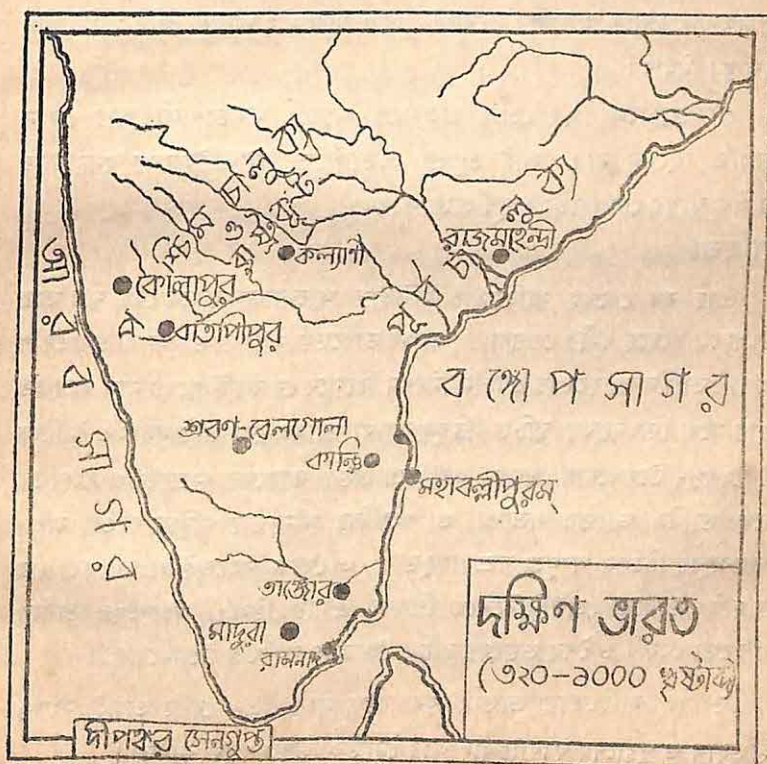
রাষ্ট্রকূট বংশ প্রায় দুশো বছর রাজত্ব করার পর তাঁদের হারিয়ে দিয়ে (বর্তমান গুজরাট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত) কল্যাণনগরে চালুক্য রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের কাহিনী অবলম্বনে সভাকবি বিহ্লন 'বিক্রমাঙ্কদেব চরিত রচনা করেন। এ বংশের রাজত্বকাল ১২শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত।

চোল বংশ দাক্ষিণাত্যে তাঞ্জোরের একটি প্রাচীন রাজবংশ। কিন্তু প্রতিবেশী প্রাণ্ড্য, পল্লব প্রভৃতি ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রের চাপে পড়ে খৃষ্টিয় নবম শতাব্দীর পূর্বে চোলরাজ্য মাথা উঁচু করতে পারেনি। দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে চোলরাজ রাজরাজ কেরল, পাণ্ড্য, সিংহল ও মহীশূরের কতকাংশ অধিকার করেন। তাঁর নৌ শক্তির যথেষ্ট ছিল। ধর্ম ও সংস্কৃতিরও তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঞ্জোরের বিখ্যাত মন্দির নির্মাণ তাঁর প্রধান কীর্তি।

রাজরাজের পুত্র রাজেন্দ্রচোল (১০১৪—১০৪৪ খৃঃ) চোলরাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সমুদ্রপথে আন্দামান-নিকোবর, ব্রহ্মদেশে পেগু, সুমাত্রা এবং মালয়ের কতকাংশ অধিকার করেন। তাঁর অতুলনীয় কীর্তি যোল মাইল দীর্ঘ এক হ্রদ নির্মাণ।

রাজেন্দ্রচোলের পর চোল রাজবংশে অনুরূপ ক্ষমতাশালী আর কোন নরপতি ছিলেন না। তাই চতুর্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর চোলরাজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন।

সাহিত্য

প্রায় সর্ব দেশের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় তার উৎসমূলে রয়েছে ধর্মীর প্রেরণা। দক্ষিণ ভারতের সাহিত্যও এর ব্যত্যয় দেখি না। তামিল সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে যে কয়টি গ্রন্থের নাম করা হয় তার মধ্যে তিরুবল্লুবর রচিত ত্রিক্কুরল বা তামিল-বেদ ভক্তিমূলক ও নৈতিক উপদেশপূর্ণ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে উত্তর ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তামিল জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিরুবল্লুবর ছিলেন অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। এ থেকে সহজেই ধারণা করা যায় যে দক্ষিণ ভারতে শ্রেণীনির্বিশেষে শিক্ষার প্রসার ছিল। মধ্যযুগের তামিল সাহিত্যে বৈষ্ণব ও শৈব ভক্তদের রচিত স্তোত্র ও সঙ্গীতই উল্লেখযোগ্য।

তামিল সাহিত্যের ভাণ্ডার খুব সমৃদ্ধ নয়। এর বেশীর ভাগই সংস্কৃত ইতিহাস ও পুরাণের কাব্যানুবাদ আর নৈতিক উপদেশপূর্ণ কবিতা।

বৈদিক ধর্মচর্চার মাধ্যমে আপস্তম্ব প্রমুখ দক্ষিণ ভারতীয় আচার্যরা সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। দক্ষিণ ভারতের সাহিত্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কুমারদাস, ভারবী, রবিকীর্তি, অলঙ্কারশাস্ত্রকার দণ্ডী ও 'বৃহৎকথা' রচয়িতা গুণাঢ্য।

ধর্ম

বিভিন্ন যুগে উত্তর ভারতে নানা ধর্মের উদয়-বিলয় ঘটেছে; দক্ষিণ ভারতের ধর্মীয় ইতিহাস তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, দক্ষিণ ভারতেও প্রবেশ করেছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সমকালে জৈনধর্ম এবং অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম দক্ষিণ ভারতে প্রসার লাভ করে; তবে খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারেনি।

পল্লব, চালুক্য এবং চোল রাজবংশের রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতে হিন্দু ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব হয়। বিখ্যাত ধর্মপ্রবর্তক ও সংস্কারক শঙ্করাচার্য বলতেন, জগতে সমস্তই মায়া, মিথ্যা—একমাত্র সত্য ব্রহ্ম। বহুদেববাদ অর্থাৎ অনেক দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না তিনি।

দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণবধর্মও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল; এবং তার মূলে ছিল প্রাচীন আলোয়ার সম্প্রদায়। ঐতিহাসিকদের মতে এই সম্প্রদায় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিল। আলোয়ারগণ জ্ঞানের পথে না গিয়ে ভক্তির পথে ঈশ্বরের সাধনা করেছেন। আলোয়ারদের পর বৈষ্ণব আচার্যদের আবির্ভাব। দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব ধর্মকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা দিলেন যমুনাচার্য, রামানুজ এবং মধ্বাচার্য।

শিল্পকলা

প্রাচীন ভারতের শিল্পকলার ইতিহাসে দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য, চিত্র ও ধাতুশিল্পের দান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাহাড় কেটে নির্মাণ করা হয়েছে বহু বৌদ্ধ চৈত্য-বিহার এবং হিন্দু মন্দির। আর সে সকল মন্দির গাত্রে অঙ্কিত হয়েছে অনিন্দ্যসুন্দর চিত্রাবলী।

সাতবাহন আমলে ভাজা, অজন্তা, নাসিক, কার্লে প্রভৃতি স্থানে অনেক বৌদ্ধ চৈত্য এবং বিহার নির্মিত হয়েছে। অন্ধ্রদেশে গোলি ভট্টিপ্রোলু, অমরাবতী ও নাগার্জুনীকোণ্ডের স্তূপগুলি স্থাপত্য-ভাস্কর্যে অবিস্মরণীয়। পঞ্চম শতাব্দীতে অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি স্থানে নূতন নূতন চৈত্যকক্ষ তৈরি হয়। খৃঃ পূঃ

তৃতীয় শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে অজন্তার গুহামন্দিরগুলি নির্মিত হয়।

পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে দক্ষিণ ভারতে হিন্দু মন্দির নির্মাণের বহুল নিদর্শন পাওয়া যায়। পল্লব এবং চালুক্য বংশের রাজারা শিল্পোৎসাহী ছিলেন। ত্রিচিনোপল্লী ও মহাবল্লীপুরম্-এর গুহামন্দির এবং রথ পল্লব-শিল্পের
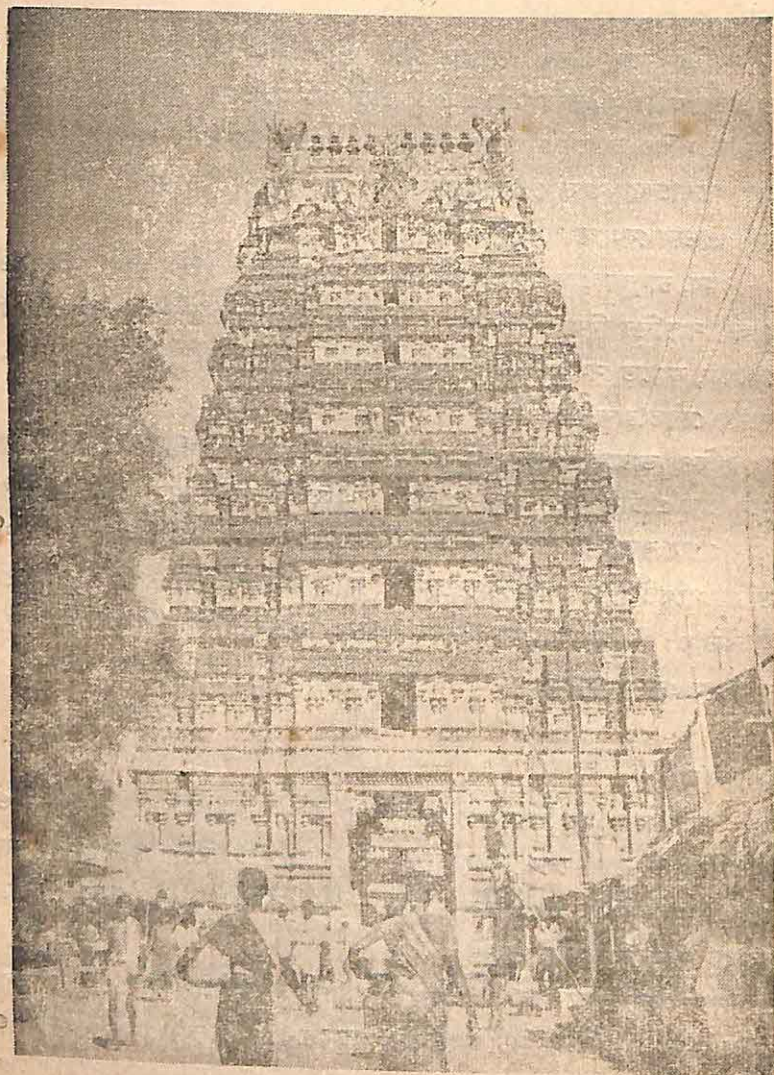
মাদ্রাজ রাজ্যের পক্ষিতীর্থ মন্দিরের গোপুরম্
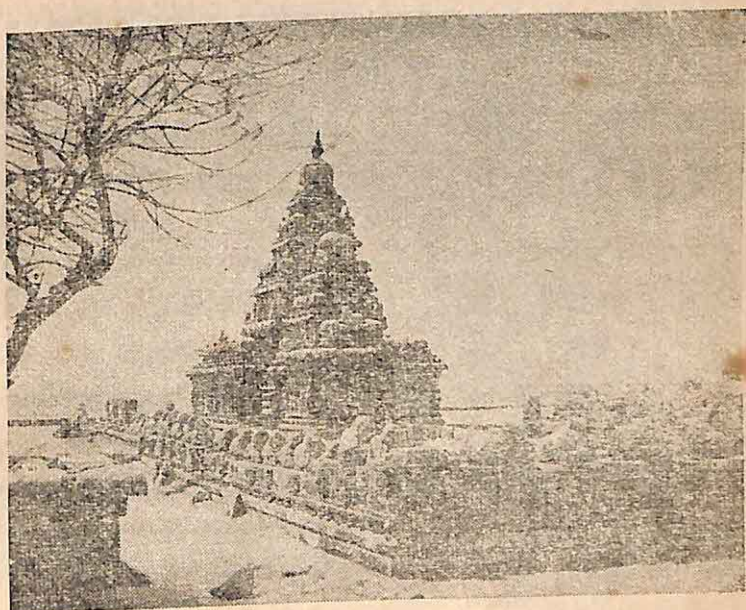
মহাবলীপুরম্ : বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমিতে প্রাচীন মন্দির
(সপ্ত মন্দিরের মধ্যে একমাত্র অবশিষ্ট)
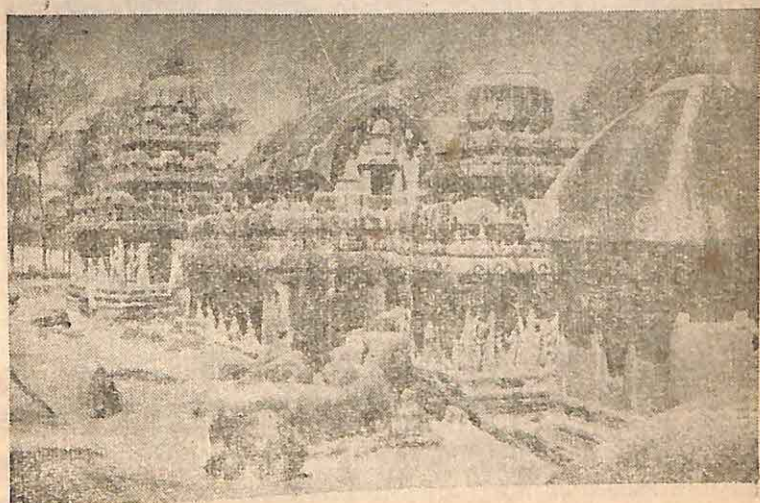
মহাবলীপুরম্ : যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুন ও দ্রৌপদী রথ
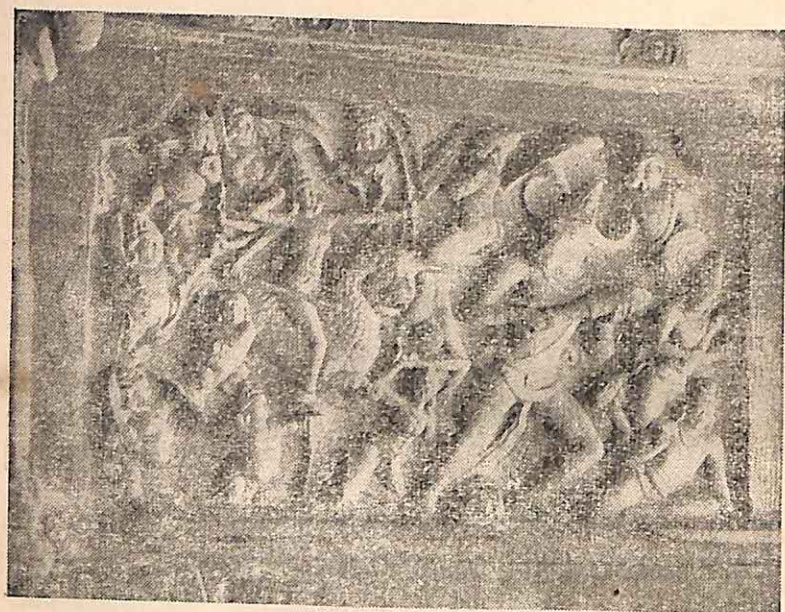
মহাবলীপুরম্ : মহিষাসুর-মর্দিনী গুহাচিত্র
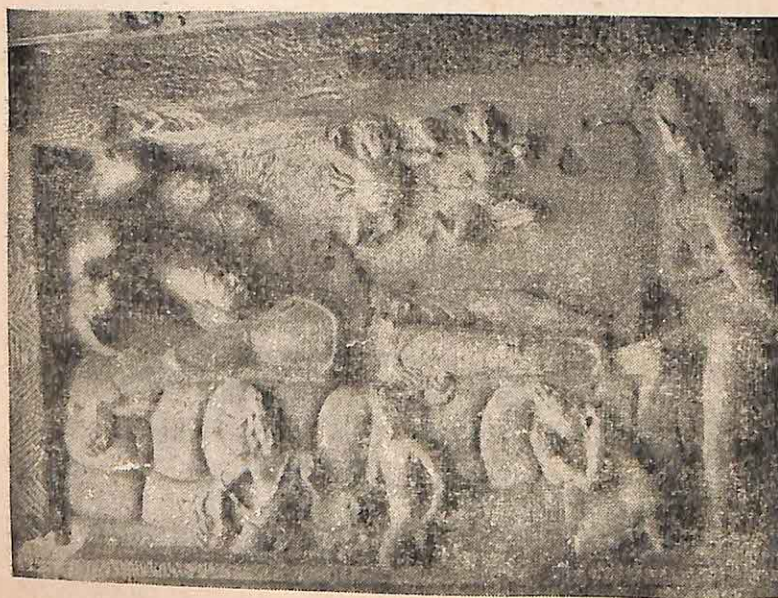
মহাবলীপুরম্ : অনন্ত শয্যায় বিষ্ণু—গুহাচিত্র
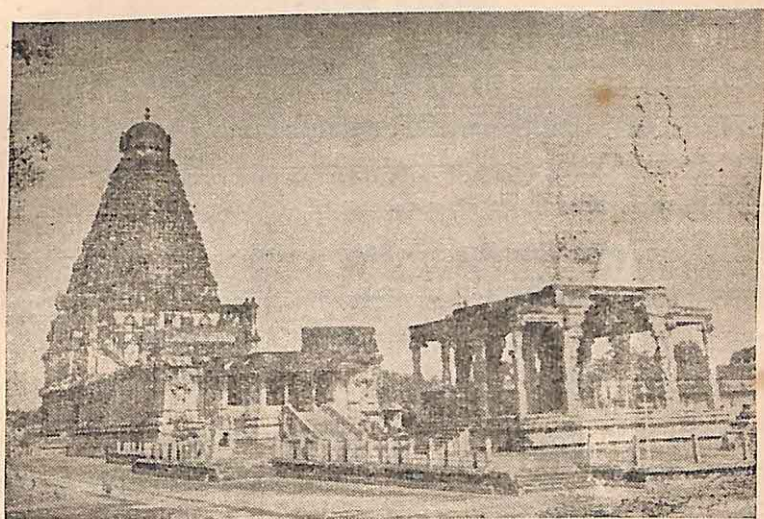
তাঞ্জোরের বিখ্যাত শিবমন্দির : সম্মুখের মণ্ডপে একটি পাথর থেকে তৈরি প্রকাণ্ড নন্দী-মূর্তি : শিবলিঙ্গের উচ্চতা ৩০ ফুট, পরিধি ৫০ ফুট

শিল্পের নিদর্শন। পাথর কেটে রথ প্রস্তুত করা নরসিংহবর্মণের কীর্তি। এর ভাস্কর্য খুব উচ্চাঙ্গের, রথগুলির নামকরণ দ্রৌপদী ও পাণ্ডব ভ্রাতাদের নামে।

আনুমানিক ৭৮০ খৃঃ রাষ্ট্রকুটরাজ প্রথম কৃষ্ণের উৎসাহে পাহাড় কেটে ইলোরার কৈলাসমন্দির প্রস্তুত হয়। এটি স্থাপত্যশিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। এর পূর্বে কাঞ্চীর কৈলাসনাথের মন্দির এবং পডট্টকলের বিরূপাক্ষ মন্দির শিল্পোৎকর্ষের পরিচয় বহন করে।

চোলরাজারাও স্থাপত্য শিল্পের উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঞ্জোর মন্দিরের নটরাজ এবং ঐ জেলা থেকে পাওয়া আরও দুটি নটরাজের মূর্তি চোলযুগের ধাতুশিল্পের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এছাড়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী, প্রভৃতি দেবদেবীর ধাতুনির্মিত মূর্তি পাওয়া গেছে।

রাষ্ট্রব্যবস্থা

দক্ষিণ ভারতে উন্নত ধরনের রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এর ভিত্তি ছিল গ্রাম সমিতি। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি গ্রাম-সমিতি বা কুররম্ গঠিত হত; কয়েকটি কুররম্-এর সমষ্টি হল একটি জেলা বা নাড়ু; কয়েকটি নাড়ুর সমষ্টি একটি বিভাগ বা কোট্টম্; কয়েকটি কোট্টম্ নিয়ে একটি মণ্ডলম্ অথবা প্রদেশ গঠিত হত।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হত। গ্রামবাসীরা তাদের প্রতিনিধি-সভার সাহায্যে গ্রামের শাসন পরিচালনা করতেন। প্রত্যেক কুররম্-এ একটি প্রতিনিধি-সভা (assembly) থাকত। এই প্রতিনিধি-সভা ভিন্ন ভিন্ন সমিতিতে বিভক্ত হয়ে শাসনকার্য চালাত। কোন সমিতি রাজস্ব সংগ্রহ, কোন সমিতি জলাশয় ও রাস্তাঘাট সংরক্ষণ, কোন সমিতি বিচারকার্যের তত্ত্বাবধান করতেন। কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত 'অধিকারিণ' নামে অভিহিত কর্মচারী কুররম্ মহাসভার কার্যাবলী দেখাশুনা করত। কুররম্-এর মত নাড়ুতে একটি করে প্রতিনিধি-সভা থাকত।

ব্যবসা-বাণিজ্য

খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে রোমের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মতে ইটালি তখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষ থেকে অধিক আমদানি করত। কয়েক বছর আগে পণ্ডিচেরীর নিকট আরিকামেড়ু নামক স্থানের খননকার্য থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তখন দক্ষিণ ভারতে বেশ কয়েকটি সামুদ্রিক বন্দর ছিল। সে সকল বন্দরের মাধ্যমে ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলত। ভারতবর্ষ থেকে বিদেশে রপ্তানি হত মণিমুক্তা, বস্ত্র, মশলা, গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি। বিদেশ থেকে আসত কাচের বাসনপত্র এবং সোনা।

পরবর্তী কালে পল্লব এবং চোল রাজাদের আমলেও ভূমধ্যসাগরীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বর্তমান ছিল॥

অনুশীলনী

১। দক্ষিণ ভারতের একটি মানচিত্র আঁক। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতের যে সকল রাজবংশের অবদান আছে তাদের ঐ মানচিত্রে চিহ্নিত কর [প্রমাণসাইজের একটি ভাল মানচিত্র এঁকে সেটি তোমাদের সমাজবিদ্যার শিক্ষক মহাশয়কে উপহার দাও—এতে প্রতি বছর বর্তমান পরিচ্ছেদটির আলোচনাকালে ওঁর অসীম উপকার হবে।]

২। দক্ষিণ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

৩। দক্ষিণ ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক কালের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার তুলনা কর।

৪। দক্ষিণ ভারতের মন্দির ইত্যাদির ছবি যতগুলি পার সংগ্রহ করে ব্যবহারিক সংকলনে বা পৃথক অ্যালবাম্-এ সন্নিবেশিত কর। নাম দাও "দাক্ষিণাত্যের দেব দেউল"।

একাদশ পরিচ্ছেদ

।। ভারতের বাহিরে ভারতীয় সভ্যতা ।।

বিশাল হিমগিরি আর তিনদিকে উত্তাল সমুদ্রে বেষ্টিত হলেও ভারতভূমি তার কর্মপ্রচেষ্টাকে নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখেনি। সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে সে দিকে দিকে আপনাকে বিকশিত করবার চেষ্টা করেছে। বাংলা, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, তামিল, মালাবার প্রভৃতি সমুদ্রোপকূলবাসী বণিকেরা যেমন বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করেছিল তেমনি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় রাজারা বিদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, ভারতীয় ধর্মপ্রচারক মহাপুরুষ ভারতীয় ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছেন, শিল্পীরা দিয়েছেন কলানৈপুণ্যের পরিচয়।

উপনিবেশের বিস্তার

প্রাচীন ভারত এই ভাবে ব্যবসাবাণিজ্য ধর্মপ্রচার ও ক্ষাত্রশক্তির সহায়তায় যে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল তার বিস্তার নিতান্ত কম ছিলনা। চম্পা, কম্বোজ, শ্যাম, মালয়, সুমাত্রা, যব ও বলী দ্বীপ, সিংহল, খোটান এই সব জায়গায় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। ফরাসী পণ্ডিত সিলভাঁ লেভির মতে পারস্য থেকে চীন সাগর, বরফে ঢাকা সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে যবদ্বীপ ও বোর্ণিও, ওসেনিয়া থেকে সকোত্রা পর্যন্ত ভারত তার ধর্মমত তার প্রতিভ ও সভ্যতা বিস্তার করেছে। দ্বীপবালাকে সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

দেখিনু চুপে চুপে
আমারি বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিত গীত কলিত কল্লোলে।"

কোন্ এক দূর অতীতে ভারতীয় শ্রেষ্ঠীরা সাগরজলে তাদের সপ্তডিঙ্গা ভাসিয়েছিল। দূর প্রাচ্যের এই দেশগুলিকে ভারতীয় সাহিত্যে সুবর্ণভূমি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মনে হয় এইসব দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে ছিল পূর্ণ আর সেই ধাতুসম্পদে প্রলুব্ধ হয়েছিল ভারতবাসী। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে প্রাচ্য দেশের বাণিজ্যবন্দরগুলির একটি দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায় এবং জানা যায় এই সব দেশের সঙ্গে বাংলা দেশের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলত।

"মকর-চূড় মুকুটখানি পরি' ললাট 'পরে
ধনুক-বাণ ধরি দখিন করে
দাঁড়ানু রাজবেশী।"

প্রায় দু'হাজার বছর আগের কথা। প্রাচ্য দেশ এবার ভারতবাসীকে দেখল রাজবেশে। ভারতীয় ক্ষত্রিয়দের বাহুবলে গড়ে উঠল কতগুলি রাষ্ট্র। এই সব রাষ্ট্রের আচার ব্যবহার ভাষা ও ধর্ম সবকিছুই ছিল ভারতীয়।

সংস্কৃত লিপি ও চৈনিক লেখকের বিবরণ থেকে এই রাষ্টগুলোর ইতিহাস জানা যায়। চম্পা, কম্বোজ এবং মালয়ের **শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যই** একদা ভারতীয় উপনিবেশগুলোর মধ্যে ছিল উল্লেখযোগ্য।

এই উপনিবেশগুলিতে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মই সমভাবে প্রসার লাভ করেছিল। চম্পা ও কম্বোজ ছিল হিন্দু রাজ্য। ভারত থেকে আগত বহু ব্রাহ্মণ এই স্থানে বসবাস করেছিলেন। শৈলেন্দ্র রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ-ধর্মের অনুরাগী। এই বংশের রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি মঠ নির্মাণ করেন। বাংলা দেশের বৌদ্ধ আচার্য কুমার ঘোষ ছিলেন এই বংশের দীক্ষাগুরু।

সম্রাট অশোকের সময় থেকেই সিংহল ব্রহ্ম ও শ্যামদেশে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার শুরু হয়। তিব্বতকেও বৃহত্তর ভারতের মধ্যে ধরা যায়। তিব্বত চীনাদের জ্ঞাতি হলেও ধর্মে ও সভ্যতায় ভারতীয়। আফগানিস্থানেও বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

নামকরণের ক্ষেত্রেও ভারতীয় প্রভাব লক্ষণীয়। শ্রীক্ষেত্র (প্রোম), দ্বারাবতী (শ্যাম), পণ্ড্যপায়ন (ফিলিপাইন), বরুণ (বোর্ণিও), যবদ্বীপ (জাভা), সিংহগিরি (সিগিরিয়া), মা গঙ্গা (মেকং নদী), চম্পা (আনাম) এবং সূর্যবর্মণ, যশোবর্মণ, ঈশ্বরমূর্তি প্রভৃতি রাজাদের নামে ভারতীয় প্রভাব পড়েছে।

শিল্প ও সাহিত্য

উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ধর্মের মতই ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্য নতুন উপনিবেশ সমূহের বিস্তার লাভ করতে থাকে।

কম্বোজের অঙ্কোরভাট আর জাভার বোরোবুদরের মন্দির ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন হয়ে সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বোরোবুদরের মন্দির দেখে রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে বলেছিলেন, "একে বলে শিল্পের তপস্যা।"

ভারতীয় সাহিত্যে যেমন রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়

যবদ্বীপের সাহিত্যেও তেমনি দেখা যায় এই দুই মহাকাব্যের প্রভাব। এই সব স্থানের মন্দিরগুলিতে উৎকীর্ণ চিত্র রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতির আখ্যায়িতা অবলম্বনে রচিত। চম্পায় কম্বোজে হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন, সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষবিদ্যার যথেষ্ট অনুশীলন হত।

এক সময়ে ভারতীয় শিল্পকলা চীনদেশীয় শিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল চীনের চিত্রকলা ভারতীয় আদর্শবাদ এবং চীনের সৌন্দর্যবোধ এই দুয়ের সমন্বয়ে ফল। বৌদ্ধ শিল্পকলা চীন থেকে কোরিয়ার মধ্যে দিয়ে জাপানে বিস্তার লাভ করে।

সেরিন্দিয়া

ভারত ও চীন এই দুটি মহান্ দেশের মধ্যবর্তী মধ্য-এশিয়ার একটি অংশ প্রাচীন কালে 'সেরিন্দিয়া' (চীন-ভারত) নামে অভিহিত। "যে দেশের প্রাচীন সভ্যতার কথা মনে করিয়া আমরা এখন সেরিন্দিয়া বলিতেছি সেই দেশ এখন মুখ্যত রুশ-তুর্কিস্থান ও চীনা-তুর্কিস্থান এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। চীন ও ভারত এই দুই দেশের সভ্যতা আসিয়া এই দেশে মিলিয়াছিল। এই দেশের লোকেরা এককালে বৌদ্ধধর্ম, ভারতীয় বর্ণমালা এবং সভ্যতা গ্রহণ করিয়া মধ্য এশিয়ার উপনিবিষ্ট ভারতীয়দের সঙ্গে মিলিয়া একটি ছোটখাট বৃহত্তর ভারতের সৃষ্টি করিয়াছিল। সেরিন্দিয়ার বহু বৌদ্ধ মঠ ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ ঐ দেশের মরুভূমির বালির নীচ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন হইতেছে, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ভারতীয় শাস্ত্রের সংস্কৃত পুঁথি, ছবি, মূর্তি ইত্যাদি। বালি খুঁড়িয়া প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার শিল্পকলাদির প্রচুর নিদর্শন ঐ অঞ্চল হইতে বাহির হইয়াছে!" (ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)।

অনুশীলনী

১। অপরের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া ভারতের একেবারে নিজস্ব গুণ।—বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব আলোচনা করে এই উক্তিটি প্রতিপন্ন কর।

২। প্রাচ্য দেশ সমূহে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে ইউরোপীয় সভ্যতার বিস্তারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। [এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ নামক গ্রন্থের অন্তর্গত "ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রবন্ধটি পড়ে নাও।]

৩। আবৃত্তির আসর॥ "বোরোবুদর"—রবীন্দ্রনাথ ; "সাগরিকা—রবীন্দ্রনাথ।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

॥ রাজপুত আমল ঃ মধ্যযুগের শুরু ॥

মানুষের গল্প বলে চলেছে ইতিহাস। পুরনো দিনের গল্প শুনেছ। এবার মধ্যযুগের কাহিনী। **মধ্যযুগ কোন্ সময়টাকে বলবো ?** মধ্যযুগের স্থিতিকাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। মোটামুটি ভাবে মুসলমান রাজত্বের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ১২০৬ খৃঃ থেকে ১৭৫৭ খৃঃ পর্যন্ত সময়কে ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যযুগ বলা যেতে পারে। ইউরোপীয় ইতিহাসের মধ্যযুগ কিন্তু আলাদা। কতগুলো **সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বৈশিষ্ট আছে বলেই** মধ্যযুগকে প্রাচীনযুগ থেকে পৃথক যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাচীনযুগে ভূমি-ব্যবস্থা ছিল ভিন্ন রকমের। প্রজা ও রাজার মধ্যে তখন ছিল প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। রাজারা প্রজাদের শোষণ করতেন না, শাসন করতেন। মধ্যযুগে রাজা এবং প্রজার মাঝখানে কতগুলো মধ্যস্বত্বভোগী উড়ে এসে জুড়ে বসলো। এই মধ্যস্বত্ব ভোগীরাই হলেন সামান্ত-রাজন্যবর্গ। এরা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতেন এবং সুবিধামত প্রজাদের হর্তা-কর্তা-বিধাতা হয়ে অন্যায় ভাবে হুকুমজারী করতেন। ফলে শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হত। সামন্ত রাজাদের অকর্মণ্যতা ও অন্তর্বিরোধের ফলেই ভারতের বুকে মুসলমান রাজত্বের ভিত্তি খুব সুদৃঢ় হতে পারেনি।

মধ্যযুগে রাজা ও প্রজার মধ্যে সম্পর্ক দূরতর হয়েছে। রাজা-বাদশারা যে পরিমাণে প্রজাদের অসন্তোষ কুড়িয়েছিলেন সেই পরিমানে শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেন নি।

তবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মধ্যযুগের অবদান অনেকখানি। এ যুগে সম্রাট ও সামন্তরাজাদের আনুকূল্যে আর্থিক ও বাণিজ্যিক উন্নতিও ঘটেছে অনেকখানি। শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্ম একান্ত হয়ে উঠেছিল আর এই সাংস্কৃতিক মিশ্রণের মধ্যে দিয়েই ভারতের মাটিতে ইসলাম ধর্ম মূর্ত হয়ে উঠছে **ধর্মের কুক্ষিগত সংস্কৃতি** মধ্যযুগের এক বিরাট বৈশিষ্ট্য।

রাজপুতদের কথা

মধ্যযুগের রাজা-রাজরাদের কাহিনীর সঙ্গে রাজপুতদের ইতিহাস জড়িত। রাজপুতদের কার্যকলাপ মধ্যযুগীয় সুলতানদের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে অনেকখানি। তাই এ প্রসঙ্গে রাজপুতদের বিষয় অবশ্য-আলোচ্য।

রাজপুতদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানান্ কাহিনী প্রচলিত আছে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে এরা নাকি মধ্য এশিয়ার হূনদের বংশধর। ভারতে এরা দলগত-ভাবে বসবাস শুরু করে এবং শেষে ঐক্যবদ্ধভাবে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে ক্ষত্রিয় জাতিতে রূপান্তরিত হয়। আবার অনেকের মতে 'গুর্জর' নামে যে জাতিটি ভারতে বসবাস আরম্ভ করে, 'প্রতিহার' নামে তাদের একটি শাখা নাকি প্রথম এক রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে। এই বংশের প্রথম রাজা হলেন প্রথম নাগভট। সেটা হল খৃষ্টীয় ৮ম শতকের কথা। রাজপুতনার চারণ কবিরা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে রাজপুতদের শৌর্য-বীর্যের অনেক কাহিনী প্রচার করেছেন এবং এঁরা মোট ছত্রিশটি রাজপুতবংশের নাম করেছেন। ঐতিহাসিকদের মতে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ (১) কনৌজের গাহড়বাল বংশ—সর্বশেষ রাজা জয়চন্দ্র; (২) বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল বংশ; (৩) মালবের পরমার বংশ—ভোজরাজ এই বংশের বিখ্যাত নৃপতি; (৪) দিল্লী-আজমীরের চৌহান বংশ—পৃথ্বীরাজ এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা; (৫) দহিলের চেদী বংশ।

রাজপুতদের শৌর্যবীর্যের গল্প ইতিহাস-বিশ্রুত। এঁরা দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের রাজ্য পরিচালনা করেছেন এবং রাজ্যের পরিধি বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এঁদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। প্রবল বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেম থাকা সত্ত্বেও সংহতির অভাবে এঁরা মুসলমানদের উন্নততর সামরিক শক্তির কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছেন। রাজপুত জাতির দুর্বলতাই মুসলমান রাজ্য প্রসারণে সহায়তা করেছে। এই শক্তিশালী জাতি ঐক্যবদ্ধ হলে ভারতীয় ইতিহাসের মোড় ফিরে যেতে পারত।

ইসলাম ধর্মের উদ্ভব

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরব দেশে এক নতুন ধর্ম প্রবর্তিত হল। দ্বিধা-বিভক্ত কুসংস্কারগ্রস্ত আরব জাতির মধ্যে ইস্‌লাম ধর্মের আলো জাললেন হজরত মহম্মদ। ইসলাম ধর্মাবলম্বনকারীদের মধ্যে এল নব জাগরণ। এঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত হলেন। এ জাতিই হল **মুসলমান জাতি**—যাঁরা সর্বপ্রথম হজরত মহম্মদের নেতৃত্বে এক রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন আরবে। নতুন উদ্দীপনায় ইসলাম ধর্মের প্রচারকেরা পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়লেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই ইসলাম ধর্ম এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের কোন কোন অংশে বিস্তার লাভ করল। অবশ্য ধর্মপ্রচারের পিছনে যে রাজ্য বিস্তারের

মোহ ছিল না এমন নয়। তাই ধর্মপ্রচারকদের হাতে একই সঙ্গে শাস্ত্র এবং শস্ত্র দেখা গেছে। ধর্মের উন্মাদনা এবং রাজ্যবিস্তারের অদম্য স্পৃহাই একদিন মুসলমানদের দৃষ্টি স্বর্ণময় ভারতের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

এ ব্যাপারে পথপ্রদর্শক হলেন ইরাক-দেশীয় সতের বছরের সমরনায়ক মহম্মদ বিন কাশিম (৭১২ খৃঃ)। ইনি সিন্ধু উপকূলে দাহির নামে এক হিন্দু রাজাকে তিনবারের চেষ্টায় পরাজিত করে সিন্ধু ও মূলতান অধিকার করেন। কিন্তু কাশিমের এই অভিযানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকলেও বিশেষ কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব নেই, কেননা এই অভিযানের ফলে ভারতের অভ্যন্তরে আরবদের প্রবেশ বা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। উত্তর ভারতে তখন পরাক্রমশালী প্রতিহার বংশীয় রাজারা রাজত্ব করছিলেন, তাঁরাই আরবদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেন।

রাজনৈতিক গুরুত্ব তেমন না থাকলেও কাশিমের এই অভিযানের সাংস্কৃতিক মূল্য ছিল। কেননা এর ফলেই ভারত ও আরবের মধ্যে সর্বপ্রথম সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। অবশ্য এই অভিযানের অনেক আগেই ৬৩৭ খৃঃ ভারতবর্ষে প্রথম মুসলমান আক্রমণ ঘটেছিল জলপথে। এর পর থেকে আরবেরা জলপথে এবং স্থলপথে অনেকবার ভারত আক্রমণ করে।

গজনী রাজ্য

৯৬৩ খৃঃ আলপ্তিগীন নামে খোরাসানের একজন শক্তিশালী রাজকর্মচারী কাবুলের কাছে গজনী নগরে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। আলপ্তগীনের এক ক্রীতদাস **সবুক্তিগীন** ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে গজনীর সুলতান হন। তিনি সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর পর্যন্ত আপন অধিকার বিস্তৃত করেন।

সবুক্তিগীনের মৃত্যুর পর ৯৯৮ খৃষ্টাব্দে **মাহমুদ** ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। আজীবন রণোন্মত্ত মাহমুদ রাজ্য লুণ্ঠনের বিক্ষুব্ধ লালসায় উদ্ধত তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভারতের বুকে। নির্দয় মাহ্‌মুদের অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধন লুণ্ঠন; রাজ্যস্থাপনের অভিপ্রায় ছিল গৌণ। ভারতের উপর সতের বার তিনি আক্রমণ চালান। অত্যাচার-কবলিত মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে সমগ্র উত্তর ভারতের মাটি, আর বিপুল ঐশ্বর্যের পসরায় পরিপূর্ণ হয়েছে মাহমুদের লুঠের ভাঁড়ার। মাহ্‌মুদের সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠনের কাহিনী তো ইতিহাসের এক নিষ্ঠুর কলঙ্ক।

চরম অত্যাচারী হলেও সুলতান মাহ্‌মুদের চরিত্রে মানবিক গুণাবলীর

অভাব ছিল না। তিনি বিদ্যার সমাদর করতে জানতেন এবং শিল্প সংস্কৃতির একজন বোদ্ধাও তিনি ছিলেন। গজনীতে তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর রাজসভা অনেক জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশে অলংকৃত হয়েছে। সুবিদিত 'শাহ্‌নামা' গ্রন্থের রচয়িতা মহাকবি ফেরদৌসী তাঁর সভায় এক উজ্জ্বল রত্ন। মাহ্‌মুদের সময়েই আরবের সুবিখ্যাত পণ্ডিত আবু-রিহান বা **আলবিরুণী** ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ঐতিহাসিক হিসেবেও এঁর একটা পরিচয় আছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে 'তারিখ-ই-হিন্দ' নামে এক বিবরণী তিনি রেখে গেছেন। বিবরণীতে আছে, সে যুগে স্ত্রীশিক্ষার বেশ চল ছিল। সাধারণের মধ্যেও শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যেত। অপরাধীরা কম সাজা পেত। প্রজাদের উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ খাজনা বাবদ দিতে হত। ব্যবসায়ীরাও আয়কর থেকে রেহাই পেত না।

ঘোর রাজ্য

ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন **মহম্মদ ঘোরী**। সুলতান মাহ্‌মুদের মৃত্যুর প্রায় দেড়শ বছর পর গজনীতে ঘোর নামে এক নতুন রাজ্যের উদ্ভব হল। এই রাজ্যের সুলতান মহম্মদ ঘোরী এবার ভারতের দিকে ধেয়ে এলেন। মুলতান, সিন্ধু এবং পাঞ্জাব তাঁর করায়ত্ত হল।

ঘোরী তাঁর পূর্ববর্তী মাহ্‌মুদের পথ অনুসরণ করে ভারত আক্রমণ করলেন বটে কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য নিছক লুণ্ঠনবৃত্তি ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন ভারতে মুসলমান অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। থানেশ্বরের কাছে তরাইনের মাঠে ঘোরী ও দিল্লী-আজমীরের চৌহানরাজ পৃথ্বীরাজের মধ্যে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হল (১১৯১ খৃঃ) ঘোরী সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু নিরুৎসাহ না হয়ে পরের বছরেই আবার বিপুল বিক্রমে পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। এবার কিন্তু বিধি বাম। পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হলেন। ঘোরী আজমীর অধিকার করলেন আর তাঁর সেনাপতি কুতবউদ্দিন দখল করলেন দিল্লী। ভারতের মাটিতে তুর্কী-সুলতানী শাসনের ভিত্তি-মর্মর স্থাপিত হল। নতুন উদ্দীপনায় কুতবউদ্দিন উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য করতলগত করতে লাগলেন। বারাণসী লুণ্ঠিত হল। গাহড়বাল হল অধিকৃত। মুসলমান আক্রমণের দুর্বার জোয়ারের মুখে হিন্দুরাজাদের অসংহত প্রতিরোধের বাঁধ ভেঙে চূর্ণ হল।

বাংলার আকাশও এবার মেঘাচ্ছন্ন হল। বক্তিয়ার খল্‌জি নামে মহম্মদ ঘোরীর একজন অনুচর বিহার ও বাংলা দেশ অধিকার করে নিলেন। বাংলাদেশে তখন সেন রাজত্ব চলেছে। রাজা লক্ষ্মণ সেন। এঁদের পরাজয় পূর্ব-ভারতে মুসলমান অভিযানের অব্যাহত গতির মাত্রা বাড়িয়ে দিল। বাংলার বুকে তুর্কী শাসনের নতুন অধ্যায় শুরু হল। বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা অস্তমিত হলেন। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে ঘোরীর মৃত্যুর পর সেনাপতি কুতবউদ্দিন দিল্লীর সিংহাসন লাভ করলেন। সমগ্র উত্তর-ভারতে মুসলমান আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠ করলেন তিনি অল্প সময়েই। **দিল্লীর প্রথম সুলতান কুতবউদ্দিন** ভারতে সুলতানি শাসনের প্রথম সূত্রধর। দিল্লীর কাছেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিল্পকলার উজ্জ্বল নিদর্শন 'কুতবমিনার' জয়স্তম্ভ তাঁর বীরত্ব ও কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে আজও।

সুলতানী শাসনের স্বরূপ

সুলতানদের শাসন ছিল সামরিক শক্তিতে নির্ভরশীল। ক্ষমতাভিলাষী স্বেচ্ছাচারী সুলতান নিজের বীরত্ব ও ক্ষমতা প্রকাশ করবার জন্যেই রাজ্যশাসন করতেন—প্রজা-কল্যাণের উদ্দেশ্য তাঁর বড় একটা ছিল না। একদল আমীর ওমরাহ্‌ পরিবেষ্টিত হয়ে সম্রাট সাম্রাজ্যশাসন করতেন। সিংহাসনের অধিকার-সম্পর্কিত কোন বিশেষ নিয়ম-কানুন ছিল না। "জোর যার মুলুক তার" নীতিই এ ব্যাপারে অনুসৃত হত। সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে রাজ্য পরিচালনার অভিজ্ঞতা সুলতানদের ছিল না। এঁরা তাই শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে হিন্দুনির্দিষ্ট শাসনপদ্ধতিই অনুসরণ করতেন। রাজস্ব, হিসাব ইত্যাদি প্রশাসনিক বিভাগে হিন্দুদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। কিন্তু সুলতানি শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য সম্ভোগের চরিতার্থতা।

মুসলমান আক্রমণের শুরুতে ভারত

খৃষ্টীয় দশম শতক পর্যন্ত শক্তিশালী প্রতিহার সাম্রাজ্যের অধিপত্য ছিল উত্তর ভারতে। অষ্টম শতকের প্রথমদিকে আরবদের রাজ্যজয়ের ঘটনাটি অকিঞ্চিৎকর। এ ঘটনার পর দীর্ঘ তিনশ বছর প্রতিহার রাজারা বীরত্বের সঙ্গে মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করছেন বার বার। কিন্তু প্রতিহার রাজত্বের অবসানের পর ভারতের ভাগ্যদেবী অপ্রসন্না হলেন। উত্তর ভারতে অসংখ্য ছোট ছোট রাজপুত রাজা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। পারস্পরিক ঐক্যবিহীন রাজ্যগুলোর মধ্যে অন্তর্বিরোধ

হল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। রাজপুত রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই মাহ্‌মুদ সতেরবার ভারত আক্রমণ করেছিলেন। মাহ্‌মুদের আক্রমণের সময়ও রাজপুতদের শৌর্যবার্য সম্পূর্ণভাবে অতীতের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়নি, তাই স্বয়ং মাহ্‌মুদও ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে পারেননি। কিন্তু মহম্মদ ঘোরীর অভিযানের সময় হিন্দুরাজাদের চরম অধঃপতন দেখা দিল; উত্তর ভারতের রাজনৈতিক জীবন আরও নিরাপত্তাবিহীন হয়ে দাঁড়াল। পরস্পর বিবাদের ফলে দিল্লীর চৌহান রাজবংশ, কনৌজের রাঠোর বংশ, গুজাটের চৌলুক্য, মালবের পরমার, বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল ও বাংলার সেনবংশের রাজারা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। মুসলমান শক্তির উদ্ধত তরবারির আঘাতে এই রাজত্বগুলি তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ল। মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সমস্ত স্বপ্ন ও সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হল।

অনুশীলনী

১। ইতিহাসে মধ্যযুগ বলতে আমরা কী বুঝি? এ যুগের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কী কী? মধ্যযুগের সংস্কৃতিতে ধর্মের প্রচণ্ড প্রভাবের কথা দু' একটি দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা কর।

২। "ভারতে মুসলমান রাজ্য প্রসারণের কারণ রাজপুত জাতির দুর্বলতা" —ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের দ্বারা উক্তিটিকে সপ্রমাণ কর।

৩। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধগ্রন্থ, কোরান এবং বাইবেল—প্রত্যেকটি থেকে মূল ভাষায় দু'তিনটি করে অমৃতবাণী চয়ন করে তাদের বঙ্গানুবাদ সহ তোমাদের ব্যবহারিক সংকলনে লিপিবদ্ধ কর—বিভাগটির নাম দাও "মণিমঞ্জুষা"।

৪। স্থলতান মাহ্‌মুদের সভাকবি ফেরদৌসীর জীবনকাহিনী ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। তোমরা আবদুল কাদের রচিত "ফেরদৌসী চরিত" বইখানা পড়ে কৌতূহল মেটাতে পার।

———

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

॥ মুসলমান অভ্যুদয়ে সমাজ ও সংস্কৃতি ॥

দিল্লীর সুলতানী : দাসবংশ

কুতবউদ্দিন সুলতান হলেও প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম হল "দাসবংশ"। দাসদের রাজত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে এক অদ্ভূত ঘটনা। এঁদের রাজধানী ছিল দিল্লী। কুতবউদ্দিন নিজের ক্ষমতার ও কৃতিত্বে হিন্দুস্থানের এক সুবিস্তৃত অঞ্চলে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ বলেছেন,"কুতবউদ্দিন একজন তেজস্বী এবং উদার সুলতান ছিলেন।" কুতবউদ্দিনের জামাতা **ইলতুৎমিস** দিল্লীর মসনদ পেলেন এবং রাজ্যে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ নিজ হাতে দমন করে সুলতানী শাসনের ভিত্তি দৃঢ়তর করলেন। তাঁর রাজত্বকালেই দুধর্ষ মোঙ্গল যোদ্ধা চেঙ্গীস খাঁ সসৈন্যে সিন্ধু নদীর উপকূলে হানা দেন। ইলতুৎমিস সুকৌশলে এই আক্রমণ থেকে অব্যহতি পান।

পুত্রেরা অযোগ্য বলে ইলতুৎমিস কন্যা **রজিয়াকে** দিল্লীর সিংহাসন অর্পণ করলেন। রজিয়া ছাড়া অন্য কোন মহিলা কোনদিন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেননি। তাই ইতিহাসের দিক থেকে রজিয়ার রাজত্ব বিশেষ স্মরণীয়। এই সুলতানার সাহস ও বীরত্ব অনেক ইতিহাস-বিশ্রুত পরাক্রান্ত নরপতির কাছেও বিস্ময়ের সামগ্রী। রজিয়ার মৃত্যুর পর রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে **গিয়াসউদ্দিন বলবন** হলেন দিল্লীর সুলতান। বলবনের রাজত্বে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হল অনেকখানি। এই সুযোগ্য শাসক মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং বাংলার শাসনকর্তা তুঘ্রিল খাঁ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে কঠোর হস্তে দমন করেন। বলবনের আমলেই দিল্লীর রাজদরবার জাঁকজমকের জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করে ; এ সময়েই দিল্লীর দরবারে এক নতুন রাজকীয় ঐতিহ্যের গোড়াপত্তন হয়। অনেক ঐতিহাসিকের মতে বলবনের রাজত্বেই ভারতের মাটিতে সর্বপ্রথম পারসিক সংস্কৃতির বীজ রোপিত হয়।

খিলজী ও তুঘলক বংশ

দাসবংশের অবসান হল, এখন খিলজী বংশ। খিলজীরা জাতিতে তুর্কী, স্বভাবে পাঠান। এই বংশের প্রথম সুলতান জালালউদ্দিন খিলজী। ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে ইনি ভ্রাতুষ্পুত্র **আলাউদ্দিনের** হাতে নিহত হলেন। গুজরাট, রাজপুতনা এবং দক্ষিণ ভারত জয় করে আলাউদ্দিন সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র

সম্রাট হলেন। ঐতিহাসিকদের মতে শৌর্য-বীর্যে আলাউদ্দিন দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উচ্চাভিলাষী সম্রাট আলাউদ্দিন আলেকজাণ্ডারের মতো দিগ্বিজয়ী হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এমন কি নিজের প্রচলিত মুদ্রায় তিনি নিজেকে "সিকন্দর সানি" বা দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার বলে পরিচয় দিয়েছিলেন।

আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হলেন গিয়াস-উদ্দিন তুঘলক। সেটা হল ১৩২০ খৃষ্টাব্দের কথা। বংশানুক্রমিকভাবে তুঘলকেরা দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছেন। গিয়াসউদ্দিনের পুত্র হলেন **মহম্মদ বিন্ তুঘলক**, যিনি পাগল না হয়েও খামখেয়ালিপনার জন্যে 'পাগলা রাজা' হিসাবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। 'ইতিহাসের বিস্ময়' এই মহম্মদ বিনের পর ফিরোজশাহ্ এবং তাঁর বংশধরেরা দীর্ঘদিন রাজত্ব করেন। তুঘলক রাজত্বেই ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে সমরখন্দের তুর্কী অধিপতি তৈমুর ভারত আক্রমণ করেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যের প্রতি এই লুব্ধ শিকারীর শ্যেনদৃষ্টি পড়েছিল। 'বিধাতার অভিশাপ' তৈমুরের দিল্লী-লুণ্ঠনের কাহিনী ভারত-ইতিহাসে এক দুঃস্বপ্ন বিশেষ।

তুঘলক বংশের পর পর্যায়ক্রমে সৈয়দবংশ এবং লোদীবংশের রাজারা রাজত্ব করেন। লোদীবংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পানিপথে পরাজিত করে বাবর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের পত্তন হল।

বঙ্গদেশ ও বিজয়নগর

প্রায় সমগ্র ভারতে যখন সুলতানী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে তখনও বাংলাদেশ ও বিজয়নগর পুরোপুরি পরাধীন হয়নি। বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশ করায়ত্ত করলেন বটে কিন্তু সম্পূর্ণ পদানত করতে পারেন নি। সেন-রাজারা বখতিয়ারের অভিযানের পরও পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেন। অবশ্য স্বল্প-কালের জন্যে। দক্ষিণে বিজয়নগরের হিন্দুরাজারা সুলতানী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীন হন এবং এক শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। মহম্মদ বিন্ তুঘলকের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের বুক্করায় নামে এক হিন্দু নেতা বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বিজয়নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দুরাজা হলেন কৃষ্ণদেব রায়। মুসলমান আমলে বাংলাদেশে ও বিজয়নগরের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল।

সুলতানী আমলে সমাজ

সুলতানী সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মানুষে মানুষে **শ্রেণীগত অসাম্য**। একদিকে সমাজের উচ্চমঞ্চে সম্রাট বসে আছেন আমীর-ওমরাহ পরিবেষ্টিত

হয়ে, অন্যদিকে সমাজের অন্ধকূপে নিঃস্ব প্রজা কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করছে। বলবন্ বলতেন—'রাজার আসন সকলের ওপরে'। সুলতানী যুগে রাজা ও প্রজাদের মধ্যে ছিল বিরাট ব্যবধান। সুলতানের স্তাবক ও সুবিধাবাদী আমীর ওমরাহরা এবং অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা দিব্যি আরামে স্ফূর্তিতে দিন কাটাতেন। তাঁহাদের বিলাস-ব্যসনে অজস্র অর্থ ব্যয়িত হয়। এই অর্থ সংগ্রহের জন্যে তাঁরা প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করতেন অবলীলাক্রমে। দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে সুলতানী যুগেরই কবি আমীর খসরু বলেছিলেন—"রাজমুকুটের প্রতিটি মুক্তোবিন্দু হল নিষ্পেষিত কৃষকদের সজল চোখ থেকে ঝরে-পড়া জমাট রক্তবিন্দু।"

হিন্দুদের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হত তাদের প্রাচীন শাস্ত্রের অনুশাসনে। তাই সুলতানী শাসন তাদের সামাজিক জীবনের কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। অবশ্য ইসলাম ধর্মের প্রভাবে হিন্দুদের ধর্মকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার পরিবর্তন যে কোন কোন ক্ষেত্রে হয়নি এমন নয়। এ সময়ে হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার ব্যাপারে যে খানিকটা শিথিলতা দেখা দিয়েছিল তা মূলত ইসলামের প্রভাবেই। অন্যদিকে মুসলমানেরাও হিন্দুদের সংস্পর্শে এসে কতগুলো সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অধিকতর রক্ষণশীল হয়ে ওঠে। হিন্দু ও মুসলমান এ দুটি জাতিই পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল—যদি দীর্ঘকাল ভারতের মাটিতে হিন্দুদের সঙ্গে সহ-অবস্থান করেও মুসলমানেরা শক, হুন, গ্রীক প্রভৃতি জাতিদের মতো হিন্দুদের সঙ্গে 'এক দেহে লীন' হয়ে যেতে পারেনি। বিস্ময় সেখানেই।

সুলতানী যুগে মানুষ হিসেবে মানুষের মূল্য স্বীকৃত হয়নি। প্রমাণ—**ক্রীতদাস প্রথা**। টাকার বিনিময়ে সুলতানেরা মানুষ কিনতেন। চরম লাঞ্ছনা ও নির্যাতন ভোগ করে ক্রীতদাসদের সম্রাটের গোলাম হয়ে থাকতে হত। ক্রীতদাসদের মধ্যেও আবার শ্রেণীভেদ ছিল। সাধারণ দাস ও সম্রাটদের পালিত দাসের মধ্যে পার্থক্য ছিল মর্যাদার দিক থেকে। সুলতানদের দাসদের বলা হত খাস বান্দা। অবশ্য দাসত্ব-মুক্তির একটা মোটামুটি ব্যবস্থা ছিল। কৃতিত্ব দেখাতে পারলে এবং সম্রাটের নজরে পড়তে পারলে দাসদের উচ্চ রাজপদে পর্যন্ত নিযুক্ত করা হত।

হিন্দু এবং মুসলমান কোন সমাজেই **নারীর মর্যাদা** বিশেষ ছিল না। নারীরা প্রধানত ছিলেন অন্তঃপুরচারিণী। তাঁদের শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল না। হিন্দুসমাজের কয়েকটি শাখায় সতীদাহ প্রথা ছিল।

১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বিন্ তুঘলকের রাজত্বে পর্যটক **ইবন বতুতা** ভারতবর্ষে এসেছিলেন। 'সফর নামা' নামে তিনি যে বিবরণী লেখেন তাতে চতুর্দশ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজের চিত্র পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন—দাসপ্রথা দেশে প্রচলিত; তবে সুলতানেরা দাসমুক্তির ব্যাপারে আগ্রহী। হিন্দুরা অতিথিবৎসল হলেও তাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা কঠোর। রাষ্ট্রে হিন্দুরা মর্যাদায় মুসলমানের নিচে। দেশে দাতব্য প্রতিষ্ঠান আছে। দুর্ভিক্ষের সময় রাজভাণ্ডার থেকে শস্য বিতরণ করা হয়। দেশে শিক্ষালয় আছে। একটি নগরে ছেলেদের ২৩টি এবং মেয়েদের ১৩টি বিদ্যালয় আছে। ইবন বতুতার বিবরণী থেকে দেখতে পাচ্ছি, সে যুগে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার বিশেষ না থাকলেও তার চল একেবারেই যে ছিল না এমন নয়।

অর্থনৈতিক কাঠামো

সুলতানী যুগের সমাজ ছিল কৃষিনির্ভর। তাই মূলত কৃষিজাত সম্পদকে কেন্দ্র করেই সে যুগের মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত হত। প্রজারা উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজকর দিত। নিজেদের ভোগ বাবদ কিছু সঞ্চিত রেখে উদ্বৃত্ত শস্য তারা বিক্রী করত। অবশ্য কৃষিজাত পণ্যের বাজার নিজেদের গ্রামেই সীমাবদ্ধ থাকত। কতগুলো শিল্পও এই যুগে গড়ে উঠেছিল, যেমন তাঁত, ধাতু, পাথর এবং চিনি, নীল, কাগজ প্রভৃতি। শিল্পজাত দ্রব্যের বাজারও খুব ব্যাপক ছিল না। তবে পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরের আশেপাশের কতগুলো দেশে ভারতীয় শিল্প-পণ্যের চাহিদা ছিল। বিভিন্ন দেশের বণিকেরা ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আসত। ভারতের বাইরে থেকে আমদানি-কৃত দ্রব্যের মধ্যে সুলতানদের বিলাসদ্রব্য, ঘোড়া, খচ্চর, মসলাপাতি উল্লেখযোগ্য। আলেকজান্দ্রিয়া, ইরাক ও চীন থেকে ব্রকেড ও রেশম আমদানি করা হত।

১৪০৬ খৃষ্টাব্দে সুদূর চীন থেকে **মা হুয়ান** নামে একজন চৈনিক দোভাষী বাংলাদেশে এসেছিলেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সুন্দর একটি চিত্র তিনি রেখে গেছেন। তা থেকে জানা যায়—অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। ধনীরা বহির্দেশীয় বাণিজ্যের জন্যে জাহাজ নির্মাণ করতেন। অধিকাংশ লোকেরা জীবিকা ছিল কৃষি। দেশের প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রাকে লোকে 'টঙ্কা' বলত। তবে খুচরা কেনা-বেচার জন্য কড়ির ব্যবহার ছিল। এদেশে চা উৎপন্ন হত না, লোকেরা চায়ের বদলে পান দিয়ে অতিথিদের

আপ্যায়ন করত। দেশে পাঁচ ছয় রকমের সূতী বস্ত্র, রেশমী রুমাল, বন্দুক, ছুরি, কাঁচি, প্রভৃতি উৎপন্ন হত। এক ধরনের কাগজও তৈরী হত। মানুষেই ব্যাবসা-বাণিজ্য করত; আবার-অনেক সময় মানুষ নিজেই ব্যাবসা-বাণিজ্যের পণ্য অর্থাৎ ক্রীতদাস হয়ে দাঁড়াত। একটি চাকরের দাম ২০্ থেকে ৪০্ টাকা। চাকরানীর দাম ৫্ থেকে ১২্ টাকা। কর্মদক্ষ ক্রীতদাসের দাম ১০০্ থেকে ২০০্ টাকা পর্যন্ত। দেখতে খুব সুন্দর এমন ক্রীতদাস বা দাসীর দাম অ-নে-ক—সে দশ পাঁচ হাজার; এমন কি আরও বেশি।

ইবন বতুতার বিবরণী থেকে জিনিসপত্রের দামের খবর পাওয়া গেছে। কী শস্তা! আজকের বাজার-দর যদি সে যুগের মত হত! অবশ্য একথা মনে রাখত হবে যে সে যুগে বাজার-দর কম হলেও টাকার মূল্য কিন্তু অনেক বেশি ছিল। কাজেই ও হরে-দরে প্রায় সমানই ব্যাপার।

শিল্পকলার নিদর্শন

সুলতানী যুগের শিল্পভাস্কর্য হিন্দু-মুসলমানের যুগ্ম সাধনার এক অপূর্ব সমন্বয়। তুর্কী অভিযানের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের মন্দির বিহার ও চৈত্যর মাধ্যমে প্রধানত বৌদ্ধ ও পরবর্তী কালে রাজপুত শিল্প-রীতি অভিব্যক্ত হয়েছে। তুর্কী শিল্পীরা বয়ে আনেন পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া, পারস্য, আরব প্রভৃতি দেশের সংস্কৃতি ও শিল্প-রীতি। বহির্দেশীয় ও অন্তর্দেশীয় শিল্প-পদ্ধতির সমন্বয়ে ভারতে এক বিচিত্র শিল্পকর্মের উদ্ভব হল। এই শিল্প-সমন্বয়ে সার্থক নিদর্শন—কুতবমিনার, আলাই দরওয়াজা, জৌনপুরের আটালাদেবী মসজিদ, গৌড়ের সোনা মসজিদ প্রভৃতি।

তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দিন তুঘলক দিল্লীর কাছে 'তুঘলকাবাদ' বলে যে শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটা ছিল শিল্প-সংস্কৃতির পীঠস্থান। এই শহরটি আজ জলগর্ভে বিলীন। শিল্পরসিক ফিরোজ তুঘলক প্রতিষ্ঠিত ফিরোজাবাদ ও জৌনপুর নগর দু'টিরও একদিন শিল্প-প্রসিদ্ধি ছিল। দিল্লী এবং তার উপকণ্ঠের প্রাসাদ ও মসজিদের ভাস্কর্য ও অপূর্ব মিনারের কারুকার্য এ যুগের শিল্প-সমৃদ্ধিরই সাক্ষ্য বহন করে। অলঙ্কারের সুন্দর পদ্ধতি এ যুগের শিল্প-কারুর এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। আরবী ও ফারসী ভাষায় অক্ষরগুলোর গড়নই এমন মজার যে এগুলো অলঙ্করণের কাজে বেশ লাগান চলে। মুসলমান শিল্পীরা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন পরিপূর্ণভাবে। সাধারণত মসজিদ বা সমাধির গায়ে 'বয়াত' বা 'রুবাই' খোদাই করার জন্য তাঁরা এই পদ্ধতি অবলম্বন

সুলতানী যুগে বাংলার শিল্প-ভাস্কর্যও নতুন রূপে বিকাশ লাভ করে। বাংলাদেশে বিশেষত উত্তর বঙ্গের বরেন্দ্রভূমিতে অসংখ্য মসজিদ ও সমাধি-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। নসরৎ শাহ্ প্রতিষ্ঠিত গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ ও 'কদম রসুলের' শিল্পশৈলী বিস্ময়কর। মালদহ জেলায় গেলে এ সব শিল্প-নিদর্শন এখনও দেখা যায়। অবশ্য এই মন্দির, মসজিদগুলো বর্তমানে জরাগ্রস্ত। মালদহের ছোট সোনা মসজিদও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হুসেন শাহ্ এটির নির্মাতা। পাণ্ডুয়ার 'একলাখী' সমাধিমন্দিরের ত জুড়ি মেলাই ভার। সুলতান সেকেন্দার সাহেবের রাজত্বে স্থাপিত পাণ্ডুয়ার আদিম মসজিদটিও বিস্ময়কর। 'চারশ' গম্বুজবিশিষ্ট এই মসজিদটি আজও অটল গাম্ভীর্যে সুলতানী আমলের শিল্প-সফলতার বার্তা ঘোষণা করে চলেছে।

সঙ্গীত

সঙ্গীত-সংস্কৃতির মধ্যে দিয়েও হিন্দু-মুসমানের যুক্ত সাধনা রূপায়িত হয়েছে নতুন বিভবে। প্রাচীন হিন্দু মার্গসঙ্গীত পারস্য সঙ্গীত-রীতির প্রভাবে অপূর্ব রূপ পরিগ্রহ করে। সৃষ্টি হয় খেয়ালের। সুলতানী যুগের সুপ্রসিদ্ধ কবি আমীর খসরুর সাধনায় সঙ্গীতকলার বিভিন্ন দিক বিশেষত উচ্চাঙ্গ বা দরবারী সঙ্গীতের বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটে। বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রেও আমীর খসরুর অবদান অসামান্য। পাখোয়াজ বা মৃদঙ্গ ভেঙ্গে তবলা তৈরির পরিকল্পনাটি তাঁরই।

সাহিত্য

উর্দু ভাষা হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের আর এক নজীর। হিন্দী ও ফারসী ভাষার সংমিশ্রণে এই ভাষাটির সৃষ্টি। উর্দু ভাষায় রচিত বিচিত্র সাহিত্যকৃতি সুলতানী যুগের সংস্কৃতির উজ্জল বৈশিষ্ট্য। ফারসী সাহিত্যে কবি আমীর খসরুর খ্যাতি ইতিহাস-বিশ্রুত। সে যুগের ঐতিহাসিকেদের রচিত গ্রন্থাদিও সাহিত্য-রীতির অপূর্ব নিদর্শন। সুলতান মাহ্মুদ ছিলেন একজন শিল্প-বোদ্ধা। তাঁর সভাকবি আলবিরুণীর সাহিত্যিক অবদানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহম্মদ বিন্ তুঘলক নিজেও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিশেষ সমৃদ্ধি দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত রঘুনাথ এবং বেদাচার্য মাধব এবং সায়নের নাম স্মরণীয়। এই যুগে বৈষ্ণব সাহিত্য খুবই উন্নত হয়ে ওঠে নব সম্ভারে। ভাব ও ভাষায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী সাহিত্য-জগতের বিস্ময়। বৈষ্ণব পদাবলীর অতুলনীয় কাব্য সৌকর্যের সঙ্গে সে-যুগের সমাজ-জীবনের বিচিত্র

আলেখ্য বিধৃত হয়েছে। রামানন্দ ও কবীর হিন্দী ভাষায় যে দোঁহাবলী রচনা করেন তা সাহিত্যকর্মে ও বিচিত্র ভাব রূপায়ণে অপূর্ব।

হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার ধারা

দুনূঁ হাথী হৈব রহে, মিলি রস পিয়া ন জাই।

"হিন্দু-মুসলমানের দুই হাত। দুই হাত একত্র না হলে কেমন করে অমৃতের অঞ্জলি রচিত হবে? কেমন করে অমৃত রস পান করা যাবে?"

হিন্দু মুসলমানের আত্মিক মিলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন সুলতানী যুগের পরম সাধক দাদূ:

সব ঘট একৈ আত্মা
ক্যা হিন্দু মুসলমান

সকলের আত্মা এক ও অভেদ, হিন্দু ও মুসলমানে কোন পার্থক্য নেই। সুলতানী যুগের ভক্ত, কবি ও সাধকেরা হিন্দু মুসলমানের ঐক্য কামনা করলেন। তাঁদের রচিত কাব্য ও দোঁহাবলীর মাধ্যমে মনুষ্যত্বের নবধর্ম মূর্ত হয়ে উঠেছিল। ধর্মের নামে জীবনের অপচয়, নীতির নামে নোংরামি আর রাজ্যশাসনের নামে মানবতার চরম অবমাননার তীব্র বিরোধিতা তারা করেছেন সাহিত্যসৃষ্টির ভিতর দিয়ে। মানুষে মানুষে বিভেদের কৃত্রিম বেড়াজাল অস্বীকার করে তাঁরা মানবধর্মের বিজয়বার্তা ঘোষণা করেছেন। শিখদের প্রথম ধর্মগুরু নানক বলেছেন—ঈশ্বর একজন; মসজিদ বা মন্দির কিংবা তীর্থস্থানে অযথা ঘোরাঘুরি করলেই ধার্মিক হওয়া যায় না। কবীর ছিলেন উত্তর ভারতের একজন সাধক; এঁর গুরু হলেন রামানন্দ। রামানন্দ চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কবীরও উদাত্ত কণ্ঠে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের বাণী প্রচার করেছেন। কবীর ধর্মের নিষ্প্রাণ বিধি-নিষেধ মানতেন না, ধর্মের কুসংস্কারকে তিনি প্রশ্রয় দেননি কখনও।

"জৌর খুদাই মসীত বসত হৈঁ ঔর মুলিক কিস কেরা
তীরথ মূরতি রাম নিবাসা দুহুঁ মৈ কিনহুঁন হেরা॥
পূরিব দিশা হরী কা বাসা পছিম অলহ মুকামা।
দিল হি খোজি দিল ভীতরি ইহা রাম রহিমানা॥

"খোদা যদি মসজিদের বাসিন্দা হন তবে আর সব মুলুক কার? তীর্থে ও মূর্তিতে রামের বাস, এই দুই ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? পূবে হরির

বাস, আর পশ্চিমে আল্লার মোকাম। কিন্তু খোঁজ, নিজের হৃদয়েই রাম-রহিম বিরাজমান।" কবীরেরই শিষ্য দাদূ।

চৈতন্য ছিলেন বাঙালী। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে এঁর জন্ম। ইনি জাতিভেদ অস্বীকার করেছেন। "আচণ্ডালে দিই কোল" এই ছিল তাঁর ধর্ম-সাধনা। চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের মূল কথা হল মানবপ্রেম। চৈতন্যদেব বলতেন, "আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখায়।" তাই যবন হরিদাস মুসলমান হলেও তিনি তাঁকে তাঁর মহান্ ধর্মে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

মুসলমান ফকিরদের সহজধর্ম সুফীবাদও ধর্ম-সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারিত প্রভাব বিস্তার করেছিল। সুফীবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে মইনউদ্দিন চিশ্‌তি এবং নিজামুদ্দিন আউলিয়ার নাম স্মরণযোগ্য। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য এঁরা অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন। সুফীবাদ হল এক সহজ সরল ধর্ম। এতে ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানের কোন আড়ম্বরই নেই, আছে মানবতার সাধনা। এ ধর্মে মানুষের স্থান অতি উচ্চে। তথাকথিত ঈশ্বর এখানে গৌণ।

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবি-সাধকেরাই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য বিধানের জন্য সাধনা করেছেন। এঁদের সাধনার প্রত্যক্ষ কোন ফল না ফললেও পরোক্ষ ফল ফলেছিল। ক্রমভঙ্গুর হিন্দু-মুসলমান সমাজ নতুন বাণীর আলোকে নিজেদের চিনতে শুরু করে এবং নতুন কর্মপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে যুগ্ম-সাধনার সঙ্গীতের সুর মিলিয়ে চলে। অবশ্য দুঃখের বিষয় ভক্ত কবিরা হিন্দু-মুসলমানের পরিপূর্ণ ঐক্যের স্বপ্ন দেখলেও তা উভয়ের জীবন-যাত্রার সর্বাঙ্গীণতায় সফল হয়ে ওঠেনি। সুলতানী যুগের যুগ্ম-সংস্কৃতি নবতর বৈশিষ্ট্যে আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে মোগল যুগে।

অনুশীলনী

১। (ক) মহম্মদ বিন্ তুঘলককে 'ইতিহাসের বিস্ময়' বলা হয় কেন? (খ) তিনি দিল্লী থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন দেবগিরিতে; তাঁর পরিকল্পনার গুণাগুণ বিচার কর। ব্রিটিশ আমলেও ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে সরানো হলো দিল্লীতে; এর ফলে শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে লাভালাভ কী হল?

২। ইবন বতুতা বলেছেন, সে যুগে (চতুর্দশ শতকে) জিনিসপত্রের দাম খুব শস্তা ছিল; আবার তিনিই সে যুগে দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন। এ সমস্যাটির কোন কারণ খুঁজে বার করতে পার?

৩। হিন্দু ও মুসলমানের যুগ্ম-সাধনায় কিভাবে মধ্যযুগীয় ভারতের সমাজ-সংস্কৃতি রূপায়িত হয়েছিল তার বিবরণ দাও।

৪। সুলতানী আমলের সমাজচরিত্রের নমুনা দাও। ক্রীতদাস প্রথা সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? আমেরিকার ক্রীতদাস প্রথার ইতিহাস সংগ্রহ করে মানব-প্রেমিক আব্রাহাম লিঙ্কন, বুকার **টি.** ওয়াশিংটন প্রভৃতি মনীষীদের কথা জানতে চেষ্টা কর।

৫। 'সুলতানী আমলের পণ্যদ্রব্য' নাম দিয়ে একটি চার্ট তৈরী কর। এর মধ্যে একটি প্রধান পণ্য হবে মানুষ—ক্রীতদাস; ক্রীতদাসের ছবিটা অন্য সব পণ্যের ছবির চেয়ে বড় করে আঁকবে।

৬। দিল্লী-লক্ষ্ণৌ যদি যাও তো সেখানকার মসজিদ ও সমাধিসৌধের গায়ে মুসলমান অক্ষরকলা (Calligraphy) দেখতে পাবে। কলকাতার জাদুঘরেও অক্ষরকলার নমুনা আছে; একদিন গিয়ে কাগজে এঁকে নিয়ে এস। সমাজ-বিদ্যার প্রদর্শনীতে দেখাতে পারবে।

৭। চল যাই ॥ মালদহ; পাণ্ডুয়া—সুলতানী আমলের শিল্পশৈলীর উজ্জ্বল নিদর্শন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

॥ মোগল সাম্রাজ্য ॥

রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস

ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতের বুকে এক নতুন জাতির শাণিত তরবারির আঁচড় পড়ল। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ। তখন ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সুলতান। মোগলবীর **বাবর** পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিমকে পরাজিত করে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন। বাবর প্রতিষ্ঠিত এই সাম্রাজ্য মোটামুটি দু'শ বছর স্থায়ী হয়েছিল।

এশিয়ার ইতিহাসে বাবর একজন কর্মবীর সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন ধুরন্ধর হিসাবে প্রসিদ্ধ। তিনি মাত্র কয়েক বছর রাজত্ব করেছিলেন, সেজন্য সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন ছাড়া তিনি আর কিছুই করে যেতে পারেননি।

১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যুর পর পুত্র **হুমায়ুন** সিংহাসনে বসেন। রাজ্যের অবস্থা মোটেই তাঁর অনুকূল ছিল না। গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ এবং পূর্বভারতের শেরশাহ হুমায়ুনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। শেষে কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুমায়ুন সিংহাসন হারান। আফগান বীর **শেরশাহ** এবং তাঁর বংশধরেরা কিছুদিনের জন্য দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে বসলেন। অবশেষে ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে শেরশাহের হাত থেকে হুমায়ুন নিজের রাজ্য উদ্ধার করে নিলেন। কিন্তু এই ঘটনার মাত্র একবছর পরেই তিনি মারা যান।

হুমায়ুনের পর ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে **আকবর** সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। সিংহাসন লাভের অল্পকাল পরেই শেরশাহের ভ্রাতুষ্পুত্র অদিলশাহের হিন্দু মন্ত্রী হিমু দিল্লীর দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ পানিপথের (দ্বিতীয়) যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে আফগান শক্তি ধ্বংস হওয়ায় মোগলসাম্রাজ্যের বিস্তারের পথ নিষ্কণ্টক হয়ে যায়।

১৬০৫ খৃষ্টাব্দে আকবরের পর **জাহাঙ্গীর** সম্রাট হন। তাঁর রাজত্ব কালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বঙ্গদেশে মোগল কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু প্রথম জীবনের মতই জীবনের শেষের দিনগুলি তাঁর কাটে বিদ্রোহ দমনের কাজে; এতে সম্রাটের শেষ জীবনের শান্তি ব্যাহত হয়। জাহাঙ্গীরের পুত্র **শাহজাহান** সিংহাসনে বসেন ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে। হয়ত তাঁর জন্মলগ্নে শুভ-অশুভ উভয় গ্রহের দৃষ্টি পড়েছিল সমভাবেই। তাই জীবনের প্রথমদিকে নানা আড়ম্বরের মধ্যে

সগৌরবে রাজত্ব করে এসেও তাঁর শেষ জীবনটা পুত্রদের কলহ ও চক্রান্তের মধ্যে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে ভ্রাতাদের হত্যা এবং পিতাকে বন্দী করে **ঔরঙ্গযেব** সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঔরঙ্গযেবের মত কোন মোগল সম্রাট এমন কুখ্যাতি অর্জন করেননি। ধর্মের গোঁড়ামি, উগ্রতা, অন্যায় অত্যাচার ইত্যাদির জন্য রাজপুত, মারাঠা প্রভৃতি বীর জাতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ঔরঙ্গজেবের বাদশাহী জীবন ছিল অভিশপ্ত। শেষে নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে এই অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন, নানাগুণান্বিত জীবনের অবসান ঘটে।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গযেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের পতন দ্রুততর হয়ে ওঠে। এই সময় ইংরেজ, ডাচ, ফরাসী ইত্যাদি বণিক জাতি ভারতে বাণিজ্য করতে এসে 'মানদণ্ডের' পরিবর্তে 'রাজদণ্ড' গ্রহণের জন্যে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। মোগল সাম্রাজ্যের ক্রমিক দুর্বলতাই অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ কোম্পানীকে শক্তি যুগিয়েছিল।

মহামতি আকবর

বাবর বাহুবলে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'মোগলের মুকুট-রতন' আকবর বাহুবলেই বাবর প্রতিষ্ঠিত এই সাম্রাজ্যকে সমগ্র উত্তর ভারত তো বটেই, দক্ষিণ ভারতেও কিছুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। কিন্তু কেবল বাহুবলের উপর নির্ভর করেই তো কোন সম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করা যায় না। সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য উৎকৃষ্ট শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তন করে সাম্রাজ্য ও সম্রাটের প্রতি প্রজাদের ভালবাসা আকর্ষণ করতে হয়। আকবরের প্রতি প্রজাদের শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। একটি সংস্কৃত শ্লোক এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ঃ

"বিধিনা তুলিতা রেতৌ সেকেন্দর-পুরন্দরৌ
গুরুঃ সেকেন্দরঃ পৃথ্বীং লঘুরিন্দ্রো দিবং যযৌ।"

অর্থাৎ বিধাতা সেকেন্দর (আকবর) এবং পুরন্দর (ইন্দ্র)-কে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করেছিলেন ; সেকেন্দারের গুরুত্ব বেশি হওয়ায় তিনি পড়লেন পৃথিবীতে আর ইন্দ্র তাঁর তুলনায় অত্যন্ত লঘু (হাল্কা) হওয়ায় উপর উঠলেন, মানে স্বর্গে গিয়ে উঠলেন। আকবরকে এভাবে গুরুত্ব দেবার চেষ্টা শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন সন্দেহ নেই।

উত্তর ভারতে আজমীর, গোয়ালিয়র, জৌনপুর, মালব, মেবার প্রভৃতি রাজ্য আকবরের করতলগত হয়। পশ্চিম ভারতে আরব সাগর পর্যন্ত, পূর্ব ভারতে

বিহার ও বাংলা দেশ, পরে দাক্ষিণাত্যের আহম্মদনগর ও খান্দেশ পর্যন্ত আকবর মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

আকবরের ইতিহাস কেবল রাজ্য-জয় বা সাম্রাজ্য-বিস্তারের মধ্যেই নিহিত নয়। উৎকৃষ্ট শাসনতন্ত্রই যে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের মূল কথা তা তিনি মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছিলেন। অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েও আকবর প্রজাদের উপর অন্যায় অত্যাচার করেন নি। তাঁর শাসন-পদ্ধতি আজ ইতিহাসের পাতায় ভারতীয় শাসনতন্ত্রের এক গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

আকবরের সাম্রাজ্য গঠনে **হিন্দুদের প্রতি উদার নীতি** বিশেষ ফলপ্রদ হয়েছিল। "মোসলেম-হিন্দুরে বাঁধি' প্রেমের বন্ধনে, প্রতিষ্ঠিত এক ক্ষেত্রে অভিন্ন পরাণে, চেয়েছিল দেখিবারে যেই মহাজন,…"—কবির এই উক্তিটি যথার্থই সত্য, কারণ ধর্ম সম্বন্ধে আকবর হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে সমান চোখে দেখতেন। জিজিয়া এবং তীর্থযাত্রা সংক্রান্ত কর তুলে দিয়ে তিনি হিন্দুদের শ্রদ্ধা-ভালবাসা আকর্ষণ করেন। কোন কোন বিষয়ে আকবর হিন্দু সমাজের সংস্কারও করেছিলেন।

ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনগণকে একসূত্রে আবদ্ধ করে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ উদ্দীপনের জন্য তিনি সব ধর্মের মূল তত্ত্বের সমন্বয় করে **'দীন ইলাহি'** নামে নতুন এক ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর এই ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার কথা স্মরণ করে কবি বলেছেন—

"তোমার হৃদয় ভরি' জেগেছিল কী মহাস্বপন!
এ ভারতভূমি,
এক ধর্ম এক রাজ্যে এক জাতি একনিষ্ঠ মন
বেঁধে দিবে তুমি।"

আকবরের সময় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক গৌরবময় যুগের সূত্রপাত হয়। সম্রাট নিজে নিরক্ষর ছিলেন সত্য কিন্তু তাঁর পাঠাগারে বহু মূল্যবান গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছিল। তাঁর রাজসভায় আবুল ফজল, ফৈজী, টোডরমল, তানসেন, বীরবল, বাজবাহাদুর প্রভৃতি ছিলেন এক একটি উজ্জ্বল রত্ন।

সাম্রাজ্যের স্থাপক রূপে আকবর পৃথিবীর ইতিহাসে অত্যুচ্চ স্থানের অধিকারী। মধ্যযুগের ইতিহাসে এমন মহানুভবতা, এমন বহুমুখী প্রতিভার বিচিত্র বিকাশ আর কোন সম্রাটের মধ্যে দেখা যায়নি। ভারতবর্ষ নানা জাতি ও নানা ধর্মে বিশ্বাসী জনগণের আবাসভূমি। সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন ছিল আকবরের আশা, আকবরের সাধনা।

মোগল শাসন-ব্যবস্থা

মোগল যুগে ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল। মোগল শাসন-ব্যবস্থায় আরব ও পারস্য দেশের প্রভাব খুব বেশি।

সে যুগে গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি প্রবর্তনের কথা ছিল কল্পনাতীত। রাজার ইচ্ছে অনুসারেই রাজ্য শাসিত হত। সুতরাং সম্রাটেরা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন সন্দেহ নেই। তবে প্রয়োজন হলে সম্রাটেরা 'দেওয়ান', 'মীরবক্সী', 'মীরসমান' ইত্যাদি সরকারী কর্মচারীর সাহায্য গ্রহণ করতেন।

আরবের মতই ভারতের শাসন-ব্যবস্থা মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত ছিল: শাসন বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগ। সুবাদার ও দেওয়ান যথাক্রমে এই দুটো কর্তা ছিলেন।

মোগল যুগে অনেক রাজকর্মচারীকে মনসব অর্থাৎ হাজার থেকে দশ হাজার অশ্বারোহী পালনের দায়িত্ব দেওয়া হত। এই মনসবের অধিকারীকে মনসবদার বলা হত। উজীর ছিলেন সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী। এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় শাসনকার্যের জন্য ছিলেন 'উকিল', 'প্রধান বক্সী', 'সদর' ইত্যাদি কর্মচারী।

আকবর মোগল শাসন-ব্যবস্থার বহু পরিবর্তন করেন। শাসনের সুবিধার জন্যে তিনি সাম্রাজ্যকে পনেরটি সুবায় বা প্রদেশে ভাগ করেন। এই সুবা 'সরকারে' এবং 'সরকার' আবার কতগুলি 'পরগনায়' বিভক্ত ছিল। সুবাদারের অধীনে 'ফৌজদার', 'কোতোয়াল', 'কাজি' ইত্যাদি কর্মচারী।

মনসবদারী প্রথাই ছিল **সৈন্য বিভাগের** ভিত্তি। সম্রাটের অধীনে স্থায়ী সৈন্যের সংখ্যা ছিল সামান্য। সৈন্যদের মধ্যে প্রধানত তিনটি বিভাগ ছিল: অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ।

শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা কেমন ছিল? 'আইন-ই-আকবরী'তে তারও বিস্তৃত বিবরণ আছে। নগরে যিনি শান্তিরক্ষা করতেন তাঁকে কোতোয়াল বলা হত। জেলার শান্তিরক্ষার ভার ফৌজদারের উপর। গ্রামের শান্তিরক্ষার ভার ছিল গ্রামের প্রধান অর্থাৎ মোড়লের উপর।

মোগল যুগে **বিচার ব্যবস্থা** পরিচালিত হত কোরানের অনুশাসনের উপর ভিত্তি করে। লিখিত আইন-কানুন ছিল না। বিচার ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে থাকতেন স্বয়ং সম্রাট। রাজধানীতে বিচারের জন্য ছিলেন 'কাজি-উল-কাজাতে' —ইনিই প্রদেশের রাজধানীর জন্য একজন কাজি নিয়োগ করতেন। গ্রামের পঞ্চায়েত গ্রামবাসীর কলহবিবাদের নিষ্পত্তি করত।

আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা

ইতিহাস কেবল রাজা-বাদশার কাহিনী নয় ; ইতিহাস থেকে আমরা বিশেষ বিশেষ যুগের মানব-সমাজ এবং তাদের অর্থ নৈতিক অবস্থার কথাও জানতে পারি।

মোগল যুগে নানা দেশ থেকে নানা জাতির পর্যটক ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের বিবরণী থেকে তখনকার সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক অবস্থার পরিচয় পাই। মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা ছিল অধিক। হিন্দুদের মধ্যে জাতভেদ ছিল খুব কঠোর। জাতি ছিল চারটি : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বাণিয়া এবং শূদ্র। ব্রাহ্মণের স্থান ছিল সকলের উপরে। হিন্দুরা মাংস খেত না, তাদের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, দুধ ও ফলমূল। স্ত্রীলোকেরা মৃত স্বামীর সঙ্গে চিতায় আরোহণ করত। হিন্দুরা বহু দেবদেবীর পূজা করত। ভারতে সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা প্রচলিত ছিল। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর মেলা বসত ; বহু নরনারী এই তীর্থে স্নান করতে আসত। এদেশের স্ত্রীলোকেরা খুব পান খেত আর অতিথিদের আপ্যায়ন করত পান দিয়েই।

তখনকার দিনে বড় বড় শহরে টাঁকশাল ছিল। কেনা-বেচার জন্য রূপার মুদ্রা, তামার পয়সা এবং কড়ির প্রচলন ছিল। লাহোর, আগ্রা, গোলকুণ্ডা, ঢাকা, পাটনা সে-যুগের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। মসুলিপত্তম ছিল বড় বন্দর, এই বন্দর দিয়ে পণ্য-বোঝাই জাহাজ পেগু, আরাকান, শ্যাম প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করত। ভারতে বাণিজ্য করতে আসত পর্তুগীজ, ইংরেজ, ওলন্দাজ ইত্যাদি বণিকদের দল। তারা সোনারূপার বদলে এদেশ থেকে নিয়ে যেত মসলিন রেশম আর নীল। এই বাণিজ্যের ফলে ভারতবর্ষে প্রচুর সোনারূপা এসে জমত।

তখনকার দিনে বারাণসী ছিল শিক্ষার কেন্দ্র। সেখানে ছাত্ররা বেদ, পুরাণ এবং সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করত। দেশের সর্বত্র জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা হত।

ধনীরা বড় বড় বাড়ীতে বাস করত। বাড়ীর সামনের দিকে থাকত উদ্যান, আরেক দিকে থাকত সুবিশাল দীঘি। সাধারণ লোকের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না, তারা ছোট কুঁড়েঘরে বাস করত।

অত্যাচারী প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও জায়গীরদারদের হাতে পড়ে বণিক, কৃষক, কারিগরদের দুঃখদুর্দশার অন্ত ছিল না। অনেক সময় সাধারণ কৃষক তাদের জীবনধারণের উপযুক্ত দ্রব্য থেকে বঞ্চিত হয়ে অনাহারে দিন কাটাত। অপর দিকে আমীর ওমরাহ ও জায়গীরদারেরা পরম বিলাসের মধ্যে জীবন কাটাত।

স্থাপত্য ও শিল্পকলা

মোগল যুগের স্থাপত্য ভারতের গৌরবের বস্তু। একমাত্র ঔরঙ্গযেব ভিন্ন মোগল সম্রাটেরা সকলেই স্থাপত্যশিল্পের অনুরাগী ছিলেন। তাজমহল, আগ্রার দুর্গ, দিল্লীর দুর্গ, ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদগুলির বোবা পাথরের গায়ে জড়িয়ে আছে মোগল সম্রাটের শিল্পানুরাগের বলিষ্ঠ নিদর্শন।

হিন্দুমুসলমান উভয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলন-সাধন ছিল আকবরের জীবনের ব্রত। তাই দেখতে পাই মোগল যুগের কোন কোন স্থাপত্যে হিন্দু শিল্পের সুস্পষ্ট ছাপ। ফতেপুর সিক্রির 'যোধাবাঈয়ের প্রাসাদ'কে হিন্দু ও মুসলমান উভয় শিল্পসংস্কৃতির প্রীতিসৌধ বলা চলে।

মোগল সম্রাট শাহ্‌জাহানের নাম ভারতের স্থাপত্যের ইতিহাসে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় করে যমুনার তীরে তিনি নির্মাণ করেছিলেন প্রিয়তমা মহিষী মমতাজের সমাধি-সৌধ, বিশ্বের অন্যতম আশ্চর্য 'তাজমহল'—যাকে নিয়ে কবিগুরুর বিমুগ্ধ দৃষ্টির প্রশস্তি :

> "হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ঘটা,
> যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা,
> যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
> শুধু কথা—
> এক বিন্দু নয়নের জল,
> কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
> এ তাজমহল।"

দিল্লীদুর্গের 'দেওয়ান-ই-আম' ও 'দেওয়ান-ই-খাস' শাহ্‌জাহানের শিল্পানুরাগের আরও দুটি নিদর্শন—যেখানে প্রেমিক সম্রাটের বেদনা ফারসী কবির কণ্ঠে বেজে উঠেছে : "পৃথিবীতে স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তবে তাহা এখানে, তাহা এখানে এবং কেবলি এখানে।"

ইসলাম ধর্মে চিত্র অঙ্কন নিষিদ্ধ হলেও শিল্পানুরাগী মোগল বাদশাহেরাও **চিত্রশিল্পের** পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মোগল সম্রাটদের সভাগৃহে দরবারী কবির মত চিত্রশিল্পীরাও সমাদর পেয়েছিলেন। মোগল চিত্রকর কাগজের উপর আঁকা ক্ষুদ্র এবং প্রাচীন চিত্র অঙ্কনে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এছাড়াও প্রতিকৃতি ও প্রকৃতি চিত্রণে তারা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এযুগে চিত্রশিল্প সুলতানি আমলের ধারায় সমৃদ্ধ
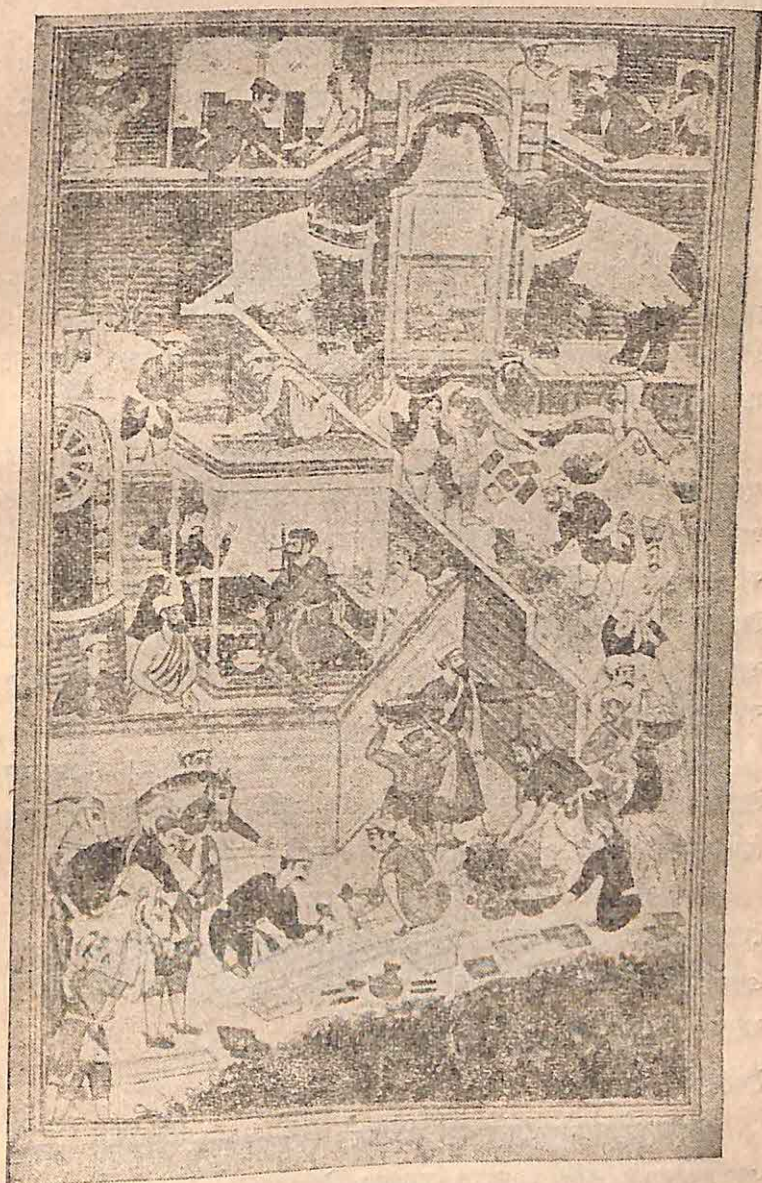
মোগল চিত্র (১৫৮০ সালের কাছাকাছি) ঃ সম্ভবত আগ্রা দুর্গের হাতী-ফটকের নির্মাণকার্য দেখান হচ্ছে।

[এ ছবিটির বিভিন্ন মানুষ শ্রমবিভাগের নীতিতে কাজ করছে, লক্ষ্য করে দেখ]

সাহিত্য

মোগল সম্রাটদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্য-রসিক ও সাহিত্য-স্রষ্টা ছিলেন। রাজদরবারে কবি ও কাব্যের সমঝদার ছিল। গ্রন্থরচনা, গ্রন্থাগার স্থাপন এবং গ্রন্থ অনুবাদে মোগল সম্রাটদের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল।

মোগল যুগের সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফারসী ভাষায় লেখা ইতিহাস, বাংলা ভাষায় লেখা পাঁচালী ও বৈষ্ণব সাহিত্য এবং হিন্দী ও মারাঠী সাহিত্য। তৈমুর, বাবর ও জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, দারাশিকোর উপনিষদের অনুবাদ, হুমায়ুন-ভ্রাতা কামরানের কবিতা-সংগ্রহ মোগল রাজবংশের স্মরণীয় কীর্তি। এই সময় আবুল ফজল, কাসিম, ফেরিস্তা, বদায়ুনী, নিজামউদ্দীন বক্সী ইতিহাস রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন।

মোগল যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই সময় বাংলায় মহাভারত-রচয়িতা কাশীরাম দাস, চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা মুকুন্দরাম, অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র তাঁদের অমর লেখনী চালনা করেছিলেন। গোবিন্দদাসের করচা এবং জ্ঞানদাসের পদাবলী বৈষ্ণব সাহিত্যের উজ্জ্বল সম্পদ। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত এ যুগের রচনা। এ ছাড়াও বাংলার বাউল সাধকদের রচনা ভারতীয় সঙ্গীত সাহিত্যকে সুষমামণ্ডিত করেছে।

মোগল যুগেই হিন্দী ভাষা এবং সাহিত্য এক অপূর্ব রূপে রসে মণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। এই সময় তুলসীদাস, মীরাবাঈ, সুরদাস, নরহরি প্রভৃতির রচনা হিন্দী কাব্যসাহিত্যে এক নতুন জোয়ার এনেছিল।

সুলতানী আমল থেকে মারাঠী সাহিত্যে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল মোগল যুগে তা-ই চরম রূপ লাভ করে মারাঠী কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল। একনাথ, তুকারাম প্রভৃতি মহাজন ভক্তিমূলক পদ রচনা করে জনসাধারণের ধর্ম ও সাহিত্যের উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন।

বৈদেশিক পর্যটকগণ

আকবরের রাজত্বকালে রালফ্ ফিচ নামে একজন ইংরেজ পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন। তিনি আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রির জাঁকজমকের কথা উল্লেখ করেছেন। ইনি পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলার বাকলা শহর দর্শন করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে এসেছিলেন হকিন্স এবং স্যার টমাস রো। শাহজাহানের রাজত্বকালে টাভার্ণিয়ে এবং বার্ণিয়ের নামে দুজন ফরাসী ভারতে এসেছিলেন।

তানসেন (একটি দুষ্প্রাপ্য তৈলচিত্র থেকে আঁকা)

মানুসী নামে একজন ইটালীয় ঔরঙ্গযেবের রাজত্বকালে দীর্ঘদিন ভারতবর্ষে বাস করেছিলেন। এই পর্যটকের লেখা বিবরণী হল মধ্যযুগের ভারতের একটি রেখাচিত্র। তার মধ্যে আমরা দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, জনসাধারণের সুখ-দুঃখের বিবরণ সংগ্রহ করতে পারি।

শিবাজীর মৃত্যুর পর মোগল-মারাঠা সংঘর্ষে এবং পরবর্তীকালে ইংরেজ-মারাঠা সংঘর্ষে মারাঠাদের বীরত্বের পরিচয় পাই। মারাঠাদের নায়ক হিসাবে আসেন **পেশোয়ারা**। বালাজী বিশ্বনাথ, বাজীরাও, বালাজী বাজীরাও প্রমুখ সংগঠক ও রাজ্যজয়ী পেশোয়াদের আমলে মারাঠা রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল উড়িষ্যা থেকে পাঞ্জাব, গুজরাট পর্যন্ত। মোগলদের কাছ থেকেও তাঁরা চৌথ আদায় করতে কসুর করেননি। শিবাজীর স্বপ্ন সার্থক হওয়ার পথে নেমে এল কালের অভিশাপ। এলেন আহম্মদ শাহ আবদালী। পারস্যসম্রাট নাদির শাহের সেনাপতি তিনি। প্রভুর নারকীয় অত্যাচারের প্রত্যক্ষদর্শী। নাদির শাহের উত্তরসূরী হিসেবে তিনি আসেন ভারত জয়ে। দিল্লী লুণ্ঠনের নেশা তাঁকে পাগল করে তুলেছিল। তাই পানিপথ প্রান্তরে মিলিত হলেন তিনি পেশোয়া বালাজী বাজীরাও-এর সঙ্গে। কিন্তু মারাঠা গৌরব-রবি তখন পাটে বসেছে—বালাজীর পতনে মারাঠা শক্তি বিনষ্ট হয়ে গেল। আবার তারা চেষ্টা করেছিল মাথা তুলে দাঁড়ানোর, কিন্তু তখন এসেছে ইংরেজ। তাদের শক্তির কাছে মাথা নোয়াতে হল মারাঠাদের।

মহীশূরের শার্দূল

দক্ষিণ ভারতে আর এক রাজ্য মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করল—সামান্য সিপাহী-সন্তান হায়দর আলির নেতৃত্বে। নিরক্ষর হায়দর ছিলেন অসাধারণ স্মৃতিধর। ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও নগণ্য নয়। তাঁর মৃত্যুর পর সুযোগ্য পুত্র **টিপু সুলতান** মহীশূরের সম্মান রক্ষা করতে যত্নপর হয়ে ওঠেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ইংরেজদের হাতে পরাস্ত হন। শ্রীরঙ্গপত্তনে টিপুর শক্তির সমাধি হল। ক্ষুদ্র মহীশূর ইংরেজদের অধিকৃত হল।

পাঞ্জাবের কেশরী

এবার এগিয়ে এলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে পাঞ্জাব-কেশরী **রণজিৎ সিং**। যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে তিনি উত্তর ভারতে শিখদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন জাতীয়তাবোধ। ইতিপূর্বে শিখরা বিভিন্ন ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত ছিল। রণজিৎ সিং শতদ্রুর পূর্বতীরের বিবদমান শিখ রাজ্যগুলোকে একতাবদ্ধ করার শুভকামনায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হননি। কিন্তু হতভাগ্য শিখগণ মহান নেতার পরিকল্পনা না বুঝে ইংরেজ সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করে বসল। ঘরের বিবাদ মেটানোর জন্যে খাল কেটে কুমীর আনল তারা। রণজিৎ সিং অমৃতসরে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। অনেক দুঃখ এবং হতাশায়

ভারতের মানচিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বললেন : 'সব লাল হো যায়েগা'। তাঁর মৃত্যুর পরই যুক্ত নায়কের অভাবে শিখ রাজ্যের পতন দ্রুততর হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় যেন দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছিল। মোগল—মারাঠা—শিখ—মহীশূর সব চলে গেল। ইতিপূর্বে শুরু হয়ে গেছে ভারতের বুকে বিদেশী বণিকের আনাগোনা। দেশের মধ্যে বিরাজমান এক অবর্ণনীয় দুরবস্থা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ চিত্র

অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক ইতিহাস ঘন-দুর্যোগপূর্ণ। একদিকে বিদেশী আক্রমণের পদধ্বনি, অন্যদিকে অভিজাত শ্রেণীর মানুষের অত্যাচার ও ষড়যন্ত্র। একদিকে দুর্বল পঙ্গু মোগল শাসকগোষ্ঠী, অন্যদিকে অত্যাচারী মারাঠা। যেখানে যেখানে তাদের পদচিহ্ন পড়েছে সেখানে চলেছে লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড আর নৃশংসতা—নাদিরশাহী ঘটনার সেই পুনরাবৃত্তি। আলীবর্দীর শাসনকালে বাংলায় **বর্গীর হাঙ্গামা** এর প্রামাণ্য ঘটনা হিসেবে ইতিহাসে স্থান পায়। ভারতের সর্বত্র সাধারণ মানুষ করভারে জর্জরিত, বিদেশীয় শোষণে তারা উৎপীড়িত। দরিদ্র চাষী জনসাধারণ বৃহত্তর সমাজের যূপকাষ্ঠে বলি হিসেবে প্রদত্ত হল। ঘুণ ধরল দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোয়। ধীরে ধীরে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছিল সমাজের মেরুদণ্ড। এর পর এল কালভৈরব—দুর্ভিক্ষ, **ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।** অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, নির্বিচার শোষণ ও দুরূহ করভার বাংলাদেশ আর সইতে পারল না। নিরন্নের হাহাকারে বাংলার বাতাস ভরে উঠল। সমাজের অধঃপতনের গতি হল বেগবতী। মুর্শিদকুলি খাঁর **ইজারাদারি প্রথা** আবার নতুন করে সৃষ্টি করল আর এক জমিদার গোষ্ঠীর; **গ্রামীণ সমাজ-বাঁধন** ছিঁড়ে গেল। চাষী প্রাণ দিল জমিদারের পায়ে। কৃষির চরম ক্ষতি হল। কুটিরশিল্প হল ধ্বংসোন্মুখ। গ্রামের ছায়াশীতল পঞ্চবটীতল হল নিস্তব্ধ। নগর-রাক্ষসী গ্রাস করল গ্রামগুলোকে। নতুন সমাজব্যবস্থা, নতুন শাসনব্যবস্থ ভেঙে দিল পুরানো ব্যবস্থার শৃঙ্খল। দেশের অবস্থা হয়ে উঠল শোচনীয়। কুসংস্কার আর দুর্নীতি নৈতিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলল। অষ্টাদশ শতাব্দী সত্যই বাংলার সমাজজীবনে এক তিমিরাচ্ছন্ন অধ্যায়। এই অধ্যায়ের অবসানের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল ইংরেজের প্রভুত্ব বিস্তারের লৌহযবনিকার অন্তরালে।

অনুশীলনী

১। মোগল সাম্রাজ্যের বিশ্ববিশ্রুতি ঐশ্বর্যের জন্য আমরা খুব উল্লসিত হই না যখন মনে পড়ে সেই ঐশ্বর্য গড়ে তোলার পিছনে সাধারণ প্রজার অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের কথা।—এ উক্তিটির তাৎপর্য অনুধাবন কর।

২। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কী? এ ব্যাপারে তুমি ঔরঙ্গযেবকে কতখানি দায়ী করবে? যে কোন রাজত্বের পতনের জন্য তার সর্বশেষ রাজা বা সম্রাটকে পুরোপুরি দায়ী করা চলে কি?

৩। মহারাষ্ট্র-বীর শিবাজীর নিকট মোগল-সম্রাট ঔরঙ্গযেবকেও হার মানতে হয়েছিল। এর কয়েকটি কারণ অনুসন্ধান কর। শিবাজীর আদর্শের সঙ্গে আকবরের আদর্শের কোথাও মিল দেখতে পাও কি?

৪। অভিনয়ের আসর॥ "মরাঠা বহ্নি" নাম দিয়ে রাজা শিবাজীর একটি জীবনালেখ্য রচনা করে সেটি অভিনয়ের ব্যবস্থা কর। নাটিকার পাত্রগণ: শিবাজী দাদাজী কোণ্ডদেব, আফজল খাঁ' ঔরঙ্গযেব, গুরু রামদাস, শম্ভাজী, সৈন্যগণ।

৫। আবৃত্তির আসর। 'শিবাজী-উৎসব' এবং 'প্রতিনিধি'—রবীন্দ্রনাথ।

৬। অভিনয়ের আসর॥ "শ্রীরঙ্গপত্তন" নাম দিয়ে মহীশূরের স্বাধীনতা-রক্ষায় টিপু সুলতানের জীবনদান ঘটনাকে উপজীব্য করে একটি নাটক লেখ। ভূমিকায়: হায়দার, টিপু, মঁসিয়ে লালী, ইংরেজ সেনাপতিবৃন্দ, সৈনিকগণ। তোমাদের তৈরী বেশভূষা, অস্ত্রশস্ত্র, দৃশ্যপট ইত্যাদি যেন যুগোপযোগী হয়।

৭। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে সমাজের চেহারা কিরকম ছিল তার বর্ণনা দাও। আমাদের দেশের এমন একটি বহু-প্রচলিত ঘুমপাড়ানি গানের উল্লেখ কর যার মধ্যে বর্গীর হাঙ্গামার বিভীষিকা অমর হয়ে আছে।
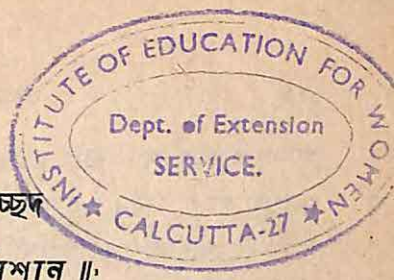
ষোড়শ পরিচ্ছেদ

॥ *ব্রিটিশ জয়-নিশান* ॥

নাটকীয় পটভূমিকা

১৪৯৮ সাল। নীল সাগরের বুক চিরে চলেছে একটি জাহাজ। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে প্রধান নাবিক। হাতে দূরবীণ, চোখে নতুন দেশ দেখার স্বপ্ন। বন্য, অসভ্য আফ্রিকার আদিম প্রকৃতির রোষ-কষায়িত ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে জাহাজ এগিয়ে চলেছে 'সোনার ভারতের' দিকে। পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা এসে পৌছলেন দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমোপকূলে কালিকট বন্দরে। ভারতের ঐশ্বর্য যুগে যুগে প্রলুব্ধ করেছে অভিযাত্রীদের। স্থলপথে পণ্যসম্ভার গেছে ইউরোপে, আফ্রিকায়। সেই ঐশ্বর্যের লোভ, স্বর্ণশস্তের মোহাঞ্জন চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে বিভিন্ন বণিকগোষ্ঠীকে। এল পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজ। রঙ্গমঞ্চের এক এক অভিনেতা। দক্ষিণ ভারত হল পটভূমিকা। দৃশ্যান্তরে বাংলাদেশ। শুরু হল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অর্থলোলুপতার মসীলিপ্ত ইতিহাস। ক্ষমতা বিস্তারের স্বার্থোদ্ধত সংগ্রাম। দিনেমার, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ ও অন্যান্য বণিক-সংস্থা নাটকের প্রথম অঙ্কেই প্রস্থান করল। প্রধান ভূমিকায় রইল ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী **ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী**। পার্শ্ব চরিত্রে ফরাসী বণিককুল।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের পৃষ্ঠপোষকতা ইংরেজ কোম্পানীকে দিল বাণিজ্যের স্বর্ণ সুযোগ। কুঠী স্থাপন করল পশ্চিম ভারতের সুরাটে। ধীরে ধীরে ভারতের বিভিন্ন অংশে গড়ে উঠল তাদের বাণিজ্যকুঠি। মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, বাংলাদেশ হয়ে উঠল বাণিজ্যকেন্দ্র। পুরানো তিনটি গ্রাম নিয়ে পত্তন হল আজকের কল্‌কাতার ইংরেজ প্রভুত্ব বিস্তারের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইলেন **জব চার্ণক**।

ফরাসী বনাম ইংরেজ

ফরাসী বণিক সংস্থাও নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল না। চন্দননগর, পণ্ডিচেরী মাহে, কারিকল হয়ে উঠল তাদের বাণিজ্যকেন্দ্র। দুই কোম্পানীর বাণিজ্য চলতে লাগল সারা ভারত জুড়ে। কিন্তু লাভ আর লোভ তাদের পাগল করে তুলল। লাগল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। ভারতের রাজধানীর আবর্তে তারা বাঁধা পড়ল। ভারতের ভাগ্যাকাশে দেখা দিল দুর্যোগের ঘনঘটা। তার

শ্যামল প্রান্তরে ফুটে উঠল রক্তের আলপনা। কালের চাকা ঘুরল—সময়ের সুতোয় পড়ল টান। ভারতের ভাগ্যবিধাতা হল ইংরেজ। বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ধ্বংসাবশেষের ওপর ইংরেজের বিজয়কেতন উড়ল ভারতের বুকে।

দক্ষিণ ভারতে ফরাসীরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে দেখে ইংরেজরা শঙ্কিত হয়ে উঠল। ফরাসীরা ভারতের রাজনৈতিক দৌর্বল্যের সুযোগ গ্রহণ করে একদল ভারতীয় সৈন্য গঠন করার দিকে নজর দেয়। উদ্দেশ্য ভারতে প্রভুত্ব বিস্তার। বিচক্ষণ নেতা **ডুপ্লে** ফরাসীদের জয়ী করলেন **প্রথম কর্ণাট যুদ্ধে**। ইংরেজেরা **রবার্ট ক্লাইভের** নেতৃত্ব পেয়েও প্রথমবার পরাজিত হয়। মোগল সাম্রাজ্যের পতনে ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিপর্যস্ত, মারাঠারাও গৃহবিবাদে পঙ্গু—এই রাজনৈতিক পটভূমিতে পর পর তিনটি কর্ণাট যুদ্ধ হয়ে গেল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুদ্ধে জয়ী হল ইংরেজরা। ফরাসী শক্তি মাথা নত করল ইংরেজদের কাছে। একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে ইংরেজ কোম্পানী তখন সর্বেসর্বা। ডুপ্লের অপসারণ আর যোগ্য নেতার অভাব ফরাসী শক্তিকে করল মেরুদণ্ডহীন।

স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত

"ব্রিটিশের ছল চলিল এবার, চারিদিকে আঁধিয়ার
সুড়ঙ্গ কাটি বাংলার মাটি করি নিল অধিকার।"

ঔরঙ্গযেবের দেওয়ান মুর্শিদকুলিখাঁ ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করতে থাকেন। তাঁর সময় থেকেই মুর্শিদাবাদ সকল ঘটনার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠে। মুর্শিদের পর আলিবর্দী সরফরাজ খাঁকে পরাস্ত করে বাংলার মসনদ অধিকার করেন; নবাব আলিবর্দী মৃত্যুকালে দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করে যান। সিরাজ সেই অভিশপ্ত সিংহাসনে বসলেন। তাঁর চারপাশ ঘিরে রইল বেইমান কুচক্রীদল। তাঁর মাত্র বৎসরকাল রাজত্বের সময়টুকু কাটল বিদ্রোহ দমনে, যুদ্ধবিগ্রহে; বাংলা বিহার-উড়িষ্যার পথে-প্রান্তরে-পর্বতে। সিংহাসনের লোভে পড়ে তাঁর পরম-আত্মীয়রাও বিদেশী কোম্পানীর সঙ্গে চক্রান্ত করতে এগিয়ে এল। স্বার্থান্ধ মীর-জাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ,উমিচাঁদ সবাই ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সোনার বাংলাকে ছারখার করে দিল। ক্লাইভ বিজয়ী বীরের দর্প এবং দম্ভ নিয়ে বাংলার মসনদ তুল্‌লেন নিলামে। হাত-বদল হতে লাগল বাংলার সম্পদ। বাঙালীর ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌ল ইংরেজ। **পলাশী রণাঙ্গন** লাল হল বাঙালীর রক্তে

(১৭৫৭ খৃঃ)। অভীষ্ট সিদ্ধির পথে আর একটি দৃঢ় পদক্ষেপ করল ইংরেজ। এই হল ভারতে **ইংরেজ রাজত্বের প্রথম স্তম্ভ ;** ক্লাইভ তার নির্মাতা। বাদশাহ্ **শাহ্ আলমের** কাছ থেকে তিনি নিলেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী। ওলন্দাজ শক্তিকে পরাস্ত করে বৃটিশ সাম্রাজ্যসৌধকে তিনি যোগ্য স্থপতির মত আকাশচুম্বী করে তুল্লেন। কিন্তু কূটনীতিজ্ঞ, চতুর ও বুদ্ধিমান ক্লাইভ ভারত-বাসীর বা তাঁর স্বদেশের মানুষেরও সমর্থন কোনদিন পাননি। তাই অপমান ও আত্মধিক্কারে ব্রিটিশ ভারতের 'মুকুটহীন প্রথম সম্রাট' ক্লাইভের শোচনীয় পরিণতি হয় আত্মহত্যায়।

ব্রিটিশ সিংহের থাবা

ইংরেজ-বিজয়ের প্রথম অধ্যায়ের হল শেষ। এলেন **ওয়ারেন হেষ্টিংস।** ভারতের ইতিহাসে একটি কু-গ্রহ। ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, অত্যাচার, অবিচার, মন্বন্তর তাঁর শাসনকালকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি, বাংলা ১১৭৬ সালের দেশব্যাপী শোচনীয় দুর্ভিক্ষ, শস্যহানি আর প্রজাদের মধ্যে হাহাকার—এসব সত্ত্বেও কোম্পানী তার শাসন প্রতিষ্ঠা করল কী করে—এটাই বড় প্রশ্ন। শাসন ব্যবস্থাকে সচল রাখতে হলে অর্থ নৈতিক বনিয়াদকে শক্ত রাখতে হয়। তাই হেষ্টিংস এসেই অর্থসংস্কারে মন দিলেন। ছলে, বলে, কৌশলে অর্থসংগ্রহ চলল। অযোধ্যার নবাবের পিতামহী ও মাতার ধনাগার লুণ্ঠন করে চৈৎসিংহের ওপর অত্যাচার, রোহিলাখণ্ড জয়ে সাহায্যের দালালি, আর বাংলার নবাব ও মোগল সম্রাটের বৃত্তি-রোধ ইত্যাদি নানা ফিকিরে রাজকোষ পূর্ণ করলেন তিনি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর হেষ্টিংস লিখলেন হিসেব কষে ঃ "যদিও এ প্রদেশের ⅓ ভাগ লোক মরেছে এবং চাষের চরম অবনতি হয়েছে, তাহলেও ১৭৭০ সালের আদায় ১৭৬৮ সালেরও বেশি। এ ব্যাপার সম্ভব হয়েছে শুধু কড়া চাপে।" বুঝতে অসুবিধা হয় না কিভাবে সে চাপ কোন্ দিক থেকে এসেছিল!

ক্লাইভের গুণের অধিকারী না হয়েও হেষ্টিংস রাজ্যকে দৃঢ় অর্থ নৈতিক বনিয়াদের উপর স্থাপন করলেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ শান্তি বিপর্যস্ত দেখে ইংলণ্ড পার্লামেন্ট ভারত শাসনের জন্য ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে এক আইন প্রণয়ন করলেন। লর্ড নর্থ তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী। এই আইনের নাম **রেগুলেটিং অ্যাক্ট** বা নিয়ামক আইন। এই আইনের বলে হেষ্টিংস হলেন প্রথম গভর্ণর-জেনারেল। তাঁর শাসনকালে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা ও মহীশূরের বিরুদ্ধে ইংরেজ শক্তিকে যুদ্ধ

করতে হয়েছিল। এতে লাভ ছাড়া ক্ষতি হয়নি। গৃহবিবাদে বিব্রত মারাঠাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিতেও হেষ্টিংস কসুর করেননি। কিন্তু রাজ্যজয় হেষ্টিংসের কীর্তি নয়। তাঁর কীর্তি হল ব্রিটিশ ভারতে **সুশাসন প্রবর্তনের চেষ্টা**। দীর্ঘকাল কোম্পানীর চাকুরি করে হেষ্টিংস যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তাই দেশীয় দেওয়ান রেজা খাঁ ও সেতাব রায়কে পদচ্যুত করে রাজস্ব-অফিস মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় নিয়ে এলেন, আর প্রত্যেক জেলায় একজন করে ইংরেজ কালেক্টার নিযুক্ত করলেন রাজস্ব আদায়ের জন্য। জমিদারি নিলামে দিয়ে সর্বোচ্চ হারে খাজনা দিতে যারা স্বীকৃত সেইসব জমিদারকেই তিনি পাঁচ বছরের জন্য জমির মালিকানা স্বত্ব দান করেছিলেন। একেই বলে **পাঁচশালা বন্দোবস্ত**। বিচার বিভাগের সংস্কার হয়ে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল সদর দেওয়ানী আদালত আর সদর নিজামত আদালত। বিদ্যোৎসাহী হেষ্টিংসের কীর্তি আরও দাঁড়িয়ে আছে কলকাতার বুকে—এশিয়াটিক সোসাইটি ও কলকাতা মাদ্রাসা। কিন্তু তাঁর সকল কীর্তি ম্লান হয়ে যায় যখন আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে সরল, তেজস্বী প্রশান্ত এক ব্রাহ্মণের মুখ—সাগরপারের আইন আমদানি করে, জালিয়াতির অভিযোগে যাঁকে বিচারক স্যার ইলাইজা ইম্পে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়েছিলেন। সেই নন্দকুমার, সেই মীরকাসিম, সেই গিরিয়া, উধুয়ানালা, কাটোয়া আজ কোথায়? বিজয়ী বীরের মতো দেশে ফিরলেও আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল হেষ্টিংসকে। দীর্ঘ সাত বছর বিচার চলার পর হেষ্টিংস বৃদ্ধ বয়সে মুক্তি পেলেন। ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপনে **দ্বিতীয় স্তম্ভ** ভারতের মাটিতে দৃঢ়ভাবে বসল।

এরপর অর্থনৈতিক সংস্কারের ও ভূমিবণ্টন ব্যবস্থার কর্ণধাররূপে আমরা দেখিতে পাই **কর্ণওয়ালিসকে**। রাজ্যজয় ও রাজ্যপ্রসারের ব্যাপারে কর্ণওয়ালিসের কৃতিত্ব আমরা ততখানি পাই না যতটা পাই তাঁর শাসন সংস্কারের মধ্যে। তাঁর শাসন সংস্কার ভারতবাসীর পক্ষেও কল্যাণের ছিল। শুধু রাজ্যজয় করে একটা সাম্রাজ্য টিঁকে থাকতে পারে না—তার প্রমাণ ইতিহাস বহুবার দিয়েছে। **রাজ্য সংরক্ষণের** প্রয়োজন সর্বাধিক। সংরক্ষণের প্রথম ধাপ শাসনব্যবস্থার দুর্নীতি দূরীকরণ। অত্যাচার নিবারণ ও উৎকোচ গ্রহণ দূর করতে হলে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন বেতনবৃদ্ধির। তাই কর্ণওয়ালিস বেতনবৃদ্ধির মারফতে কর্মচারীদের দুর্নীতি দূর করার প্রথম প্রয়াস পেয়েছিলেন। রাজস্ব বিভাগ ও বিচার বিভাগ পৃথক করে তিনি শাসনতন্ত্রের দূষিত পরিবেশ দূর করলেন। আইন-আদালতের সংস্কার জনসাধারণের মনে আশার সঞ্চার করল

তাঁর সর্বাপেক্ষা কীর্তি হল রাজস্ব-সংস্কার। হেষ্টিংসের পাঁচসালা বন্দোবস্তের বদলে তিনি চিরস্থায়ী ভাবে জমিবিলির নীতি গ্রহণ করলেন। ইতিহাসে এর নাম **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত** (১৭৯৩ খ্রীঃ)। এর ফলে জমিদারের স্থবিধা হল বটে, কিন্তু চাষীদের বা প্রজাদের স্বার্থ রক্ষিত হল না, আর জমির দাম বাড়লেও রাজস্ব বাড়ল না। ক্রমে ক্রমে এই বন্দোবস্ত ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ল। এর ফলে তৈরি হল ইংরেজের খয়ের খাঁ একদল জমিদার গোষ্ঠী।

দেশের আইন, রাজস্ব ও শাসন-সংক্রান্ত ত্রুটি দূর করতে গিয়ে কর্ণওয়ালিস রাজ্যজয় ও যুদ্ধবিগ্রহ থেকে দূরে সরে রইলেন। কিন্তু তবুও তাঁকে মহীশূরের টিপুর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করতে হল। পরিচালনায় স্থফল পেল কোম্পানী। দক্ষিণ ভারতের জাগ্রত নব-শক্তি স্তিমিত হয়ে পড়ল, আর সেই স্থযোগে ইংরেজরা প্রভুত্ব স্থাপনের পথ করে নিল।

এরপর এলেন **স্যার জন শোর**। কিন্তু তখন ভারতে ইংরেজ কোম্পানী নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে চলেছে। দেশের অভ্যন্তরীণ গোলযোগে মাথা গলানোর বদভ্যাস তারা কমাতে চাইছে—ভবিষ্যৎ শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে। শোরের ঔদাসীন্য আবার দেশীয় রাজ্য নিজাম, মহীশূরের টিপু আর সিন্ধিয়াদের শক্তি সঞ্চয়ে প্রেরণা দিল। কোম্পানীর বিরুদ্ধে আবার তাঁরা মাথা তুলে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

কিন্তু সে স্বপ্ন বেশিদিন তাঁদের দেখতে হল না, এলেন **মারকুইস অব ওয়েলেসলি**। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ইংরেজদের অনুকূল নয়, ভারতীয় রাজন্যবর্গ সম্প্রীতির অভাবে পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ। উত্তরে আফগান আক্রমণের ত্রস্ততা, এদিকে ফরাসী পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা ইংরেজ শক্তিকে এক সঙ্কটময় আবর্তের মধ্যে ফেলে দিল। তাই ওয়েলেসলি এসে যোগ্য নাবিকের মতো কোম্পানীর হাল ধরলেন। তাঁর সামনে রইল দুটি উদ্দেশ্য—ইংরেজ শক্তির প্রশ্নাতীত সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, আর ফরাসী শক্তি বিনাশের মারণযজ্ঞ পরিকল্পনা। পরস্পর-বিবদমান রাজ্যগুলোকে তাই তিনি মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করতে চেষ্টা করলেন। এই মৈত্রীর বলে দেশীয় রাজারা নিজেদের খরচায় একদল ইংরেজ সৈন্য রাখতে পারত, ইংরেজ ছাড়া আর কোন বিদেশী কর্মচারী নিয়োগ করা যেত না, বিনিময়ে ইংরেজ কোম্পানী তাদের রাজ্য রক্ষা করতে বিদেশীর আক্রমণ থেকে। এই বন্ধুত্বের ফাঁদের ঐতিহাসিক নামকরণ হল **অধীনতামূলক মিত্রতা**। আসলে তৈরি হতে লাগল ইংরেজের তাঁবেদার রাজ্য, যারা হুকুম করা মাত্র ব্রিটিশ প্রভুদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে প্রাণপাত করত। হায়দরাবাদের নিজাম,

বরোদার গায়কোয়াড়, অযোধ্যার নবাব, পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও, সিন্ধিয়া, ভোঁসলা প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের রাজারা ইংরেজের বিশাল বক্ষপটে নিরাপদ আশ্রয় আর নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য পাবে বলে এই নীতিকে জানাল সাদর অভ্যর্থনা। ওয়েলেসলির গলায় পড়ল সাফল্যের জয়মাল্য। ভারতে ইংরেজের রাজ্যদখলের ইতিহাসে নির্মিত হল **তৃতীয় স্তম্ভ**। ভারতের পূর্বপ্রান্ত বাংলা থেকে পশ্চিমে দিল্লী এবং দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত ব্রিটিশ সিংহের হুঙ্কার ধ্বনিত হতে লাগল। টিপু সুলতানের পরাজয়ে ইংরেজ আবার পেল নিরুপদ্রব শান্তি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যসৌধের ওপর উড়ল ওয়েলেসলির বিজয় পতাকা।

ওয়েলেসলির পর এলেন কর্ণওয়ালিস, বার্লো, মিণ্টো। কিন্তু যোগ্যতার পরীক্ষায় কেউই ওয়েলেসলির মত কৃতিত্ব দেখাতে পারলেন না। এলেন আর্ল অব ময়রা বা **লর্ড হেষ্টিংস**। দশ বছরের শাসনকাল তাঁর, কিন্তু তাকে পরিণতি দিলেন ব্রিটিশ উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন সার্থক করে। নেপালে বিস্তৃত হল ব্রিটিশ অধিকার। সীমান্ত হল নীরব। পিণ্ডারী দস্যুদের অত্যাচার-জর্জরিত পাঞ্জাব থেকে গুজরাট ভূখণ্ড স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। মারাঠাদের হল পক্ষশাতন, ইংরেজের বিরুদ্ধে পাখা-ঝাপটানোর উপায় আর তাদের থাকল না। লর্ড হেষ্টিংস শুধু রাজ্যবিস্তারে নয়, শাসক এবং বিদ্যোৎসাহী হিসেবেও সুপরিচিত। তার সাক্ষ্য দিচ্ছে কলকাতা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা, সমাচার-দর্পণ ও বাঙ্গালা গেজেট প্রকাশ। কর্ণওয়ালিসের আইন রদ করে, মাদ্রাজে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে তিনি আরও স্মরণীয় হয়ে রইলেন। তিনি যখন ভারত ছেড়ে গেলেন তখন দেখে গেলেন ইংরেজের নিশান আরও অনেক দূরে উড়ছে। হিমালয় থেকে কুমারিকা, ব্রহ্মপুত্র থেকে শতদ্রুর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে শুনলেন ইংরেজের সাফল্যের জয়ভেরী। ভারতের মুখরিত আকাশ-বাতাস তাঁকে জানালো বিদায়, শুভবিদায়।

লর্ড হেষ্টিংসের পর ভারতের ভাগ্যাকাশে আর এক ইংরেজ জ্যোতিষ্ককে দেখি সমাজ-সংস্কারের উজ্জ্বল জ্যোতি বিকিরণ করতে। ব্যয় সঙ্কোচ ও আয় বৃদ্ধি করে কোম্পানীর লাভের ঘরে তিনি অনেক দাগ কাটলেন। রাজ্যজয়ের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় নন। কাছাড় আর কুর্গ তাঁর মুকুটের দুটি মাত্র মণি, কিন্তু বাংলার সমাজ, বাঙালী ঘরের নির্যাতিতা বোনেরা তাঁকে কোনদিন ভুলবে না। যখন ধর্মের দোহাই দিয়ে, মৃত স্বামীর জলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিতে বাধ্য করা হত সদ্যোবিধবা তরুণীদের, সংস্কার-সর্বস্ব হিন্দুসমাজের সেই চরম নিষ্ঠুরতা দেখে কেঁদে উঠল তাঁর অন্তর। আইন করে বন্ধ করলেন তথাকথিত **'সতীদাহ'**। তাঁর আর এক কীর্তি হল ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন। শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় অর্থ

ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এগিয়ে এলেন ব্রাহ্মমুকুটমণি রাজা রামমোহন—চিরকালের বিদ্রোহী রামমোহন। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল মানব-কল্যাণের মূর্ত প্রতীক মেডিক্যাল কলেজ। জাতিধর্ম নির্বিশেষে যোগ্য ভারতবাসীরা উচ্চ রাজপদে নির্বাচিত হতে লাগল। কীর্তিমান হয়ে রইলেন বেন্টিক—**লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক**।

তারপর এলেন **লর্ড ডালহৌসী**—ইংরেজ রাজত্বে **চতুর্থ স্তম্ভ**। তাঁর শাসনকাল কোম্পানীর রাজ্যজয় আর রাজ্যবিস্তারের ইতিহাসকে মুখর করে রেখেছে। ভারতে আধুনিক যুগের প্রবর্তক হিসাবে তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিচয় দিয়েছেন তা স্মরণে রাখার মত। রাজ্যজয়ের প্রথম ধাপে তিনি এক চমৎকার কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। **স্বত্ববিলোপ নীতির** আওতায় তিনি বহু রাজ্য গ্রাস করে কোম্পানীর অধিকারের পরিধি বাড়িয়ে দেন। অপুত্রক অবস্থায় কোন দেশীয় রাজ্যের রাজা মারা গেলে সেই রাজ্য তাঁর দত্তক পুত্র না পেয়ে কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হতে লাগল। দেশীয় রাজ্যের ও সামন্ত রাজ্যের নৃপতিবর্গের মধ্যে ধূমায়িত হল অসন্তোষের আগুন; অন্যদিকে প্রজাসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক।

বিদ্রোহ বহ্নি ঃ ১৮৫৭

রাজনৈতিক পটভূমিতে যখন আতঙ্ক অসন্তোষ আর বিদ্বেষ, সামাজিক পটভূমিতেও সংস্কারগ্রস্ত মানুষ টেলিগ্রাফ প্রচলন, রেলওয়ে পত্তন, রাস্তা নির্মাণ, হিন্দু-মুসলমান ও ইংরেজের মধ্যে ব্যবহার-বৈষম্য, মিশনারীগণ কর্তৃক খৃষ্টধর্ম প্রচার, বিধবা বিবাহ আইন—ইত্যাদি নতুন নতুন ভাবধারায় হতচকিত। অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে তখন ব্যয়সঙ্কোচ নীতির প্রাবল্য। সব দিক দিয়ে জনসাধারণের মনে নিরাপত্তার অভাব। এই সময় আবার ইংরেজ পল্টনে সিপাহীদের মনেও দেখা দিল তীব্র বিক্ষোভ। সাদা চামড়া আর কালো চামড়ার ভেদ, ব্রহ্মদেশে যুদ্ধের সাজ সাজ রব, এন্‌ফিল্ড রাইফেলের প্রচলন—সব মিলিয়ে জ্বালা ধরে গেল তাদের মনে। আঠারোশ' সাতান্ন সালে **সিপাহী বিদ্রোহ** চিহ্নিত হয়ে রইল ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। ইংরেজ শাসনের শৃঙ্খল ছিন্ন করার দুর্দমনীয় আগ্রহ, শাসক শক্তির বিরুদ্ধে মুক্তি আন্দোলনের প্রথম প্রয়াস। ইতিপূর্বে ভারতের বুকে অনেক ছোটখাট আন্দোলন হয়েছে—সন্ন্যাসীরা বিদ্রোহ করেছে, বাঁশের কেল্লা গড়ে লড়াই করেছে তিতুমীর, সাঁওতালরাও এগিয়ে এসেছে মহুয়া-মাতাল পরিবেশ ছেড়ে; কিন্তু সেই সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্ধ আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়তে

পারেনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। তাই ব্যর্থ হয়েছে সে সব আঞ্চলিক বিক্ষোভ। এবার কিন্তু বাংলার মাটি থেকে দ্বীপ জ্বালালো মঙ্গল পাণ্ডে, দেখতে

দেখতে সে দীপশলাকা ছড়িয়ে পড়ল ঝাঁসী—সাতরা—নাগপুর। বিদ্রোহীরা অমিত বিক্রমে লড়ল ইংরেজের বিরুদ্ধে। মোগল বাদশাহ্ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে তারা স্বাধীন সম্রাট বলে স্বীকার করে তাঁর পতাকাতলে ইংরেজ-নিধন যজ্ঞে আহুতি দিতে সমবেত হল। বাদশাহের কণ্ঠে ধ্বনিত হল আশাব্যঞ্জক উক্তি ঃ

> "গাজীয়োঁ মেঁ বূ রহেগী জব্ তলক্ ইমান কী।
> তব তলক্ লণ্ডন তক্-চলেগী তেগ্ হিন্দুস্থান কী"

—'বীরদের মধ্যে যতদিন আত্মপ্রত্যয়ের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকবে, ততদিন হিন্দুস্থানের তলোয়ার (শক্তি) লণ্ডন পর্যন্ত ছুটবে।' দীর্ঘকাল ধরে চল্‌ল সংগ্রাম। বীরত্বের রাজটীকা পরলেন কুমারসিংহ, তাঁতিয়া টোপী, লক্ষ্মীবাঈ, নানাসাহেব, আহম্মদ উল্লা। "মেরীঝাঁসী নেহী দেঙ্গী"—গর্জন করে উঠলেন রাণী লক্ষ্মীবাই।

কিন্তু আর এক পরাজয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ হল ভারতের ইতিহাসে। অস্ত্রসজ্জা, রণনীতি আর নেতৃত্বের অভাবে ব্যর্থ হল সংগ্রাম। এর সবটাই ব্যর্থ বললে কিন্তু ভুল করব আমরা। সিপাহী বিদ্রোহের একটি গৌরবময় দিকও আছে। এই আন্দোলনকে পরবর্তী কালের সর্বভারতীয় ব্যাপক স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। আমরা ইতিহাসে ইংরেজের বিরুদ্ধে এক 'প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলে অভিহিত করতে পারি কি-না সে বিষয়ে আজ পণ্ডিতমহলে গবেষণার অন্ত নেই। সবার চেয়ে বড় জিনিস যা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় তা হল—'১৮৫৭ সাল ভারতের জনগণের সামনে কোন্ প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত দিয়েছে?' এর উত্তর পেতে হলে আমাদের বহু ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান করতে হবে। জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে এবং ইংরেজের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ১৮৫৭ সাল আর এই মুক্তি-আন্দোলন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ এবং যুগান্তকারী ঘটনা।

শাসনতান্ত্রিক কাঠামো

পলাশীর আম্রকাননে সংগ্রামের শেষ। বাংলার স্বাধীন নবাবীর গৌরব-রবি ভাগীরথী-গর্ভে অস্তমিত। ইংরেজ-সৌভাগ্য-সূর্যের রক্তিমাভায় ভারতের আকাশ উদ্ভাসিত। নবাবী, বাদশাহী শাসনব্যবস্থার কাঠামো ধীরে ধীরে ভেঙে পড়েছে। কোম্পানী তার শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে। শাসন-দণ্ড এবার তাদের হাতে। পলাশী থেকে সিপাহীযুদ্ধ—এই একশ' বছরের ইতিহাস মন্থনে অনেক অমৃত আর হলাহল উঠেছিল।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহ আর বাদশাহী ফরমানের জোরে কোম্পানী এক বাণিজ্য কুঠি (factory house) তৈরী করল সুরাটে। ক্রমে ক্রমে ভারতের বিভিন্ন অংশে তারা কুঠি স্থাপন করে বাণিজ্য শুরু করল। কলকাতা, বোম্বাই আর মাদ্রাজ প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠল। বেসরকারী কোম্পানী বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার লাভ করার আকুল আগ্রহে জড়িয়ে পড়ল এদেশের রাজনৈতিক আবর্তে। ইংলণ্ড-সরকারের অনুমতি তাদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। তাদের বাণিজ্য বিস্তারের পথে যেখানে যেখানে তাদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে সেখানেই বেধেছে সংঘাত। কোম্পানীর সামরিক বাহিনী যোগ্যতার সঙ্গে সে সব সংঘর্ষে জয়ী হয়ে নিজেদের স্বার্থ এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় হয়ে উঠেছিল খুব তৎপর। মোগল বাদশাহ্ **ফরুখ্‌সিয়ারের** আনুকুল্যে ইংরেজ কোম্পানী বাংলাদেশে বার্ষিক করের বিনিময়ে বিনাশুল্কে

বাণিজ্য করার অধিকার পেল ; কিন্তু বাংলার দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ কোম্পানীর জমিদারী কেনার ব্যাপারে বাঁধা দিতে আরম্ভ করলেন। আবার নবাব আলীবর্দীর শিথিলতায় কোম্পানী অবাধ বাণিজ্য করতে লাগল। নবাব হলেন **সিরাজদ্দৌলা**। কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ লাগল। কোম্পানী ভেদনীতির আশ্রয় নিয়ে রাজকর্মচারীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সিরাজকে সিংহাসন-চ্যুত করল। মীরজাফরকে মসনদের লোভ দেখিয়ে কোম্পানী চব্বিশ-পরগনার জমিদারী লাভ করল। তারপর নবাবী গেল **মীরকাশিমের** হাতে। কোম্পানী এবার পেল মেদিনীপুর, বর্ধমান আর চট্টগ্রামের জমিদারী। মীরকাশিম কিন্তু ইংরেজ কোম্পানীর বিনাশুল্কে বাণিজ্যের ব্যাপার বরদাস্ত করতে পারলেন না। দেশীয় বণিকেরা শুল্কভারে জর্জরিত, আর বিদেশী কোম্পানী লাভের অঙ্কে নিজেদের পুষ্ট করতে থাকবে—এই বৈষম্য দূর করতে যাওয়ার পথে কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধল। তার ফলাফল আমাদের অজানা নয়।

ক্লাইভ দক্ষিণ ভারতে যুদ্ধ জয় করে ইংলণ্ড চলে গেলেন। আবার যখন ভারতে ফিরে এলেন, তখন কোম্পানী মোগল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেছে। ক্লাইভ **দ্বৈত শাসন** নীতি চালিয়ে রাজকোষ এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, আর নবাবের ওপর বর্তালো ফৌজদারী ও শাসন বিভাগের নানান্ কাজ। রেজা খাঁ ও সেতাব রায়ের নির্মমতা ও কোম্পানীর কর্মচারীদের অত্যাচারে বাংলাদেশ হতশ্রী হয়ে পড়ল। দুর্ভিক্ষ, অনাচার, কুশাসন বাংলাকে গ্রাস করতে উদ্যত হল। ওয়ারেন হেষ্টিংস দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটিয়ে কিছুটা শৃঙ্খলা আনলেন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ **রেগুলেটিং অ্যাক্ট** (১৭৭৩)-এর বলে বাংলার গভর্ণর-জেনারেল ও চারজন সদস্য নিয়ে এক কাউন্সিল করল। বাংলাদেশের এই কাউন্সিল কোন কোন ক্ষেত্রে বোম্বাই ও মাদ্রাজের কর্তৃত্বও পেল, আর কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল সুপ্রীম কোর্ট।

অতঃপর ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী **উইলিয়ম পিটের** উদ্যোগে নূতন ভারত শাসন আইন লিপিবদ্ধ করা হল। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হিসেবে ১৭৭৩ সালের অ্যাক্টের প্রথম ধারার চারজন সদস্যের বদলে তিনজন করা হল, আর কোম্পানীর কার্যকলাপ পরীক্ষার জন্যে ইংলণ্ডে ছ'জন সদস্য-বিশিষ্ট একটি নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। ইলণ্ডের মন্ত্রিসভা এই সময় থেকে কোম্পানীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ শুরু করে।

এরপর শাসন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য সংশোধন **১৮৩৩ সালের সনদ**। এখন হতে বাংলার গভর্ণর গণ্য হবেন ভারতের গভর্ণর-জেনারেল রূপে ; এবং এই গভর্ণর-জেনারেল তাঁর পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভারত-শাসনের জন্য আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতাও পাবেন। বড়লাটের শাসন পরিষদে একজন আইন-সচিব নিযুক্ত হলেন। আইন-সচিব পদে প্রথম বৃত হলেন লর্ড মেকলে।

সিপাহী যুদ্ধের পর ইংলণ্ড পার্লামেণ্ট ভারতের মত বিরাট দেশের শাসনভার সামান্য এক বণিকগোষ্ঠীর উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তৎকালীন ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৫৮ সালে এক নূতন আইন পাশ করিয়ে ভারত-শাসনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। **মহারাণীর ঘোষণাপত্র** অনুযায়ী ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ভাইসরয় (রাজ-প্রতিনিধি) এই পদমর্যাদায় ভূষিত হলেন। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভায় একজন ভারত-সচিব নিযুক্ত হলেন। দেশীয় রাজাদের অভয়বাণী দেওয়া হল যে তাঁদের রাজ্য গ্রাস করার স্বপ্নও ইংলণ্ডেশ্বরী দেখেন না। কোন ধর্মে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করবেন না। তাঁরা পুরোপুরি ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসক হিসেবে কাজ করবেন এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে যোগ্যতানুসারে সরকারী বা উচ্চপদসকল জনসাধারণই পাবার যোগ্য হবে।

এই আইনের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন আমরা অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতকে পাইনে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরেজ সরকারকে নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আর সেগুলো সমাধান করতে গিয়ে তারা যে কত বিচিত্র ও চমকপ্রদ কৌশল অবলম্বন করেছে, তার সাক্ষী রয়েছে ইতিহাস আর দলিলপত্র।

অনুশীলনী

১। ব্রিটিশ ও ফরাসী—এই দুই বিদেশী শক্তি কী উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে পদার্পণ করেছিল ? নিছক সেই উদ্দেশ্যে বর্তমান যুগে কোন বিদেশী শক্তির পক্ষে ভারতে প্রবেশ করা সম্ভব হবে কি ?

২। পলাশী প্রান্তর বাংলার স্বাধীন নবাবীর সমাধি —ঐতিহাসিক তথ্য সহযোগে আলোচনা কর। [পড়ে নাও : 'পলাশীর যুদ্ধ'—তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।]

৩। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' বইটা থেকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের একটা ধারণা মনের মধ্যে গড়ে নাও। শত মন্বন্তরেও বাঙালী মরে

নি, মরতে পারে না—এ কথা দৃপ্ত ভাষায় কোন্ কবি লিখে গিয়েছেন ঃ কবিতাটি উদ্ধার কর।

৪। সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে লর্ড বেন্টিঙ্কের অবদানের উল্লেখ কর।

৫। রামমোহনকে 'চিরকালের বিদ্রোহী' বলা হয়েছে।—কী কারণে?

৬। "সিপাহী বিদ্রোহকে কেবলমাত্র সৈন্যবিভাগের বিদ্রোহ মনে করা ভুল। এটা দ্রুতপ্রসারিত হয়ে একটি জাতির বিদ্রোহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"

—নেহেরু।

উক্তিটির পক্ষে বা বিপক্ষে তোমার কি অভিমত পেশ কর।

৭। বিতর্কের আসর ॥ বিষয় ঃ "সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের প্রথম স্বাধী-তা সংগ্রাম।" [পড়ে নাও ঃ "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস"—মণি বাগচী।]

৮। মোগল বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ তখন পলিতকেশ বৃদ্ধ, দুর্বল; অথচ বিদ্রোহী সিপাহীরা তাঁকেই নেতা নির্বাচিত করে।—এর কয়েকটি কারণ অনুসন্ধান কর।

৯। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পটভূমিতে ভারতের আর্থনীতিক অবস্থার বিশ্লেষণ কর। এদেশের পুরাতন গ্রামীণ সভ্যতার ধ্বংসসাধন এ বিদ্রোহের জন্য কতখানি দায়ী?

১০। ভারতের শাসনদণ্ড যেভাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ক্রমশ ব্রিটিশ রাজার হাতে চলে যায় স্বাধীন ভারতেও কি ঠিক সেইভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে?

১১। অভিনয়ের আসর ॥ (ক) "পলাশী" নাম দিয়ে একটি নাটক রচনা কর। পাত্রবৃন্দ ঃ সিরাজদ্দৌলা, জগৎশেঠ, মীরজাফর, উমিচাঁদ, ক্লাইভ, ওয়াট্‌সন, মোহনলাল, প্রভৃতি। অভিনয় কালে পোশাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র ও দৃশ্যপট সব তোমরাই তৈরী করবে।

(খ) "মহারাজ নন্দকুমার" শীর্ষক আরেকটি নাটিকা রচনা করে, সেটি অভিনয়ের ব্যবস্থা কর। ভূমিকায় ঃ নন্দকুমার, হেষ্টিংস, মোহনপ্রসাদ, বুলাকিদাস, ইলাইজা ইম্পে।

১২। শিক্ষামূলক সফর ॥ কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল।

১৩। নক্সা-মানচিত্র ॥ (ক) পলাশী রণক্ষেত্রে নবাব ও ক্লাইভের সৈন্য-সমাবেশের নক্সা আঁক বড় চার্টে। (খ) উত্তর ভারতের মানচিত্র এঁকে সিপাহী বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ যে সব স্থানে দেখা দিয়েছিল সেগুলি সন্নিবেশিত কর।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

॥ ভারতীয় অর্থনীতির নব রূপায়ণ ॥

কোন দেশের ইতিহাস পড়তে গেলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর। এই দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী হয় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের সমবায়ে। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ বল্‌তে আমরা ধরব—রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক সকল দিকই। এই দৃষ্টিকোণগুলি এমনই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা সম্পূর্ণ হতে পারে না। রাষ্ট্রিক জীবনে পরিবর্তনটাই যে শুধু ইতিহাসের উপাদান—তা নয়। সকল দিকের পরিবর্তনকেই আমাদের সামনে রেখে যুগের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে হবে। ইংরেজ কোম্পানীর 'রাজদণ্ডের' শাসন আলোচিত হয়েছে। এবার তাদের 'মানদণ্ডের' কথা।

পুরাতনীর সমাধি

ইংরেজ ভারতে আসার পর কিভাবে ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল তা দেখতে গেলে সর্বপ্রথম আমাদের মনে উদয় হয় একটি সমস্যার কথা : ইংরেজের আগেও দেশে বিদেশী শাসন বহুদিন চলেছে, তবুও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আমরা দেখিনি কেন? তার উত্তর খুঁজতে আমাদের বেশি দূর যেতে হয় না। পাঠান, মোগল সবাই সিংহাসনের লোভে এত বেশি আকৃষ্ট ছিল যে তারা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান কী, বা কী হবে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর চেষ্টা করেনি। কিন্তু ইংরেজ আরও চতুর। দেশের ওপর একাধিপত্য বিস্তার করতে হলে জাতির সামগ্রিক জীবনে প্রভাব বিস্তারের প্রয়োজন—সে দিকে নজর রেখে তারা দেশের অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে অগ্রণী হয়ে উঠেছিল। রত্নপ্রসূ ভারতকে তারা কামধেনু মনে করে সকল দিক থেকে চরম শোষণের প্রস্তুতি করছিল। পুরনো অর্থ নৈতিক কাঠামোকে ভেঙে দুমড়ে নতুন করে তা তৈরি করবার উদ্দেশ্য তাদের মনে আশার দীপ জেলেছিল।

ক্ষয়িষ্ণু মোগল সাম্রাজ্যের ধনী সামন্তগোষ্ঠী ধ্বংসোন্মুখ। মধ্যবিত্ত সমাজ মেরুদণ্ডহীন, দেশের দরিদ্র সম্প্রদায় অত্যাচার-জর্জরিত এবং অবিচার-কণ্টকিত। এইরকম এক পরিস্থিতিতে ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী এল। উন্নত তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী। ছল, বল আর কৌশল, কূটনীতির ও সামরিক চাতুর্য তাদের

অপরিসীম। সবার ওপর তাদের সংস্কৃতি ছিল নতুন ধরনের। সব দিক দিয়ে তারা প্রলুব্ধ করল ভারতবাসীকে। বুদ্ধির দৌড়ে তাহা জয়ী হল। এবার শুরু হল জাল বিস্তারের পর্ব।

এই জাল বিস্তারের প্রথম পর্বে ইংরেজ ছিল অত্যন্ত দুর্বল, নিজ দেশের পণ্য আমদানির ব্যাপারে তাদের সামর্থ্য ছিল ক্ষীণ। একমাত্র পশম ছাড়া তাদের এদেশে বাণিজ্য করার মত আর কোন সম্পদই ছিল না। আমদানি ছেড়ে তাই এদেশের কাঁচামাল ও তৈরি জিনিসপত্র রপ্তানির জন্যে তৎপর হয়ে উঠল। ইংরেজ কোম্পানী তার কুক্ষিগত অন্যান্য উপনিবেশ থেকে অর্থসংগ্রহ করে ভারতের মাল কিনতে শুরু করল। তাদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব বাণিজ্যের ব্যাপারেও তাদের সহায়তা করল অনেক। তারা একচেটিয়া অধিকারের প্রশ্ন তুলে ভারত-সম্রাট বা বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসনকর্তার মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করছিল। বিদেশী কোম্পানী তখনও দেশের লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করতে সমর্থ হয়নি, তাই তারা এদেশের লোক নিযুক্ত করে তাদের মাধ্যমেই ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে লাগল। এদেশের 'দালাল' ও পাইকার—এই দু'শ্রেণীর লোকেরা দাদন দিয়ে দেশের লোকের কাছ থেকে জিনিসপত্র সংগ্রহ করে কোম্পানীকে সাহায্য করতে লাগল। শেঠ ও বসাকেরা সুতানটিতে প্রাধান্য লাভ করল ১৭৫১-৫২ সালের দাদনি-বণিকদের মধ্যে রামকৃষ্ণ ও লক্ষ্মীকান্ত শেঠ, শোভারাম বসাক, উমিচাঁদ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এদেশের উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্য হিসেবে কাপড়ই ছিল প্রধান এবং এর আদর ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ছিল। তাই তাঁতীদের সঙ্গে কারবার করতে এগিয়ে এল ইংরেজ কোম্পানী তার দালাল আর গোমস্তাদের নিয়ে। একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার পেয়ে কোম্পানীর কর্মচারীর তাঁতীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার ও শারীরিক নির্যাতন চালাতে শুরু করল। তাদের রক্ত-জল-করা শ্রমে যে জিনিস উৎপন্ন হত তার মজুরি বাঁধার অধিকার তাদের ছিল না; দাদন দিয়ে তাদের সে অধিকার কেড়ে নেওয়া হত। তাই তাদের তৈরী জিনিসের দাম বাঁধত কোম্পানীর লোক। সে দাম যদি তারা না নিত তাহলে বিনিময়ে সইতে হত বেত্রাঘাত। এটাই শেষ ব্যবস্থা নয়, এর পরে আরও ছিল। তার কাছ থেকে ভবিষ্যতে মাল নেওয়া হবে না—এ হুমকি দিয়ে তাকে অন্য সহ-ব্যবসায়ীর থেকে আলাদা করে রাখত। বাজারে কোম্পানীর একাধিপত্য, সুতরাং বুঝতেই পারছ, দেশীয় উৎপাদনকারীরা পেটের দায়ে অল্পমূল্যে অর্ধমূল্যে কোম্পানীর কাছে জিনিস বিক্রি করতে বাধ্য হত। কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের অত্যাচারে উত্যক্ত হয়ে বহু তাঁতী

তাদের ব্যবসা ছেড়ে ধীরে ধীরে কৃষক ও মজুর শ্রেণীতে পরিণত হতে লাগল ; এদিকে তাঁতের শিল্পজাত দ্রব্যে ইংরেজ কোম্পানী লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা পেল।

বাংলার বয়ন শিল্পের ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় দেখা দিল **ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের** পর। নতুন নতুন কল, উন্নত যন্ত্রপাতির কৌশল আর উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনে ভারতের বাজারে ইংলণ্ডের বস্ত্র আমদানি হতে লাগল। বিলিতি কাপড়ের তুলনায় এদেশের কাপড় দামে অনেক চড়া বলে প্রতি-দ্বন্দ্বিতাত টিঁকতে পারল না। আবার কাঁচামাল হিসেবে এদেশ থেকে তুলা রপ্তানি করতে শুরু করেছিল কোম্পানী। সব দিক মিলিয়ে বাংলার সর্বপ্রধান শিল্প—বয়ন-শিল্প—ধ্বংস হয়ে গেল। বাঙালীর অর্থনৈতিক জীবনে দুর্দিন নেমে এল। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও কোম্পানীর নীতি এই একই ছিল। ভারতকে কৃষিপ্রধান অঞ্চলে পরিণত করে তার সম্পদ নিংড়ে নেওয়ার নেশা ইংরেজ কোম্পানীকে যেন পেয়ে বসল। চাষীর জীবন বরণ করতে বাধ্য হল ভারতবাসী।

কিন্তু এই চাষীর জীবনেও কি শান্তি ছিল ? মোটেই না। ভারতের নিজস্ব সমাজব্যবস্থা আর গ্রামীণ অর্থনীতি তাকে দীর্ঘকাল ধরে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী করে রেখেছিল। কিন্তু তাতেও ভাঙন ধরল। ইংরেজ কোম্পানীর শোষণের জাঁতাকলে পড়ে দেশের সাধারণ মানুষ পিষ্ট হতে লাগল। আত্ম-নির্ভরশীল, স্বয়ংস্পূর্ণ যে গ্রাম্যসমাজ সমবায় প্রথার ওপর ভর করে চলছিল, তার ভিত্তিমূল ক্রমশ শিথিল হতে লাগল। কোম্পানীর জমি বিলি বণ্টন ও রাজস্ব নির্ধারণ ব্যাপারে বার বার প্রভেদ এবং পরিবর্তন আসার ফলে কোন ব্যবস্থাই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারছিল না। একদিকে যেমন মুনাফালোভী জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছিল ; অন্যদিকে তেমনি মধ্যস্বত্বভোগী একদল অত্যাচারী সম্প্রদায়েরও প্রভাব বাড়ছিল। অর্থকে কোম্পানী সামাজিক জীবনের মানদণ্ড রূপে গ্রহণ করার ফলে দেশের পুরানো সমাজব্যবস্থায় ঘুণ ধরতে থাকে।

মানুষের সমাজ-জীবনের এই পরিবর্তন সমাজের অর্থনৈতিক জীবনকে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত করল। রাজা—জমিদার—প্রজা—সকলেই মিলে সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে অংশীদার ছিল। রাজার ভূমিকা ছিল রাজস্ব আদায়ের, জমিদারের কাজ প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা সংগ্রহের, আর প্রজা বা কৃষক শ্রেণী মাটীর বুক থেকে ফসল নিয়ে জমিদারকে খাজনা দিতে আসত। রাজস্ব বা খাজনা ঠিক হত আপোষে। গ্রামের উৎপন্ন শস্যের ওপরে নির্ভর করত

রাজার রাজস্ব। বছর বছর নির্দিষ্ট হারে খাজনা দিয়ে গেল কৃষক বংশানুক্রমে জমির স্বত্ব ভোগ করতে পারত; জমি বেদখল হয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকত না।

কিন্তু ইংরেজ কোম্পানী যখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী পেল তখন থেকে সে তার নিজের মত করে জমি বিলি করা ও রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে জমিদারের জমি বিলি করা হল। তাদের উদ্দেশ্য একটি—রাজস্ব বৃদ্ধি। যে সময়ে যেমন করে রাজস্ব বাড়ানোর সুযোগ তারা পেয়েছে সে সময় পাঁচসালা থেকে দশসালা, দশসালা থেকে চিরস্থায়ী ইত্যাদি সব রকম ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছে। এই নীতির ফলে দেশের প্রাচীন জমিদারগোষ্ঠী লুপ্ত হয়ে বিত্তশালী নতুন জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। যখন যে গ্রাম বা অঞ্চল যে জমিদারের হাতে পড়েছে তখন সে জায়গায় রাজস্ব বা আদায় তাঁর মর্জির ওপর নির্ভর করেছে। প্রজার ওপর দরদ বা সহানুভূতির নামগন্ধ নেই, শুধু উৎপীড়ন, আর অত্যাচার। মানবিক যে কোন আবেদন তাদের দুয়ারে বার বার মাথা কুটে ফিরে এসেছে। স্বার্থান্ধ অত্যাচারী এই জমিদারগোষ্ঠীর নীচ মনোবৃত্তি আর বিলাসের বলি হয়েছিল কৃষক। সভ্যতার ইতিহাসকে এই সব জমিদারকুল বারবার কলঙ্কিত করেছে নিজেদের উদ্ভাবিত জঘন্য কৌশলে। তাই বার বার এদের মর্জির মধ্যে পড়ে দেশের প্রজাদের যাতে সর্বনাশ না হয় সেজন্য কর্ণওয়ালিশ **চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের** ব্যবস্থা করলেন। প্রবর্তিত হল 'সূর্যাস্ত আইন'। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হল কৈ! তৈরী হল আর এক অত্যাচারী সম্প্রদায়—**মধ্যস্বত্বভোগীদের**। জমিদার সৃষ্টি করলেন মেজাজী অকর্মণ্য প্রজা-শোষক-গোষ্ঠী, যারা চাষীর জীবনের সমস্ত সুখশান্তি কেড়ে নিল। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-বারানসী হল এই সব মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলাস বাসনের কেন্দ্রস্থল।

দক্ষিণ ভারতে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিবর্তে প্রচলিত ছিল রায়তওয়ারী মহালওয়ারী বন্দোবস্ত। প্রজাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বন্দোবস্তের ফলে পুরানো ধারায় পরিবর্তন হতে লাগল। রাজস্ব গেল বেড়ে। কৃষকরা চাষবাস লাভজনক নয় দেখে কাজ ছেড়ে দিতে লাগল। পিছনে তাদের সরকারী অত্যাচার তো আছেই। কৃষির অধঃপতন ত্বরান্বিত হল। দক্ষিণ ভারতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

ইংরেজ কোম্পানীর এই রাজস্ব বৃদ্ধি ও জমি-বিলি ব্যবস্থা গ্রাম্যজীবনের সুখ-শান্তি কেড়ে নিল। গ্রামের নিরালোক শূন্যতা জমিদারের প্রাণে আর সাড়া

জাগলো না। শহরের নতুন আলোর ঝলমলানি তাদের অন্ধ করল। বিলাসের সকল উপকরণ ছড়ানো রয়েছে শহরের পথে পথে. তাই একে একে তারা শহরবাসী হয়ে উঠতে লাগল। গ্রামের ধ্বংসস্তূপ থেকে জন্ম নিল নগর। হাজার হাজার গ্রাম জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে শেয়াল-কুকুরের আবাসে পরিণত হল। গ্রামের বিভিন্ন বৃত্তিজীবী আপন পেশা ত্যাগ করতে বাধ্য হল ইংরেজের অত্যাচারে। জাত ব্যাবসা ছেড়ে নতুন কাজেও তারা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারছিল না। বেকারের সংখ্যা বেড়ে চল্‌ল। শিল্পের প্রসার তখনও এত দ্রুতবেগে হচ্ছিল না যে বেশি সংখ্যায় লোক সেখানে কাজ পেতে পারে; তাই অলস মস্তিষ্ক-গুলোকে তারা শয়তানের কারখানা বানিয়ে ফেলল। ইংরেজ-সান্নিধ্যে আর তাদের চটক্‌দারী সভ্যতার মোহে একদল লোক আচার-ব্যবহারে, আহার-বিহারে ও পোশাক-পরিচ্ছদে 'সাহেব' হয়ে ওঠার প্রাণান্ত প্রয়াস করছিল। 'আমরা ইংরেজ ধরনে হাসি, জার্মান ধরনে কাশি, আর ফরাসী ধরনে পা ফাঁক করে সিগারেট খেতে ভালবাসি'—এটাই ছিল তাদের কাছে গর্বের। দেশীয় যা কিছু তাই তারা উন্নাসিকের মত পরিত্যাগ করত। হঠাৎ-আসা ইংরেজীয়ানায় বাংলা ডুবুডুবু, ভারত ভেসে যায় যায় এই অবস্থা। ব্রিটিশ-আশ্রিত দেশীয় নৃপতিকুল আরেক নতুন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছিল।

শিল্প—বাণিজ্য—পরিবহণের রূপান্তর

ভারতের কৃষি শিল্প কিভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তার মোটামুটি একটা পরিচয় আমরা পেয়েছি। এবার আমরা আরেক পরিবর্তনের সম্মুখীন হবো, যার প্রভাব আজ সকলেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। বিচিত্র ইতিহাসের গতিতে আজ আমরা এক নতুন শিল্পায়নের পথে এগিয়ে চলেছি। দিকে দিকে সেই শিল্পায়নের জয়গান। এমনকি জাতীয় শিল্প গড়ে তোলার এবং বিদেশী শিল্প জাতীয়করণের জন্য আজ আমরা বদ্ধপরিকর। এই শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্বে বাংলা দেশ ছিল অগ্রণী। ভাগীরথী যত দক্ষিণে এগিয়ে এসেছে মোহনার দিকে ততই তার গুরুত্ব বেড়েছে। তাই ভাগীরথী যেখানে 'হুগলী' নাম নিয়েছে তার দুধারে একদিন বেজে উঠল **কলের বাঁশী**। একটানা বুক-ফাটান চীৎকার করে সে মজুর ডাকতে শুরু করল। কালো ধোঁয়ায় আকাশ গেল ছেয়ে, বাতাস হল বিষাক্ত। বাংলার দুই প্রধান শিল্প পাট আর কাপড়। তাই দুই ধরনের কল বসল। বাংলায় কাঁচামালের প্রাচুর্যে কলগুলোর চাকা ঘুরতে লাগল অবিরাম আর মানুষগুলোও সেই চাকার ঘূর্ণিতে বাঁধা পড়ল।

তারপর এল শিল্পের ক্ষেতে পঙ্গপাল—নীলকর সাহেবরা। তারাও বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে কুঠি তৈরি করে মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে চাষীদের প্রলুব্ধ করল **নীলের চাষ** করতে। প্রথমটা তারা দেখল যেন চাষীদের সকল সুখস্বাচ্ছন্দ্যের স্বর্ণ-সিংহাসনে বসাবে কিন্তু তাদের সাধুতার মুখোস খুলে গিয়ে যেদিন নগ্নভাবে প্রকাশ পেল বর্বরতার নির্লজ্জ রূপ সেদিন চাষী বাঙালী ক্ষেপে উঠল। প্রথম প্রথম ৫॥৹টাকা মণ মণ দরে নীল বিক্রী করতে হত। অল্পায়াসে নীল উৎপন্ন করে নীলকর সাহেবরা দেখল যে তা রপ্তানির যোগ্য নয়। পরে যখন নীলের চাষ দ্রুত উন্নতির পথে তখন কোম্পানী আবার রপ্তানির ওপর কর বসাতে আরম্ভ করল। আগ্রা দিল্লী লক্ষ্ণৌ সর্বত্র নীলের চাষ হতে লাগল। চাষ যেমন-তেমন হোক, সবার ওপর ছাপিয়ে গেল নীলকর সাহেবদের অত্যাচার। কত সাধুচরণ তাদের জুতোর তলায় পিষ্ট হল। আদালত ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে রইল দুর্বৃত্তদের শয়তানির কাছে। দেশের লোককে গোমস্তা করে নিজেদের জেদ বজায় রাখতে নীলকর সাহেবরা মোটেই পিছিয়ে রইল না। ভারতের সর্বত্র হাহাকার পড়ে গেল। চরম অত্যাচারের চাবুক পড়েছিল বাংলাদেশের পিঠে। চোখের জলে ভেসে গান গাইল চাষীরা: "নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারখার।" সেই নৃশংস বর্বরতার কাহিনী মুখর হয়ে আছে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে।

নীলের চাষ ছাড়া **চা কফির চাষ**ও চলতে লাগল। চায়ের চাষ করতে যেসব বিদেশী এগিয়ে এসেছিল তারাও সমাজ-জীবনের মানদণ্ডকে আরও নিচে নামিয়ে দিয়েছে। তাদের অত্যাচারের বলি হয়েছিল বিভিন্ন উপজাতি। দার্জিলিং, আসাম, নীলগিরি অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে তারা ছড়াল রোগের বীজ, আর কল্জে ভেঙে-দেওয়া দুর্নীতির বিষ।

যে নতুন শিল্পায়নের পথে দেশ এগিয়ে যাচ্ছিল তাকে আরও গতি দিল **কয়লা খনির আবিষ্কার** এবং **লৌহশিল্পের প্রসার**। ধীরে ধীরে এই সব শিল্প ও খনিজ সম্পদ আহরণের প্রয়োজনে সংস্কার করা হল **যানবাহন ব্যবস্থার**। যোগাযোগ ও যানবাহন সার্থক শিল্পায়নের প্রথম ধাপ। তাই দেশের সর্বত্র সহজে যাতায়াত ও মালপত্র আনা-নেওয়ার জন্য পাথরের বুক কেটে, বাংলার মেঠো জমির ওপর বাঁধ তৈরি করে **রেলপথের পত্তন** হল। বিসর্পিল রেলের লাইন পড়ল যেন মানুষেরই বুকের ওপর। বিরাট লৌহবর্ত্মের কান-ঝালাপালা-করা বাঁশি যেন আরেক মৃত্যুদূতের মত এগিয়ে এল। গ্রামের যেটুকু প্রাণরস ছিল তাও এবার শুকিয়ে যেতে লাগল; কিন্তু শিল্প দ্রুতবেগে চলতে লাগল প্রগতির পথে। বাইরের জিনিস আমদানিতে গ্রামের হাট বাজার মুখর হয়ে উঠল।

রূপান্তরের দুর্দান্ত বন্যা-গতিকে বাধা দেওয়ার শক্তি রইল না কারও। একের পর এক এই পরিবর্তনের স্রোত ইন্দ্রের ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবার বাধাকেও হার মানিয়ে দিয়েছে।

পরিবর্তনের সূচনা

দেশের অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থার এই পরিবর্তন মানুষ উপভোগ করতে পারত যদি বিদেশীর অধীনতা-পাশে তারা আবদ্ধ না থাকত। পরাধীন মন এর ফল ভোগ করতে পারেনি স্বচ্ছন্দ স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে। পদে পদে মানুষের মনে পড়ে গেছে অতীত জীবনকে। অতীতের সুখস্মৃতি তাদের মনকে এমন এক স্বপ্নভরা মধুর জগতে নিয়ে যেত যে তারা এই সব নতুন ব্যবস্থাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারেনি। তারা ভাবত 'আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে তার আবেগ ; তাতে আছে গতির আনন্দ, নেই যতির আয়েস।' তাই দীর্ঘকালের অভ্যস্ত এক ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন তাদের সামনে অগ্রগতির ও উন্নতির সোনালী সূর্যকে সম্ভব করেনি।

কিন্তু তাই বলে পরিবর্তন বসে থাকেনি। আপন খাতে তার ধারা বয়ে চলেছে দিকে দিকে। বিজ্ঞানের সম্ভাবনা আর যন্ত্রদানবের শক্তি দুয়ে মিলে সভ্যতার নতুন ইতিহাস রচনা করেছে। চলিষ্ণু জীবন-ধর্মের মূল কথা 'চরৈবেতি'—এই সত্যকে বজায় রেখে আজও বিজ্ঞান কাজ করে চলেছে অনাগত ভবিষ্যতের সুখ-কল্পনায়। বিজ্ঞানের যুগে এই সভ্যতা মানুষকে শান্তি দিক, কল্যাণ আর মঙ্গল এনে দিক তার জীবনে। বিভেদ, নীচতা, উৎপীড়ন আর অশান্তির অমারাত্রি বিদূরিত হোক। নূতন পরিবর্তনের প্রসন্ন প্রভাতসূর্য তার দারুণ দীপ্তি নিয়ে প্রাচ্যের আকাশে কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে যাক।

অনুশীলনী

১। (ক) ইংরেজের আগমনে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার বিপুল পরিবর্তন ঘটেছিল।

(খ) ইংরেজের আগেও ভারতে বিদেশী শাসন বহুদিন চলেছে, তবুও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি।

— সমস্যাটির সম্ভাব্য উত্তর অনুসন্ধান কর।

২। “একজন ইংরেজের পক্ষেও একথা ভাবতে দুঃখ হয় যে, কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পর জনসাধারণের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়েছে।”—মুর্শিদাবাদের ইংরেজ কর্মচারী বেচার (১৭৬৯ খৃঃ)।

জনগণের এই আর্থিক দুরবস্থার কারণ কী? বাংলাদেশে ১৩৫০ বাংলা সনে যে দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সেই ‘পঞ্চাশের মন্বন্তরের’ কারণের সঙ্গে ‘ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের’ কারণের কোথাও মিল আছে কি? [পঠিতব্য পুস্তক : ‘আনন্দমঠ’—বঙ্কিমচন্দ্র ; ‘পঞ্চাশের মন্বন্তর’—শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।]

৩। (ক) “এই সুন্দর দেশ…ইংরেজ শাসনের ফলে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই ধ্বংসের একটি প্রধান কারণ দেশব্যাপী শিল্পের ওপর কোম্পানীর একাধিপত্য।”—বেচার।

(খ) “আমি স্বীকার করি না যে ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ ; কৃষি ও শ্রমশিল্প সমভাবেই তার ছিল।”—মণ্ট্‌গোমারি মার্টিন।

এই উক্তি দুটির আলোকে বাংলার হস্তচালিত বয়নশিল্পের শোচনীয় পরিণতির কারণগুলি বিশ্লেষণ কর। বর্তমান কালে তাঁতশিল্পীদের অবস্থা কিরূপ? আমাদের জাতীয় সরকার এ সম্পর্কে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন।

৪। কর্ণওয়ালিশ-প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভাল-মন্দ বিচার কর। স্বাধীন ভারতে এবিষয়ে কী বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে? “লাঙ্গল যার জমি তার”—এর অর্থ কী?

৫। আমাদের আলোচনা থেকে এমন একটি উক্তি খুঁজে বার কর যা থেকে বোঝা যায় দেশের শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে নদনদীর গুরুত্ব কত বেশি।

৬। সার্থক শিল্পায়নের প্রথম ধাপ যোগাযোগ যানবাহন।—এর তাৎপর্য কী?

৭। একটা দেশের অর্থনীতিক ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটলে তার সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন হতে বাধ্য। একথা তুমি স্বীকার কর কি-না?

৮। বিতর্কের আসর ॥ “রেলপথের প্রবর্তন ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছে।”

৯। শিক্ষামূলক সফর ॥ বীরভূমের শ্রীনিকেতন অথবা যে কোন বয়ন-শিল্পের কেন্দ্র।

———

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

॥ সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয় ॥

জমাট ঘুম চট্ করে ভাঙে না। হৈ চৈ হল্লায় ঘুম ভাঙলেও শয্যাগত

আলসেমি কাটে না। ঘরের আগুনে পিঠ পুড়ে গেলেও ফিরে শোবার অভ্যাস তো আছেই।

একটা জাতির জীবনে দীর্ঘ নিদ্রার জড়তাও চট্ করে ভাঙে না।

জাতির জীবনে নিদ্রাটা কী? যা চলে আসছে তাতেই গা ঢেলে দেওয়া, লোকাচার-কেই পরমধর্ম বলে মেনে নেওয়া, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের অভাব, দৈববাদ ও নিষ্ক্রিয়তা—এ সবই নিদ্রার লক্ষণাক্রান্ত। অবশ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই নিদ্রাকে গাঢ় করে তুলতে অনেকটা সাহায্য করে তা বলাই বাহুল্য।

১৭৫৭, ২৯শে জুন। ক্লাইভ মাত্র দুশো গোরা সৈন্য আর পাঁচশো দেশী সেপাই নিয়ে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করলেন। পথের দুধারে হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে এই শোভাযাত্রা দেখল ভীতচকিত দৃষ্টিতে। ক্লাইভ বলেছিলেন—'**If they had an inclination to have destroyed the Europeans they might have done it with sticks and stones.**' কিন্তু তা কেউ করেনি। তাদের দেশের জড়তা তখন দেশটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। শোষণ, পীড়ন, দুর্ভিক্ষ, ষড়যন্ত্র—অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের এই হল চিত্র। কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হতে না পেরে আমরা তখন দেবদেবীর অনুগ্রহকে আশ্রয় করেছি সাহিত্যে। কোন নূতন আস্বাদন নেই, শুধু চর্বিত-চর্বণ। সেই মঙ্গলকাব্য, সেই বৈষ্ণব সাহিত্য, সেই শাক্তপদাবলী।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই আমাদের চিন্তার জগতে একটা নূতন দিগন্ত খুলে গেল। এই উন্মোচনের পটভূমিতে ছিল পাশ্চাত্যের কতগুলি বৈপ্লবিক ঘটনা।

পশ্চিমে নূতন প্রভাত

১৭৭৫ সালে **আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম** শুরু হল এবং সে-দেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটল। ১৭৮৮ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান রচিত হল।

এর পরই ১৭৮৯ সালে ইউরোপে আরম্ভ হল **ফরাসী বিপ্লব**। **সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী** সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সে

যখন রাজতন্ত্র আর সামন্তপ্রথা ভেঙে পড়েছে তখন **ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব** শুরু হয়ে গেছে। এই বিপ্লব এসেছে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে। শিল্পের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যে পরিবর্তন বয়ে আনল তা-ই আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করেছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমাজের পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই সময়ে **কার্ল মার্ক্স** 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' নামে এক নূতন মতবাদ প্রচার করলেন এবং এই মতবাদের আলোকে ভবিষ্যদ্‌বাণী করলেন যে, ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ করে শ্রমিকশ্রেণী ক্রমশ সমাজতন্ত্র ও সাম্যতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাবে—অর্থাৎ ক্রমশ এমন সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন হবে যেখানে দেশের কৃষি ও শিল্পের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা লুপ্ত হয়ে যাবে, সমস্ত উৎপাদনের দায়িত্ব নেবে সমাজ, এবং উৎপাদিত সম্পদ সবাই সমানভাবে ভোগ করতে পারবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ইউরোপে নতুন চিন্তার যে ঢেউ জাগল তা ভারতকে দোলা দিয়ে গেল। ইংরেজের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ অবশ্য অনেক আগেই ঘটেছিল, কিন্তু তখন ইংরেজদের মধ্যেই এই প্রগতিশীল চিন্তাধারা ছিল না। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে যে সব ইংরেজ ভারতে এলেন তাঁরাই নবজাগ্রত ইউরোপের প্রাণধারার সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু ভারতের নবজাগরণ সম্ভব হয়েছিল ভারতীয়দেরই সাধনায়—যাঁরা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আলোকে দেশের সমস্যাকে ঠিকমত বুঝে সমাধানের পথ খুঁজে ফিরছিলেন। এই অন্বেষ্টাদের আমরা প্রথমে পেয়েছিলাম বাংলাদেশে। কারণ বাংলাই ছিল ইংরেজ শাসনের প্রাণকেন্দ্র। রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল সংস্কার আন্দোলন। এইদিক থেকে দেখলে ইউরোপের রেনেসাঁস বা পুনরভ্যুদয়ের ইতিহাসে ইতালীর যে স্থান ছিল, বাংলাদেশেরও তাই।

বাংলার ধর্মসংস্কার

এই সংস্কার আন্দোলন প্রথমে শুরু হয়েছিল ধর্মকে কেন্দ্র করে। এতে প্রথম অগ্রণী হয়েছিলেন **রামমোহন রায়** (১৭৭৪—১৮৩৩)। কিশোর বয়সেই তিনি ইসলামী শাস্ত্র ও একেশ্বরবাদ চর্চা করেছিলেন এবং আরবী ভাষায় অনূদিত ইউক্লিড ও অ্যারিস্টট্‌ল পাঠ করেছিলেন।

ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কৈশোরেই তিনি পিতামাতার বিরাগভাজন হয়েছিলেন এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বাস

করিতে বাধ্য হয়েছিলেন। যৌবনের শুরুতে কাশীতে এসে উপনিষদ বেদান্ত ও তন্ত্র অধ্যয়ন করলেন। কৈশোরের একেশ্বরবাদ-বিশ্বাস এবারে আরও দৃঢ় হল। তিরিশের কোঠায় লিখলেন তোহ্‌ফাৎউল মুওহাদ্দীন নামে ফারসী গ্রন্থ। এতে তিনি বল্‌লেন, সব ধর্মের প্রবণতা একেশ্বরবাদের দিকেই, কিন্তু লোকে বিশেষ বিশেষ উপাসনা, সংস্কার আর লোকাচারের দিকে যতই ঝুঁকে পড়েছে, ধর্মে ধর্মে তফাৎ ততই বেড়েছে। বেদান্তের ব্রহ্মবাদকে তিনি বর্জন করলেন মায়াবাদকে বর্জন করে। প্রবল যুক্তিবাদের ভিত্তিতে প্রচার করলেন নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা। ১৮১৫ সালে 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এবং নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার সপক্ষে তত্ত্বালোচনার ব্যবস্থা করলেন। এই সময়ে (১৮১৫-১৮১৭) তিনি বেদান্ত ও প্রধান প্রধান উপনিষদের অনুবাদ করলেন, যুক্তিবাদী ভাষ্যও লিখলেন। সনাতনপন্থীদের বিরোধিতার উত্তরে ইংরেজী ও বাংলায় অজস্র প্রত্যুত্তর তাঁকে রচনা করতে হয়েছে। তিনি যুক্তি দিয়ে শাস্ত্রকে এবং শাস্ত্র দিয়ে যুক্তিকে যাচাই করেছিলেন। যুক্তি ও শাস্ত্রের সমন্বয়েই রামমোহনের মতবাদ প্রতিষ্ঠা। আচারসর্বস্ব ধর্মকে তিনি অনুভবের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন ; "অনুভূতিপর্যন্তং জ্ঞানম্‌" অর্থাৎ জ্ঞান যতক্ষণ অনুভূতি পর্যন্ত না পৌঁছায় ততক্ষণ তাকে জ্ঞান বলা যায় না। এইখানেই রামমোহনের সাধনার বৈশিষ্ট্য।

আত্মীয় সভার তত্ত্বালোচনাই তাঁর নব ধর্মমত প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট বলে না মনে হওয়ায় শিষ্যদের সহযোগিতায় তিনি 'ব্রাহ্মসভা' নাম দিয়ে একটি একেশ্বরবাদী সমাজ গঠন করেন (১৮২৮ সাল)।

রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজের পুরোধা হলেন **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর**। রামমোহন বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য অস্বীকার করেননি। কিন্তু মহর্ষি বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য বর্জন করলেন। এমন না করলে নব্যশিক্ষিতদের মনে যে নাস্তিক্য আর সন্দেহবাদ মাথা চাড়া দিচ্ছিল তাকে ঠেকানো যেত না। 'আত্মপ্রত্যয়' বা Intuitionকেই মহর্ষি প্রমাণ বলতে চেয়েছিলেন। সোজা কথায়—গুরু নয়, শ্রুতি নয়, স্মৃতি নয়, নিজের বিচার-বুদ্ধিতে যা সত্য বলে বোধ হবে তাকেই মেনে নেব।

দেবেন্দ্রনাথের পর ব্রাহ্মসমাজের ভার পড়ে তাঁরই শিষ্য **কেশবচন্দ্র সেনের** উপর। গুরু-শিষ্যের মধ্যে প্রগাঢ় সম্পর্ক সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে মতভেদ ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠল। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে শুধু ধর্মোপাসনার ক্ষেত্র করে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র একে সর্বাঙ্গীণ সমাজ-সংস্কারের কাজে

লাগাতে চাইলেন।* সবার আগে জাতিভেদ তুলে দেবার ব্যবস্থা হল 'ব্রাহ্মণ' ব্রাহ্মদের পৈতে বর্জন করে। দেবেন্দ্রনাথ একে ভাল চোখে দেখলেন না। আর নানা বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তিনি স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করলেন ; এর নাম হল 'ভারতবর্ষীর ব্রাহ্মসমাজ'।

ব্রাহ্মসমাজের পাণ্ডিত্য-পরিশীলিত যুক্তিবাদের যুগেই বাঙালী শুনল দক্ষিণেশ্বরের পাগলা ঠাকুর **রামকৃষ্ণ পরমহংসের** (১৮৩৫-১৮৮৬) আকুল-করা 'মা' ডাক। ইনি করেছিলেন সমন্বয়ের সাধনা। বলতে চেয়েছিলেন, নিরাকার উপাসনার সঙ্গে সাকার উপাসনার কোন বিরোধ নেই, বলতে চেয়েছিলেন, যত মত, তত পথ—যে কোন সাধনার মধ্যে দিয়ে মানুষ একই ব্রহ্মের উপাসনা করে।†

ব্রাহ্মসমাজের এবং পরমহংসদেবের সাধনা এ দুয়েরই যথেষ্ট সমর্থক গড়ে উঠেছিল। **স্বামী বিবেকানন্দ** রামকৃষ্ণের বাণীকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমাজ সংস্কার

বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কার আন্দোলনকে ধর্মসংস্কার আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায়না। যে বোধ রামমোহনকে ধর্মসংসারে নিয়োজিত করেছিল সেই বোধই তাঁকে সমাজ সংস্কারের প্রেরণা যুগিয়েছিল। বাংলার সমাজ-সংস্কারের ইতিহাসে **সতীদাহ প্রথার** বিরুদ্ধে রামমোহনের সংগ্রাম

---

*"দেবেন্দ্রনাথ যে স্রোতকে প্রবর্তিত কবিয়া ধীর গম্ভীর ভাবে সুনির্দিষ্ট খাতের ভিতর দিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কেশবচন্দ্রের আলোকসামান্য প্রতিভা সকল বাঁধন ভাঙিয়া সেই স্রোতকে চারিদিকে উদ্দাম তরঙ্গভঙ্গ তুলিয়া ছড়াইয়া দিয়েছিল।" —বিপিনচন্দ্র পাল : নবযুগের বাংলা ॥ পৃষ্ঠা ৭৭

† শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, তোমার 'সাকারে' বিশ্বাস না 'নিরাকারে' ?

মাষ্টার—আজ্ঞা নিরাকার, আমার এইটি ভাল লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বেশ। একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হল। নিরাকার বিশ্বাস তাতো ভালই। তবে এ বুদ্ধি কারো না যে, একটি কেবল সত্য আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য, আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস সেইটি ধরে থাকবে।

মাষ্টার দুই-ই সত্য এই কথা বারবার শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। একথা তো তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে নাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত (শ্রীম কথিত)

অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইংরেজ শাসকেরা সতীদাহ প্রথাকে বর্বরতা মনে করলেও আইন করে তুলে দিতে সাহস পায়নি, বাঙালীর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগবে বলে। রামমোহন রায় সতীদাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপন করে এক ধর্মের শাস্ত্রের এবং মনুষ্যত্বের বিরোধী বলে প্রতিপন্ন করিলেন। অবশেষে প্রাচীনপন্থীদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও সতীদাহ আইনানুসারে নিষিদ্ধ হল বেন্টিকের আমলে (১৮২৯)।

জাতিভেদ প্রথা এবং অন্যান্য কুসংস্কার যে জাতীয় জীবনে জড়তার সৃষ্টি করছে তা নানাভাবে প্রতিপন্ন করেছেন রামমোহন। তাঁর আত্মীয়-সভা লোকায়ত সংস্কারের প্রতিকূলতার জন্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এবারে বলতে হয় ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের কথা। ১৮২৬ সালে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হয়ে এলেন **হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও**। ফরাসী বিপ্লবের বাণী বালক ডিরোজিওর চিত্তে উন্মাদনা জাগিয়েছিল। গুরু ড্রমণ্ডের কাছে তিনি পেয়েছিলেন স্বাধীন চিন্তার দীক্ষা। এই তরুণ অধ্যাপক তাঁর বুদ্ধির দীপ্তিতে অল্প সময়ের মধ্যেই একটি শিষ্য-মণ্ডলের সৃষ্টি করলেন। এই শিষ্যেরাই হলেন ডিরোজিয়ান বা **ইয়ং বেঙ্গল**। ডিরোজিওর নেতৃত্বে এঁরা দেশের সমস্ত আচার-বিচারের বিরুদ্ধে প্রবল ধিক্কারবাদে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুললেন। কোন লক্ষ্যে পৌঁছানো নয়, নিয়ম ভাঙাই যেন হল এঁদের ব্রত। মদ্যপান, গোমাংস ভক্ষণে এঁরা গর্ব বোধ করতেন। কলেজের সেরা ছেলেরা এই দলে। কলমও এদের ভাল চলত। 'Enquirer' এবং 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে একটি ইংরেজী আর একটি বাংলা সাময়িক পত্র এঁরা প্রকাশ করেছিলেন। এই মুখপত্রে তাঁরা দেশাচারকে বিদ্রূপ করতেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ ভয় পেয়ে ডিরোজিওকে কলেজ থেকে সরিয়ে দিলেন (২৪শে এপ্রিল, ১৮৩১)। সেই বছরই ডিরোজিও মারা যান।

'ইয়ং বেঙ্গলে'র আন্দোলনে উচ্ছৃঙ্খলতা থাকলেও তাঁদের বক্তব্যে প্রগতিশীল পৃথিবীর চিন্তাধারা এসে মিশেছিল। এঁরা কোন সভাসমিতি করলে শহরের গণ্যমান্য লোক তাতে উপস্থিত থাকতেন। ইয়ং বেঙ্গল দলের প্রধানদের মধ্যে ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিক-কৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি বিদ্বজ্জন। এঁদের অনেকেরই অবদান বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এই সময় মানবতার মূর্তিমান বিগ্রহ যুগপুরুষ **বিদ্যাসাগর** সমাজ-সংস্কারের

কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ব্রাহ্মসমাজ এবং ডিরোজিয়ান চক্রের বাইরে থেকেও একজন দরিদ্র বামুনের ঘরের ছেলে নবযুগের সমস্ত শুভ চেতনা আত্মস্থ করে অসাধারণ প্রতিভার আলোকে ভাস্বর হয়ে বাংলার গগনে উদিত হলেন। বাংলা দেশের এমন সৌভাগ্য কমই হয়েছে। বাংলার সমাজ-সংস্কারে, শিক্ষা বিস্তারে, সাহিত্য সাধনায়—এক কথায় বাংলার নবজাগৃতির সর্বক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের দান অতুলনীয়। বিদ্যাসাগরের বিরাট ব্যক্তিত্বের সম্মুখে সমস্ত প্রতিকূলতা মাথা নত করত। প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর বিধবাবিবাহ আন্দোলন জয়যুক্ত হল। বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হল ১৮৫৬ সালে লর্ড ক্যানিং-এর সময়ে। আইন পাস হলেই হল ? বিধবাবিবাহ ব্যবস্থা তো করতে হবে। সে ব্যবস্থার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিলেন ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই। আইন পাস হবার চার মাস পরেই প্রথম বিয়ে স্থকিয়া ষ্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের বাড়ি। পাত্র বিদ্যাসাগরের বন্ধু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন আর পাত্রী নদীয়া জেলার পলাশডাঙ্গা গ্রামের ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা মেয়ে কালীমতি। এই বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। বিয়ের চিঠি ছাপা হয়েছিল কালীমতির মায়ের নামে। চিঠির মুসাবিদা করেছিলেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র।*

এই রকম শতাধিক বিধবাবিবাহ তিনি দিয়েছিলেন। প্রতি ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরই কন্যাপক্ষে। সব খরচ তাঁর। তারপর বিয়ে দিলেই কি পাট চুকে গেল ? মোটেই না। নবদম্পতি স্থখে আছে কিনা, সংসার চলছে কিনা সব দেখতেন তিনি, দরকার হলে খরচ যোগাতেন মুক্তহস্তে।

বিধবাবিবাহ চালু করতে গিয়ে কী কষ্টই না তাঁহাকে সহ্য করতে হয়েছে। প্রতি পদে বাধা,ব্যঙ্গবিদ্রূপ। এমন কি তাঁর প্রাণহানির সম্ভাবনাও ছিল বিরোধী-পক্ষের হাতে। স্বমত প্রতিষ্ঠায় কত শাস্ত্রই না তাঁকে মন্থন করতে হয়েছে। সে এক ইতিহাস। কত রাত্তির সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারেই ভোর হয়ে গেছে। বিধবা-বিবাহের সমর্থনে লেখা তাঁর দু'খানি বইয়ের ছত্রে ছত্রে তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি এবং অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় মেলে। সবচেয়ে বড় করে চোখে পড়ে

---

* "সবিনয় নিবেদনম্, ২৩ অগ্রহায়ণ রবিবার আমার বিবধা কন্যার শুভ-বিবাহ হইবেক। মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্বক কলিকাতার অন্তঃপাতী শিমুলিয়া স্থকিয়া ষ্ট্রীটে ১২ সংখ্যক ভবনে শুভাগমন করিয়া শুভকর্ম সম্পন্ন করিবেন, পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি তারিখ ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৭৭৮ শকাব্দ।"

তাঁর কান্না-ভরা বিরাট হৃদয়ের ছবি! একটি বইয়ের উপসংহারে তিনি বলেছেন: "ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিতেছিস্। তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস্, ধর্মের মর্মভেদ করিয়াছিস্, হিতাহিতের গতিরোধ করিয়াছিস্, ন্যায় অন্যায়ের পথরোধ করিয়াছিস্ তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলে গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে, ধর্মও অধর্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্মও ধর্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্বধর্ম-বহিষ্কৃত দুরাচারেরাও তোর অনুগত থাকিয়া, কেবল লৌকিক রক্ষাগুণে সর্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে।"

বাংলায় তৎকালীন সমাজের এর চেয়ে জীবন্ত চিত্র আর কী হতে পারে? এক নির্বিচার লোকাচারের বিরুদ্ধেই ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনপণ সংগ্রাম।

এই সময় ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে কয়েকটি সমিতি গঠিত হয়। ১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র সেন পরিচালিত আন্দোলনের ফলে অসবর্ণবিবাহ বিল (Civil Marriage Act) পাস হয়। ঊনবিংশ শতকের সমাজ সংস্কারে নারীশিক্ষার বিস্তারের উদ্যম এবং নারীর মানবিক অধিকার রক্ষার ব্যবস্থাপনা জাতীয় জনগণের অন্যতম লক্ষণ।

বহির্বঙ্গে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার

বাংলার ব্রাহ্মসমাজের অনুকরণে মহারাষ্ট্রে গড়ে উঠেছিল **প্রার্থনা সমাজ**। শিক্ষাবিস্তার, নৈশ বিদ্যালয় চালনা, অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন, অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলন, অনাথ আশ্রম ও বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা ছিল প্রার্থনা সমাজের কর্মসূচীর অন্তর্গত। প্রার্থনা সমাজের সভ্যেরা ব্রাহ্মদের মতো নিজেদের হিন্দুধর্মের বহির্ভূত নূতন ধর্মসম্প্রদায় বলে মনে করত না। প্রার্থনা সমাজের সভাপতি ছিলেন **গোবিন্দরাম রানাডে**। সমাজ সংস্কারে তাঁর প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কাথিয়াওয়াড়ের **দয়ানন্দ সরস্বতী** (১৮২৪—১৮৮৩) প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের নাম **আর্যসমাজ**। দয়ানন্দের কর্মস্থল ছিল প্রধানত পাঞ্জাব। তিনি বেদকে সর্বজ্ঞানের আধার বলে স্বীকার করতেন। বেদের পরবর্তী ধর্মশাস্ত্রে তাঁর আস্থা ছিল না। দয়ানন্দ পৌত্তলিকতার এবং জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। তিনি অহিন্দুকে হিন্দুধর্মে দীক্ষা দেবার জন্য 'শুদ্ধি' আন্দোলন শুরু করেন। শুধু শিক্ষিতদের মধ্যেই নয়, অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিতের মধ্যেও তিনি তাঁর ধর্মমত

প্রচার করতে চেষ্টা করেছিলেন। আর্যসমাজীদের উদ্যোগে অনেক বিদ্যালয় এবং প্রার্থনালয় স্থাপিত হয়।

ইয়ং বেঙ্গলের মত পশ্চিম ভারতে **ইয়ং বোম্বে** দল গড়ে ওঠে। **বাসুদেব বাবাজী নৌরঙ্গীর** পরিচালনায় বোম্বাইয়ের যুবকেরা বিধবাবিবাহ এবং নারী-শিক্ষা প্রচলনে উদ্যোগী হয়। ১৮৭৫ সালে মাদ্রাজেও **বীরেশ-লিঙ্গমের** নেতৃত্বে বিধবাবিবাহ আন্দোলন ব্যাপক আকারে দেখা দেয়।

আধুনিক শিক্ষার প্রচলন

ইংরেজ শাসকেরা প্রথমে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। কেরী আর মার্শম্যান ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলেজ খুলতে চেয়েছিলেন কলকাতায়, কিন্তু ইংরেজ কর্তৃপক্ষ রাজী না হওয়ায় তাঁরা পেলেন শ্রীরামপুরে— অর্থাৎ দিনেমার রাজ্যে। হিন্দুদের শিক্ষার জন্য সংস্কৃত কলেজ আর মুসলমানদের শিক্ষার জন্য আরবী ফারসী মাদ্রাসাই তাঁরা যথেষ্ট মনে করেছিলেন। বরং যেসব ইংরেজ এদেশে চাকরি-বাকরির জন্য আসত তাদের দেশীয় রীতিনীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করার জন্যে আর দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেবার জন্যে **ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ** প্রতিষ্ঠিত হল ১৮০০ সালে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দেশীয় ভাষার মধ্যে বাংলারও একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। এ কলেজের প্রথম চৌদ্দ বছর বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ মূল্যবান।

ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত হয় দেশীয় বিদ্বজ্জনের চেষ্টায়। ইংরেজেরা নিজে থেকে কিছু করবে না মনে করে ১৮১৪ সালে কাশীরাম ঘোষাল নামে একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোক মৃত্যুকালে লণ্ডন মিসনারী সোসাইটির হাতে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য ২০,০০০ টাকা দিয়ে যান।

বস্তুতঃ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে **হিন্দু কলেজ** প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ দেশে আধুনিক শিক্ষার সূত্রপাত। ১৮১৬ সালে রামমোহনের আত্মীয়-সভার একটি অধিবেশনে ডেভিড হেয়ার উপস্থিত ছিলেন। সভান্তে দুই বন্ধুতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন করার বিষয়ে অনেক আলোচনা হল। সেই আলোচনাই কালক্রমে রূপ নিল হিন্দু কলেজ।

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার বছরেই ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে **স্কুলবুক সোসাইটি** স্থাপিত হল। এই সভার সভ্যেরা ছাত্রদের জন্য ইংরেজী ও বাংলা পাঠ্যপুস্তক লিখতে লাগলেন। রামমোহনও নূতন ধরনের পাঠ্য পুস্তক লেখায় হাত দিলেন। রামমোহনের লেখা একটা বাংলা ব্যাকরণ বিশেষ মূল্যবান। স্কুল বুক সোসাইটির পাঠ্যপুস্তকগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন পথ খুলে দিল।

১৮১৮ সালে হেয়ারের প্রচেষ্টায় **স্কুল সোসাইটি** নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতায় ইংরেজী ও বাংলা শেখাবার জন্য নতুন স্কুল খোলা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল।

ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনে সাহায্য করবার জন্য রামমোহন নিজে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্কুলের পাঠ্য বিষয় ছিল মেকানিক্স, অ্যাষ্ট্রনমি, ভলটেয়ার ও ইউক্লিড। ১৮২৫ সালে তিনি বেদান্ত কলেজ স্থাপন করেন; এই কলেজের পাঠ্য ছিল প্রাচ্য বিদ্যা এবং পাশ্চাত্ত্য কলা ও বিজ্ঞান বিদ্যার একটা সমন্বয়।

ইংরেজরা এদেশীয়দের জন্য প্রাচ্য বিদ্যার ব্যবস্থা করবেন, না পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার ব্যবস্থা করবেন এ বিষয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদের সৃষ্টি হয় ইংরেজ মহলে। যাঁরা প্রাচ্যবিদ্যার সমর্থক ছিলেন তাঁদের বলা হত Orientalists আর যারা পাশ্চাত্ত্য-বিদ্যার সমর্থক ছিলেন তাঁদের বলা হত Anglicists, শেষোক্ত দলের নেতা ছিলেন মেকলে।

রামমোহন বুঝেছিলেন ভারতীয়দের নতুন পরিবর্তিত পৃথিবীর সঙ্গে সমান তালে চলতে হলে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন অপরিহার্য। সরকারী প্রচেষ্টার সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের যে পরিকল্পনা হল তাতে ঠিক হল বেদান্ত ব্যাকরণাদি বিশেষ করে পড়ানো হবে। রামমোহন এই শিক্ষাপরিকল্পনার প্রতিবাদে লর্ড আমহার্ষ্টকে লিখলেন:

"Nor will youths be fitted to be *better members of society* by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother, etc. have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore sooner we escape from them and leave the world the better."

বালক ও যুবকদের "সমাজের পক্ষে উপযোগী" করে তুলবার জন্য যে শিক্ষাধারার প্রয়োজন, রামমোহন বিস্তারিতভাবে এই পত্রে তার বিবরণ দেন। নয় বছর পরে, ১৮৩৩ সালে Anglicist-দেরই জয় হয়, এবং রামমোহনের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি অনেকাংশে গৃহীত হয়। ১৮৩৫ সালে লর্ড বেন্টিক ইংরেজী শিক্ষার অনুকূলে সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর সময়ে ঠিক হল শিক্ষার খাতে যে সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হবে তা কেবল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার জন্যেই খরচ করা হবে। এর পর ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রচলন সহজ হল। ১৮৩৫ সালে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮৪০ সালে

লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন ইংরেজী-জানা লোকদের চাকুরিক্ষেত্রে সুবিধা দেওয়া হবে। এর ফলে দেশে ইংরেজী শেখবার আগ্রহ অনেক বেড়ে গেল। লর্ড ডালহৌসীর আমলে বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উড ভারতীয় শিক্ষার উন্নতিকল্পে এক আদেশপত্র প্রেরণ করেন (১৮৫৪)। এই আদেশপত্রের (Wood's Despatch) ঘোষিত নীতি অনুসারে প্রতি প্রদেশে **সরকারী শিক্ষাবিভাগ** স্থাপিত হয়। ১৮৫৭ সালে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার পরিচালিত স্কুল ও কলেজের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। জনসাধারণের উদ্যোগেও অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যেও শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন ক্রমশই অনুভূত হয়।

স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের চেষ্টায় প্রথমে মিশনারীরাই উদ্যোগী হয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ ও ইয়ং বেঙ্গলও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে প্রেরণা দিয়েছিলেন। ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেবের চেষ্টায় বেথুন স্কুল স্থাপিত হয়, এই স্কুলই পরে কলেজে উন্নীত হয়। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে বেথুনের প্রধান সহযোগী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার।* ১৮৫৭-৫৮ সালে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে হুগলী বর্ধমান মেদিনীপুর ইত্যাদি বিভিন্ন জেলায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমশ বাংলার বাহিরেও নারীশিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ দেখা যায়।

নূতন চিন্তা, ভাষা ও সাহিত্য

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে চিন্তার ক্ষেত্রে সত্যই বিপ্লব ঘটে গেল। মধ্যযুগে মানুষকে শুধু মানুষ বলে মূল্য দেওয়া হয়নি, মানুষের জীবন বা ইহলোকের

* 'এই স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন লইয়া কলিকাতার হিন্দুসমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্ত্রী-শিক্ষার বৈধতা প্রমাণ করিবার জন্য যে কেবল গ্রন্থ রচনা করিলেন তাহা নহে, স্বীয় কন্যাকে নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দিলেন। তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-সুহৃদগণ স্বীয় স্বীয় ভবনের বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা লইয়া সমাজ মধ্যে নানা আলোচনা উপস্থিত হইল। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" (কন্যাকেও এইরূপে পালন করিতে হইবে এবং অতি যত্নে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে)—মহানির্বাণতন্ত্রের রচনালঙ্কৃতনবপ্রতিষ্ঠিতবিদ্যালয়ের গাড়ী যখন রাজপথে বাহির হইত তখন লোকে হা করিয়া তাকাইয়া থাকিত ও নানা কথা কহিত।

—শিবনাথ শাস্ত্রী ॥ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'

প্রতি কোন মমত্ববোধ ছিল না, দেব এবং দৈবই ছিল সর্বেসর্বা। ধর্মীয় সংকীর্ণতা মানুষের সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। আচারের মরুবালুরাশি বিচারের স্রোতঃপথকে গ্রাস করে ফেলেছিল। উনবিংশ শতক হল মানুষের **মুক্তির যুগ**—বেড়া ভাঙার যুগ। দেশের সীমা লুপ্ত হয়ে গেল, বিরাট বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হলাম আমরা। মানুষকে দেখতে শিখলাম নতুন চোখে, নতুন মূল্য দিলাম মানুষকে। জীবনটা মিথ্যে বলে আর উড়িয়ে দিতে পারলাম না। দেশটাকে কেমন নিজের বলে মনে হল। সেই সঙ্গে নিজের শক্তিকে নতুন করে আবিষ্কার করলাম। যেন নতুন করে জন্ম নিলাম আবার।

এই নতুন বোধ সাহিত্যেও প্রতিফলিত হল। এবার আর দেবদেবী নয়, ধর্ম নয়, এবার সাহিত্যে এল **মানুষ**, রক্তমাংসের মানুষ—যারা হাসে কাঁদে, ভালবাসে, যারা প্রাণ দিয়ে প্রাণ বাঁচায়। আনন্দের কানায় ভরে উঠল মন—কত কথা, কত ভাব, কত অনুভূতি। পদে পদে মিলের-বেড়ি-দেওয়া পদ্যের আধারে আর ধরা যায় না সে বক্তব্য, নতুন মাধ্যম চাই, সুস্থ আর স্বাভাবিক নতুন মাধ্যম। এই নতুন মাধ্যম হল **গদ্য**। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কেরী আর বাংলা বিভাগের মুন্সীরা বাংলা গদ্য লিখেছিলেন বটে, কিন্তু তা ছিল বাইবেলী বাংলা, সেটা প্রাণের ভাষা হয়ে ওঠেনি। তবু সে প্রচেষ্টাকে অবজ্ঞা করা অন্যায় হবে, বাংলা গদ্যের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এর মূল্য কিছু-না-কিছু আছেই। এরপর রামমোহন আর বিদ্যাসাগরের হাতে এসে বাংলা গদ্য ক্রমশ সরল ও সুন্দর হয়ে উঠল। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিভাশালী লেখকদের সাধনায় বাংলা কাব্যসাহিত্য নতুন সম্ভাবনার পথে পাড়ি দিল। কাব্যে **মধুসূদন**, নাটকে **দীনবন্ধু মিত্র** এবং উপন্যাসে **বঙ্কিমচন্দ্র** নতুন দিগন্ত খুলে দিলেন, আর সেই দিগন্ত রাঙা হয়ে উঠল সহস্ররশ্মি **রবির** আভায়॥

অনুশীলনী

১। সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয় বলতে কি বোঝ? ইউরোপীয় সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয় আর ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয় কি সমকালীন?

২। উনবিংশ শতকে ভারতের নব জাগরণের পটভূমিতে ইউরোপের কোন্ কোন্ ঘটনা উল্লেখযোগ্য?

৩। সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যবর্তী কয়েকজন চিন্তানায়কের নাম কর যাঁদের চিন্তাধারা সমকালীন মানবসমাজে প্রভাব বিস্তার করেছে।

সূত্র॥ ভলটেয়ার (১৬৯৪—১৭৭৮), রুশো (১৭১২—১৭৭৮), ভিক্টর

হুগো (১৮০২—১৮৮৫), জন ষ্টুয়ার্ট মিল্ (১৮০৬—১৮৭৩), লিও টলষ্টয় (১৮২৮—১৯১০)।—এঁদের কিছু উক্তি সংগ্রহের চেষ্টা কর।

৪। সংস্কার আন্দোলন প্রথমে ধর্মকে কেন্দ্র করে শুরু হল কেন? ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের সঙ্গে আগেকার সংস্কার আন্দোলনের পার্থক্য কোথায়?

৫। সমাজ-সংস্কারক হিসেবে রামমোহন আর বিদ্যাসাগরের মধ্যে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য কোন্‌টা তোমার চোখে পড়েছে? কোন মনীষী বলেছেন—রামমোহন আর বিদ্যাসাগর মানবতার এপিঠ-ওপিঠ। এ কথার অর্থ কী?

৬। একজন মনীষী বলেছেন—"এই বিধবাবিবাহ ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র মূর্তিটি দেখিতে পাই"।—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত মহাপুরুষের সমগ্র মূর্তির ধারণা করা সহজ নয়। তবু তুমি বিদ্যাসাগর-চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলো ধরতে পেরেছ, বিধবাবিবাহ ব্যাপারে তার প্রতিফলন কিভাবে ঘটেছে আলোচনা কর।

৭। উনবিংশ শতকে স্ত্রী-স্বাধীনতার বোধনে বার বার কোন্ বিষয়গুলি সহায়ক হয়েছিল?

৮। ধরে নিচ্ছি স্ত্রী-শিক্ষা তুমি সমর্থন কর, কিন্তু পুরুষ ও নারীর শিক্ষণীয় বিষয়ে কোন তারতম্য থাকা উচিত কি না? পক্ষে বা বিপক্ষে তোমার অভিমত দাও।

৯। 'উনবিংশ শতক হল মানুষের মুক্তির যুগ'—এ কথার তাৎপর্য কী?

১০। বিতর্কের আসর। বিষয়ঃ "পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাব ভারতের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই বেশি করেছে।"

১১। দলগত কর্মোদ্যোগ॥ ছাত্ররা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, হিন্দু কলেজ (বর্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজ), সংস্কৃত কলেজ ও বেথুন কলেজের সংক্ষিপ্ত গৌরবেতিহাস সংগ্রহ করে সেগুলো ব্যবহারিক সংকলনে লিপিবদ্ধ করবে।

১২। বাংলার সাংস্কৃতিক পুনরভ্যুদয়ের যুগে যেসব মনীষীর নাম স্মরণীয়, তাঁদের ছবি যতগুলো পার সংগ্রহ করে তোমাদের ব্যবহারিক সংকলন গ্রন্থে সন্নিবেশিত কর। প্রত্যেক ছবির নিচে তাঁর একটি করে সদুক্তি যদি লিখে রাখতে পার তো খুব ভাল হয়।

১৩। উনবিংশ শতকের প্রধান প্রধান নাট্যকার ও কবিদের নাম, রচনা ও রচনাকাল নির্দেশ করে একটি চার্ট তৈরি কর।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ভারতের মুক্তি আন্দোলন ॥

"Kick them first and then speak to them"—

একদিন নেটিভদের সঙ্গে ইংরেজদের এই মধুর আচরণের পরামর্শ দিয়েছিল উদ্ধত একটি ইংরেজী কাগজ। এর জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'আজ অন্য কোন দেশে যদি কোন কাগজ ঐরূপ অপমানের আভাস মাত্র দিত, তাহা হইলে দেশবাসীরা তৎক্ষণাৎ নানা উপায়ে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিত। কিন্তু এতদিন হইতে আমরা জুতা হজম করিয়া আসিতেছি যে আজ উহা আমাদের নিকট গুরুপাক বলিয়া ঠেকিতেছে না।

গুরুপাক বলে ঠেকলেও সমুচিত জবাব দেওয়ার মতো সাহস ও শক্তি তখন আমাদের গড়ে ওঠেনি। সম্মিলিত কণ্ঠে 'ভারত ছাড়ো' বলতে আমাদের অনেক দিন লেগেছে। সে এক ইতিহাস।

সাম্রাজ্যবাদ নিজেই নিজের কবর খোঁড়ে। ঔপনিবেশিক নীতিও তাই। ইংরেজদের জমিদারী প্রথা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকের দুরবস্থা চরমে পৌঁছায়। জমিদারের সঙ্গে তার বিরোধের সম্ভাবনা ওঠে ঘনিয়ে। নতুন কলকারখানা গড়ে উঠায় শ্রমিক-মালিক বিরোধের নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। ইংরেজের কায়েমী স্বার্থের মস্ত বড় খুঁটি জমিদার আর কারখানার মালিকেরা। সেই খুঁটিই যদি নড়ে ইংরেজ শাসনের ভিত্তিই ওঠে টলমলিয়ে।

মুক্তি-অভিযানের বিভিন্ন পর্যায়

নূতন সৃষ্ট মধ্যবিত্ত সমাজ শিক্ষার আলোকে কল্যাণের পথ চিনে নেয়, তাঁদের মধ্যেই জাগে জাতীয়তাবোধ। স্বাধীনতার পূজারী রামমোহনই প্রথম নিয়মতান্ত্রিক মতে ভারতীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ দেখান। যান্ত্রিক উৎকর্ষ আর যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হয়ে ওঠার ফল জাতীয়তাবোধের পরিপুষ্টি। একই জাঁতার পেষণে পিষ্ট সবাই একই পথে মুক্তি খোঁজে। শোষণের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক আন্দোলন অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগেই শুরু হয়েছে। দিনাজপুর রংপুর বাঁকুড়া বীরভূমের **কৃষক বিদ্রোহ** তার সাক্ষ্য। কিন্তু কৃষকের বিদ্রোহ ব্যাপক আকারে দেখা দেয় ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল পরগণায়। আমাদের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে এই বিদ্রোহ অবশ্যই স্মরণীয়। অর্থনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। রুজি ও রুটির লড়াইয়ের

মধ্য দিয়ে খেটে-খাওয়া মানুষের মধ্যে যে ঐক্য গড়ে ওঠে সে ঐক্যে ফাটল ধরানো শক্ত।

উনবিংশ শতকে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে যে নবজাগরণের সূচনা হল স্বাধীনতা আন্দোলন তারই অভিব্যক্তি। রাজনৈতিক সুবিধালাভের জন্যে সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই অনুভূত হয়। ১৮৩৭ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে 'বঙ্গীয় জমিদার সভা' গঠিত হয়; কিন্তু এতে জমিদারদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন সিদ্ধির চেষ্টাই করা হয়েছে।

১৮৩৯ সালে রামমোহন রায়ের সুহৃৎ আডাম সাহেবের উদ্যোগে ইংলণ্ডে 'বিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপিত হয়। ভারতবাসীদের সুখ-দুঃখের কথা ইংলণ্ডের লোকদের শোনাবার জন্যই এই সভার প্রতিষ্ঠা। এই সভার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট জর্জ টমসন এদেশে এসে ১৮৪৩ সালে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে একটি সমিতি গঠন করেন।

ইতিমধ্যে ইংরেজ শাসকের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্রমেই বিক্ষোভ জমে উঠেছে। মফঃস্বলের ফৌজদারী আদালতে ইংরেজদের বিচার হত না। তাদের বিরুদ্ধে নালিশের বিচার হত সুপ্রীম কোর্টে। ফলে কুঠিয়াল সাহেবদের অত্যাচার ক্রমশ বাড়তে লাগল। ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেব ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার্থ চারিটি আইনের খসড়া তৈরী করেন। ইংরেজেরা একে বল্‌ল 'কালা আইন'। এই আইনের বিরুদ্ধে তারা এদেশ ওদেশ আন্দোলন চালাতে লাগল। আমাদের দেশে ভাল আইনগুলোর সপক্ষে বলবার লোক তেমন ছিল না। একমাত্র রামগোপাল ঘোষ বজ্রগর্ভ বক্তৃতা করে সেকথা বললেন। সেই সঙ্গে লেখনীও ধরলেন তিনি। প্রকাশ করলেন একটি পুস্তিকা—'A few remarks on certain Draft Acts, commonly called Black Acts' কিছুতেই কিছু হল না। ইংরেজদের ইচ্ছাই পূর্ণ হল।

কিন্তু এর থেকে একটা বিষয় প্রতিপন্ন হল। ইংরেজদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে চাই দেশবাসীর সংহতি। ইংরেজরা তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য কি তুমুল আন্দোলনই না গড়ে তুল্‌ল—ছাব্বিশ হাজার টাকা তুল্‌ল কয়েক দিনে। চোখের সামনে এসব দেখে দেশের শিক্ষিতেরা উপলব্ধি করলেন রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য দরকার কোন শক্তিশালী সম্মেলনের। এ উদ্দেশ্যেই ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হল '**ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন**'। রাজা রাধাকান্ত দেব এর প্রথম সভাপতি আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক। পরের বছরেই তাঁরা ইংরেজের নিকট বিক্ষোভ জানালেন—রাজস্বপ্রথার ত্রুটি, পণ্য-উৎপাদন শিক্ষা

ও শাসনতান্ত্রিক চাকরিতে ভারতীয়দের নিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাব—এরকম নানা বিষয়ে। দাবী জানালেন আইন-পরিষদ গঠনের—জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হবে যে পরিষদে ("*possessing a popular character so as in some respects to represent the sentiments of the people*")। তাঁরা বলতে দ্বিধা করলেন না যে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে ভারতবাসীর আশানুরূপ লাভ হয়নি।*

এই সভা সকলের মনেই আশার সঞ্চার করেছিল।

১৮৫৭ সালে ভারতের মুক্তি কামনা **সিপাহী বিদ্রোহের** মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠল। এই আন্দোলনকে শুধু সিপাহী বিদ্রোহ বলে ইংরেজরা একে খাটো করতে চেয়েছে। এই বিদ্রোহ হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম। এক লক্ষ বর্গমাইল ভূখণ্ড বিদ্রোহীদের দখলে আসে, চার কোটী ভারতবাসী কিছুদিনের জন্য ইংরেজ-শাসন-মুক্ত হয়। চার কোটী চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে ইংরেজরা বিদ্রোহ দমন করতে পারল বটে, কিন্তু দেশবাসীর মুক্তিচেতনা তাতে স্তব্ধ হল না। ১৮৫৮ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া সরাসরি ভারতশাসনের ভার নিলেন। **মহারাণীর ঘোষণাপত্রে** কিছু আশার বাণী শোনা গেলেও দেশবাসীর বিক্ষোভ তাতে শান্ত হল না।

১৮৬০ সালে এই বিক্ষোভ ফেটে পড়ল **নীল বিদ্রোহকে** কেন্দ্র করে। সারা দেশে যেন আগুন লাগল। 'নীলদর্পণে' প্রতিফলিত হল চাষীদের প্রতিরোধের কাহিনী। শিবনাথ শাস্ত্রী স্মৃতিকথায় লিখেছেন: "যখন মানুষের মন এইরূপ উত্তেজিত, তখন দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ প্রকাশিত হইল। নাটক-খানি বঙ্গসমাজে কী মহা উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল তাহা আমরা কখনও ভুলিব না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম ঘরে ঘরে সেই কথা, বাসাতে বাসাতে অভিনয়—ভূমিকম্পের ন্যায় এক সীমা হইতে আর এক সীমা পর্যন্ত বঙ্গদেশ কাঁপিয়া যাইতে লাগিল।" পাদ্রী জেম্‌স লঙ তাঁর নিজের নামে নাটকটির অনুবাদ প্রকাশ করে আদালতে অভিযুক্ত হলেন। লঙের একমাস জেল আর এক হাজার টাকা জরিমানা হল। কালী-প্রসন্ন সিংহ লঙের জরিমানার টাকা গুণে দিলেন। লঙ হাসতে হাসতে কারাবরণ করলেন। বললেন, 'এরকম কাজে যদি হাজার বার জেলে যেতে হয়, তাতে আমি প্রস্তুত।" এদিকে দীনবন্ধু মিত্রের অনেক আগে থেকেই

* Hirendra Nath Mookerjee : 'India Struggles for Freedom P. 66

নিপীড়িত চাষীদের জন্য কাজ করেছিলেন হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায়। মরা বাঁচানোর শক্তি ছিল তাঁর কলমে। তিনি 'ইণ্ডিগো কমিশন' গঠন ও নিষ্ঠুর আইন রদ করার জন্য প্রাণপাত করেন। তাঁর মা বললেন, ওরে মানুষের শরীরে এত শ্রম সইবে না। ওরে, মারা পড়বি, ওরে, কলম রাখ।' হরিশ উত্তর দিলেন, 'মা, তোমার সব কথা শুনব, কিন্তু গরীব প্রজাদের জন্য যা করছি তাতে বাধা দিও না। ওরা ধনে প্রাণে সারা হল, এ কাজ না করে আমি ঘুমোতে পারব না।' ১৮৬১ সালের জুন মাসে মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে তিনি মারা গেলেন। সারা দেশ কান্নায় ভেঙে পড়ল :

'হায়রে ভাই, প্রজার এবার প্রাণ বাঁচানো ভার!
অসময়ে হরিশ ম'ল, লঙের হল কারাগার—
নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারেখার।'

নীলবিদ্রোহের প্রত্যক্ষ ফল সমাজ-জীবনে এবং সাহিত্যে জাতীয় ভাবের সঞ্চার। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—'বলতে কি, ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবা বিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনী, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরগুপ্তের তিরোভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটি বঙ্গসমাজকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করিয়াছিল।'

এই সময় জোড়াসাঁকোর **ঠাকুর বাড়ি** দেশের জাতীয়তার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলে। দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে ঠাকুর পরিবারে একটি প্রবল স্বদেশাভিমান জাগ্রত ছিল। ইংরাজীতে পণ্ডিত হয়েও ঠাকুর বাড়ীর ছেলেরা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করে এসেছেন।

রাজনারায়ণ বসু দেবেন্দ্রনাথের বন্ধু ছিলেন। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জাতীয় ভাবধারা প্রসারে বিশেষ অনুকূল্য হয়েছিল। ইংরেজী-শিক্ষিতদের মধ্যে জাতীয়ভাব জাগাবার জন্য রাজনারায়ণ বসুর চেষ্টা স্মরণীয়। ১৮৬১ সালে তিনি মেদিনীপুরে 'জাতীয় গৌরবেচ্ছাসঞ্চারিণী সভা' স্থাপন করেন। পরবর্তী স্বাদেশিকের সভা আর হিন্দুমেলার বীজ এই সভাতেই ছিল।

স্বাদেশিকের সভা স্থাপিত হয় ১৮৬৫ সালে। এই সঞ্জীবনী সভার উদ্যোক্তা ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ যুবকেরা। জাতীর পক্ষে কল্যাণকর সমস্ত কাজই এই সভার অনুষ্ঠেয় ছিল। বালক রবীন্দ্রনাথও সভার সঙ্গে জড়িত

ছিলেন। তাঁর কথাতেই বলি : 'আমার মত অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। এই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে অহরহ উৎসাহে আমরা যেন উড়িয়া চলিতাম,লজ্জা ভয় সঙ্কোচ আমাদের কিছুই ছিল না।'

হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৬৭ সালে। রাজনারায়ণ বসুর পরিকল্পনা, নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগ, গণেন্দ্র ঠাকুরের অর্থসাহায্য, দ্বিজেন্দ্র ঠাকুরের পৃষ্ঠ-পোষকতা, শিশির ঘোষ ও মনোমোহন বসুর উৎসাহ—এই সব একত্র মিলে সৃষ্টি হল হিন্দুমেলার। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও আত্মনির্ভর করে তোলাই হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের কথায় : 'এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণী লোক পুরস্কৃত হইত।' হিন্দুমেলা প্রতি বছর বাংলা দেশে অভূতপূর্ব সাড়া এনে দিত।

তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে এক বিরাট শক্তি। আনন্দমোহন বসু বিলেত থেকে ফিরে এসে যে ছাত্রসভা গড়ে তুলেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ তাকেই কেন্দ্রকরে স্বদেশী আন্দোলনের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করলেন। হাজার হাজার ছাত্র রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ল। বিশেষ করে সুরেন্দ্রনাথের ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডী সম্পর্কীয় বক্তৃতাবলী যুবকমনে ঝড় তুল্‌ল। স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে ইতালীতে যে সব গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয় তার নাম ছিল **কার্বোনারি**; তারই অনুকরণে **সঞ্জীবনীসভার** মত গুপ্ত সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন বিপ্লবী মনোভাবের দ্বারা চালিত না হয়েও সভ্যেরা জাতীয় কল্যাণের আদর্শে নিষ্ঠাবান্‌ ছিলেন।

ইতিমধ্যে জনসাধারণের রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন ক্রমশই বেড়ে চলছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্‌ অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সাধারণের যোগ ছিল না। ধনীদের স্বার্থ রক্ষার জন্যেই এই সংস্থা; ক্রমেই একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাই শিশিরকুমার ঘোষের উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়া লীগ' নামে সাধারণ মধ্যবিত্তের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল (১৮৭৫)

১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনের উদ্যোগে **ভারত সভা** স্থাপিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন : 'বঙ্গদেশে সামাজিক ইতিবৃত্তে সে একটা স্মরণীয় দিন। যতদূর স্মরণ হয়, সেদিন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি পুত্রের মৃত্যু হয়। তাহা সত্ত্বেও তিনি সভাস্থলে আসিয়া ভারত-সভা স্থাপনে সহায়তা করেন। ...আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীনে ভারত-সভা একটি মহৎ কাজ করিতে লাগিলেন। কয়েকজন ভ্রমণকারী

বক্তা নিযুক্ত করিয়া স্থানে স্থানে সভা করিয়া বক্তৃতা করাইতে লাগিলেন। এই ভ্রমণকারী বক্তাগণ সর্বত্র ভারত-সভার দিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; ইহার অনুষ্ঠিত নানাপ্রকার কার্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; এবং রাজনীতির চর্চার অভ্যাস যাহাদের ছিল না, চর্চাতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন।' আমাদের যে স্বদেশাভিমান আদর্শবাদকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল, সুরেন্দ্রনাথ বিদেশের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা দিয়ে তার ভিত্তি সুদৃঢ় ও বাস্তবনিষ্ঠ করে তুললেন।

ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট নিম্নতম বয়স আরও কমিয়ে দেবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কিছুদিন থেকে আন্দোলন চলছিল সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে। ভারতীয়রা সিভিল সার্ভিস পাশ করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা জজ হয়েও ইংরেজ সিভিলিয়ানের সমান অধিকার পান না। ইংরেজ আসামীর বিচারের ভারও ভারতীয় সিভিলিয়ানদের উপর ছিল না। এই অব্যবস্থা দূর করার জন্য তখনকার বড়লাট লর্ড রিপনের নির্দেশে আইন-সচিব স্যার ইলবার্ট একটি 'বিল' আইন সভায় উপস্থিত করেন। এতে ইংরেজেরা একেবারে ক্ষেপে গেল। তারা ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তুমুল আন্দোলন করতে লাগল। এ দেখে ব্যঙ্গ করে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন—

'…হ্যাট্‌কোট্ বুট্ পরে'
সরা ভাবে জগতেরে—তাদের বিচার
নেটিভের কাছে হবে? 'নেভার—নেভার!'

যাহোক বছরখানেক পরে ইলবার্ট বিল যেভাবে পাস হল (১৮৮৩) তাতে অবস্থার কোন উন্নতি হল না। ইংরেজেরা অধিকসংখ্যক ইংরেজ জুরীর দাবী করলেই দেশীয় জজদের তা মেনে নিতে হত।

এই সময়ে আর একটি ব্যাপারে উত্তেজনা দেখা দিল। হাইকোর্টের বিচারপতি নরিসের আদালতে শালগ্রাম শিলা আনানোর প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথের হল কারাদণ্ড। জনপ্রিয় নেতার এই অবমাননায় সারা দেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ছাত্ররা ধর্মঘট করে আদালত প্রাঙ্গণে সমবেত হল।

সুরেন্দ্রনাথের মুক্তি হয় ১৮৮৩ সালের ৪ঠা জুলাই—আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার দিনটিতে। এই দিন ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাব-সংবলিত পত্রে বলা হয়ঃ প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মিলিতভাবে আন্দোলন চালাতে হলে চাই একটি 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী' আর ব্যয়নির্বাহের

জন্য চাই একটি 'ন্যাশানাল ফণ্ড' প্রতিষ্ঠা। এর কয়েক মাস পরে সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রমুখ যুবকদের উদ্যোগে **ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স** আহূত হয়—কলকাতায়, ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। রামতনু লাহিড়ীর সভাপতিত্বে এই সম্মেলনে অস্ত্রআইন প্রত্যাহার, প্রতিনিধিত্ব-মূলক শাসনব্যবস্থা, সিভিল সার্ভিসের সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় যখন এই সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন চলছিল তখন বোম্বাইয়ে স্কটিশ সিভিলিয়ান অক্টোভিয়াস হিউমের নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলেছে।

জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম

'Three cheers for Mr. Hume, the father of the Congress.'

হিউম বললেন—Three times three cheers, and if possibe thrice that for Her Majesty the Queen Empress!'

১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরে বোম্বাই নগরীতে এই অভিনন্দন ধ্বনিত হয়েছিল কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের শেষে।

ভারতীয় রাজনীতি যেভাবে মোড় নিচ্ছিল তাতে কংগ্রেসের মতন সর্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান আজ হোক কাল হোক গড়ে উঠতই। তাই শাসকেরাই এগিয়ে এলেন জাতীয় কংগ্রেস গঠনে, যাকে হিউম বলেছিলেন 'a safety valve for the escape of great and growing forces generated by our own action.' সভাপতি হলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরেজ শাসনের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থেকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দেশবাসীর অভাব অভিযোগ উপস্থিত করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হল—'All that they desired was that the basis of the Government should be widened and that the people should have their proper share in it.

পর বৎসর জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসল কলকাতায়। ন্যাশনাল কনফারেন্সের সবাই আহূত হলেন এই অধিবেশনে। এইভাবে ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স আর বোম্বাইয়ের জাতীয় কংগ্রেস মিলে গিয়ে 'একটি জাতীয় সংস্থা গড়ে উঠল। কংগ্রেসের দ্বিতীয় উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথ গাইলেন :

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে

কিন্তু শুধু নিয়মতান্ত্রিক মতে আবেদন নিবেদনের থালা সাজিয়ে আর কত দিন চলবে? কংগ্রেসের মধ্যেই একদল একটু চড়া সুর ধরলেন। তাঁরা জনসাধারণকে আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনতে চাইলেন। ইংরেজ-বিরোধী

সংগ্রামকে ক্রমশ প্রত্যক্ষ করে তুলতে চাইলেন। কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয় বার্ষিক অধিবেশনগুলোকে 'তিন দিনের তামাশা' বলতেও কুণ্ঠিত হলেন না। কংগ্রেসের মধ্যে যারা 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় রইলেন তাঁদের আমরা বলব **দক্ষিণপন্থী** বা নরমপন্থী, আর যাঁরা এগিয়ে যেতে চাইলেন আন্দোলনের মুখে তাঁদের বলব **বামপন্থী** বা চরমপন্থী। চরমপন্থীদের অগ্রণী হলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিন পাল, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ কর্মীরা। আসামের চা-বাগানের কুলিদের দাসত্ব-জীবনের নিদারুণ দুঃখ দূর কার জন্যে প্রস্তাব আনলেন বামপন্থীরা (১৮৮৭)। আসামের চীফ কমিশনার হেনরী কটন চাপে পড়ে বাধ্য হলেন চা-বাগানের অনেক অনাচার দূর করতে।

স্বদেশী প্রচারের ঢেউ

১৮৮৭ সালেই বরিশালের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে ৪৫০০০ লোকের স্বাক্ষর-সংবলিত একটি স্মারকলিপিতে কংগ্রেসের কাছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হয়। বাংলার বামপন্থী কংগ্রেস-কর্মীদের প্রচেষ্টায় বাংলার রাজনৈতিক চেতনা বলিষ্ঠতর হতে থাকে। স্বদেশী জিনিসের প্রচারের জন্য সরলাদেবী চৌধুরাণী 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' খুললেন, 'ভাণ্ডার' বলে একটি মুখপত্রও প্রকাশিত হল। বিপিনচন্দ্র পাল প্রকাশিত 'New India' কাগজ নতুন আদর্শ প্রচারের সহায়ক হল। ১৯০৩ সালে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হল আর এই সমিতির মুখপত্র হল 'ডন'! ডন সোসাইটির সভাপতি হলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে ১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মসম্মেলন থেকে ফিরে আসার ফলে তরুণ সমাজে নূতন প্রাণের জোয়ার এল। বাংলার বাহিরে মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক ও পাঞ্জাবে লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বে বামপন্থী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠল। কিন্তু শাসকশক্তি ভয় করত বাংলাদেশকেই, কারণ বাংলা-দেশই নব জাতীয়তাবোধের পীঠস্থান। তাই বাংলাদেশকেই দুর্বল করে দেবার জন্য লর্ড কার্জন দেশটাকে দুভাগ করবার ব্যবস্থা করলেন ১৯০৫ সালে। পূর্ববঙ্গ আর আসাম নিয়ে একটা প্রদেশ, এবং পশ্চিমবঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে আর একটা প্রদেশ গঠিত হল। কিন্তু **বাংলার** এই **অঙ্গচ্ছেদ** দেশবাসী মেনে নিল না—

'ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে
গড়বে ততই দ্বিগুণ করে
ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা
ততই যে ঢেউ উঠবে।'

ঢেউ উঠল, সারা দেশে ছড়িয়ে গেল। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি মুখে মুখে, রাস্তায় রাস্তায় মিছিল অফিস কাছারি আর বিলিতি জিনিসের দোকানের সামনে পিকেটিং—সে এক অভূতপূর্ব সাড়া। যেদিন বঙ্গভঙ্গের আদেশ জারি হল (১৬ই অক্টোবর) সেদিন **রাখীবন্ধন উৎসব** পালিত হল। রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সহযোগিতায়। ভ্রাতৃত্বের চিহ্ন স্বরূপ সবাই সবাইকে রাখী পরাবে এই ঠিক হল। অবনীন্দ্রনাথের কথায় : "রওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দুধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাত অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে—মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁখ বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম—যেন একটা শোভাযাত্রা। দিনুও ছিল সঙ্গে—গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চল্‌ল—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।

এই গানটি সে সময়েই তৈরী হয়েছিল। ঘাটে সকাল থেকে লোকারণ্য। রবিকাকাকে দেখবার জন্য আমাদের চারিদিকে ভিড় জমে গেল। স্নান সারা হল—সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল একগাদা রাখী, এ ওর হাতে পরালুম। অন্যেরা যারা কাছাকাছি ছিল, তাদেরও হাতে রাখী পরানো হল। হাতের কাছে ছেলেমেয়ে যাকে পাওয়া যাছে, কেউ বাদ পড়ছে না, সবাইকে রাখী পরানো হচ্ছে। গঙ্গার ঘাটে সে এক ব্যাপার !"

রাখীবন্ধন উৎসবের পর 'ফেডারেশন হল গ্রাউণ্ডে' আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় সঙ্কল্প নেওয়া হল—বঙ্গভঙ্গ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত দেশবাসী আন্দোলন চালিয়ে যাবে, কেবল স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করবে, বিদেশী জিনিস কিনবে না। হাজার হাজার সভায় জাতীয় সঙ্কল্পবাক্য পঠিত ও সমস্বরে উচ্চারিত হতে থাকল। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি এই সময়ে 'জাতীয় মন্ত্রে' পরিণত হল। ইংরেজ সরকার এক সার্কুলার জারি করে বললেন, স্বদেশী সভায় যোগ দিলে বা বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ করলে ছাত্রদের স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এই হল কুখ্যাত **কার্লাইল সার্কুলার**। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে ছাত্রদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিল। সভা-সমিতিতে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ধ্বনিত হল। মাথায় লাঠি পড়লেও ছাত্ররা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি পরিত্যাগ করেনি। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে **জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনও** যুক্ত হল। সর্বত্র জাতীয় আন্দোলনের মুখে ইংরেজ সরকার বিভ্রান্ত হয়ে

দমননীতি গ্রহণ করল। শত শত লোক কারাবরণ করল। মুক্তি-কামনা তাতে বেড়েই গেল।

বিপ্লবের অগ্নিশিখা

১৯০৬ সালে দাদাভাই নৌরজী স্বরাজ দাবী করলেন। চরমপন্থীদের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ চলতেই লাগল। বাংলার বিপ্লবী দল সন্ত্রাসবাদের পথ ধরলেন। গোপনে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরী করার কারখানাও গড়া হল। বৈপ্লবিক সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি' এবং 'যুগান্তর' গঠিত হল (১৯০৭), এদের শাখা প্রশাখা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। অত্যাচারী ইংরেজদের হত্যা করা গোপন সংগঠন-গুলির কর্মসূচীর অন্তর্গত ছিল। অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন। তাঁর সঙ্গী প্রফুল্ল চাকী অত্মহত্যা করলেন। বিপ্লবী কিশোর ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগ বিপ্লবীদের কাছে জলন্ত আদর্শ হয়ে রইল। ঐ বছরই মানিকতলায় বোমা তৈরির গোপন কারখানা ধরা পড়ল। অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষও ধরা পড়লেন। বিখ্যাত 'আলিপুর বোমার মামলা'য় অরবিন্দ ছাড়া পেলেন, অন্যান্য নেতাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল।

১৯১১ সালে ইংরেজ সরকার বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত করতে বাধ্য হলেন। কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হল। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বাড়তেই লাগল। দিল্লীর রাজপথে বড়লাট হার্ডিঞ্জকে মারবার চেষ্টা হল। এতে প্রমাণিত হল বাংলার বাহিরেও সন্ত্রাসবাদী কর্মধারা প্রবাহিত হয়েছে।

তিন বছরের মধ্যেই **প্রথম বিশ্বযুদ্ধ** আরম্ভ হল। যুদ্ধে ভারতের অর্থ ব্যয়িত হল। 'স্বায়ত্তশাসন' পাবার আশায় কংগ্রেস যুদ্ধের সময় ইংরেজের সহযোগিতা করল। কিন্তু কংগ্রেসের বাহিরে বাংলায়, পাঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন থামল না। বিদেশ থেকে গোপনে অস্ত্র আমদানী করে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা করলেন। বালেশ্বরের জঙ্গলে সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ দিলেন তিনি।

মহাযুদ্ধ থামল, কিন্তু ইংরেজ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাল ভারতবাসীকে। ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু আর ভারতের বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ড ভারত শাসনের জন্য এক নূতন বিধান রচনা করলেন। 'স্বায়ত্তশাসন' নয়—কিছু 'শাসন সংস্কার' মাত্র। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ামাত্র দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন শুরু হল। এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য **রাউলাট বিল** পাস হল। এই আইনের বলে সন্দেহজনক ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক করার ব্যবস্থা হল। রাউলাট

বিলের প্রতিবাদে সর্বত্র সভা সমিতি আর ধর্মঘট হতে লাগল। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ নামে একটি প্রাচীর-ঘেরা উদ্যানে এই আইনের প্রতিবাদে একটি সভা হচ্ছিল। ইংরেজ সেনাপতি মাইকেল ও' ডায়ার গুলী চালিয়ে সভায় উপস্থিত শত শত নরনারীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বড়লাটকে একটি পত্র লিখে সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করলেন :

The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I, for my part, wish to stand, shorn of special distinctions, by the side of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer degradation not fit for human beings'.

অহিংসার বাণীদূত গান্ধী
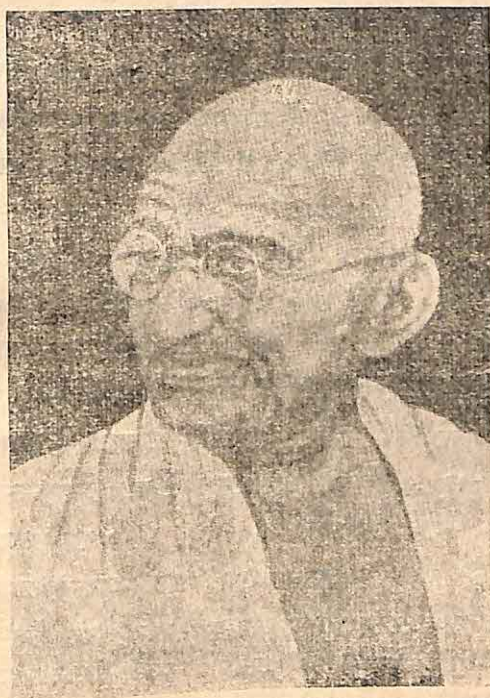
ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাগ্রত দেশজোড়া বিক্ষোভ কী রূপ নেবে? কোন্ পথে চলবে ভারতের রাজনীতি? এই প্রশ্নের মুখোমুখী আমরা পেলাম মহাত্মা গান্ধীকে। গান্ধিজীর নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলোন নূতন পথে পরিচালিত

হল। ইতিপূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকারের জন্য তিনি এক অভিনব আন্দোলন চালিয়েছিলেন। এই আন্দোলন **অহিংসা সত্যাগ্রহ** নামে খ্যাত। হিংসাকে হিংসা দিয়ে নয়, অহিংসা দিয়ে জয় করতে হবে, আর সত্যের প্রতি অবিচলিত আস্থা রেখে অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যেতে হবে। এই হল তাঁর আন্দোলন নীতির বৈশিষ্ট্য। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনেও তিনি এই নীতি প্রয়োগ করলেন। তিনি বলিলেন, শান্তিপূর্ণ উপায়ে অন্যায়কে প্রতিরোধ কর, ইংরেজদের সঙ্গে সবরকমের সহযোগিতা বর্জন কর, যদি নির্যাতন হয় সত্যাগ্রহী হয়ে সে নির্যাতন বরণ কর। অর্থাৎ গান্ধিজী দুটো অস্ত্র দেশবাসীর হাতে তুলে দিলেন—'অহিংস সত্যাগ্রহ' এবং 'অসহযোগ'।

১৯২০ সালে তিনি **অসহযোগ আন্দোলন** শুরু করলেন। ইংরেজের সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিত বর্জন করে ইংরেজ শাসনকে পঙ্গু করাই ছিল এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য। বিদেশী জিনিস বর্জন করা হল। মুসলমানেরাও এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে **স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা** আলোচনা করা দরকার। মুসলমানেরা প্রথম থেকেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসতে চায়নি, বলে তারা পিছিয়ে পড়েছিল, উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক সচেতনতা তাদের তেমন করে স্পর্শ করেনি। তা ছাড়া উনবিংশ শতকের রাজনীতি বা স্বদেশী আন্দোলন ছিল হিহুঁয়ানিতে মাখামাখি 'হিন্দুমেলা' নামের মধ্যেও সেই মনোভাবই ধরা পড়ে। সাহিত্যেও হিন্দু সংস্কৃতির মহিমাকীর্তন হয়েছে স্বদেশী যুগে। শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে-পড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বভাবতই যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জন্মায়, ইংরেজ সরকার তাকে সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। সৈয়দ আহমদের উদ্যোগে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৭৪); এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় নব-শিক্ষিত মুসলমান সমাজ স্বার্থচিন্তায় মন দিল। ১৯০৬ সালে **মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা** হলে এই শিক্ষিত মুসলমান সমাজই তার নেতৃত্ব করতে লাগল। 'বঙ্গ-ভঙ্গ' ব্যবস্থাকে সাধারণ মুসলমান সমাজ সমর্থনই করেছিল' একটা অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগুরুত্ব থাকবে এই ভেবে। মার্লি-মিণ্টো সংস্কারে (১৯০৯) মুসলমান নেতাদের বহুবাঞ্ছিত 'পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা' মঞ্জুর হল। ইংরেজের সুচতুর বিভেদনীতি ক্রমশ মুসলমানদের মনে **দুই-জাতি তত্ত্ব** দৃঢ়মূল করে তুলল।

মুসলমান সমাজের পক্ষে গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার একটা কারণ ছিল; প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর সঙ্গে যোগ দেবার অপরাধে **তুরস্কের**

সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করে খলিফার পদ বিলুপ্ত করেছিল ব্রিটিশ সরকার। তুরস্কের সুলতান ছিলেন মুসলমান জাতির ধর্মগুরু। এজন্য ভারতের মুসলমান সমাজ সৌকত আলী এবং মুহম্মদ আলীর নেতৃত্বে খলিফা পদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেন। স্বভাবতই গান্ধীর ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনে তাঁরা সহযোগিতা করলেন। ধর্মীয় খিলাফৎ আন্দোলন গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতের মুক্তিসংগ্রাম জোরদার করে তুল্‌ল।

এদিকে গোরখপুরের চৌরীচৌরা গ্রামে নিরস্ত্র জনতার উপর পুলিসের নির্মম অত্যাচার হল। ক্ষিপ্ত জনতা থানায় আগুন লাগিয়ে দিল আর বাইশ জন পুলিশ কর্মচারিকে মেরে ফেল্‌ল। গান্ধিজী তখন আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন (১৯২২)।

১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহেরু প্রমুখ নেতারা **স্বরাজ্য দল** গঠন করলেন। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল আইন সভায় প্রবেশ করে পদে পদে সরকারকে বাধা দেওয়া। প্রথমে কিছুটা সাফল্য লাভ হলেও চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর স্বরাজ্য দল দুর্বল হয়ে পড়ল। এদিকে তুরস্কে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় খিলাফৎ আন্দোলনও গেল বন্ধ হয়ে ; খিলাফৎ আন্দোলনের নেতারা অনেকেই মুসলিম লীগে এলেন।

১৯৩০ সালে গান্ধিজী আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলেন। সারা ভারতে **লবণ আইনের** বিরোধিতা করা হল। সমুদ্রঘেরা ভারত ; অথচ লবণ আনতে হবে বাইরে থেকে, আর তার জন্য দিতে হবে কর ? লবণ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন এত প্রবল হয়ে উঠল যে অহিংস জনতার উপর লাঠি আর গুলী বর্ষণ হতে লাগল। গান্ধী-আরউইন চুক্তি (১৯৩১) অনুসারে ইংরেজ রাজবন্দীদের মুক্তি দিলেন। গান্ধিজী লণ্ডনের 'গোলটেবিল বৈঠকে' যোগ দিলেন। এ বৈঠকে মুসলিম লীগের প্রধান নেতা মহম্মদ আলী জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় কিছুই সুফলল হল না।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য **সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা** প্রকাশ করলেন। হিন্দুরা ইংরেজের বিভেদ নীতিতে ক্ষুব্ধ হল। আন্দোলন শুরু হল প্রবল ভাবে। গান্ধিজীসহ হাজার হাজার কর্মী কারারুদ্ধ হলেন। গান্ধীর অনশনের ফলে উচ্চবর্ণ এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে একটা মীমাংসা হল। ঠিক হল, দুইবর্ণের হিন্দুরাই ভোট দেবে একত্র, কিন্তু নিম্নবর্ণ-হিন্দুদের কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা

থাকবে। তবে হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছুই মীমাংসা হল না। আইন অমান্য আন্দোলন চলতেই থাকল।

এই সময়ে ভারতের ভিতরে, বিশেষ করে বাংলায় এবং পাঞ্জাবে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা চলছিল। বিপ্লবী সূর্য সেনের (মাষ্টারদা) নেতৃত্বে **চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের** চেষ্টা মুক্তি আন্দোলনে স্মরণীয় হয়ে আছে।

দমন নীতিতে তেমন কাজ হচ্ছে না, এবারে তোষণ নীতি। ১৯৩৫ সালে নতুন শাসন-সংস্কার করল ইংরেজ। প্রতি প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হল। সংখ্যাগরিষ্ঠতার দরুণ ১১টি মধ্যে ৮টি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করল। মুসলিম লীগের নেতারা এ-সময়ে স্বতন্ত্ররাষ্ট্র দাবীর কথা ভাবছেন।

১৯৩৯ সালে **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ** বাধল। ভারত সরকার কংগ্রেসী আইন-সভার সঙ্গে কোন আলাপ আলোচনা না করেই ভারতকে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে টেনে আনল। স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি না পেলে কংগ্রেস এ যুদ্ধে সহ-যোগিতা করতে অসম্মত হল এবং সমস্ত প্রদেশে মন্ত্রিপদ ত্যাগ করল। সঙ্কটকালে কংগ্রেসের এই বিপক্ষতায় ইংরেজ সরকার বিব্রত বোধ করল। আপোষ করার জন্য ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে কূটনীতি-বিশারদ স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ভারতে এলেন স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দিতে, কিন্তু তাঁর শর্ত কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কারও পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব হল না। লীগ চাইল স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান, আর কংগ্রেস চাইল অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা। **ক্রীপস্ মিশন** ব্যর্থ হল। ১৯৪২ সালের ২রা আগষ্ট গান্ধিজীর 'ভারত ছাড়ো' (Quit India) প্রস্তাব গৃহীত হল। এর মর্ম হল—ইংরেজকে বিনা শর্তে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে, ভালয় ভালয় না গেলে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হবে। এই ঘোষণার কয়েকদিন পরেই কংগ্রেস কমিটিগুলো বে-আইনী ঘোষিত হল। গান্ধী বা অন্য কোন নেতাই আর কারাগারের বাইরে রইলেন না। আন্দোলন সন্ত্রাসবাদ রূপ নিল। শুরু হল নির্বিচার গুলীবর্ষণ। হাজার হাজার নরনারী হতাহত হল। এই গণ-আন্দোলনই **আগষ্ট বিপ্লব** নামে পরিচিত।

শেষ পর্যায়

আগষ্ট বিপ্লবের রেশ যখন চলেছে তখন ভারতের পূর্ব সীমান্তে দেখা দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের এক অভিনব পর্যায়। এই মুক্তিযুদ্ধের নায়ক হলেন **নেতাজী সুভাষচন্দ্র**। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পরই তিনি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে উপস্থিত হলেন জাপান। জাপানে ইংরেজ পক্ষের অনেক ভারতীয় সৈন্য

বন্দী অবস্থায় ছিল। সুভাষচন্দ্র জাপানী কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এই ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে **আজাদ হিন্দ ফৌজ** গঠন করলেন এবং ব্রহ্মের মধ্যে দিয়ে ভারত সীমান্তে এসে পৌছলেন। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল অবরোধ করে আসামের কোহিমা পর্যন্ত অগ্রসর হলেন ঃ কণ্ঠে তাঁদের 'চল দিল্লী' আওয়াজ।

আজাদ-হিন্দ ফৌজ দিল্লী পর্যন্ত যেতে পারেনি, কিন্তু সংগ্রামকে এগিয়ে দিয়েছিল অনেকখানি, একথা মানতেই হবে। ভারতের নানা জায়গায় গণ-অভ্যুত্থান ইংরেজ শাসনের ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দিল। ইংরেজ এবার ভাল করেই বুঝল প্রত্যক্ষ শাসন আর চলে না। ১৯৪৫ সালে ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা নতুন করে গঠিত হল শ্রমিকদের নেতৃত্বে। এই মন্ত্রিসভা ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার ইচ্ছায় তিন জন সদস্যের একটি মিশন পাঠাল। **মন্ত্রী-মিশনের** প্রস্তাব হল, ইংরেজ ভারত ছাড়বে, স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য গণপরিষদ আহ্বান করা হবে, কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনার জন্যে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে। কংগ্রেস এ প্রস্তাবে সম্মত হল এবং জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হল। মুসলিম লীগ এই অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিল না এবং এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে ১৬ই আগষ্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' দিন বলে ধার্য করল।

ইংরেজের বিভেদনীতির বীজ এবারে ফলন্ত মহীরুহে রূপ নিল। সারা দেশে সাম্প্রদায়িকতার অমানুষিক উত্তেজনা দেখা দিল। ইতিহাসের কালো পাতায় সে দুর্যোগের উল্লেখ থাকবে চিরকাল। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের অক্লান্ত চেষ্টায় অশান্তি প্রশমিত হল কিছুটা। মুসলীম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিল, কিন্তু গণপরিষদকে মেনে নিতে চাইল না। এই অপ্রীতিকর অবস্থা দূর করার জন্যে বড়লাট **লর্ড মাউন্টব্যাটেন** ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ করে দেশ-বিভাগের পরিকল্পনা পেশ করলেন। অগত্যা এই বিভাগ মেনে নেওয়া হল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকৃত হল। এই দুই রাষ্ট্রের উপর ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা বা পার্লামেন্টের কোন কর্তৃত্ব না থাকলেও এরা ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থের অন্তর্ভুক্তরূপে গণ্য হল।

১৯৫০ সালে ২৬শে জানুয়ারী থেকে ভারতের শাসনতন্ত্র চালু হয়েছে। এতে ভারতকে "স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র" বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পরে

ভারত এখন স্বাধীন। এতদিন স্বাধীনতালাভ ছিল আমাদের লক্ষ্য, এখন তা হল লক্ষে পৌছবার পথ। লক্ষ্য কী? ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ। স্বাধীনতা এবারে আমাদের সেই লক্ষ্যে পৌছতে সাহায্য করবে। দেশ গড়ে তোলার কঠিন কাজ আমাদের সামনে। সৃষ্টির কাজে শান্তিই সহায়। তাই ব্যাপকভাবে শান্তির পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে হবে আমাদের। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুর **"পঞ্চশীল"** শান্তির সপক্ষে ভারতের চিরকালের সমর্থনকেই রূপ দিয়েছে।

স্বাধীনতা রঙীন ফানুষ নয়। স্বাধীনতা অন্ন হয়ে আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে, স্বাধীনতা বস্ত্র হয়ে আমাদের শীত তাপ থেকে রক্ষা করবে, স্বাধীনতা জ্ঞান হয়ে আমাদের নিত্য নব শুভকর্মে প্রেরণা দেবে, স্বাধীনতা বিজ্ঞান হয়ে মানুষকে বড় করবার অমিত শক্তি আমাদের হাতে তুলে দেবে। স্বাধীনতাকে আমরা সমস্ত সত্তা দিয়ে পেতে চাই। এমন স্বাধীনতারই স্বপ্ন দেখেছিলেন আমাদের অগ্রজেরা। যে দেশের সহস্র বীর ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেলেন, স্বাধীনতা পাবার পর সে দেশের লোক যদি দুবেলা দুমুঠো খেতেও না পায় তবে সে কিসের স্বাধীনতা?

এই জিজ্ঞাসা বুকে নিয়েই দেশের নেতারা শাসনভার গ্রহণ করেছেন। অনেক বাধাবিঘ্নের মধ্যে দিয়েও তাঁরা দেশের উন্নয়নে ব্রতী হয়েছেন। দেশের কৃষি

বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব বিষয়েই উৎকর্ষ সাধনের জন্য পর পর তিনটি **পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা** নেওয়া হয়েছে।

বড়রা বড়দের মত করে কাজ করছেন, ছাত্ররা তাদের মত করেই দেশের নানা কাজে সহযোগিতা করতে পারে! তাদের মধ্যে দিয়ে বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ দেশবন্ধু আবার ফিরবেন। ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে তাদের পেয়ে দেশ ধন্য হবে। চিত্ত আর বিত্তের সার্থক সমন্বয়ে স্বাধীন সুখী ভারত গড়ে উঠবে।

'সেদিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিবে বপন
এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন
আসিবে সে দিন আসিবে ॥

অনুশীলনী

১। 'সাম্রাজ্যবাদ নিজেই নিজের কবর খোঁড়ে'—কিভাবে?

২। কৃষক বিদ্রোহের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সম্পর্ক কোন্‌খানে?

৩। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬১ সাল এই সময়টিকে 'বঙ্গসমাজের পক্ষে মহেন্দ্রক্ষণ' বলবার তাৎপর্য কী?

৪। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় ইংরেজ শাসকেরা উদ্যোগী হলেন কেন?

৫। 'বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন' কি প্রাদেশিক আন্দোলন? স্বাধীন ভারতে রাজ্য-পুনর্বিন্যাস ব্যাপারে কোন কোন প্রদেশে সরকারী নির্দেশের বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন হয়েছে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ আন্দোলন সম্পর্কে তোমার মতামত কী?

৬। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায় একটি দেশাত্মবোধক নাটিকা রচনা কর।

৭। রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত রাখিবন্ধন উৎসবের তাৎপর্য কী? রাখীবন্ধন উৎসবের একটি পূর্ণবিবরণ তৈরী কর [পড়ে নাও : ঘরোয়া ॥ অবনীন্দ্রনাথ] এই উৎসব পশ্চিমবঙ্গে পুনঃ প্রচলিত করার সপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি দাও।

৮। ভারতের মুক্তি আন্দোলনকে কয়েকটি পর্বে ভাগ কর এবং প্রত্যেকটি পর্বের বৈশিষ্ট্য দেখাও। মুক্তি—আন্দোলনের একটি যুগরেখা (Time Line) অঙ্কন কর।

৯। আমাদের স্বাধীনতাকে 'রক্তপাতহীন বিপ্লব বলা যায় কিনা আলোচনা কর।

১০। ইংরেজের বিভেদনীতি ভারতের রাজনীতিতে কিভাবে কাজ করেছে দেখাও।

১১। যে সব কবি, সাহিত্যিক একং নাট্যকারের রচনা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছে তাঁদের নাম কর এবং কালানুক্রমিক ভাবে তাঁদের রচনার একটি তালিকা তৈরি কর।

১২। বাংলার বিপ্লবী বীরদের জীবনী ও আলেখ্য সংগ্রহ কর। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিরক্ষার সর্বোত্তম উপায় কী ?

১৩। শ্রীনেহেরুর 'পঞ্চশীলে'র পাঁচটি 'শীল' কী কী ? 'পঞ্চশীল' নামটি উৎস কোথায় ?

১৪। বিতর্কের আসর : "কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ উপায়েই বিশ্বের সকল সমস্যা দূর করা যাবে।"

১৫। ছোটরা ছোটদের মত করে নানা কাজে সহযোগিতা করতে পারে—একথা আমরা বলেছি। তুমি ছোটদের জন্য এরকমের কাজের কোন পরিকল্পনা দিতে পার কি ?

১৬। ফিল্ম প্রদর্শনী ॥ 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ; সিপাহী বিদ্রোহ এবং গান্ধী প্রমুখ নেতাদের জীবনী অবলম্বনে ভারত সরকারের ফিল্মস্ ডিভিশনের তোলা ডকুমেণ্টারী চিত্র।

তৃতীয় পর্ব

সমাজ-সমিতি-রাষ্ট্র
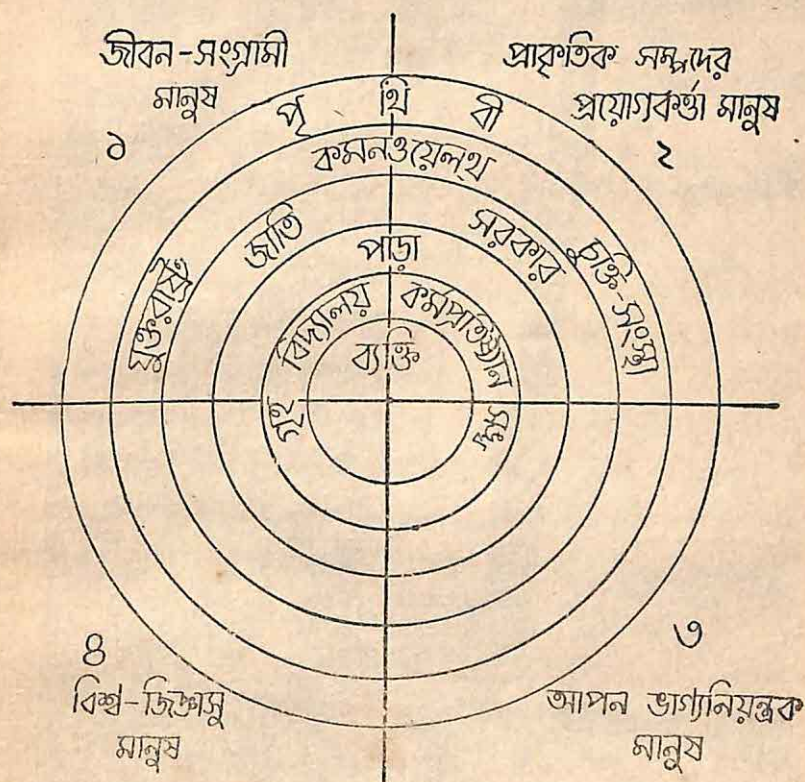
ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে বৃহৎ অঙ্গনে : মানুষের অভিজ্ঞতার পরিধি বৃদ্ধি
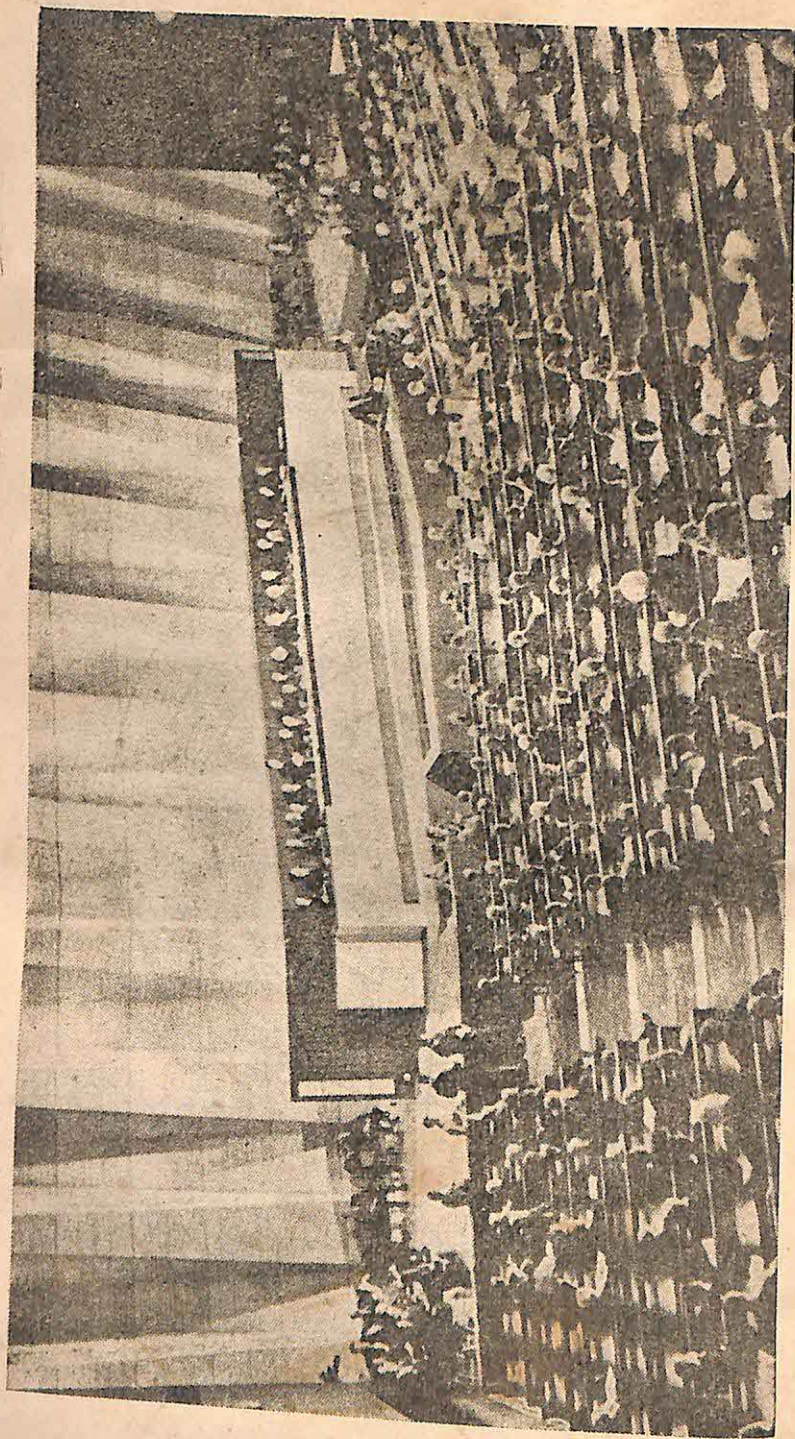
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ : প্যারিসে ইউনেস্কোর একটি অধিবেশন চলছে

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ পরিবার ও পরিবেশ ॥

'There is only one man in the world
and his name is all Men.
There is only one woman in the world
and her name is All women.
There is only one child in the world
and the child's name is All Children.'

প্রসিদ্ধ কবি কার্ল স্যাণ্ডবার্গের এই কথাগুলি দেশ কালের গণ্ডি পেরিয়ে আজও অমর হয়ে আছে। কত জাতি, কত ধর্ম, কত দেশ, কত কর্ম,—এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও মূল কথা শুধু একটিই : 'আমরা মানুষ'। মানুষের কবি সত্যেন দত্ত বলেন :

"জগৎ জুড়িয়া এক জাতি শুধু, সে জাতির নাম মানুষ-জাতি ;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত, একই রবি-শশী মোদের সাথী ॥"

সৃষ্টির কোন্ আদি কাল থেকে মানুষের জীবনযাত্রা শুরু হয়েছে, কোটি কোটি নরনারীর মিলিত চেষ্টায় গড়ে উঠেছে এই সমাজ ও সভ্যতা। চলতে চলতে একদল মুখ থুবড়ে পড়েছে, তাদের অসমাপ্ত কাজ সার্থকতার পথে টেনে নিয়ে গেছে আরেক দল মানুষ। এই ভাবে মানুষের অভিযান চলেছে ক্রমাগত, সুন্দর আর সুখী একটা পৃথিবী গড়ে তোলার স্বপ্ন তার চোখে।

লোকসমাজ

এ কথাটা খুবই সত্যি যে একলা থাকতে মানুষের মন চায় না। আমাদের কাজকর্ম, চিন্তা, অবসর-বিনোদন সবকিছু এক সাথে মিলে-মিশে করতে আমাদের ভাল লাগে। দশজনে মিলে যে কাজটা সহজসাধ্য, একার পক্ষে সেটা অত্যন্ত দুরূহ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : 'মানুষ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে। সেই সৃষ্টির কাজে ও রক্ষণের কাজে দেশের লোকের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়, আর সেই সৃষ্টি-করা দেশকে তারা প্রাণের চেয়ে ভালবাসতে পারে। দেশকে সৃষ্টি করার দ্বারাই দেশকে লাভ করবার সাধনা আমাদের ধরিয়ে দিতে হবে।'

পরস্পরের এই মিলনের সূত্রে পৃথিবীর দেশে গড়ে উঠেছে লোকসমাজ। সমাজ মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছে, আবার মানুষের জীবনযাত্রা যাতে উচ্ছৃঙ্খল না হয় সেজন্যে প্রয়োজনীয় মান নির্দিষ্ট করেছে, সামাজিক কতগুলো নিয়ম-কানুনে বেঁধে দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছে তার জীবনকে। একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই নিয়ম বা মান—এগুলো কি চিরস্থায়ী, চিরসত্য, অপরিবর্তনীয়? না, তা নয়। কেন না, যুগে যুগে মানুষের চিন্তা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে মানুষের মূল্যবোধও (sense of Values) বদ্‌লে যাচ্ছে। সেই পরিবর্তিত মূল্যবোধের পটভূমিকায় সামাজিক বিধিনিয়মগুলোকেও বদ্‌লাতে হয় বৈ কি! এবং সেটা করতে হয় মানবসমাজেরই কল্যাণের খাতিরে।

লোকসমাজ বলতে কী বুঝি? পৃথিবীর এক 'স্থানে' একদল 'লোক' যখন 'সহযোগিতা' ভিত্তিতে বাস করে তখনই গড়ে ওঠে **লোকসমাজ**। কয়েকটি বিশেষ Institution বা **সংগঠনের** সমবায়ে লোকসমাজের সৃষ্টি। একটা লোকসমাজের অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলো সংগঠন, যেমন—পরিবার, ধর্ম, সরকার, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি। এই বিভিন্ন সংগঠনের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে লোকসমাজের প্রতিষ্ঠা এবং অগ্রগতি। সেই সম্পর্কের সুতোটি ছিঁড়েছে কি লোকসমাজের নৌকোও টলমল!

একথা প্রায়ই বলা হয় যে পরিবারই হচ্ছে মানুষের প্রথম সমাজ। মানুষের মধ্যে সাদৃশ্য আছে, আবার বৈসাদৃশ্যও আছে। সাদৃশ্য না থাকলে একদল মানুষ মিলেমিশে থাকতে পারত না, সমাজও গড়ে উঠত না। আবার সমস্ত মানুষই যদি একেবারে একরকম হত, তা হলে তাদের সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে কিছুই বৈচিত্র্য থাকত না। যেমন নেই পিঁপড়ে বা মৌমাছির পতঙ্গ-সমাজে। তা হলে দেওয়া-নেওয়ার পাট চুকিয়ে দিতে হত, 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলবে'—সেই মহৎ ভাবটাকেও বিসর্জন দিতে হত। মানুষের সমাজে বৈসাদৃশ্য আছে, বিভিন্নতা আছে—এবং তা আছে বলেই 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'। আমাদের সমাজে প্রত্যেকেই অপরের কাছ থেকে কিছু নিচ্ছে, আবার অপরকে কিছু দিচ্ছে। সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

ঐ যে 'বিভিন্নতা'র কথা বললাম, তার নমুনা দেখতে পাই সমাজের **শ্রমবিভাগের** মধ্যে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, আগে সহযোগিতা, পরে বিভাগ। একটা স্কুলে শিক্ষক আছে, ছাত্র আছে, কেরানী আছে দপ্তরী আছে, মিস্ত্রী আছে, মালীও আছে। ভিন্ন ভিন্ন কাজ বটে, কিন্তু সবাই পরস্পরের সঙ্গে

সহযোগিতা করেছে। এই সহযোগিতার সূত্রটি শিথিল হয়েছে কি স্কুলের অধঃপতন শুরু হল। স্কুলের সম্বন্ধে যে কথাটা প্রযোজ্য, সমাজের অন্যান্য ছোট-বড় সংগঠনগুলির ক্ষেত্রেও তাই।

ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে বৃহৎ অঙ্গনে

ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে মানুষ দলবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করে। এর ফলে তাদের জীবনযাত্রার কত পরিবর্তন, কত বৈচিত্র্য। প্রথমে **পরিবার**। মানব-পরিবার সম্বন্ধে সবচেয়ে মজার কথা এই যে, দুজন ব্যক্তির কখনও ঠিক একরকম কাজ থাকে না—উভয়ের চিন্তায়, মতে, যোগ্যতায়, সামর্থ্যে কত প্রভেদ। এই প্রভেদের মধ্যে দোষের কিছু নেই, ব্যক্তিগত প্রভেদ আছে বলেই সমাজ-সভ্যতার এত উন্নতি, পৃথিবী এত সুন্দর। প্রত্যেক পরিবারের চাই একটা বাসস্থান, কিন্তু অর্থসম্পত্তি, কিছু সামাজিক বিধি-নিষেধ—সনাতন এবং স্ব-কল্পিত দুই-ই—যার বলে পারিবারিক জীবনযাত্রায় পরিবারের প্রত্যেক সদস্যেরই কোন-না-কোন অবদান থাকে।

তারপর **বিদ্যালয়**। পরিবারের শিশুটি এল এক নূতন পরিবেশে। প্রথম দিকের অচেনা অজানা পরিচয়ের কুয়াশা কেটে যাবার পর শিশু আবিষ্কার করল যে বাড়ীতে তার একটা স্বতন্ত্র মূল্য বা আসন ছিল, কিন্তু স্কুলে তারই বয়সী আরও কত শিশু প্রায় একই রকম শক্তি ও যোগ্যতা সবায়ের, একই অধিকার, একই কর্তব্য ও দায়িত্ব। বাড়ীতে আদর-আবদারের আধিক্যে বিচারধর্ম কতসময় অনাদৃত হত—স্কুলে এসেই সে জানল ন্যায়বিচার কাকে বলে। এখানে দুটো বিষয়ের সঙ্গে তাকে খাপ খাইয়ে চলতে হবে : স্কুলের দৈনন্দিন কাজকর্মের সঙ্গে আবার বিদ্যালয়-সমাজের জীবনযাত্রার সঙ্গে।

এরপর আছে নানা **কর্মপ্রতিষ্ঠান** : দোকান-পাট, কল-কারখানা, অফিস-আদালত। স্কুলের যেমন, এদেরও তেমনি পৃথক সংগঠনী আছে। 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ'—বিভিন্ন মানুষের যোগ্যতাও আলাদা আলাদা। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে সংগঠনগুলি বিভিন্ন মানুষকে আপন-দলভুক্ত করে। অবশ্য একথা মানতেই হবে যে বিদ্যালয়ের লক্ষ্য এবং আদর্শ থেকে এই সংগঠনগুলির লক্ষ্য বা আদর্শ অনেক পৃথক।

পরিবার, বিদ্যালয়, বিভিন্ন কর্মকেন্দ্র এবং অবকাশ-রঞ্জন সঙ্ঘ—এই সবকিছু হচ্ছে একটি বৃহত্তর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, যার নাম আমরা দিয়েছি **পরিবেশ**। স্থানীয় পরিবেশের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে গিয়ে তার অধিবাসীদের সমস্যা ও

প্রয়োজন কী কী, তাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কী, পরিবর্তনশীল দুনিয়ার সঙ্গে তারা নিজেদের মানিয়ে চলতে পারছে কি-না এগুলোর প্রতি যদি আমরা অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে তাকাতে পারি তবেই আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি পাকা হতে পারে। কাজেই সর্বপ্রথম জানতে হবে আমার পরিপার্শ্বকে। সেই জানা শেষ না হলে আমার সারা দুনিয়া সম্পর্কে জ্ঞানও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

স্থানীয় পরিবেশ সম্পর্কে প্রথম পাঠ আরম্ভ হোক আমার **গ্রাম** বা **শহর**কে নিয়ে। তার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, তার প্রাকৃতিক সম্পদ, তার বৃত্তি-বিভাগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য, তার সামাজিক সঙ্ঘ-সমিতি, এ সবই আমাদের অন্বেষণের বিষয়বস্তু।

এখানকার আলোচনা শেষ করে আমরা তাকাব আরও দূরে। হয়ত বৃহত্তর কলকাতা, অথবা, একটা **মহকুমা** বা **জেলা**র মত বৃহৎ অঞ্চলে। একটি অঞ্চলের সঙ্গে পৃথক-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন আরেকটি অঞ্চলের তুলনা করে আমাদের জ্ঞানকে সম্পূর্ণ করে তুলব।

এবার পরিধি আরও ব্যাপক। হয়ত সম্পূর্ণ **দেশ**টা, গোটা **জাত**টা। ভারতবর্ষ আর ভারতবাসী। নিজের দেশ ও জাতিকে চেনা হলে চীন, জাপান, মিশর, আরব, ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ, জার্মানী প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদের সম্বন্ধে 'কী ও কেন'র হাজার রকম প্রশ্ন তুলে কত তথ্যই না সংগ্রহ করা যায়। সমাজ-জিজ্ঞাসার দিক থেকে সে সব তথ্যের মূল সত্যই অপরিসীম। ওদের আর আমাদের প্রয়োজন একই, স্বপ্ন একই, প্রতিভা একই, একই উচ্চাশা—কিন্তু আদর্শ ও লক্ষ্যের দিক দিয়ে ওদের আর আমাদের সমাজে হয়ত আকাশ-জমি তফাৎ।

এবার আমরা পৃথিবীর কতগুলো বৃহত্তর এলাকার মধ্যে এসে পড়লাম : **প্রাকৃতিক অঞ্চল**—যেমন, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, মৌসুমী অঞ্চল, তুন্দ্রা অঞ্চল ইত্যাদি ; কিংবা, **রাজনৈতিক সংস্থা**—যেমন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা (SEATO), উত্তর-আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (NATO), কমিউনিষ্ট পার্টি, ইত্যাদি ; অথবা কোনো **সামরিক অধিকার**—যেমন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ফরাসী সাম্রাজ্য, ইত্যাদি। পৃথিবী এই যে সব বৃহৎ এলাকায় ভাগ হল, এই সমস্ত বিভাগের ফলে সমাজে বহু গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, তাও স্বীকার করতে হবে।

সবশেষে, সর্ববৃহৎ অঙ্গন হচ্ছে আমাদের **পৃথিবী**—'অচল অবরোধ আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী, গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌন ধ্যাননিমগ্না

পৃথিবী, নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী।' এই পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের সুখ-দুঃখ, অভাব অভিযোগ, স্বার্থ আর প্রয়োজন, স্বপ্ন এবং আশা আমাদের জিজ্ঞাসার দুয়ারে এসে প্রতিনিয়ত ঘা মারছে। সভ্যতার ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাসে গোটা পৃথিবীর মানুষ কিভাবে আপন চেষ্টা আর কল্পনা দিয়ে সুখী-সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলছে তার কাহিনী যেমন চমকপ্রদ তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য শিল্পকলা কি শুধু একজনের আর একটি দেশের? ওগুলো এখন ঐতিহ্য-সূত্রে নিখিল বিশ্বের সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পণ্যদ্রব্যগুলো? সেগুলো তো নিখিল বিশ্বের সম্পত্তি হয়নি, যার-যার তার-তার। বহু প্রাচীন যুগে, সভ্যতার উষালোক যখন দেখা দেয়নি পৃথিবীর বুকে, তখন কিন্তু সবাই একসঙ্গে জিনিস উৎপন্ন করত, একযোগে ভাগাভাগি করে তাই ভোগ করত। আর আজকের দুনিয়ায় একটা দেশের লোক হয়ত উপোস করে মরছে, অন্য দেশে উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্য পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে।

পরিবার

মানবগোষ্ঠীর প্রধানত দুটি ভাগ: ক্ষুদ্র বা **মুখ্যগোষ্ঠী** (Primary Group) যেমন পরিবার—যেখানে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও চেনাপরিচয়; আর বৃহৎ বা **গৌণ গোষ্ঠী** (Secondary Group), যেমন সঙ্ঘ সমিতি—যেখানে সদস্যদের মধ্যে আন্তরিক জানাশুনো খুব কম।

মানুষের সামাজিক জীবনের প্রথম সোপান হচ্ছে পরিবার। এই পরিবারেই গড়ে ওঠে শিশুর প্রথম সমাজ-বন্ধন যার মাধ্যমে সে নানান্ অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং সেগুলোকে প্রণালীবদ্ধ করে। মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বলেন, শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, শিশুর মন যেন একখানি পরিষ্কার শ্লেট (*'tabula rasa'*), কাজেই প্রথম পাঁচ বছরে তার মনের শ্লেটে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার যে ছাপ পড়ে, তার প্রভাব এত বেশি যে ঐ শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন সেই প্রভাবের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে, তার চরিত্র সেইভাবেই গঠিত হয়। আর যেহেতু শিশুর প্রথম পাঁচ বছর কাটে পরিবারের মধ্যে মায়ের নিবিড় সান্নিধ্যে, কাজেই পারিবারিক আবহাওয়া যদি সুন্দর না হয়, শিশুর মনোমত না হয়, তার বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিভা বিকাশের উপযোগী না হয়, তা হলে সেই শিশু পরবর্তী জীবনে একটা খাপছাড়া (maladjusted) মানুষে পরিণত হবে, দেশের প্রকৃত নাগরিক রূপে গড়ে উঠবে না, সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ব্রাউনের ভাষায়: 'যে পরিবারে ভালবাসার সহজ আন্তরিক প্রকাশ রয়েছে

সেখানে শিশু এমন একটি চমৎকার ব্যক্তিত্ব নিজের মধ্যে গড়ে তোলে যার স্পর্শ কেবল তার পরিবারের মধ্যেই নয়, বাহিরের অন্য যার সান্নিধ্যে সে আসে তাকেও মুগ্ধ করে। পরন্তু, যদি সেই স্নেহের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়, তবে অন্যদের প্রতি একটা অনাত্মীয় মনোভাবের সৃষ্টি হয়।'*

সঙ্ঘ-সমিতি

মানুষ তার জীবনের উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করে তিনটি উপায়ে। (১) অন্যের বা পরিণামের কথা চিন্তা না করে স্বাধীনভাবে কাজ করা যেতে পারে। এটা কিন্তু অত্যন্ত অসামাজিক কাজ বিশেষত যেখানে একদল মানুষ একসঙ্গে বসবাস করছে। (২) অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষ করে নিজের ব্যক্তিগত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা সম্ভব। আমাদের সমাজ-জীবনে সংঘাত থাকবে না, এমন হতেই পারে না; কিন্তু কাজে বা মতে সংঘাতটা যদি বিধিনিয়মের দ্বারা সুপথে পরিচালিত না হয়, তা হলে সমাজের অস্তিত্বই বিপন্ন হবার আশঙ্কা। (৩) সহযোগিতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজে হাত লাগালে উদ্দেশ্য সার্থক হতে পারে; এখানে প্রত্যেকেই অপরের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক।

এই যে শেষতম উপায়টি—অর্থাৎ **সমবায় প্রচেষ্টা**—এরই ফলে একদল মানুষ নিজেদের কোন স্বার্থ পরিপুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যভাবেই হয়ত একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুল্‌ল। যখন এটা ঘটে, তখনই জন্ম নিল Association বা "সঙ্ঘ-সমিতি"।

সঙ্ঘ-সমিতি বলতে তা হলে এই বোঝায়: যার সঙ্গে সকলে সাধারণভাবে জড়িত, এমন কোন স্বার্থ বা একাধিক স্বার্থের চরিতার্থতার জন্যে যে গোষ্ঠী গড়ে ওঠে তাকে অ্যাসোসিয়েশন বা সঙ্ঘ-সমিতি বলে—'a group organised for the pursuit of *an interest or group of interest* in common' এই সংজ্ঞাটি থেকে বোঝা যায় যে **সঙ্ঘ-সমিতি আর লোকসমাজ** (community) এক জিনিস নয়; সঙ্ঘ বা সমিতি লোকসমাজের অন্তর্গত একটা প্রতিষ্ঠান। লোকসমাজ কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান মাত্র নয়। সভা-সমিতিগুলো "বিশেষ" কোন উদ্দেশ্য বা স্বার্থ আছে বলে আমি তার সভ্য হই। লোকসমাজের অত সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য থাকে না; প্রকৃতপক্ষে একটি লোক সমাজের মধ্যে অনেকগুলো সঙ্ঘ-সমিতির অস্তিত্ব থাকতে পারে। তেমনি

*F. J. Brown : Sociology of Childhood. p. 11.

একজন মানুষ মাত্র একটি লোকসমাজের অন্তর্গত হতে পারে, কিন্তু সে ইচ্ছা করলে একাধিক সভাসমিতির সদস্য থাকতে পারে।

সংঙ্ঘ-সমিতি আর সংগঠনের (Institution) মধ্যেও পার্থক্য অনেক। মানুষের সমাজে যে চারিটি প্রধান সংগঠন আছে—পরিবার, ধর্ম, সরকার এবং ব্যবসা-বাণিজ্য—সেগুলো সভা-সমিতির চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী। একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ধর্ম আমাদের একটা সংগঠন। কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে কত সঙ্ঘ-সমিতি মানব-সমাজের সেবা করে চলেছে—রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম, গৌড়ীয় মঠ, ইয়ং মেন্‌স্ ক্রীশ্চান অ্যাসোসিয়েশন, স্যালভেশন আর্মি ইত্যাদি।

আধুনিক যুগে সঙ্ঘ-সমিতিগুলোর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর কারণ সংস্কৃতির বিপুল উন্নতি। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের অবকাশ বিনোদনের অধুনা-প্রচলিত হাজার রকম উপায়ের কথা বলা যায়, সেটা সম্ভব হয়েছে নূতন নূতন খেলাধূলা এবং আমোদ-প্রমোদ সমিতির উদ্ভাবনের ফলে। আবার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যতই বাড়ছে তার কাজকর্মের পরিধি ততই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। পাড়ার ক্রিকেট ক্লাবের শুধু ক্রিকেট খেলাই কাজ, পূজা সমিতিও প্রতিমা বিসর্জনের পর সমাজের পাঁচটা সমস্যা নিয়ে এমন কিছু মাথা ঘামায় না। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। প্রত্যেক সঙ্ঘ বা সমিতিই চাইছে আত্মপ্রচার, সংখ্যায় অগুন্‌তি বলে তাদের মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে, উপায়ান্তর না দেখে প্রত্যেক সমিতিই নিজের কর্মক্ষেত্র এনেছে ছোট করে। এইখানেই তো 'সঙ্ঘ-সমিতি' আর 'সংগঠনে' তফাৎ। আমাদের পারিবারিক, ধর্মীয়, সরকারী বা বাণিজ্যিক সংগঠনগুলির কর্মক্ষেত্র কত ব্যাপক ও বিচিত্র, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। অমুক ছাত্রটি কিশোর-সঙ্ঘের সভ্য, যার কাজ শুধু ফুটবল খেলা। অমুক শিক্ষকটি শিক্ষক-সমিতির সভ্য. যার কাজ শিক্ষকদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা। ছাত্র আর শিক্ষক যে যার বিশেষ ক্ষেত্রে এক-একজন 'স্পেশ্যালিষ্ট' হয়ে উঠেছে। বর্তমান যুগের এই **বিশেষীকরণের** Special-isation) হেতু কী? কতগুলো সামাজিক কারণ এর জন্যে দায়ী। এক, লোকসংখ্যার বৃদ্ধি। দুই, সভা-সমিতির আধিক্য। তিন, যোগাযোগ ও যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি। চার, সমিতিগুলোর কর্মদক্ষতা, কেননা একদল মানুষ যখনই সঙ্ঘভুক্ত হয় তখনই তারা নিজেদের উদ্দেশ্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারে। সবচেয়ে দামী কথা হচ্ছে, যেসব সঙ্ঘ-সমিতি অধিকতর সক্রিয় এবং কর্মকুশলী সেগুলিই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, আর যারা নিষ্ক্রিয় হয়ে কেবল

পরনিন্দা, পরচর্চা ও আড্ডায় মশগুল তাদের প্রদীপের সলতে নিভতে বেশি দেরি হয় না।

পরিবার ও সঙ্ঘ জীবনের শিক্ষা

উপরের আলোচনা থেকে একটা মূল্যবান সিদ্ধান্তে পৌছানো গেল যে, পারিবারিক জীবনে আমরা মা বাবা-ভাই-বোনের স্নেহ ভালবাসা ও সাহায্য সহানুভূতি যেমন প্রত্যাশা করি, তেমনি বৃহত্তর-সমাজ-জীবনে নানান্ সভা-সমিতি-সঙ্ঘের দলভুক্ত হয়ে সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে তুলি। এইভাবে আমাদের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সমাজ-জীবনের সেতুবন্ধ স্থাপিত হয়। আমাকে শুধু নিজের স্বার্থ সুখের চিন্তা করলেই চলে না। আমি যেমন পরিবারের সকলের কাছেই কোনো-না-কোনো সাহায্য নিয়ে থাকি, তেমনি আমারও কর্তব্য পরিবারের সবায়ের মঙ্গলামঙ্গলের কথা চিন্তা করা। নইলে এক পরিবারের মধ্যে বাস করে আমি আত্মীয় হলাম কিসে?

পারিবারিক জীবনে যা সত্য, বৃহত্তর সমষ্টিজীবনেও সেই কথা খাটে। সমাজের বিভিন্ন সংগঠন আমাকে কতভাবে সাহায্য করছে, সেই সমাজের শুভচিন্তা করা কি আমার কর্তব্য নয়? আমাকে নিয়েই তো সমাজের সংগঠন আর সঙ্ঘ-সমিতিগুলো গড়ে উঠেছে, কাজেই তাদের সেবা করার মধ্য দিয়ে আমিই উপকৃত হচ্ছি না কি? পারিবারিক জীবনে এবং সভা-সমিতি সঙ্ঘের জীবনে আমরা কত শিক্ষাই না লাভ করি! এই সব শিক্ষা আমাদের চরিত্র-গঠনে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

পরিবারের রূপ বদল

আধুনিক বিশ্বে যন্ত্রসভ্যতার আবির্ভাবে কলকারখানা সৃষ্টি ও নগর প্রতিষ্ঠার ফলে আমাদের জীবনযাত্রায় অনেক রূপান্তর ঘটেছে। কখনও বা যন্ত্রযুগ-সুলভ কৃত্রিম মনোবৃত্তির প্রভাবে, কখনও বা নিছক প্রয়োজনের তাগিদে আগেকার একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এর ফল ভাল, মন্দ দুই-ই আছে। তারপর, আজকাল পরিবারের অনেক কাজের দায়িত্ব সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে। বর্তমান জটিল আবহাওয়ায় বিদ্যালয়ের পক্ষে এমন কতগুলো বিষয়ে শিক্ষাদান সম্ভব বা পরিবারের সহজসাধ্য নয়। রোগের পরিচর্যা বা আরোগ্যবিধানের জন্যে পরিবারের চেয়েও হাসপাতালগুলো বেশি উপযোগী। তাই অনেক সমাজবিজ্ঞানী ভবিষ্যদ্বাণী

করেছিলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমাদের পরিবারগুলো বোধহয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু এত পরিবর্তনের ধাক্কা সহ্য করে আজও মানুষের সমাজে চিরস্থায়ী সত্য হয়ে টিঁকে আছে পরিবার। ভবিষ্যতের শত পরিবর্তনেও টিঁকে থাকবে সে।

পবিত্র জীবন

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছেন, "Life is not merely living but is living well"—বেঁচে থাকাটাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, ভালভাবে বেঁচে থাকাই জীবনের সার কথা। উদরের চাহিদা মিটিয়ে নেবার পরও আমাদের মনের পিপাসা যায় না। মনের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য মানুষ তাকায় যা কিছু সুন্দর আর পবিত্র তার পানে। রচনা করে কত কাব্যকাহিনী, গড়ে তোলে সুস্থ-সুখী দেশ ও সমাজ। সমাজে বিভিন্ন মানুষের চিন্তাধারা ও ভাবের বিনিময়ে ফলে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়, সভ্যতার ভাণ্ডারে জমা হয় সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিল্প-কলার বিচিত্র অবদান, যেগুলো সভ্য ও পবিত্র জীবন যাপনের পক্ষে একান্তই অপরিহার্য। 'জীবনে জীবন যোগ করা না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় পসরা'—এই মহৎ আদর্শ বুকে নিয়ে মানুষ তার জীবনের জয়গান গেয়ে চলেছে দিকে দিকে, দেশে দেশে, নিখিল জগৎপারাবারের তীরে। শুধু পরিবার নয়, শুধু সঙ্ঘ-সমিতি নয়, শুধু সংগঠন নয়, একটি লোকসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকাও নয়—মানুষ আজ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে **আন্তর্জাতিক সংস্থা** গড়ে তুলছে, "এক পৃথিবী" রচনায় অগ্রসর হচ্ছে। শুধু মন্দিরের কোণে বসে ঈশ্বরের নাম জপ করলেই জীবন পবিত্র হয় না। চরিত্র ও মনকে সুন্দর করতে হবে, পরিবারেরও বৃহত্তর সমাজের প্রতি প্রত্যেকের মহান্ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হতে হবে। তবেই জীবন পবিত্র হল, নইলে জ্ঞানবিজ্ঞানের দশ দিকে বিচরণ করেও জীবন অপূর্ণ রয়ে গেল।

অনুশীলনী

১। (ক) প্রাচীন কালের লোকসমাজগুলি অন্যনিরপেক্ষ, স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল।

(খ) বর্তমান যুগের সমাজকে পরনির্ভর না হয়ে উপায় নেই।

—সমস্যাটির সম্ভাব্য কারণ কী কী হতে পারে?

২। শৈশব থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত সব বয়সের সমস্ত প্রয়োজন কি পরিবারের দ্বারা মেটানো সম্ভব? সমাজের কাছ থেকে পরিবার কিভাবে সাহায্য পায়?

৩। বিতর্কের আসর॥ "একক পরিবার অপেক্ষা একান্নবর্তী পরিবারই ভাল।"

৪। (ক) মানুষের পিতৃপ্রধান সমাজে—যেখানে একার কর্তৃত্ব সবাইকে মেনে চলতে হত—সেখানে পরিবারের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকত।

(খ) আধুনিক সমাজে নারী ও পুরুষের কর্তৃত্ব সমান বলে স্বীকৃত হওয়ায় পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে।

—এ সমস্যাটির আলোচনা কর।

৫। কিশোরদের পারিবারিক জীবনযাপনের উপযোগী করার ব্যাপারে আমাদের স্কুল-কলেজের কী কর্তব্য হওয়া উচিত?

৬। তোমাদের পাড়ার কয়েকটি ক্লাব বা সমিতির নাম কর। তুমি কোন্‌টির বা কোন্‌গুলির সদস্যভুক্ত? এই সব সমিতির সদস্য হয়ে তোমার কোন উপকার হয়েছে কি? তোমাদের সমিতির কিভাবে আরও উন্নতি করা যায় সেজন্য কোন গঠনমূলক পরামর্শ দিতে পার কি?

৭। 'আদর্শ' বলতে কী বোঝ? কী সেই আদর্শ যা মানুষকে একটি সুখী সমাজ গড়ে তুলতে প্রেরণা দেয়?

৮। তুমি যে পাড়ায় বাস কর সেটা সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পিত হয়েছে তো? তোমার পাড়ার সঙ্গে অন্যান্য এলাকার কতভাবে যোগাযোগ রয়েছে? আচ্ছা, তোমায় যদি পাড়াটাকে নতুন পরিকল্পনা দিতে বলা হয়, তা হলে তুমি কিভাবে সেটা তৈরী করবে?

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতি ॥

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট—"

এ তো সমাজের প্রতিটি মানুষের আকাঙ্ক্ষা। সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি সবল সুস্থ হয়ে গড়ে না ওঠে তবে সে-সমাজের কাছ থেকে মানবসভ্যতা খুব বেশি কিছু আশা করতে পারে না। আমাদের দেশের জনস্বাস্থ্যের মান অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই নিচু। মড়কে উজাড় হয়ে যায় গ্রাম-কে-গ্রাম। শহর বা নগরের স্বাস্থ্য-সমস্যাও অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে। দারিদ্র্য এবং বেকার সমস্যাই প্রধানত স্বাস্থ্যসমস্যার মূলে। অর্ধাশনে অনশনে যারা আছে, রোগের শিকার তারা সহজেই হবে বলাই বাহুল্য। স্বাধীনতালাভের পর যে তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে যেসব অভাব বা অব্যবস্থা স্বাস্থ্যহানির মূলে, তা নিরসন করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু নাগরিক হিসেবে এবিষয়ে আমাদেরও কিছু ভাববার আছে। আমাদের অনেক সমস্যার জন্য আমরাও নিজেরা কতকটা দায়ী। স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও একই কথা। নাগরিকের গুণ এবং অধিকার সম্বন্ধে আমরা যদি আর একটু অবহিত হই তা হলে স্বাস্থ্য-সমস্যারও কিছুটা সমাধান হতে পারে। কারণ স্বাস্থ্য-সমস্যাকে পৃথক ভাবে দেখা যায় না, অন্যান্য জাতীয় সমস্যার সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

নাগরিকের গুণ ও কর্তব্য

যখনই বলছি, 'চাই বল চাই স্বাস্থ্য' তখনই তার মধ্যে অধিকার-বোধের একটা সুর বেজে ওঠে। হ্যাঁ, স্বাধীন দেশে সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকবার অধিকার আমাদের আছে। কিন্তু যখনই অধিকারের প্রশ্ন উঠল তখনই তার সঙ্গে এল কর্তব্যের কথা। অধিকার অর্জন করতে হলে নাগরিকের কতকগুলো গুণ ও কর্তব্য থাকা প্রয়োজন।

নাগরিকের গুণ মানুষের সাধারণ গুণ থেকে পৃথক কিছু নয়। এক কথায় বললে বলতে হয়—শুধু নিজের কথা নয়, পরের কথাও ভাবা। আনন্দ পাবার জন্যে রেডিওর গান নিশ্চয়ই শুনতে পারি, কিন্তু পাশের বাড়িতে

গুরুতরভাবে অসুস্থ বৃদ্ধটির কথা ভেবে নিশ্চয় রেডিওটা বন্ধ করে অথবা ভলিউমটা খুব কম করে দেওয়া উচিত। অনেকটা জায়গা নিয়ে বসবার একটা স্বাচ্ছন্দ্য আছে, কিন্তু আরেকজনকে দাঁড় করিয়ে রেখে সে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ চাওয়া নিশ্চয়ই ভাল নয়। বাড়ির পাঁচিলটা কয়েক ফুট বাড়িয়ে দেওয়া যায় অনায়াসেই, কিন্তু তাতে যদি বস্তির ঘরগুলোতে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে তা হলে সেটা করা অনুচিত হবে। আইনগত বাধা না থাকলেও এই যে অন্যের সুবিধা অসুবিধার দিকে তাকিয়ে চলা একেই বলে Civic sense. আদর্শ নাগরিকের এ গুণ থাকা চাই-ই। সেই সঙ্গে সকলের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে যে সব আইন করা হয়েছে তাও মেনে চলতে হবে সমাজের সবাইকে। এই যে মেনে চলা, বুঝে চলা—এই হল নাগরিকের গুণ বা কর্তব্য। সংক্রামক রোগের সময় যে টিকা নেয় না, সে শুধু নিজেকেই বিপন্ন করে না, সমাজের আর সবাইকেও বিপন্ন করে তোলে। নাগরিক কর্তব্য ঠিকমতো মেনে না চলার ফলে সমাজের নিরাপত্তাই বিঘ্নিত হয়।

নাগরিকতার আদি কথা : স্বাস্থ্য

সু-নাগরিক। আদর্শ মানুষ। 'মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন'—আদর্শ মানুষের পণ। যুগে যুগে ইতিহাসের পাতায় এই প্রতিজ্ঞার উজ্জ্বল স্বাক্ষর :

'We will never bring disgrace to this our city by any act of dishonesty or cowardice ;

nor ever desert our suffering comrades in the rank ;

we will fight for the ideals and sacred things of the city —*both alone and with many* ;

we will revere and obey the city's laws, and do our best to incite a like respect in those among us who are prone to annul them or set them at naught ;

we will strive unceasingly to quicken the public's sense of civic thought.

Thus in all these ways we will transmit this city not only less, but *greater*, *better*, *more beautiful* than it was transmitted to us.'

গ্রীসের নাগরিকদের এই কঠিন শপথবাণী যে-কোনো দেশের নাগরিকদেরই জীবনের ব্রত হওয়া উচিত। আলেকজাণ্ডারের যখন জন্ম হয় তখন তাঁর

পিতা ম্যাসিডনাধিপতি ফিলিপ দার্শনিকপ্রবর অ্যারিস্টটলকে লিখলেন: "আমার একটি পুত্রলাভ হয়েছে; এজন্যে দেবতাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু খুব বেশি কৃতজ্ঞ হতে পাচ্ছি না, তার কারণ এই শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে আপনারই সমসাময়িক কালে। আমি জানি, আপনার নিকট শিক্ষাগ্রহণের পর সে আমাদেরই সমান যোগ্যতা এবং সিংহাসনের অধিকার অর্জন করতে পারবে।" ভবিষ্যৎ জীবনে আলেকজাণ্ডার অতুলনীয় পরাক্রমে কিভাবে দিগ্বিজয়ী হয়েছিলেন তা কারও অজানা নয়। গুরুর প্রতি তিনি এই বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন: "To my father, I owe my life, to Aristotle, the knowledge how to live worthily."—পিতা আমাকে জীবন দিয়েছেন; আর গুরু আমায় শিখিয়েছেন কী করে বাঁচাকে সার্থক করতে হয়।

সার্থকভাবে বাঁচতে চাই—আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু। প্রাচীন গ্রীকেরা একটা সুন্দর কথা ব্যবহার করতেন—'*Mens sana en corpor sana*'—যার ইংরেজী মানে হচ্ছে—Sound mind in a sound body—দেহই যদি সুস্থ না রইল তবে মস্তিষ্কের কাজ সুষ্ঠুভাবে করব কী করে। গ্রীক মায়েরা নাকি পাহাড়ের উপত্যকায় যখন মেষ চরাতে যেতেন তখন কোলের শিশুকে শুইয়ে রাখতেন পাহাড়ের বুকে—রোদে পুড়ে, জলে ভিজে শিশুর দেহ মজবুত হয়ে গড়ে উঠত কঠিন ইস্পাতের মত।

ভারতের জনস্বাস্থ্য

আসল কথা, সুন্দর স্বাস্থ্য চাই। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির একেবারে গোড়ার কথা হচ্ছে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে সচেতন করা, দায়িত্ব গ্রহণে প্রণোদিত করা। সেটা কি ভাবে সম্ভব? নিজেকে নিজে সাহায্য করা; অর্থাৎ নিজের নিজের সমস্যাগুলোর নিজেই সমাধান করা; তাতে নিজেরই উপকার। এই নীতি আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে প্রকৃত শক্তি যোগায়—এই সহজ নীতিটাই **গণতন্ত্রের ভিত্তি**।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে আমরা চাই পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ জলবাতাস, ময়লা দূরীকরণ, সুবাস্তু নির্মাণের সুবিধা, পরিষ্কার রাস্তাঘাট, আমোদ-প্রমোদের সুযোগ—এমনি কত কী! উপযুক্ত আহার, পরিচ্ছন্ন পোশাক, স্বাস্থ্যসম্মত শোয়া-হাঁটা-বসা, সৎ রুচি চিন্তা ও অভ্যাস এবং সুনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাত্রা—এ তো সকলেরই কাম্য। একদিকে রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ (prevention of infection), অন্যদিকে সুস্থ পরিবেশ (healthy environment) গঠন—এই দুটি উদ্দেশ্যকে মূলধন করে রচিত হয় জনস্বাস্থ্য পরিকল্পনা।

একথা কারও অবিদিত নয় যে জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে ভারতবর্ষের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। হল্যাণ্ডে যেখানে মনুষ্যের গড় আয়ু ৭২ বৎসর, আমেরিকায় ৫০ বৎসর ব্রিটেনে ৫৬ বৎসর, সেখানে ভারতে মাত্র ৩২ বৎসর। এ দেশের জন্মহার যেমন বেশি, তেমনি বেশি এর মৃত্যুসংখ্যা। পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই সর্বাধিক সংখ্যা শিশু অকালে প্রাণ হারায়। এক হাজার নব জাতকের মধ্যে সুইডেনে এক বছর মারা যায় মাত্র ১৭টি, ভারতে ১৬৭টি।

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সরকার প্রথম মনোযোগ দেন ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। এই সময় মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। সেই সময় সৈনিকদের মধ্যে মৃত্যুর হার খুব বেশি থাকায় তার প্রতিকারকল্পে একটি **রাজকীয় কমিশনের** (Royal Commission) প্রতিষ্ঠা হয়। এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বোম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজে একটি করে 'স্যানিটারী কমিশন' বসিয়ে পৌর স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য অফিসার নিয়োগ করা হল। তারপর ১৮৯৬ সালে বোম্বাইতে মহামারীর আকারে প্লেগ রোগ দেখা দিলে ঐ প্রদেশে একজন জনস্বাস্থ্য-কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৯১২ সালে **প্রত্যেক প্রদেশে** কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে **জনস্বাস্থ্য-বিধান** (Department of Public Health) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রতিটি প্রদেশে সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের নিয়ে একটি করে 'স্যানিটারী বোর্ড' গঠিত হল। প্রত্যেক জেলায় একজন সিভিল সার্জনের অধীনে সরকারী হাসপাতাল আছে, আর আছেন ডিষ্ট্রিক্ট হেল্‌থ অফিসার। প্রতিটি মহকুমা এবং থানায়ও স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মচারী আছেন, ইউনিয়ন বোর্ড ও পঞ্চায়েতগুলিকেও জনস্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব নিতে হয়। সমগ্র জনস্বাস্থ্য-বিধানটির নিয়ামক হচ্ছেন রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন দপ্তরের মন্ত্রী।

কেন্দ্রীয় সরকারেও আলাদা ভাবে একটি জনস্বাস্থ্য বিভাগ আছে। জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দেবার জন্য এই বিভাগের অধীনে একজন ডিরেক্টর জেনারেল ও একজন কমিশনার আছেন।

ভারতে সর্বপ্রথম মেডিক্যাল কলেজ খোলা হয় কলকাতা ও মাদ্রাজে—১৮৩৫ সালে। এর পর থেকেই এ দেশে চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষার দ্রুত প্রসার হতে থাকে, অনেক মেডিক্যাল কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়। চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণা চালাবার জন্য ভারতে প্রায় পঁচিশটি গবেষণাকেন্দ্র আছে। সরকারী উদ্যম ও কর্মপ্রচেষ্টার পাশাপাশি অনেকগুলি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অকুণ্ঠ সহযোগিতা জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সত্যই প্রশংসনীয়।

সমস্যা ও প্রতিকার

আমাদের দেশের ভগ্নস্বাস্থ্য, নিরানন্দ গ্রামগুলির পানে তাকালে সত্যই দুঃখ হয়। স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে সরকারী প্রচেষ্টা এতই নগণ্য যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাকে "a drop in the ocean of Indian humanity" বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। সংক্রামক ব্যাধির দমনের চেয়ে নিবারণের উপরেই অধিক জোর দেওয়া উচিত ছিল, পল্লীগ্রামে তা হয়নি, হচ্ছেও না। জাভার মতো একটা ছোট অনুন্নত দেশ যদি বাধ্যতামূলক টিকাদানের ব্যবস্থা করে কলেরার উচ্ছেদ করতে পেরে থাকে, তবে ভারতবর্ষের পল্লীগুলোতেই বা সে ব্যবস্থা হবে না কেন? খাদ্যাভাবের দরুন পুষ্টিহীনতা এবং অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা—এ দুটি হচ্ছে আমাদের সকল ব্যাধির মূলে। তার সঙ্গে আছে অতিজনতার চাপ। বড় বড় শহরের **বস্তি সমস্যা** সমগ্র জাতির স্বাস্থ্যে ঘুণ ধরিয়ে দিচ্ছে! দেহের পুষ্টিবৃদ্ধির জন্য শুধু গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করলেই তো সমস্যা মিটবে না। "Give the people enough food, and nutrition will take care of itself"—বলেছিলেন জনৈক বিখ্যাত ইংরেজ চিকিৎসক। ব্রিটেন, রাশিয়া, জার্মানী ও জাপানে প্রবর্তিত **পল্লীস্বাস্থ্য-পরিকল্পনা**গুলো আমাদের দেশেও আশু অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন। ভারতের প্রধান প্রধান প্রধান চিকিৎসকদের অভিমত এই যে, এদেশে উপযুক্ত ডাক্তারের অভাব নেই, আসল গলদ আমাদের পরিকল্পনা ও পরিচালনার মধ্যে, **মেডিক্যাল শিক্ষাপ্রণালীর** মধ্যে। কলকাতার ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অনুসন্ধান-কমিটী যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন তার চিত্র অত্যন্ত ভয়াবহ। অথচ ছাত্রদের সুচিকিৎসার জন্য পথক পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল কত আগেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। একখানি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গে এই রকম চিন্তা করেছেন:

"কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ বাংলার প্রাচীনতম প্রধান চিকিৎসা-বিদ্যালয়। ...শুধু মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেই নহে, এই মহানগরীর অন্যান্য কলেজ হাসপাতালগুলিতেও রোগীর চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। মেডিক্যাল শিক্ষা ও **হাসপাতালগুলির বিকেন্দ্রীকরণের** কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যদি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থাকিত তাহা হইলে অবস্থা হয়ত এরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিত না। স্বাস্থ্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এবং রাজ্যসরকার যতদিন শুধু কলিকাতাতেই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ও উহার উন্নতির চিন্তায় আত্মসমাহিত না থাকিয়া মফঃস্বলের দিকে তাঁহাদের কর্ম প্রসারণের ব্যবস্থা করিতে না পারিবেন, ততদিন ইহার প্রতিকারের আশা বৃথা।...

নাম-করা চিকিৎসক কিংবা পাস-করা ডাক্তার অনেকেই মফঃস্বলে যাইতে চাহেন না। সরকারেরও এমন ব্যবস্থা নাই যাহাতে রোগিগণ কঠিন রোগে মফঃস্বলেই চিকিৎসা পাইতে পারে। অতএব অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যাপারেও কলিকাতার হাসপাতালগুলিতে ভীড়ের পরিমাণ ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং সুচিকিৎসা সম্পর্কে অভাব-অভিযোগও ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে।

একটি পল্লী-স্বাস্থ্যকেন্দ্র

হাসপাতালে বেড পাওয়া যায় না, আউটডোরে চিকিৎসকদের নিঃশ্বাস লইবার অবকাশ মেলে না, অধ্যাপকগণ অভিযোগ করেন এত বেশি ছাত্র থাকিলে সুশিক্ষা দান সম্ভব হয় না, এবং সম্মিলিত কণ্ঠে সকলেই বলিতেছেন—ধিক্! ধিক্!" (যুগান্তর)

মনঃস্বাস্থ্য : শিক্ষা-সংস্কৃতি

শুধু দৈহিক সুস্থতাকেই স্বাস্থ্য বলা যায় না, সুস্থ দেহ সুস্থ মন—এই হল স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা। মনের সুস্থতা আসে শিক্ষা-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা বিশ-বাইশ জন। এটা নিশ্চয়ই জাতির স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। মহামারী দমনের অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষার বিরুদ্ধেও আমাদের অভিযান চালাতে হবে। শিক্ষাই হবে আসল 'টিকা' বা দেশবাসীকে অনেক অমঙ্গলের হাত থেকে বাঁচাবে। এখানে শিক্ষা বলতে আমরা প্রধানত **লোক শিক্ষাকেই** (mass education) বোঝাতে চাচ্ছি। বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ব্যাপক লোকশিক্ষার আয়োজন

সম্ভব নয়। এই লোকশিক্ষা বিস্তারে চলচ্চিত্র, বেতার, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, সংবাদপত্র ইত্যাদি যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে সহজ ও সুলভ গ্রন্থরচনার আয়োজন এই শিক্ষা-অভিযানকে সফল করে তুলবে। এ ধরনের প্রচেষ্টার উজ্জ্বল নিদর্শন বিশ্বভারতী-প্রকাশিত লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা যার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "শিক্ষণীয় বিষয়-মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদনুসারে ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষা-বর্জিত হবে, এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। অথচ রচনার বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না সেও আমাদের চিন্তার বিষয়! দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই। এমন বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে না।"

লোকশিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে **স্কুল-কলেজের সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষাকে** আরও সম্প্রসারিত করতে হবে। ওপর থেকে চাপানো নয়, ভেতর থেকে টেনে আনাই হবে সুস্থ শিক্ষাপদ্ধতি। শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে 'আনন্দের বেদী'তে।

ভারতীয় গণতন্ত্রে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিকল্পে বর্তমানে বিশেষ চেষ্টা চলেছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার যুগ্ম-দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অবশ্য সাধারণভাবে মুখ্য দায়িত্ব রাজ্য সরকারেরই। এজন্য প্রতিটি রাজ্যে একজন মন্ত্রীর অধীনে একটি করে শিক্ষা দপ্তর আছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এই দপ্তরের মাধ্যমে তাঁর রাজ্যের শিক্ষাবিস্তারে মনোযোগী হয়েছেন। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্ব-ভারতীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারই গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার সমন্বয় সাধন, সুযোগ সুবিধাদান বিশ্ব-বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার মান নির্ধারণ, গবেষণা, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মধারা প্রসারিত হয়েছে। বারাণসী, আলিগড়, দিল্লী ও বিশ্বভারতী এই চারিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার গুরুদায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাদপ্তরের হাতে। এ ছাড়া বিশেষ কয়েকটি কেন্দ্রীয়-শিক্ষা সংস্থা—যেমন সেণ্ট্রাল ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্ এডুকেশন, ন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্ বেসিক এডুকেশন, ন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্ অডিও-ভিস্যুয়াল এডুকেশন, ন্যাশনাল সেণ্টার

অফ্ দি ব্লাইণ্ড ইত্যাদিও কেন্দ্রীয় দপ্তরের অধীন। বৈদেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সাধনহেতু বৃত্তিদানের ব্যবস্থাও কেন্দ্রীয় সরকার আপন 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের' মারফৎ পরিচালনা করেন।
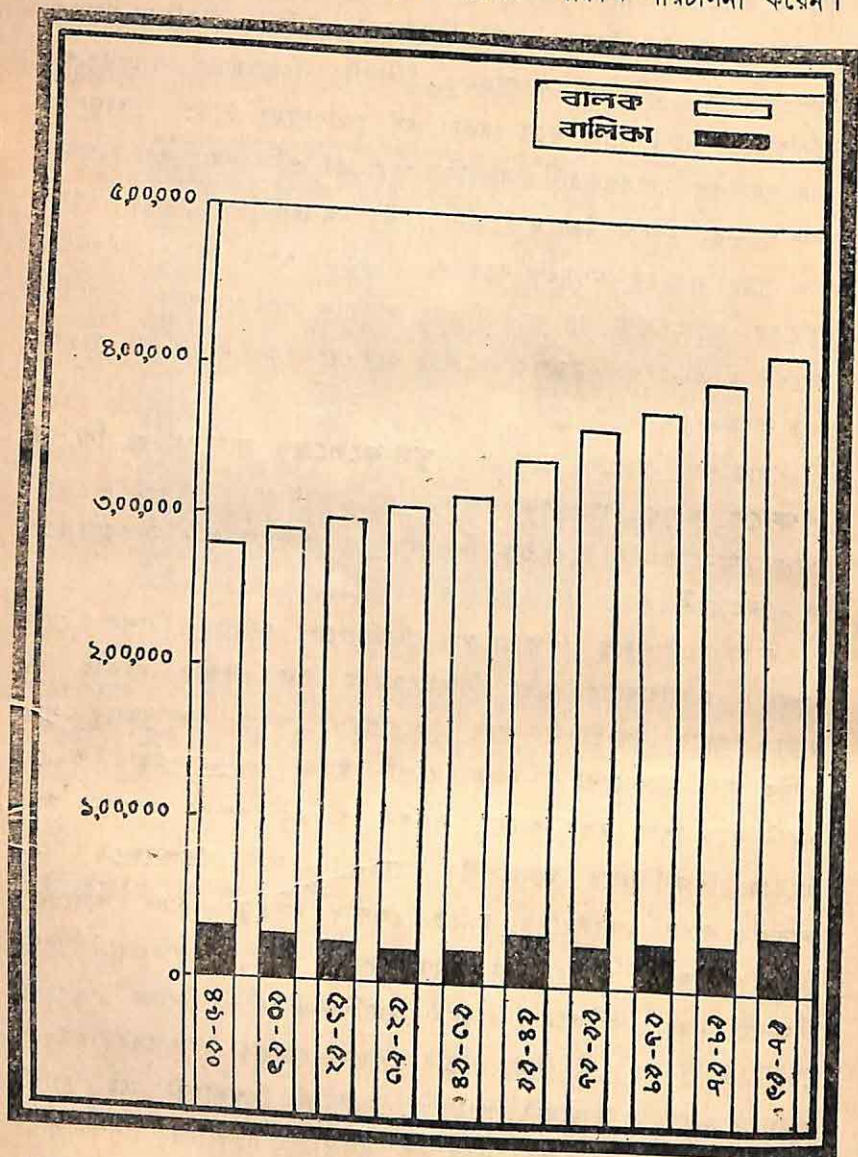
দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থাও কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। বর্তমানে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী হওয়ায় হিন্দী শিক্ষা প্রসার ও

প্রচারের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছেন। বর্তমান ভারতে শিক্ষাদান পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে ; যথা—

[১] নার্সারী বা প্রাক্প্রাথমিক শিক্ষা [২] প্রাথমিক ও নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষা [৩] উচ্চবুনিয়াদী শিক্ষা [৪] মাধ্যমিক শিক্ষা [৫] উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা [৬] বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা [৭] বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষান্তে গবেষণা।

এ ছাড়াও আছে কারিগরী, পেশাদারী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা এবং আরও কিছু সংস্থা, যেমন গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষালয় (Rural Higher Education), সমাজ (বয়স্ক) শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষাও সর্বভারতীয় শিক্ষায় অঙ্গীভূত হয়েছে।

জাতীয় স্বাস্থ্যের জীবন্ত পরিচয় তাঁর **সংস্কৃতিতে**। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলায় তার স্বাক্ষর। সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে স্রষ্টা তার আনন্দকে প্রকাশ করে। সংস্কৃতি মানুষের সেই আনন্দের বাণীবহ। এজন্যেই সাহিত্য সঙ্গীত শিল্পকলা মানুষকে যুগে যুগে আনন্দ দিয়ে আসছে। এই আনন্দ না হলে মানুষ বাঁচত না।

সামাজিক উৎসবের মধ্যে গণতন্ত্রের বীজ লুকিয়ে আছে। বাংলাদেশের উৎসবপ্রিয়তা প্রবাদবাক্যে দাঁড়িয়েছে—এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা!" বাংলার বারো মাসে তেরো পার্বণ। এই পালপার্বণগুলোর মাধ্যমেই বাঙালীর আনন্দপ্রিয়তা শতধারায় উৎসারিত। তাইতো 'মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি'। এটা কাব্যিক অতিরঞ্জন নয়। উৎসবের আনন্দ আমাদের মনে যে সজীবতা আনে তা দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্যকে জয় করতে সহায়তা করে বৈকি।

বর্তমান চিত্র

কালক্রমে আমাদের আমোদ-প্রমোদ গতি-প্রকৃতি অনেক বদলে গিয়েছে। মেলা, যাত্রা, কবিগানের যুগপ্রায় অস্তমিত। রুচি, পরিবেশ সবই পরিবর্তিত। আধুনিক নগর-সংস্কৃতিতে আনন্দ-লাভের প্রচেষ্টা দুটি ভিন্নপথ ধরেছে : একটি লঘু চাপল্যের, আরেকটি বুদ্ধি-পরিশীলিত শিল্পকর্মের। দ্বিতীয় পথের পথিক বিদগ্ধজন, তা বলাই বাহুল্য। বিদগ্ধমহল সাহিত্যপত্র, সাহিত্যালোচন, সাহিত্য সম্মেলন ইত্যাদির মাধ্যমে একটি সুস্থ সাংস্কৃতিক

পরিমণ্ডল গড়ে তুলছেন। বণিকবুদ্ধি যখন আনন্দ পরিবেশনের নামে স্থূল উত্তেজনার খোরাক যোগাচ্ছে, তখন এই নির্বিত্ত বুদ্ধিজীবীরা জনসাধারণকে রুচিগত অধঃপতন থেকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

সম্প্রতি সরকারী উদ্যোগে সাহিত্য একাডেমি, সঙ্গীত নাটক একাডেমি, ললিতকলা একাডেমি ইত্যাদি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও শিল্পীদের পুরস্কৃত করবার ব্যবস্থা হয়েছে। সর্বভারতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতায় 'একাডেমি অব ফাইন আর্টস্' পরিচালিত চিত্রপ্রদর্শনী, বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন, সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন, শিশু-রঙমহল ইত্যাদি নগরবাসীদের প্রতিবছরের আকর্ষণ।

কলকাতা ফুটবল মরশুমে আই-এফ-এ পরিচালিত লীগ ও শীল্ডের খেলা প্রতি বছর সারা শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানগুলিও আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় বহন করে। নগরের দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব যেমন পৌরসভার, মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব তেমনি এসই সব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের।

অনুশীলনী

ইউনিট-পরিকল্পনার খসড়া ॥ বিষয়ঃ "স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতি"

[এক] প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচিতব্য বিষয়গুলির অনুধাবন

১। প্রকৃত শিক্ষার জন্য চাই দেহের সুস্থতা—একথা কেন বলা হয়?

২। তুমি জীবনে কখনও রোগে ভুগেছ? তুমি কি নিয়মিত ভাবে কোন রোগে ভোগো? যদি তাই হয়, তা হলে তার কারণ কী? সেই রোগ থেকে স্থায়িভাবে যাতে আরোগ্যলাভ করতে পার সেজন্য তুমি কী কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছ?

৩। পাড়ার স্বাস্থ্যব্যবস্থা তোমার পরিবারের স্বাস্থ্যের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে?

৪। পাড়ায় বা শহরে যখন মড়ক লাগে তখন প্রতিকার-ব্যবস্থা কি হওয়া উচিত?

৫। সরকারী ও বেসরকারী কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান তোমার পাড়ায় স্বাস্থ্যরক্ষার সাহায্য করছে? তুমি কি মনে কর এই সব প্রতিষ্ঠানের কাজ আরও সুষ্ঠুভাবে হওয়া উচিত? কিভাবে উন্নতি সম্ভব, তুমি কোন পরামর্শ দিতে পার?

৬। নিরক্ষর লোকদের মধ্যে সু-অভ্যাস গঠনের জন্য কী করা যেতে পারে?

৭। ছাত্রদের স্বাস্থ্যপালনে বিদ্যালয়ের ভূমিকা কী? পরিবারের এবং বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যের কিভাবে উন্নতি করা সম্ভব?

৮। জনসাধারণের সংস্কৃতি-চর্চার কী কী সুযোগ-সুবিধা তোমাদের পাড়ায় আছে?

৯। সংস্কৃতির নাম দিয়ে পাড়ায় যে সমস্ত লোক সমাজবিরোধী কাজ করে তাদের হাত থেকে সমাজকে বাঁচানোর উপায় কী?

[দুই] সমস্যা ও বিচারধর্মী প্রশ্ন

১। প্রায়ই সংবাদপত্রে হাসপাতালগুলির ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধ-সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সব দিক বিচার করে এ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

২। বেসরকারী সমস্ত হাসপাতাল যদি সরকারী পরিচালনার আওতায় আনা হয়, তাতে ভাল হবে, না মন্দ হবে?

৩। (ক) দেশের চিকিৎসকদের কর্তব্য হচ্ছে সেবাব্রতের আদর্শ নিয়ে গ্রামে কাজ করা—বলেছেন পণ্ডিত নেহেরু। (খ) গ্রামে কাজ করার উপযোগী সুযোগ-সুবিধার বড়ই অভাব এদেশে—বলেছেন চিকিৎসকেরা।

—এ সমস্যাটির কিভাবে সমাধান সম্ভব?

৫। আধুনিক কালে সিনেমা-থিয়েটারের বহুল প্রচলনের ফলে লোক-সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। —একথা তুমি স্বীকার কর কি না?

৫। বহু-উদ্দেশ্যমূলক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রবর্তনে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি না অবনতি হবে?

[তিন] কর্মোদ্যোগ

(ক) জ্ঞানমুখী কাজ ঃ

১। দলগত কর্মোদ্যোগ—(ক) রোগ-সংক্রমণের কারণ এবং সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের উপায়; (খ) বিদ্যালয় স্বাস্থ্য-সংস্থা; (গ) হাসপাতালের কর্ম-দপ্তর; (ঘ) পরিবেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা—জল ও দুগ্ধ সরবরাহ, টিকাদান, ময়লা-নিষ্কাশন প্রণালী; (ঙ) সিনেমা-থিয়েটার; (চ) খেলাধূলার সুযোগ-সুবিধা; এবং (ছ) বিদ্যালয় বা ক্লাবের সরস্বতী পূজা—এরকম কয়েকটি বিষয়ে ছাত্ররা তথ্য সংগ্রহ করবে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে।

২। বিদ্যালয়-স্বাস্থ্য-সংস্থার ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে ছাত্রদের 'হেল্থকার্ডগুলি নিয়ে তাদের পারিবারিক স্বাস্থ্য ও রোগব্যাধির ইতিহাস সংগ্রহ করবে একদল ছাত্র।

(খ) অভিজ্ঞতামুখী কাজ ঃ—

১। সমাজ অনুসন্ধান বা সার্ভে॥ বিভিন্ন সরকারী দপ্তর বা অন্যান্য

স্বাস্থ্যনিয়ামক প্রতিষ্ঠানের সূত্রে পাওয়া তথ্যাদি নির্ভরযোগ্য নয় বলে যদি সন্দেহ হয় তা হলে ছাত্রদের কর্তব্য হবে এক একটা পাড়ায় গিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পরিবারের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যাবতীয় খবর যোগাড় করা। এবার সংগৃহীত রিপোর্টগুলি একত্র করে উক্ত পাড়ার স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটা মোটামুটি সামগ্রিক চিত্র পরিবেশন করার দায়িত্ব সমাজবিদ্যার শিক্ষকের।

২। বিতর্ক সভা॥ বিষয়—(ক) "কলকাতা শহরের জনস্বাস্থ্যের অবনতির জন্য অস্বাস্থ্যকর বস্তিগুলিই দায়ী"।

(খ) "বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ থাকলে লেখাপড়ার ক্ষতি হবে।

৩। শিক্ষামূলক সফর॥ কলকাতার মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়ম, পলতা জল সরবরাহ কেন্দ্র, একটি হাসপাতাল, একটি চিত্র-প্রদর্শনী, ন্যাশনাল লাইব্রেরী ও বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন।

৪। ফিল্ম প্রদর্শনী॥ "The Big Four ('ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, লৌহ, এবং ভিটামিন বিষয়ক খাদ্য সম্পর্কে কার্টুনচিত্র), 'The Thief of Health' —ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস। 'How Sickness Spreads', 'Your Sanitary Inspector', 'Small Town Library—মার্কিন সরকার।

(গ) পরিবেশনমুখী কাজ :—

১। চার্ট ও নক্শা॥ বিভিন্ন স্বাস্থ্যনিয়ামক প্রতিষ্ঠান; বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য বিবিধ হাসপাতাল; বিভিন্ন বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য-বিষয়ক ব্যয়বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র অবলম্বনে দণ্ডলেখ (Bar Graph)।

২। অভিনয়ের আসর॥ স্বাস্থ্যহীনতার কারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় অবলম্বনে একটি নাটিকা রচনা করে সেটি মঞ্চস্থ কর।

৩। কলকাতা শহরে খেলাধূলার একটি ষ্টেডিয়াম গঠন করার আশু প্রয়োজনীয়তার যুক্তি দেখিয়ে (ক) রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে, (খ) কর্পোরেশনের মেয়রকে, বা (গ) সংবাদপত্রের সম্পাদককে একখানা চিঠি লেখা হবে; তার খসড়া তৈরি কর।

[চার] কতিপয় ভাববস্তুর উপলব্ধি

১। স্বাস্থ্যই সম্পদ।

২। পরিবেশের স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

৩। শিক্ষাই সমাজের অগ্রগতির মূল।

৪। সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে পরমত-সহিষ্ণুতার সৃষ্টি এবং সুপ্ত প্রতিভার জাগরণ সম্ভব।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ নাগরিক ও সরকার ॥

গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিস্টট্‌ল বলেছিলেন—'জীবন রক্ষার জন্যেই সমাজের উৎপত্তি'। জনসাধারণকে নিয়ে সমাজ। আবার সমাজ রক্ষার জন্যে প্রয়োজন রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ভূমিকা হল মানুষের জীবনের নিরপত্তা রক্ষা করা, জীবন-প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে তোলা।

রাষ্ট্র

জনসাধারণকে নিয়ে গড়ে ওঠে রাষ্ট্র। কিন্তু জনসাধারণ ছাড়াও আরও তিনটি উপাদান প্রয়োজন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে। রাষ্ট্র আকাশকুসুম নয়। এর জন্য চাই **নির্দিষ্ট ভূখণ্ড**। তারপর চাই **সরকার**। সরকার কী? সরকার হল এমন এক শাসন-প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে দিয়ে জনগণের রাজনৈতিক শক্তি মূর্ত হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক শক্তির মানে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা, যা থাকে সরকারের হাতে। সরকার হল জনসাধারণের অভিভাবক। রাষ্ট্রে নাগরিক কিভাবে চলবে, কিভাবে সুষ্ঠু জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে ও অন্যের সহযোগিতা করবে, সেই নির্দেশ দেয় সরকার। রাষ্ট্রপরিচালনায় সরকারের দায়িত্ব অনেকখানি। তবে অনেকে রাষ্ট্র বলতে সরকারকে বোঝে, আবার সরকার বলতে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র আর সরকার কিন্তু এক বস্তু নয়।

রাষ্ট্রের আর একটি উপাদান **সার্বভৌমত্ব**। সত্যি কথা বলতে গেলে, এই উপাদানটির গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। কেননা সার্বভৌমত্ব ছাড়া রাষ্ট্রকে রাষ্ট্র বলেই দাবী করা যাবে না। সার্বভৌমত্ব অর্থ রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা। এই বিশেষ ক্ষমতার ভরসাতেই রাষ্ট্র সমস্ত জনসাধারণ, সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও বস্তুর উপর কর্তৃত্ব করতে পারে। সার্বভৌমত্ব বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ শক্তি রাষ্ট্রের এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য। ১৯৪৭ সালের আগে ভারতকে কিন্তু রাষ্ট্র বলা যেত না। নির্দিষ্ট ভূমি, জনসাধারণ, সরকার এই তিনটে উপাদান

থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ রাষ্ট্রের দল থেকে নির্বাসিত হল শুধু এই একমাত্র দৈন্যের বলে।

সরকারের নানা মূর্তি। রাজা স্বয়ং সরকারের একক ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে সেই শাসন-ব্যবস্থাকে বলা হয় **রাজতন্ত্র**। পুরানো দিনের ভারতবর্ষে এই প্রথা বর্তমান ছিল। এখনও পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে এই প্রথা চালু আছে। সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যক্তিবিশেষের হাতে কেন্দ্রীভূত হলে বলা হয় **একনায়কতন্ত্র**। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইটালী, স্পেন, জার্মানী ইত্যাদি দেশে একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই ধরনের শাসনতন্ত্রে সরকারের শীর্ষে যিনি থাকেন তাঁকে বলা হয় ডিক্টেটর। এই শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণের ভূমিকা গৌণ। তাদের স্বাধীনতা উপেক্ষিত, অধিকার অবহেলিত। এরপর আসে **গণতন্ত্রের** কথা। গণতন্ত্র একনায়কতন্ত্রের ঠিক বিপরীত। এই শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের অধিকার স্বীকৃত। 'গণতন্ত্র' অর্থ হল জনসাধারণের শাসনপ্রথা। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা আছে ; অর্থাৎ জন-নির্বাচিত প্রতিনিধি জনগণের পক্ষে দেশ শাসন করেন। এ জাতীয় গণতন্ত্রকে বলে **পরোক্ষ গণতন্ত্র**। দেশে লোকসংখ্যা খুব বেশি হলে তো সকলে মিলে শাসনযন্ত্রে অংশগ্রহণ করা যায় না। তাই পরোক্ষ গণতন্ত্রই পৃথিবীর অধিকাংশ জনবহুল দেশে আজ প্রচলিত। প্রাচীন গ্রীসের কতগুলো দেশে **প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র** ছিল। কেননা সে সব দেশে জনসংখ্যা ছিল অল্প, তাই প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষেই দেশ পরিচালনার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল।

নির্বাচন ও ভোটের কথা

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমেই গঠিত হয় সরকার। জন-সাধারণের তরফ থেকে যাঁরা দেশ শাসন করবেন তাঁরা জনসাধারণেরই নির্বাচিত প্রার্থী। নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাই একই দলের পক্ষে চিরদিন গদীতে বসে থাকা সম্ভব হয় না৷ নূতন নির্বাচনের সাহায্যে ইচ্ছে করলে জনসাধারণ দেশের সরকার পরিবর্তন করতে পারে। নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে ভোটের কথা এসে পড়ে। চারিদিকে রঙ-বেরঙের ফেষ্টুন আর পোষ্টারের মেলা। পার্কে পার্কে মিটিঙের হৈ চৈ। রাস্তায় রাস্তায় মিছিলের স্রোত। মাইকের বিচিত্র আওয়াজ। সে এক এলাহী ব্যাপার! এত কাণ্ডকারখানায় সার্থকতা কী? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। প্রত্যেক নাগরিকেরই

ভোটদানের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। অবশ্য এর জন্যে নাগরিকদের কতগুলো ন্যূনতম গুণ অর্জন করতে হবে। যেমন, নির্দিষ্ট বয়স বা লেখাপড়া জানা ইত্যাদি। ভোটের - সাহায্যেই প্রার্থী বা প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ভোট অপরিহার্য। **ভোটদানের পদ্ধতি** আবার দু'রকম: প্রকাশ্য ও গোপন। প্রকাশ্য ভোট ব্যবস্থায় প্রার্থী বা অন্যান্য সকলেই জানতে পারে ভোটদাতা কাকে ভোট দিচ্ছে, না দিচ্ছে। আর গোপন ব্যবস্থায় ভোটদাতা ছাড়া কাক-পক্ষীও জানতে পারে না ভোটটা কার ভাগ্যে পড়ল, না পড়ল। ভারতে সাধারণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই গোপন ভোটদান পদ্ধতিই গৃহীত হয়েছে।

রাজনৈতিক দল

দলের ভূমিকা কী? ভোটের সময় নানান্ দলের মধ্যে চলে ক্ষমতার লড়াই। এরা নিজেদের কর্মসূচী ও আদর্শের কথা প্রচার করে। দলগত আদর্শ বাস্তবে-রূপায়িত করবার জন্য চাই যন্ত্র। সরকার হল এই যন্ত্র। এ যন্ত্র আয়ত্তে আনবার জন্য চাই নাগরিকের সম্মতি বা ভোট। আবার ভোট পেতে হলে নাগরিকের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। দলগুলো তাই মাঠে ময়দানে বক্তৃতা দিয়ে আর কাগজে কাগজে নিজেদের আদর্শ প্রচার করে ভোট পেতে চায়। যত
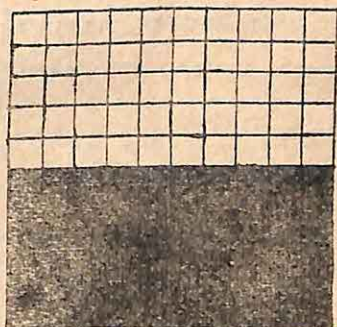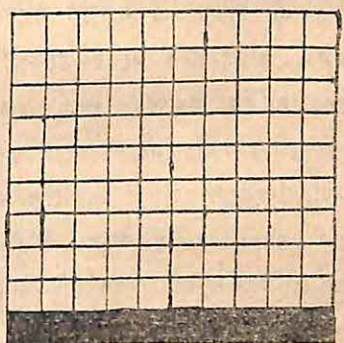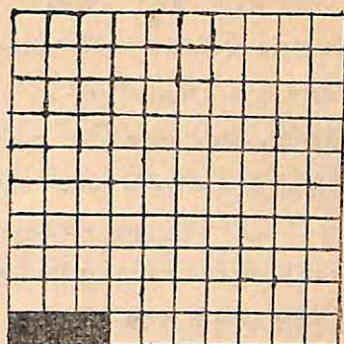
আমাদের ভোটদাতা ■.

উপরে: ১৯১৯ সালের আইনে

মধ্যে: ১৯৩৫ সালের আইনে

নিচে: নূতন শাসনতন্ত্রে

মত তত পথ। রুচির বিভিন্নতা, মতের বৈচিত্র্যই হল সচল, সতেজ লোকমানসের বৈশিষ্ট্য। তাই স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠে নানান্ দল। স্বাধীনতার নাম স্বেচ্ছাচারিতা নয়। একটি দলই যদি পর্যায়ক্রমে গদীতে মৌরসীপাট্টা করতে থাকে তো জনসাধারণের স্বাধীনতা ও অধিকার বিপন্ন হয়। নতুন চিন্তা, নতুন আদর্শ ও নতুন কর্মপন্থা প্রাণবান্ ও গতিশীল করে তোলে রাষ্ট্রকে। তাই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় একাধিক দলের অস্তিত্ব অবশ্যই প্রয়োজন। দলের মাধ্যমে স্বাধীন চিন্তাধারার বলিষ্ঠ প্রকাশ আমাদের কাম্য, কিন্তু সঙ্কীর্ণ দলাদলি অবশ্য-পরিত্যাজ্য।

দল কী চায়? দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কী কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত, না উচিত—এ সম্পর্কে যাঁদের মত এক, তাঁরা রাজনৈতিক দল গঠন করেন। রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি নয়। এদের লক্ষ্য দেশের সার্বিক উন্নতি। প্রথম কর্তব্য হল, দেশের সমসাময়িক ও ভবিষ্যৎ সমস্যাগুলোর সমাধানের উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত কার্যতালিকা প্রণয়ন। দ্বিতীয় কর্তব্য, নিজেদের আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে নিজের মতের বশীভূত করার চেষ্টা। তৃতীয় কর্তব্য, আইন সভার নির্বাচনে জয়লাভের প্রস্তুতি; এ ছাড়া প্রচলিত শাসনব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি আলোচনা করে নাগরিক এবং সরকার উভয় পক্ষকেই সচেতন করে তোলা।

পণ্ডিত নেহেরু বলেন: "রাজনীতি অত্যন্ত নোংরা জিনিস"। রাজনৈতিক দল যখন দেশের নানারকম অকল্যাণকর কাজ করে তখন নাগরিক হিসেবে আমাদেরও নানারকম অবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

ব্যক্তি-স্বাধীনতাই হল গণতন্ত্রের ভিত্তি। ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে আবার প্রয়োজন কতগুলো অধিকারের। এ অধিকারের ভোক্তা হল নাগরিক। নাগরিকের রাজনৈতিক শক্তির স্ফূর্তি এবং ব্যক্তিজীবনের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার জন্য এই অধিকারসমূহ অপরিহার্য। স্বাধীনভাবে ভোটদানের অধিকার নাগরিকের একটি বড় অধিকার, কিন্তু এ ছাড়াও আরও কতগুলো **অধিকার** অবশ্যপ্রাপ্য। যেমন—

(১) বাঁচবার অধিকার: রাষ্ট্র নাগরিকের জীবন রক্ষা করবে। খেয়ে-পরে' বেঁচে থাকার সুযোগ-সুবিধা যখন লুপ্ত হয়ে যায় তখন রাষ্ট্রের বড় দুর্দিন। দেশে যখন ভয়াবহ

বেকার সমস্যা দেখা দেয়, সরকার যদি তার আশু প্রতিকার করতে না পারেন তা হলে নাগরিকদের পক্ষ থেকে বিশেষ চাপ আসে।

(২) মত প্রকাশের স্বাধীনতা: নাগরিক বা সংবাদপত্র তার মতামত নির্ভীকভাবে ব্যক্ত করবার অধিকারী। কিন্তু সামাজিক সমস্যা সেখানেই, যেখানে মতপ্রকাশের পিছনে স্বার্থপরতা বা পক্ষপাতিত্ব ফুটে ওঠে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক অপপ্রচার কিংবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অন্যায় প্ররোচনাকে যদি কোনো নাগরিক তার 'বাক্‌স্বাধীনতা'র অঙ্গ বলে মনে করে, সেক্ষেত্রে তাকে সমর্থন করা যায় না।

(৩) স্বাধীনতার অধিকার: রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে সর্বত্র অবাধে চলাফেরার অধিকার নাগরিকের আছে। কিন্তু রাষ্ট্রের চোখে যারা সন্দেহভাজন, তাদের অবাধ চলাফেরায় অবশ্যই বাধা দেওয়া হবে।

(৪) আইনের দৃষ্টিতে সাম্য: ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সমস্ত আইন সমভাবে প্রযোজ্য। কোনো ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব বা বৈষম্যমূলক বিচার চলবে না।

(৫) শোষণমুক্তির অধিকার: সবল দুর্বলের ওপর প্রভুত্ব করবে না।

(৬) ধর্মাচরণের স্বাধীনতা: প্রত্যেক নাগরিক যে ধর্ম বা ধর্মানুষ্ঠানে বিশ্বাস করে তা অনুসরণ করার পূর্ণ অধিকার তার থাকবে।

(৭) সংস্কৃতি ও ভাষা সংরক্ষণের অধিকার: প্রত্যেক নাগরিক তার মাতৃভাষার ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য সচেষ্ট হতে পারবে। দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই অধিকার তো বিশেষ করেই প্রয়োজন।

কিন্তু অধিকার-ভোগের একটা সীমা আছে। একজনের অধিকার তো অন্যের বিপত্তির কারণও হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই সমাজের কল্যাণের জন্যে কতগুলো **নাগরিক কর্তব্য**ও বিধিবদ্ধ হয়েছে:

(১) সর্বপ্রথম কর্তব্য হল রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা। নাগরিকের সহযোগিতা ছাড়া সরকারের পক্ষে রাজ্য-পরিচালনা অসম্ভব।

(২) রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা নাগরিকের কর্তব্য।

(৩) একটি সংস্কৃত শ্লোকে আছে—সূর্য পৃথিবীর বুক থেকে জল শুষে নেয় শুধু সমৃদ্ধতর রূপে সে জলরাশি পৃথিবীকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে। রাষ্ট্রও নাগরিকের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই কর গ্রহণ করে, তাই নাগরিকের কর্তব্য নিয়মিত কর প্রদান করা। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই আয়কর প্রচলিত আছে। কিন্তু নানা অসৎ প্রক্রিয়ায় আয়কর ফাঁকি দেওয়ার নজীরেরও অভাব নেই

আমাদের দেশে। একরকম **সমাজবিরোধী কার্যকলাপ** দৃঢ় হলে সরকারের দমন করা উচিত।

(৫) রাজনৈতিক অধিকারের সার্থক প্রয়োগে যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রচেষ্টাও নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য। এখানে একটা ভাববার বিষয় এই, নির্বাচনে ভোট দেবার সময় কোন্ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে—প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব, সততা ও কর্মদক্ষতা, অথবা রাজনৈতিক দলের ঘোষিত নীতি (manifesto) ?

নাগরিকের একটি পরিকল্পনা

শিক্ষার উদ্দেশ্য কী—সে সম্পর্কে একটা চল্‌তি কথা হচ্ছে : দেশের প্রকৃত নাগরিক রূপে শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলা। এই নাগরিকত্ব-শিক্ষা সর্বত্র হতে পারে—গৃহে, বিদ্যালয়ে, সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে, সঙ্ঘ-সমিতির প্রাঙ্গণে। আমেরিকার একটি রাষ্ট্রের শিক্ষাদপ্তর এ সম্পর্কে যে পরিকল্পনা (Citizenship Programme) করেছেন সেটি এই :

(১) বিদ্যালয়ের পরিবেশ গণতান্ত্রিক হবে ;

(২) অভিভাবক এবং শিক্ষকেরা প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব স্বীকার করবেন, এবং তাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করবেন ;

(৩) প্রত্যেক ব্যক্তির সৃজনশক্তিকে উৎসাহ দেওয়া হবে ;

(৪) পাঠ্যবিষয় অন্যান্য কাজকর্ম তরুণদের প্রয়োজন ও আগ্রহ মেটাবে ;

(৫) গণতন্ত্রের উপযোগী বিধিনিয়ম ও প্রয়োগ-পদ্ধতির শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে ;

(৬) স্কুল বা পাড়ার যে সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে তারা জড়িত সেগুলি সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার সুযোগ দিতে হবে ;

(৭) স্কুল এবং পাড়ার মধ্যে একটা নিবিড় যোগসূত্র গড়ে তুলতে হবে ;

(৮) স্বদেশের মূল ঐতিহ্যগুলি এবং বর্তমান কালের সামাজিক সমস্যাগুলি—যা অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবে—সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের মনে সম্যক্ ধারণা সৃষ্টি করা হবে।

পরিকল্পনাটি আমাদের দেশেও অনায়াসে কাজে লাগাতে পারি।

আধুনিক জীবনযাত্রা ও রাজনীতি

গণতন্ত্রের মূলতন্ত্র হল রাজনৈতিক চেতনা। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের আদর্শ প্রচার ও রাজনীতির বিচিত্র তথ্যের ইতিবৃত্ত ঘোষণার মাধ্যমে জন-

সাধারণের মনে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তোলে। সংবাদপত্র, বেতার সভা-সমিতি, সিনেমা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে **জনমত** গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক চেতনা জনসাধারণকে রাষ্ট্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। নাগরিকের রাজনৈতিক অজ্ঞানতা বা ঔদাসীন্য স্বেচ্ছাচারী সরকারকে শোষণে অনুপ্রাণিত করে। তাই রাজনৈতিক চেতনাই রক্ষাকবচ হয়ে নাগরিককে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করে। আধুনিক জীবনযাত্রায় রাজনীতির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব সুদূরপ্রসারী। বিভিন্ন দলের সংখ্যাধিক্য এবং আধিপত্যের ফলে জনসাধারণের রাজনীতি-সম্পর্কিত জ্ঞান ক্রমবর্ধমান। জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় কার্য-কলাপ ও সমাজের সমস্যাবলী সম্পর্কে অধিকতর সজাগ।

আদর্শ গণতন্ত্রের ছবি

আগেই বলা হয়েছে যে গণতন্ত্রের ভিত্তি হল শিক্ষা। শিক্ষার সঙ্গে আবার রাজনৈতিক চেতনার সম্পর্ক ওতঃপ্রোত। অশিক্ষিতের পক্ষে রাজনীতির কূটকৌশল দুর্জ্ঞেয়। তাই আধুনিক যুগে যে সব দেশ শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে রয়েছে সে সব দেশে গণতন্ত্র সার্থক হয়নি। যতদিন ব্যাপকভাবে **জনশিক্ষার** প্রচলন না হচ্ছে ততদিন গণতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ভারতের শিক্ষাগত মান উন্নত হলে এদেশ হয়ত একদিন আদর্শ গণতন্ত্রের পীঠস্থান হিসেবে সর্বজন-স্বীকৃতি পাবে।

আমরা ভারতবাসী, আদর্শ গণতন্ত্র বলিতে বুঝি কল্যাণ-রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রের নীতি, নিয়ম, আইন-কানুন জনসাধারণের স্বার্থসংরক্ষণ ও আত্মবিকাশের অনুকূলে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন—সমাজের রিক্ত-নিপীড়িত নিগ্রো ক্রীতদাসের মুক্তিসংগ্রামের যোদ্ধা, 'গণতন্ত্রের অগ্রনায়ক' লিঙ্কনের সেই মহৎ উক্তি : 'Government of the **people**, by the **people**, and for the **people**'—সে তো মানুষেরই জয়গান। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি তথা সমগ্র রাষ্ট্রের কল্যাণবিধানই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য। এ রাষ্ট্রে স্বীকৃত হবে প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তি-স্বাধীনতা, রক্ষিত হবে প্রতিটি মানুষের অধিকার। সুপ্রশস্ত হবে জীবন-প্রতিষ্ঠার সকল পথ। অধিকার-স্বীকৃতি আর কর্তব্য-পালনের সুমহান আদর্শে মিলিত হবে রাষ্ট্র ও প্রতিটি নাগরিক। উজ্জ্বল হয়ে উঠবে সমাজ-জীবন সহযোগিতা আর স্বার্থত্যাগের আদর্শ-বৈভবে॥

অনুশীলনী

১। 'রাষ্ট্র' কাকে বলে? তোমাদের ক্লাবকে যদি রাষ্ট্র বলি তবে কি ভুল হবে।

২। বেকার সমস্যার জন্য তুমি (ক) দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং (খ) সরকারী নীতিকে কতটা দায়ী করবে? জাতির কর্মসুযোগ আরও বাড়াবার জন্য সরকারী তরফে কী করা হচ্ছে?

৩। নির্বাচনের দিনে অনেক নাগরিক নির্বাচন-কেন্দ্রে উপস্থিত হন না। এর কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ কর। ভোটদানের নিম্নতম বয়স আরও কমিয়ে দেওয়া উচিত কি না? অনেক যোগ্য নাগরিক নির্বাচনপ্রার্থী হতে চান না। এর কারণ কী?

৪। নির্বাচনকালে বিভিন্ন প্রার্থীর পক্ষে যে ব্যাপক প্রচারকার্য চলে তার ভাল-মন্দ বিচার কর। কলকাতা কর্পোরেশনের একটি নির্বাচনে পুলিশ বহু হাতবোমা উদ্ধার করে প্রচারকদের কাছ থেকে। এ অবস্থায় দেশের সমস্ত নির্বাচনী অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া উচিত বলে মনে হয় কি?

৫। দেশের সমস্ত রাজ্যে যদি একই রাজনৈতিক দল মন্ত্রিত্বের আসনে না থাকে, তা হলে কোন অসুবিধা দেখা দিতে পারে কি?

৬। 'জনমত' সৃষ্টির কাজে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে? প্রচণ্ড বাদানুবাদের সৃষ্টি হতে পারে এমন কোন বিষয়ে কিভাবে সুকৌশলে জনমত জাগ্রত করা সম্ভব?

৭। 'সমাজবিরোধী কাজ' বলতে কী বোঝ? তোমাদের পাড়ার কেউ এ ধরনের কাজ করে কী? এসব কাজের পিছনে তাদের উদ্দেশ্য কী? এর বিরুদ্ধে তোমাদের ক্লাব বা অন্যান্য সঙ্ঘ-সমিতি থেকে কিভাবে অভিযান চালানো যায় যাতে সমাজের শান্তি ফিরে আসে?

৮। বিতর্কের আসর॥ বিষয়ঃ (ক) "সংবাদপত্রের উপর কোনরকম সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত নয়।" (খ) "দেশে রাজনৈতিক দল মাত্র একটিই থাকা বিধেয়।" (গ) "বিবাহিতা নারীদের চাকুরি করা অনুচিত।"

৯। অভিনয়ের আসর॥ একটি নির্বাচনকেন্দ্রের দৃশ্য অবলম্বনে একটি নাটিকা রচনা করে সেটি মঞ্চস্থ কর।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ স্থানীয় শাসন ॥

বিশাল দেশ এই ভারতবর্ষ। দেশ আমাদের আদর্শ হয়ে উঠুক শিক্ষায়, সভ্যতায় সমৃদ্ধি আর শান্তিতে—এটা আমরা সবাই চাই। কিন্তু এত বড় একটা রাষ্ট্র, তাকে চালানোও তো সহজ ব্যাপার নয়! অথচ কঠিন ব্যাপার বলে ছেড়ে দিলেও চলবে না। এ দায়িত্ব সকলের। আমরা যখন নাগরিকের অধিকার ভোগ করছি তখন আমাদের সামনে নাগরিকের কর্তব্যও আছে বইকি! আর সেই কর্তব্যবোধের খাতিরে আমাদের দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে রাষ্ট্রকে ঠিকমত গড়ে তোলার জন্য। সাধারণ মানুষের সমবেত চেষ্টাতেই গণতন্ত্রের ভিত পাকা করে তুলতে হবে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কী?

দেশের বেশির ভাগ লোক যাতে রাষ্ট্রের কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব বুঝে সেটা চালিয়ে নিতে পারে তার জন্য সভা সমিতি, সঙ্ঘ, নানারকম ছোটখাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হয়। সেটা খুব শক্ত ব্যাপার নয়। ইস্কুলে, বাড়িতে বা পাড়ায় ছোটরা নিজেরাই কত সঙ্ঘ-সভা-সমিতি পরিচালনা করে থাকে। কোনো একটা বড় কাজে নামতে হলে কাজটার দায়িত্ব ছোট ছোট এলাকায় যোগ্য লোকের বা দলের হাতে ভাগ করে দিতে পারলে কাজটা সহজ হয়, আর অল্প সময়ে সার্থকও হয়ে ওঠে। এটা বিবেচনা করেই সরকার স্থানবিশেষে গ্রামের বা শহরের ছোট ছোট এলাকা ভাগ করে নিয়ে সেগুলো পরিচালনার দায়িত্ব কোন স্থানীয় দল বা প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দিয়েচেন। এরকম দায়িত্বসম্পন্ন, স্বাধীন আঞ্চলিক প্রতিস্থানের হাতে তুলে দিয়েছেন। এরকম দায়িত্বসম্পন্ন, স্বাধীন আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান ও তাদের কাজকর্মকে বলব **স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (Local Self-Government)**।

কতকগুলো আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের ওপর শহর আর গ্রামের শাসনভার দিয়ে রেখেছেন সরকার। ফলে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে এদের সর্বদাই যোগাযোগ রাখতে হয়। কিন্তু সেটা পরোক্ষভাবে। স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে কোনো আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা থাকলেও সেটা শুধু আইনসঙ্গত ভাবে সামাজিক কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে, স্বেচ্ছাচার চলবে না। রাষ্ট্রের যেমন চূড়ান্ত দায়িত্ব, কর্তব্য আর সার্বভৌম ক্ষমতা আছে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসক

গোষ্ঠীর তা নেই। এদের কাজকর্ম তদারক করা, এমনকি সময়বিশেষে বিচার করে নাকচ করবার ক্ষমতা সরকারের সব সময়েই থাকে।

কেউ কেউ হয়ত বলবে, এই স্বায়ত্তশাসনের কোন দরকার আছে কি? রাষ্ট্র একক, সমস্ত চূড়ান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত, তবে আর স্বায়ত্তশাসনের মূল্য কী? এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে নিচের আলোচনা থেকে।

গ্রাম্য ও পৌর শাসন

গ্রাম আর শহর নিয়ে হল আমাদের দেশ। একথাটা মনে করলেই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার পরিচালন-পদ্ধতিটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে গ্রাম আর শহরের বিচারে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে দুভাগে ভাগ করে নেওয়া সহজ—(২) গ্রাম্য (২) পৌর। গ্রাম্য-প্রতিষ্ঠানগুলোর আওতায় পড়ল গ্রাম্য পঞ্চায়েত, ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড। আর পৌর প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কর্পোরেশন মিউনিসিপ্যালিটি, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট ইত্যাদি পড়েছে। প্রথম শহরের ব্যবস্থাটা দেখা যাক।

কর্পোরেশন

বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতার মত বড় বড় নগরে স্বায়ত্তশাসন পরিচালনার জন্য যে ধরনের পৌর-প্রতিষ্ঠান তাকেই বলব পৌরনিগম বা কর্পোরেশন। সোজা কথায় ছোট শহরে মিউনিসিপ্যালিটির যা দায়িত্ব যা কর্তব্য, বড় নগরে কর্পোরেশনেরও তাই। পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞানুসারে অবশ্য পাঁচ হাজারের ওপর লোক-বসতির শহরকেই 'নগর' বলতে পারি; কাজেই কলকাতায় যেখানে প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোক বাস করছে সেখানে পৌরনিগম থাকবে বইকি।

শুধু আমাদের দেশের নয়, সমগ্র এশিয়ার বড় বড় পৌরনিগমের অন্যতম হল **কলিকাতা কর্পোরেশন**। বর্তমানে এর আয় ৮ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। ১৯২৩ সালের কথা। সারা দেশটায় ব্রিটিশ শাসক বেপরোয়া ভাবে সাম্রাজ্যবাদের রথ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেই সময় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তি চেষ্টায় মিউনিসিপ্যাল আইন (The Bengal Municipal Act, 1923 ,পাস হল, আর তারই ফলে কলকাতার পৌরনিগম পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করল। তারপর অবশ্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে কলকাতা পৌরনিগমের অনেক অগ্রগতি হয়েছে।

বর্তমানে ১৯৫১ সালের এবং পরে আবার ১৯৫৬সালের নতুন পৌর আইনের ছাঁচে পরিমার্জিত আর পরিবর্ধিত অবস্থায় কলকাতা পৌরনিগম কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। সমগ্র কলকাতায় ৮০টা পল্লীর বাসিন্দারা ৮০ জন সদস্য নির্বাচিত করেছে। এঁরাই হলেন কাউন্সিলর। সাধারণ সদস্যদের মধ্যে আর একজন হলেন কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের সভাপতি তাঁর পদমর্যাদার বলে। এঁদের কাজের মেয়াদ হল ৪ বছর। একাশী জন কাউন্সিলর মিলে আরও ৫ জনকে বেছে নেবেন শহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্যে থেকে। এঁদের বলি অল্ডারম্যান বা নগরপাল। অল্ডারম্যান আর কাউন্সিলর মিলে নির্বাচন করবেন পৌর অধিকর্তা বা মেয়র আর সহ-অধিকর্তা বা ডেপুটি মেয়র। কলকাতার বাসিন্দারা এঁদের সরাসরি নির্বাচন করতে পারে না। মেয়র, ডেপুটি মেয়র, অল্ডারম্যান আর কাউন্সিলরগণ—এঁরা সকলে মিলে হল সারাধণ পৌরনিগম। শহরের সেবা করাই পৌরনিগমের কাজ।

কাজের স্থবিধার জন্য পৌরনিগমকে নয়টি **স্থায়ী কমিটিতে** (Standing Committee) ভাগ করা হয়েছে: (১) স্বাস্থ্য (২) শিক্ষা (৩) গৃহনির্মাণ (৪) অর্থ ও কর (৫) আয়-ব্যয় (৬) জল সরবরাহ (৭) জনকল্যাণ ও বাজার (৮) ওয়ার্কস্ এবং (৯) নগর পরিকল্পনা।

এছাড়া, শহরের বিভিন্ন পল্লীতে (ward) শহরবাসীদের স্থখ-স্থবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখতে আর পৌরনিগমের কাজকর্মের স্থষ্ঠু পরিচালনায় সাহায্য করতে কতকগুলি **এলাকা কমিটি** (Borough Committee) আছে। সম্প্রতি প্রতি পাঁচটি পল্লী নিয়ে তৈরী হয়েছে একটা এলাকা কমিটি। কাউন্সিলর ও বিভিন্ন পল্লীর বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে এই এলাকা কমিটির সদস্য বাছাই করা হয়।

স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা পৌরনিগম পেয়েছে। কিন্তু সে ক্ষমতা তাকে দিল কে? দিলেন রাজ্য সরকার, আমাদের রাষ্ট্রের সরাসরি প্রতিনিধি। তার মানে, রাজ্য-সরকার নেপথ্যে থেকে পৌরনিগমের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। কিন্তু শাসন ব্যাপারে নেপথ্যে থাকলে চলে না। তাই ১৯৫১ সালের আইনে, সরকারের সঙ্গে পৌরনিগমের যোগাযোগ রাখার জন্য নিযুক্ত হলেন একজন **কমিশনার**— খোদ রাজ্য-সরকারের দ্বারা মনোনীত কাজকর্ম তদারকের জন্য প্রতি পাঁচ বছর অন্তর কমিশনারকে নিয়োগ করা হয়। তাঁর হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। সব ব্যাপারেই চূড়ান্ত মত তাঁর।

আগে যে নয়টি কমিটির উল্লেখ করা হয়েছে তাদের কথা মনে করলেই

পৌরনিগমের কাজের ছবিটা পরিষ্কার হবে। নগরকে সুন্দর, শোভাময় করে তোলা, নাগরিকদের স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশুদের জন্য বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, পথঘাট নির্মাণ, ময়লা নিষ্কাশন ও আবর্জনা পরিষ্কার, জন্ম-মৃত্যুর হিসেব রাখা, হাট-বাজার, পার্ক-উদ্যান তৈরী করা—পৌরনিগমের প্রধান কাজ।

ভারতীয় সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষা "বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক" হবে বলে জানানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে অবৈতনিক শিক্ষার ব্যাপারে পৌরনিগমই অগ্রণী হয়ে আছে। সমস্ত কলকাতা শহরে ২৪২টা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৯,০০০ ছাত্র বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ পাচ্ছে। পৌরনিগমের নিজস্ব একটা চিত্রশালাও (Municipal Museum) আছে।

বাৎসরিক ধার্য করই **পৌরনিগমের প্রধান আয়**। এ ছাড়া যানবাহনের ওপর কর, ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর কর, হাট-বাজার, গোরস্থান ইত্যাদির ওপর কর থেকেও তার কিছু আয় হয়। কিন্তু তার ব্যয়ের ধাক্কাটাও কম নয়। আয়ের শতকরা ৫৫ ভাগই অফিসি বন্দোবস্তে খরচ হয়ে যায়। এ ছাড়া বহু বেসরকারী বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, হাসপাতাল ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান পৌরনিগমের তরফ থেকে বরাদ্দ সাহায্য পেয়ে থাকে। প্রয়োজনে রাজ্য-সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার তাকে আর্থিক সাহায্যও করে থাকেন। অদূর ভবিষ্যতে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব হয়ত সরকার সরাসরি নিজ হাতেই নিয়ে নেবেন।

মিউনিসিপ্যালিটি

কলকাতার বাইরে পশ্চিমবঙ্গের সব জেলা-শহরগুলিতেই পৌরশাসনের ভার মিউনিসিপ্যালিটির ওপর ন্যস্ত। পৌরনিগমের যা লক্ষ্য, যা কাজ, এই সব মিউনিসিপ্যালিটিরও তাই। তবে কাঠামোতে কিছুটা তফাৎ আছে।

মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যদের বলে 'কমিশনার'। জেলা-শহরেরও বাসিন্দারা এই কমিশনারদের নির্বাচিত করেছে বিভিন্ন এলাকা বা ওয়ার্ড থেকে। কম পক্ষে ৯ জন, নয়ত সর্বাধিক ৩০ জন কমিশনার নিয়েই পৌরসঙ্ঘ বা মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত। ১৯৩২ সনের মিউনিসিপ্যাল আইনের ধারায় পৌরসঙ্ঘের কাজকর্ম চলছে। পৌরসঙ্ঘের মেয়াদ চার বছর।

পৌরসঙ্ঘের সাধারণ সদস্যরা মিলে নির্বাচন করেন সঙ্ঘপাল (Chairman) আর উপ-সঙ্ঘপাল (Vice-Chairman)। রাজ্য-সরকার

আর পৌর সঙ্ঘের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য আছেন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট। কর্পোরেশনের মেয়র ও ডেপুটি মেয়রের মত এঁদের পদও অবৈতনিক।

কলকাতার পৌরনিগমের যা কাজ, জেলা-শহরের মিউনিসিপ্যালিটিরও তাই। শহরের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তাঘাট তৈরী, জলের ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা, নালা নর্দমা পরিষ্কার রাখা—সবই এর কাজের তালিকাভুক্ত।

নানাদিকে নানা ব্যাপারে ট্যাক্সই পৌরসঙ্ঘের প্রধান আয়। বাড়ির মালিক, জমির মালিক, গাড়ির মালিক, ব্যবসার মালিক, বৃত্তির মালিক—কেউই পৌরসঙ্ঘের "কর" থেকে রেহাই পায় না। সে রকম দরকার পড়লে পৌরসঙ্ঘ সরকার ছাড়াও সাধারণের কাছ থেকে ঋণ নিতে পারে।

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট

বড় বড় নগরের উন্নতি বিধানের জন্যে যে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, তাকেই বলে নগরোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (Improvement Trust)। শহরের বাগান মাঠ রাস্তা বাড়ি বাজার, এগুলোকে মনোরম করে তোলাই আসলে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ। আজকের বৃহত্তর কলকাতার যে জাঁক-জমক, তার অনেকটাই এই নগরোন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের দৌলতে। এ প্রতিষ্ঠানেও আছেন সরকারের মনোনীত (Chairman) একজন, আর চারজন সদস্য। বাকী সদস্যদের পৌরনিগমের বাছাই করা চারজন আর দুজন হলেন বিভিন্ন বণিক-সঙ্ঘের প্রতিনিধি। বছরে একটা বরাদ্দ সাহায্য এঁরা পেয়ে থাকেন পৌরনিগমের কাছ থেকে। অবশ্য নিজস্ব আয়ের উপায়ও কিছুটা আছে। প্রত্যেক বড় বড় নগরেই আজকাল ঐ রকম নগরোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

এ ছাড়া, বন্দরের স্বার্থরক্ষার জন্য এক ধরনের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা দেখা যায়, যাকে বলা হয় **বন্দর-রক্ষা প্রতিষ্ঠান** (Port Trust)। আবার যে সব শহরে সেনানিবাস থাকে, সেই সব জায়গায় **সেনানিবাস সঙ্ঘ** (Cantonment Board) নামে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন

এইবার গ্রামে ফেরা যাক। কতকগুলো গ্রাম নিয়ে হয় ইউনিয়ন, তাতো সকলেরই জানা। যে কটা গ্রাম ইউনিয়নের আওতায় পড়ল, তাদের তদারকির ভারটা ইউনিয়নের ওপরই পড়বে। তাই জনাকয়েক যোগ্য লোককে বেছে নিয়ে একটা **ইউনিয়ন বোর্ড** তৈরী করা হয়। ১৯১৯

সালের 'পশ্চিমবঙ্গ স্বায়ত্তশাসন আইন' অনুযায়ী এই বোর্ডের কাজকর্ম চলে আসছে। কমপক্ষে ছ'জন, অনধিক ন'জন ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য হতে পারেন। এঁরা সকলেই ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হন। সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হয়ে গেলে তাঁরাই বোর্ডের সভাপতি (Chairman) আর সহ-সভাপতি (Vice-Chairman) বাছাই করেন। এঁদের মেয়াদ চার বছর। সরকারের তরফ থেকে সার্কেল অফিসার এঁদের কাজকর্ম দেখাশুনা করেন। ইউনিয়নের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করাই ইউনিয়ন বোর্ডের আসল কাজ। উপরন্তু গ্রামবাসীর স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহ, জল নিষ্কাশন, রাস্তাঘাট, পরিষ্কার ও মেরামত, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, জন্ম-মৃত্যুর হিসেব রাখা—সবই ইউনিয়ন বোর্ডকে করতে হয়।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে **জেলা বোর্ড**-এর দায়িত্বই সবচেয়ে বেশি, কারণ জেলার সমস্ত গ্রামের তদারকির ভারটা শেষ পর্যন্ত জেলা বোর্ডের ওপরেই ন্যস্ত। প্রত্যেক জেলার সদরে জেলা বোর্ড থাকে। জেলার মিউনিসিপ্যাল এলাকা বাদ দিয়ে সমস্ত বাসিন্দার সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখাই জেলাবোর্ডের প্রধান কাজ।

জেলা বোর্ডের কাজ লাঘব করার জন্য **লোক্যাল বোর্ডের** সৃষ্টি। আজকাল লোক্যাল বোর্ড (নামান্তরে সার্কেল বোর্ড) উঠেই যাচ্ছে।

গ্রাম পঞ্চায়েত

কোন্ আদিকাল থেকে—কি ঘরে কি বাইরে—ছোটখাট সমস্যার ব্যাপারে পাঁচজনের পরামর্শ আর মতামত নিয়েই আমাদের সমাজজীবন চল্‌ত। পুরনো আমলের সমাজব্যবস্থায় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রভাব ছিল খুব বেশি। তারপর হঠাৎ একদিন যখন "বণিকের মানদণ্ড, পোহালে শর্বরী। দেখা দিল রাজদণ্ড-রূপে" তখন থেকেই পল্লীর প্রাণকেন্দ্র ঐ পঞ্চায়েত তিলে তিলে মরছে। আজ স্বাধীন ভারতে সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৯৫৬ সালের ২৫শে আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইনের বলে। অন্যান্য রাজ্যেও আবার গ্রাম পঞ্চায়েত দেখা দিয়েছে। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার একটা দায়িত্বপূর্ণ অংশ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে।

পুরনো আমলের পঞ্চায়েতে একজনকে মোড়ল মানা হত। সভ্যেরা তাঁরই পরামর্শটা কাজে লাগাতেন। তখনকার পঞ্চায়েতের যা কাজ ছিল আজকের

গ্রাম পঞ্চায়েত ঐ সবই করছে, তবে তার করবার ধরনটা গেছে পাল্টে, কারণ যুগটাও পাল্টে গেছে। আদর্শ পল্লী তৈরি করতে এর দায়িত্ব আজ সবচেয়ে বেশি। ঝগড়া বিবাদ মেটানো, গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা ব্যবস্থা, চাষবাসের উন্নতি, রাস্তাঘাট নির্মাণ—সবদিকেই আজ তাকে লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে! ছোটখাট মামলার বিচারের ভারও এদের হাতেই থাকে। এ ব্যাপারে যারা বিশষভাবে সংশ্লিষ্ট তাদের বলি **ন্যায় পঞ্চায়েত**।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সভ্যসংখ্যা ৯ থেকে ১৫ জনের মধ্যে হতে হবে। তার মধ্যে ⅓ সভ্য রাজ্য সরকারের বাছাই করা, যদিও তাঁদের ভোট দেবার অধিকার থাকবে না। গ্রাম পঞ্চায়েতর আয়ুষ্কাল চার বছর।

পাশাপাশি কয়েকটা গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে হবে **অঞ্চল পঞ্চায়েত।** সরকারের মনোনীত একজন কর্তা এর সম্পাদক হয়ে থাকবেন। অঞ্চল পঞ্চায়েতের কর-আদায়ের ক্ষমতা আছে, এরাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যয় বরাদ্দ করে দেয়।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা

দেশের পাঁচশালা পরিকল্পনায় আমরা ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছি। এই সব পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যই হল দেশকে উন্নততর আর সমৃদ্ধশালী করে তোলা। এ ব্যাপারে প্রথমেই নজর দিতে হচ্ছে গ্রাম-ভরা দেশটার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিক। বর্তমান সরকারের সমাজ-উন্নয়ণ পরিকল্পনা (Community Development Ptoject) এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছে, সেই সঙ্গে গ্রামবাসীর মনের মরা-গাঙে জোয়ার আনছে।

১৯৫২ সাল থেকে গ্রাম-উন্নয়নের কাজ আরম্ভ হয়েছে। স্থানীয় লোকদের শুভবুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলে কল্যাণ রাষ্ট্রের লক্ষ্যস্থলে পৌছান যায়, আর তার জন্য এই ধরনের সমাজচেতনা ও কর্মপ্রেরণার যথেষ্ট প্রয়োজন। জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সামর্থমত সরকারকে সাহায্য করছে টাকা দিয়ে, শস্য দিয়ে আর শ্রম দিয়ে। চাষের উন্নততর ব্যবস্থা, ছোটখাট কাজ, পতিত জমির উদ্ধার, পশুপালন, বুনিয়াদী আর বয়স্ক শিক্ষা, কুটির শিল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্য-সম্পদ সুন্দর গ্রাম গড়ে তোলা সবই এই উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য। যুবকদের উৎসাহ দিতে নানা ধরনের প্রমোদকেন্দ্র খোলা হচ্ছে। মহিলাদের জন্য হয়েছে কত সমিতি আর নারীকল্যাণ প্রতিষ্ঠান।

শতখানেক গ্রামকে একসঙ্গে একটা এলাকাভুক্ত করে নিয়ে অথবা একটা থানার অধীনে যত গ্রাম তাদের একসঙ্গে ধরে, পরগনা বা Block-এর কাজ শুরু

হয়েছে। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ভারতের সমস্ত গ্রামকে এর আওতায় আনার সঙ্কল্প করা হয়েছে। দু'শ' কোটি টাকাও বরাদ্দ আছে এর জন্য। ব্লকের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য আছেন ব্লক ডেভলপ্‌মেণ্ট অফিসার, কৃষি প্রসারণ কর্তা, শিক্ষা-সংগঠক, গ্রামসেবক, আর গ্রামসেবিকা। সব কিছুর উপরে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের একজন। ব্লকের পাশাপাশি আর একটি সংস্থা হল **জাতীয় প্রসার কৃত্যক** (National Extension Service)

সমস্যা ও প্রতিকার

এই পরিকল্পনার কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে আজকাল অনেক মহলে নানান্ সমালোচনা হচ্ছে। অভিযোগের মর্মার্থ এই যে এই সব ব্লক এবং কৃত্যকের অফিসারেরা বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবের দরুন গ্রামবাসীদের নিকট কোন পরিকল্পনাই যথাযথ ভাবে উপস্থিত করতে পারছেন না। কেবল থিয়োরী আর বক্তৃতা আর ফলাও করে প্রোপ্যাগাণ্ডা—এ সব কৃত্রিম জিনিসকে অন্তরের সঙ্গেই ঘৃণা করে পল্লীর মানুষেরা। কাজেই তাদের সহযোগিতাও বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না।

এখন কর্তব্য কী ? আমরা শুধু একথাই বলতে চাই যে, আমাদের মৃতপ্রায় গ্রামগুলোর পুনরুজ্জীবনই যদি এসব পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হয়, তা হলে গ্রামে গ্রামে এমন কাজ শুরু করতে হবে যার সঙ্গে পল্লীবাসীদের প্রত্যক্ষ সংশ্রব আছে। তাদের নানন্ সামাজিক সমস্যার প্রকৃত সমাধান যাতে হয় এমন কোন বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তাই যদি না হল তবে দরিদ্র জনসাধারণের কোটি কোটি টাকা এই সব বিলাসী পরিকল্পনার পিছনে অপচয় করা একান্তই মূঢ়তা

অনুশীলনী

১। তোমার পাড়ার কোন ব্যাপারের মীমাংসা কিভাবে হবে, সেটা কে ঠিক করে ? স্থানীয় একজন নাগরিক কিভাবে তাঁর মতামত দিতে পারেন ?

২। দেশের সরকার যখন রয়েছে, স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা আবার কেন ?

৩। কলকাতা কর্পোরেশন একটি স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠান ; কিন্তু এর কোন কোন কাজে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রভাব বিস্তার করে। তুমি এটা সমর্থন কর কি না ?

৪। দলগত কর্মোদ্যোগ। ছাত্ররা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে কর্পোরেশন কী মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পথঘাট, হাট-বাজার, সংস্কৃতি ইত্যাদি

বিভিন্ন শাখার কর্মপ্রণালীর তথ্য সংগ্রহ করবে। ঐ সব কার্যকলাপের মধ্যে কোথাও ত্রুটি বা অসঙ্গতি যদি চোখে পড়ে, তাও উল্লেখ করবে এবং তার প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করবে।

৫। কলকাতা শহরের চারধারে ঘনবসতিপূর্ণ যে শহরতলীগুলো গড়ে উঠছে সেগুলো নাগরিক জীবনে কোন্ কোন্ সমস্যার সৃষ্টি করছে?

৬। চার্ট তৈরি কর॥ শহরের বা গ্রামের স্বাস্থ্য বা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য ও হিসাব স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট পাওয়া যায়। সেগুলো সংগ্রহ করে বড় বড় চার্ট এঁকে স্কুলের প্রদর্শনীর জন্যে জমা কর।

৭। কাঠামো-নকশা বা Schematic। (ক) কর্পোরেশন, (খ) মিউনিসিপ্যালিটি ও (গ) গ্রাম পঞ্চায়েত—এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের গঠনপদ্ধতি ও বিবিধ কাজের (functions) কাঠামো-নকশা এঁকে প্রদর্শনীর আয়োজন কর।

৮। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হলে দেশের গ্রামগুলির পুনরুজ্জীবন ঘটবে। কি ভাবে এটা সম্ভব বলতে পার? জনসাধারণের সঙ্গে এই সব পরিকল্পনার যোগাযোগটা আরও ঘনিষ্ঠ করে তোলা যায় কী করে—তুমি কোন পরামর্শ দিতে পার?

৯। বিতর্কের আসর॥ "গ্রামের জীবনের চেয়ে শহরের জীবন ভাল।"

১০। শিক্ষামূলক সফর॥ কলকাতা কর্পোরেশনের মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম, জাতীর প্রসারণ কৃত্যকের একটি ব্লক।
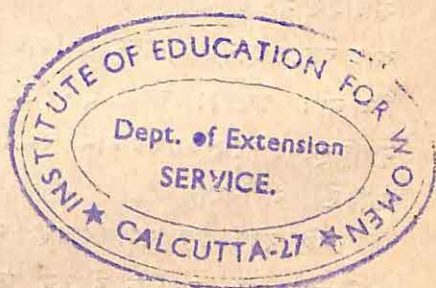
পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ ভারতের সার্বভৌম গণতন্ত্রী সরকার ॥

প্রাচীন ভারতের রাজধর্ম

ভারতবর্ষের শিক্ষা কোনদিন রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত ছিল না। পণ্ডিত হ্যাভেল বলেছেন : 'ব্যক্তিগত চিন্তার স্বাধীনতা বা ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অধিকারের জন্য ভারতবর্ষে কোন সংগ্রাম করতে হয়নি, দেশের অলিখিত বা প্রচলিত আইনের দ্বারা দুটিই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং প্রত্যেক রাজা তাঁর অভিষেককালীন শপথে তা বলবৎ করতেন।' বুদ্ধদেবের জন্মেরও বহু পূর্বে রচিত 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণের' সময় থেকে ভারতীয় নৃপতিগণ তাঁদের অভিষেকের সময় সমবেত প্রজাবৃন্দকে লক্ষ্য করে এই শপথ গ্রহণ করতেন : "যে রাত্রিতে আমি জন্মগ্রহণ করেছি, আর যে রাত্রিতে আমি মৃত্যুমুখে পতিত হব, এই উভয়ের মধ্যে আমার যা-কিছু সুকৃত কর্মের ফল, আর আমার পরলোক, জীবন এবং সন্তান-সন্ততি সমস্ত থেকেই যেন বঞ্চিত হই যদি আমি তোমাদের উপর অত্যাচার করি।" কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রয়েছে :

'প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাং চ হিতে হিতম্।
নাত্মপ্রিয়ং হিতং রাজ্ঞঃ প্রজানাং তু প্রিয়ং হিতম্ ॥"

—প্রজার সুখে রাজার সুখ, প্রজার হিতে রাজার হিত, রাজার নিজের প্রিয়বস্তু হিত নয়, প্রজাদের প্রিয়ই হিত। এই ছিল প্রাচীন ভারতের রাজধর্ম—'হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি ত্যজিতে মুকুট-দণ্ড...'

প্রাচীন ভারতে শাসনকার্য চলত তিন জনের মধ্যে সামঞ্জস্য করে : রাজা, মন্ত্রিপরিষদ ও প্রজা কৌটিল্যের স্পষ্ট বিধান ছিল যে, মন্ত্রিপরিষদ ও মন্ত্রিগণের সম্মিলিত সভায় (Council of Ministers) অধিকাংশের মতানুসারেই রাজাকে কাজ করতে হবে। এ অবস্থায় রাজার পক্ষে স্বেচ্ছাচারী হওয়া একেবারেই সম্ভব ছিল না। সুতরাং এরকম সুনিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ভারতবর্ষীয় নৃপতিকুলের পক্ষে জাতির নানা কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করা সহজ হয়েছিল।

ভারতীয় সংবিধান

সেই গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ধূলিসাৎ হয়েছিল বৃটিশ শাসনকালে। স্বাধীনতাকামী দেশভক্ত বীরেরা তখন স্বপ্ন দেখতেন : 'রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?' রাত্রির তপস্যার শেষে সত্যই একদিন নব প্রভাতের

সূচনা হল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। জাতির মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় দিন। ১৯৫০ সালে ২৬শে জানুয়ারী থেকে ভারতের নূতন সংবিধানও প্রবর্তিত হয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম এই সংবিধানের প্রথমে একটি প্রস্তাবনা (Preamble) যুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ভারত একটি **সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র** (Sovereign Democratic Republic)।

প্রথম কথা : 'সার্বভৌম রাষ্ট্র'। ভারতবর্ষ এখন পরাধীন নয়, অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের মত সমান ক্ষমতা ও মর্যাদা সে অর্জন করেছে। আবার, স্বাধীন হয়েও ভারত স্থির করেছে, সে ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থ-এর অন্যতম সদস্য থাকবে—যেমন রয়েছে আরও কয়েকটি দেশ। এরপরও ভারতের 'সার্বভৌমত্ব' অক্ষুণ্ণ থাকল, কি থাকল না—সেটাই প্রশ্ন।

দ্বিতীয় কথা : 'গণতান্ত্রিক'। এটা বলবার তাৎপর্য হচ্ছে, জনগণের ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ইচ্ছা, জনগণের সেবাই রাষ্ট্রের ব্রত। জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত আইনসভাই দেশের সার্বভৌম ক্ষমতাকে বাস্তব রূপ দেবে। সমস্যা হচ্ছে, ভারতের রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে এই আইনসভাকে ভেঙে দিতে পারেন। এখন একজনের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর যদি জন নির্বাচিত আইনসভার স্থায়িত্ব নির্ভর করে, তা হলেও রাষ্ট্রকে 'গণতান্ত্রিক' বলব কি না?

তৃতীয় কথা : 'প্রজাতন্ত্র'। প্রজাপুঞ্জই দেশের শাসক; ভারতবর্ষে রাজা নেই, সিংহাসন নেই, উত্তরাধিকার নিয়ে খুনোখুনিও নেই। এখন আমাদের ইতিহাসনিষ্ঠ মন হয়ত প্রশ্ন করে বসবে : প্রাচীন ভারতে যদিও রাজা ছিল, সিংহাসন ছিল, তবু, সে যুগের রাজধর্মের আদর্শ ছিল—'ভিক্ষুকের প্রতিনিধি', 'রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন,' বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো,—ভরত অশোক হর্ষ আকবর এবং শিবাজী প্রমুখ প্রজানুরঞ্জক নরপতি সে-আদর্শের ধারক ও বাহক; তা হলে 'প্রজাতন্ত্র' নামে আমাদের অতটা পুলকিত হবার কী আছে? কিন্তু এখানে সামাজিক সমস্যাটা হল এই যে, বর্তমান যুগের পরিবর্তিত পটভূমিকায় ভারতবর্ষে রাজতন্ত্রের পুনরাবির্ভাব কি সত্যই সম্ভব?

ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য

(১) নূতন সংবিধানে ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) শাসনব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতাগুলো ভাগ করে দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারদের মধ্যে; ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বজায় থাকে।

(২) ভারতের শাসনতন্ত্র লিখিত (Written)।

(৩) আইনের দিকে আমাদের শাসনতন্ত্র অনমনীয় (rigid) বটে, কিন্তু আমেরিকার শাসনতন্ত্রের মতন পুরোপুরি নয়।

(৪) রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে একজন শাসক থাকলেও আমাদের শাসনব্যবস্থা মন্ত্রিপরিষদ-পরিচালিত।

(৫) শাসনতন্ত্রই ভারত সরকারের সকল ক্ষমতার উৎস।

(৬) One-citizenship বা এক-নাগরিকত্বেই ভারতীয়দের পরিচয়।

(৭) ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের কতগুলো **মৌলিক অধিকার** (Fundamental Rights) স্বীকৃত। এগুলো কী কী? সাম্যের অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মাচরণের অধিকার, শিক্ষালাভ ও সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবিধানের অধিকার, ইত্যাদি। (এই অধিকারগুলো খুবই মহৎ আদর্শের ভিত্তিতে রচিত, কিন্তু সমস্যা এই যে, আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্রপ্রধানকে এত বিপুল ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে তাঁর নির্দেশে সরকার এই সব অধিকার থেকে, সাময়িক ভাবে হলেও নাগরিকদের বঞ্চিত করতে পারে।)

(৮) ভারত একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State)। জাতি বা ধর্মের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য আমাদের দেশে প্রশ্রয় পায় না। আবার কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, কোনো কোনো সরকারী চাকরিতে কয়েকটি পদ নির্দিষ্ট করে রাখা হয় তপশীলী ও অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর ভারতীয়দের জন্যে। এর দ্বারা সংবিধানের মূল নীতি লঙ্ঘিত হচ্ছে কি হচ্ছে না?

(৯) 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' এই আমাদের ভারত ; জনসাধারণের মতামতই রাষ্ট্রের মতামত।

কেন্দ্রীয় সরকার

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রনীতি, মন্ত্রিপরিষদ, পার্লামেণ্ট বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদ এবং সুপ্রীম কোর্ট বা অধি-ধর্মাধিকরণ নিয়ে গঠিত।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনভার **রাষ্ট্রপতির** (President) উপর ন্যস্ত। পার্লামেণ্টের উভয় সদনের, অর্থাৎ রাজ্যসভা ও লোকসভার নির্বাচিত সদস্যগণের গোপন ভোটে তিনি নির্বাচিত হবেন—পাঁচ বৎসরের জন্য, তবে মেয়াদ ফুরোলে তিনি পুনর্নির্বাচন-প্রার্থীও হতে পারেন। সংবিধানবিরোধী কাজ করলে তাঁর বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টের যে-কোন সদন অভিযোগ

আনতে পারেন, এবং ⅔ সংখ্যক সদস্যদের অনুমোদন পেলে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যাবে।

সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী। (ক) শাসনপরিচালনা, (খ) আইন-প্রণয়ন, (গ) অর্থ, (ঘ) বিচার, (ঙ) রাজ্য এবং (চ) জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা তিনি ভোগ করে থাকেন। তবে এত ক্ষমতা থাকলেও তাঁকে প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ না মেনে চলার উপায় নেই। যুক্তরাষ্ট্রের একজন **উপ-রাষ্ট্রপতিও** পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত হন; ইনি রাষ্ট্রপতির সাময়িক অনুপস্থিতির সময় রাষ্ট্রশাসন পরিচালনা করেন।

এর পর আসে **মন্ত্রিপরিষদের** (Council of Ministers) কথা। পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচন শেষ হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন; প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে মন্ত্রি পরিষদের অন্যান্য সদস্য নিযুক্ত হন। সমগ্র কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা কতগুলো দপ্তরে ভাগ করে সেগুলো ন্যস্ত করা হয় মন্ত্রীদের ওপর। মন্ত্রীরা কিন্তু যৌথভাবে পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী। নীতিগত ভাবে মন্ত্রিপরিষদ তার কাজের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী হলেও, কার্যত হয় কি - সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দ্বারা গঠিত বলে কি আইন প্রণয়নে, কি অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে, কি নীতি নির্ধারণে, সকল বিষয়েই সে পার্লামেণ্টের কাজ নিয়ন্ত্রিত করে।

আচ্ছা, এমন যদি কখনও হয় যে, কোন একটি নীতির ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে জনৈক মন্ত্রীর গুরুতর মতভেদ হল, প্রধান মন্ত্রী হয়ত তাঁকে পদত্যাগ করতে বললেন, তিনি তা অগ্রাহ্য করলেন,—তখন কী ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে? তাও এক গুরুতর প্রশ্ন।

এবার **পার্লামেণ্টের** কথা। রাষ্ট্রপতি-সহ রাজ্যসভা (Council of States) ও লোকসভা (House of People) নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদ তৈরি। রাজ্যসভার ও লোকসভার সদস্যসংখ্যা যথাক্রমে অনধিক ২৫০ জন ও ৫০০ জন। এঁরা সকলেই জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত; অল্প কয়েকজন মাত্র রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত। শাসন সংক্রান্ত নানা বিষয়ে এই দুটি সভা সরকারী কাজের আলোচনা করার অধিকারী।

ভারতীয় সংসদের প্রথম ও প্রধান কাজ, আইন প্রণয়ন। দ্বিতীয় কাজ সরকারের আয়-ব্যয় মঞ্জুর করা, কর ধার্য করা, কোন্ বিভাগের জন্য কত টাকা খরচ হবে তা স্থির করা। তৃতীয় কাজ, ক্ষমতার অপব্যবহার না হয়, সেজন্য মন্ত্রিপরিষদের কাজের তদারকি করা। এ ছাড়া আমাদের সংবিধান সংশোধন

করা, এবং গুরুতর অপরাধে রাষ্ট্রপতি বা বিচারপতিদের নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পদচ্যুত করবার ক্ষমতাও সংসদের আছে।

সবশেষে **সুপ্রীম কোর্ট** বা অধি-ধর্মাধিকরণ। একজন বিচারপতি এবং অনধিক সাতজন বিচারপতি নিয়ে এটি গঠিত। সংবিধানের নির্দেশ ও জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা, এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারদের মধ্যে বিবাদের নিষ্পত্তি করা অধি-ধর্মাধিকরণের লক্ষ্য।

রাজ্য সরকার

ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশকে কয়েকটি সুবা, প্রদেশ বা রাজ্যে ভাগ করে নিলে শাসনকার্য সুপরিচালিত হতে পারে, এটা বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের শাসনকর্তারা উপলব্ধি করেছিলেন। এই প্রদেশ বা রাজ্যগুলোর সীমানা যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে, মাঝে মাঝে দুই পক্ষে ঘোর বাদানুবাদ ও তিক্ততারও সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের পুনরায় **রাজ্য-পুনর্গঠন আন্দোলন** দেখা দেয়; বহু আলাপ-আলোচনার পর ১৯৫১ সালের ৩১শে আগষ্ট "রাজ্য পুনর্গঠন বিল"টি রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেয়ে আইনে পরিণত হল। এ আইনর বলে সম-মর্যাদাসম্পন্ন ১৪টি রাজ্য, আর কেন্দ্রীয় শাসনাধীন ছয়টি এলাকা গঠিত হয়েছে। যেহেতু এই রাজ্য পুনর্গঠন 'ভাষাভিত্তিক' সেজন্য সকল ক্ষেত্রে সকলের মনস্তুষ্টিবিধান করা সম্ভব হয়নি, আজও মাঝে মাঝে অসন্তোষের ঢেউ জাতীয় ঐক্যের তরীকেও বিপন্ন করে তুলেছে। বর্তমানে ভারত ইউনিয়ন ১৬টি রাজ্য নিয়ে গঠিত।

রাজ্যের শাসনবিভাগ গড়ে উঠেছে **রাজ্যপাল** এবং মন্ত্রীপরিষদকে নিয়ে। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। তিনি ক্ষমতা ভোগ করেন প্রধানত চারটি বিষয়ে: শাসন, আইন, অর্থ এবং বিচার। ধরা যাক, রাজ্যের জনগণের মধ্যে আইন লঙ্ঘন করবার একটা হিড়িক পড়ে গেছে, অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে—সে অবস্থায় রাজ্যপালের কর্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, তিনি রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র, শাসন পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত। সরকারের বিরোধী পক্ষরা তাই বাহুল্য বিবেচনায় রাজ্যপালের পদকে তুলে দেবার জন্য আন্দোলন করেন। রাজ্যপালের পদ তুলে দেবার পক্ষে, না রাখবার পক্ষে—এটি বিতর্কসাপেক্ষ।

কেন্দ্রের মন্ত্রিপরিষদের মতনই প্রত্যেক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে একটি করে **মন্ত্রিপরিষদ** আছে। শাসনবিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের কার্যাবলী সম্বন্ধে এঁরা

দায়ী থাকেন রাজ্যের আইনসভার কাছে মন্ত্রিপরিষদ যদি জনকল্যাণবিরোধী কোন কাজ করে, তা হলে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করবার নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিও আছে।

আইনসভার দুইটি সদন: নিম্ন সদন বা বিধান সভা (Legislative Assembly) এবং উচ্চসদন বা বিধান পরিষদ্ (Legislative Council) মহীশূর, মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব— শুধু এই ক'টি রাজ্যে দুটি সদন আছে, অন্যান্য রাজ্যে কেবল নিম্নসদন। নিম্নসদনের সদস্যরা প্রত্যক্ষ ভোটদান পদ্ধতিতে প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা নির্বাচিত হন। মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্যেরই আইনসভার যে কোন একটি সদনের সদস্য হওয়া চাই-ই।

সরকারী ত্রিভুজ

সরকারের কার্যাবলী তিন ভাগে বিভক্ত: (ক) ব্যবস্থাপক বিভাগ—Legislature—যার কাজ আইন প্রণয়ণ করা; (খ) শাসন বিভাগ—Executive—প্রণীত আইন অনুসারে শাসনকার্য চালানো যার কাজ; এবং (গ) বিচার-বিভাগ—Judiciary—আইনের উপযুক্ত ব্যাখ্যা করে ন্যায়বিচার করা এর কাজ। আমাদের দেশে এযাবৎ শাসন বিভাগেরই একছত্র প্রতিপত্তি ছিল; বর্তমানে বিচার বিভাগের ক্ষমতাকেও স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। এবং সেটা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

শাসন বিভাগের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত আরও দুটি সরকারী বিভাগের নাম: রাষ্ট্র-সেবক নিয়োগ পরিষদ (Public Service Commission) এবং প্রধান হিসাব-নিরীক্ষক (Comptoller and Auditor-General) দপ্তর। প্রথমোক্ত বিভাগটির কাজ উচ্চ সরকারী পদে যোগ্যতম কর্মচারী নিয়োগ করা; আর দ্বিতীয় বিভাগের কাজ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির হিসাব পরীক্ষা করা।

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন

দেশ শাসন করবার একমাত্র অধিকার যখন একটিমাত্র সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে, তাকে বলি কেন্দ্রিক রাষ্ট্র (Unitary State)—যেমন ব্রিটেন ফ্রান্স। আর যখন দেশে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক দু'রকমের সরকার থাকে, তাদের ক্ষমতা ও কাজের সুনির্দিষ্ট বিভাগ থাকে, তাকে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্র (Federal State) আমাদের ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রকার রাষ্ট্রের পর্যায়ে পড়ে; একে বলা হয় Indian Union বা ভারতীয় রাজ্যসঙ্ঘ।

এদেশে আইন প্রণয়ন ও শাসনের সমগ্র ক্ষমতা তিন ভাগে বিভক্ত: (১) সঙ্ঘতালিকা—অর্থাৎ যে সব বিষয়ে একমাত্র কেন্দ্রীয় সংসদেরই অধিকার; (২) রাজ্যতালিকা—যে সব বিষয়ে শুধু রাজ্য সরকারই আইন প্রণয়ন করতে পারে; এবং (৩) যুগ্ম তালিকা বা Concurrent List—
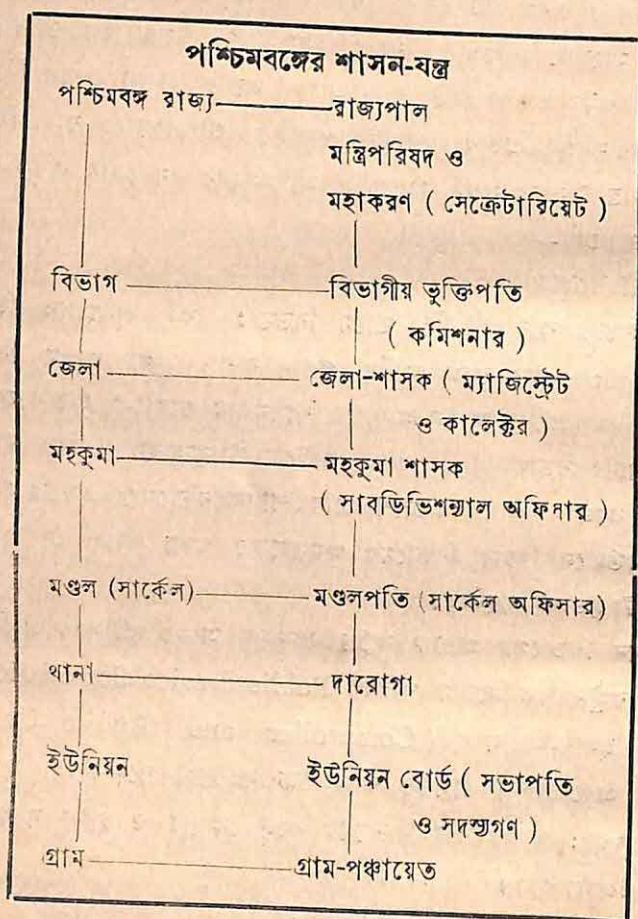
অর্থাৎ যে সব বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য, উভয় সরকারেরই যুগ্ম অধিকার আছে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের আয়ের উৎসও নির্দিষ্ট করা আছে ভারতীয় সংবিধানে।

একটা কথা কিন্তু সত্যি। ভারতীয় রাজ্যসঙ্ঘ যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) কাঠামোতে গঠিত হলেও রাজ্য সরকার অপেক্ষা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

আইন প্রণয়নের কথা

আগেই বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সংসদের প্রধান কাজ আইন প্রণয়ন। অর্থ সংক্রান্ত ছাড়া অন্যান্য আইনের খসড়া সংসদের যে-কোন সদনে উপস্থিত করা যায়। আইন সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার আগে তাকে **বিধেয়ক** বা Bill বলা হয়। এক মাস পূর্বে অনুমতি নিয়ে সংসদে বিধেয়কটি উত্থাপন করতে হয়, মন্ত্রীদেব ক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। বিধেয়কের প্রথম আলোচনার (First Reading) সময় কেবল নীতিগত দিকটাই দেখা হয়। এর পর বিধেয়কটিকে দরকার হলে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়, কমিটির সভ্যেরা তাঁদের সুপারিশ পাঠালে পর বিধেয়কটি নিয়ে বিশদভাবে দ্বিতীয় আলোচনা (Second Reading) হয় এবং ভোট নেওয়া হয়। অধিক সংখ্যক সদস্যের ভোট পেলে বিধেয়কটির তৃতীয় আলোচনা (Third Reading) হয়। এইভাবে একটি সদনে গৃহীত হবার পর বিধেয়কটি প্রেরিত হয় অপর সদনে। সেখানেও বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যদি অধিকাংশ সদস্যের দ্বারা গৃহীত হয় তা হলে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয় এবং তাঁর চূড়ান্ত সম্মতি পেলে **আইনে** (Act) পরিণত হয়।

কিন্তু বিধেয়কটি যদি অন্য সদন কর্তৃক অগ্রাহ্য হয়? সে অবস্থায় মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি উভয় সদনের একটি মিলিত অধিবেশন ডাকতে পারেন, সেখানে পুনরায় আলোচনার পর ভোটাভুটির জোরে বিধেয়কটি গৃহীত বা অগ্রাহ্য হবে।

কিরকম কাণ্ডকারখানা! কেউ কেউ বলবে, এত সব নিয়ম-পদ্ধতির বেড়া ডিঙিয়ে যদি একটা আইন পাস করতে হয় তবে তো অনেক সময় নষ্ট হবে, অনেক বাদ-বিতণ্ডার ঝড় উঠবে, দিন ফুরিয়ে যাবে তর্কের মারপ্যাঁচে। একটা কোন সহজ নিয়ম যদি বাৎলানো যেত, যাতে আইন পাসের ব্যাপারে এত ঝক্কি পোয়াতে হবে না! কিন্তু আইন পাসের পূর্বেকার ঐ জটিল সময়সাপেক্ষ নিয়ম-পদ্ধতিগুলোরও যে একটা উপযোগিতা আছে, তাও আমাদের বুঝতে হবে বৈকি!

কেন্দ্রীয় সংসদে যেমন, রাজ্যের আইনসভায়ও এভাবেই আইনগুলো প্রণীত হয়।

শাসনের রোজনামচা

দেশের এই সুবৃহৎ রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিদিনকার কাজকর্ম কিভাবে চলে, সে বিষয়ে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। আসল কথা হচ্ছে, সারাটা দেশ জুড়ে

শাসনব্যবস্থার জাল এমনভাবে পাতা রয়েছে যে কাজের নড়চড় হবার উপায় নেই এতটুকু। শাসনতান্ত্রিক সমস্ত কাজ ছকে বাঁধা রুটিনের মত সমাধা হচ্ছে। উচ্চতম অফিসার থেকে নিম্নতম কর্মচারী পর্যন্ত প্রত্যেকের কাজ আলাদা নির্দিষ্ট করা আছে, যে যার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। তবে মাঝে মাঝে যন্ত্রের স্ক্রু যেমন ঢিলে হয়ে যায়, সরকারী শাসনব্যবস্থায়ও তেমনি মাঝে মাঝে গলদ দেখা যায়। এই গলদ যখন অত্যন্ত মারাত্মক ও জনস্বার্থবিরোধী হয়, তখন অনুসন্ধান কমিশন বসে এবং দোষী ব্যক্তির শাস্তি হয়। এরকম ঘটনা আজকাল ভারতবর্ষে বিরল নয়।

সরকারী কাজে মন্ত্রীরা সাধারণত নীতি নির্ধারণ করেন, আর দপ্তরের সচিবেরা সেই নীতিকে কার্যে প্রয়োগ করেন। অবশ্য বিরোধী পক্ষের বা জনসাধারণ ও সংবাদপত্রের মতামতও সরকার-পক্ষ একেবারে উপেক্ষা করতে পারেন না; প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে এদের মতটাই ক্ষেত্রবিশেষে এমন প্রবল ও যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে যে সরকার-পক্ষ নিজের মত বা নীতিকে শেষ পর্যন্ত বদ্‌লাতে বাধ্য হয়। যে কোন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এ না হয়ে উপায় নেই, এবং এটাই গণতান্ত্রিক সুস্থতা।

অনুশীলনী

১। তোমাদের বিদ্যালয়ের পরিচালন-ব্যবস্থা এবং রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে মিল ও কোন্ কোন্ বিষয়ে অমিল দেখতে পাও?

২। মোগল সম্রাটের আমলে জন-প্রতিনিধিদের মতামত নিয়ে ভারতের শাসনকার্য চলত কি?

৩। আমাদের বিধান সভায় শীঘ্রই কোন গুরুত্বপূর্ণ বিধেয়ক (Bill) উত্থাপিত হবে কি? বিধেয়কটির সার্থকতা বা অসারতা সম্বন্ধে তোমার অভিমত দাও।

৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সরকার নাগরিকদের কোনো কোনো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। এরকম কোন ঘটনা সম্প্রতি এদেশে ঘটেছে বলে জান কি?

৫। ধর, ভারতের সংবিধানের দু' একটি ধারা সংশোধন করা প্রয়োজন। কিভাবে সেটা সম্ভব হবে?

৬। কেন্দ্রীয় সংসদে রাজ্যসভার চেয়ে লোকসভার ক্ষমতা বেশি—কারণগুলি কী?

৭। বিতর্কের আসর॥ বিষয়ঃ (খ) "ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশ নেওয়া অনুচিত।"

(গ) "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জেলাগুলির সংখ্যা আরও কমানো উচিত।"

(ঘ) "রাজ্য আইনসভাগুলিতে উচ্চ সদন (Up... House) অপ্রয়োজনীয়।"

৮। বিদ্যালয়ে একটা নকল আইনসভার (Mock Parlia...) অধিবেশন ডাকো। কয়েকটি ছাত্র সরকার পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করবে, বা ছাত্ররা বিরোধী পক্ষের। সরকার পক্ষের শিক্ষামন্ত্রী একটা বিল্ আইনসভায় উপস্থিত কর—"ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ-নিরোধ বিল্।" উভয় পক্ষে তুমুল বিতর্ক চলুক ; স্পীকার বা পরিষদপাল শৃঙ্খলা বজায় রাখুক।

৯। এ কথাগুলোর অর্থ জানবার চেষ্টা করঃ Ordinance, Adjournment motion, No confidence motion, Amendment, Plebiscite, Chief Whip এবং Budget.

১০। Schematics বা কাঠামো-নকশা আঁক॥ কেন্দ্রীয় সরকারঃ রাজ্য সরকার ; বিচার বিভাগ।

১১। ফিল্ম প্রদর্শনী॥ ভারত সরকারের ফিল্মস্ ডিভিশনের তোলা ভারতীয় নির্বাচনের প্রামাণ্য চিত্র।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ ভারত ও বহির্বিশ্ব ॥

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই প্রাচীনতম সভ্যতার জন্মস্থানগুলোর সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল। মৌর্যযুগে এই যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হয়, বিশেষ করে অশোকের 'ধর্ম-প্রচারের ফলে বাণিজ্যিক যোগ আত্মিক যোগে' পরিণত হয়। অষ্টম শতক পর্যন্ত ভারত নিজের ভৌগোলিক সীমা পেরিয়ে ক্রমশ বৃহত্তর জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তারপর দীর্ঘদিন ধরে বিদেশীদের অধীনতায় থাকার ফলে ভারতের গতি ছিল পদে পদে ব্যাহত। নূতন সংস্কৃতির সংস্পর্শে দেওয়া-নেওয়া চলতে থাকলেও কার্যত বাহিরের আহ্বানে সাড়া দেবার শক্তি ভারতের ছিল না। স্বাধীনতালাভের পর আবার আমরা বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছি। বিজ্ঞানের উন্নতি এই যোগাযোগকে সহজ করে তুলছে আরও।

রাজনৈতিক যোগ

পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। দূতের মারফৎ এই যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। আমেরিকা, রাশিয়া, মিশর ইত্যাদি দেশে ভারতের দূতাবাস আছে, আবার ভারতেও এই সব দেশের দূতাবাস আছে। দূত বিনিময়ের আদর্শ সুপ্রাচীন। বৈদেশিক সফর এই রাজনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা করতে সাহায্য করে। বুলগানিন, ক্রুশ্চেভ, আইযেনহাওয়ার এলেন ভারতে আর নেহেরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ গেলেন রাশিয়ায়। পর্যবেক্ষণ আর পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে দুই দেশের মৈত্রীবন্ধন হল দৃঢ়তর। ভারত যেমন আমন্ত্রণ জানিয়েছে বিভিন্ন দেশের প্রধান মন্ত্রীদের, ভারতের প্রধান মন্ত্রীও তেমনি আমন্ত্রিত হয়েছেন বিভিন্ন দেশে। এই বৈদেশিক সফরের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে ভারতের সম্মান পরিবর্ধিত হয়েছে।

অর্থ নৈতিক যোগ

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সব দেশের কৃষিগত বা শিল্পগত

সম্ভাবনা সমান নয়। কৃষিপ্রধান দেশকে শিল্পপ্রধান দেশের উপর নির্ভর করতে হয় বিভিন্ন শিল্প-পণ্যের জন্য। আবার শিল্পপ্রধান দেশকেও কৃষিপ্রধান দেশের উপর নির্ভর করতে হয়—খাদ্যসম্ভারের জন্য। সম্ভাবনা থাকলেও আজ সব দেশ সব কিছু উৎপন্ন করার স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথ খোঁজে না, কারণ তাতে লাভ নেই। আমার দেশে গম উৎপন্ন করা কোন রকমে সম্ভব হলেও তাতে যে খরচ, অন্য দেশ থেকে আমদানি করলে যদি তার চেয়ে অনেক কম খরচ পড়ে তা হলে আমি গম ফলাবার চেষ্টায় অর্থ আর
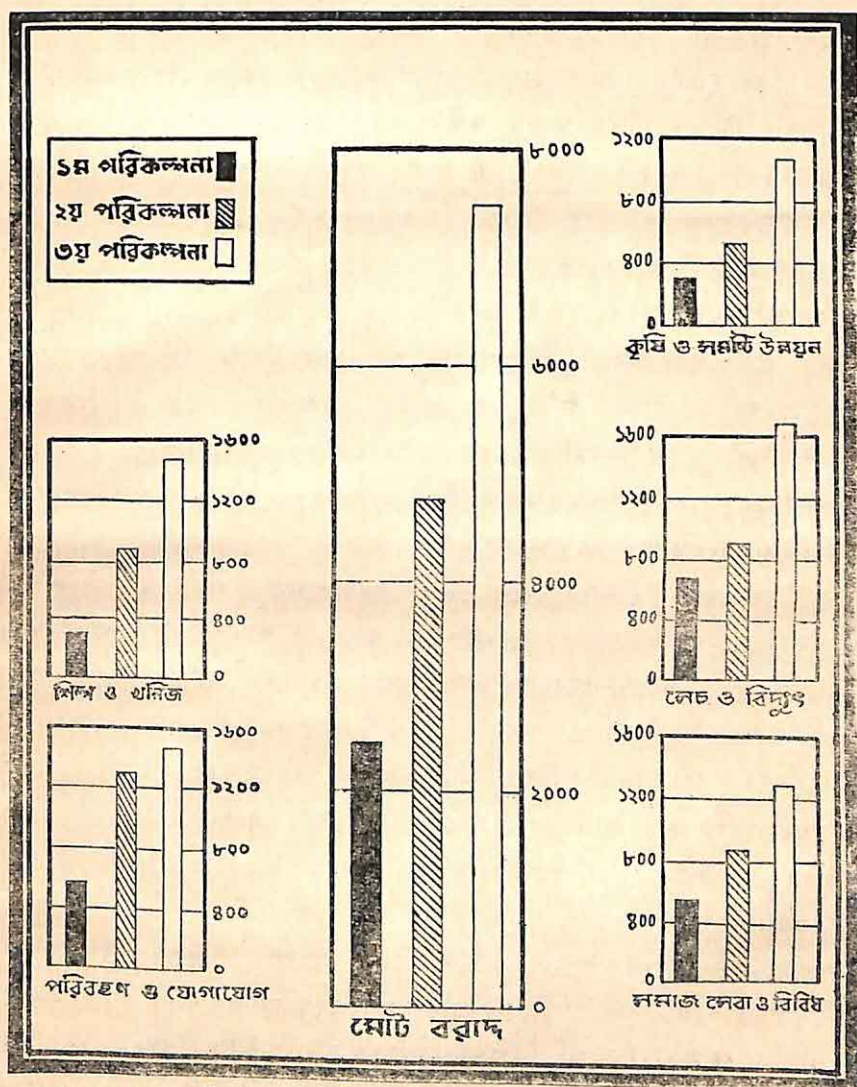
ভারতের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার বিভিন্ন খাতে ব্যয়বরাদ্দ

শ্রম বৃথা নষ্ট করব কেন? তবে একটা দেশ যদি কৃষি বা শিল্পে খুবই অনুন্নত অবস্থায় থাকে তবে যতটা সম্ভব উন্নয়নের চেষ্টা করতে হবে বৈকি! এবং এই উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাকে উন্নত দেশগুলোর সাহায্য নিতে হবে। ভারত প্রথম **পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়** কৃষি এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্পের উপর জোর দিয়েছে। ভারতে ভারী শিল্প গড়ে তুলতে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। এ জন্যে ভারতকে শিল্পোন্নত বিত্তবান দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি করতে হয়েছে। রাউরকেল্লা, ভিলাই, এবং দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা যথাক্রমে জার্মানী, রাশিয়া ও ইংলণ্ডের মূলধনে এবং তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন দেশকে ঋণদানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ঋণদান সমিতি গড়ে উঠেছে। এর নাম বিশ্ব ব্যাঙ্ক (World Bank)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারত এই ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে। পৃথকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও ভারত ডলারের ঋণে আবদ্ধ।

সাংস্কৃতিক যোগ

উনবিংশ শতকের নব জাগরণের শুভ সূচনা থেকে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ নিবিড় হয়ে ওঠে। বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দিয়ে এই যোগাযোগ নিবিড়তর হয়। উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে বিবেকানন্দ ভারতের অধ্যাত্মচিন্তার সঙ্গে বিশ্ববাসীর যে পরিচয় ঘটালেন, পরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনার মধ্যে দিয়ে তা হল পূর্ণতর।

বাণিজ্যের প্রয়োজনে দেশে দেশে যে যোগাযোগ গড়ে ওঠে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের অভাবে তা কখনই স্থায়ী হয় না। শাসকে শাসকে প্রয়োজনিক যোগ নয়, মানুষে মানুষে আত্মিক যোগ চাই। এই আত্মিক যোগ গড়ে উঠে সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ে। আজ তাই সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগে প্রেরিত সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের মারফৎ বিভিন্ন দেশের মৈত্রীবন্ধনের শুভ আয়োজন চলছে। আমাদের দেশের সাহিত্যিক এবং শিল্পীরা ব্রিটেন, রাশিয়া, আমেরিকা, জার্মানী, জাপান ইত্যাদি দেশে যাচ্ছেন, ওসব দেশ থেকেও সাহিত্যিক এবং শিল্পীরা আমাদের দেশে আসছেন; এঁদের আমরা বলতে পারি সাংস্কৃতিক দূত। রাজনৈতিক দৌত্যের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক দৌত্য যুক্ত হয়ে ক্রমশ গড়ে উঠছে মানুষে মানুষে প্রীতির সেতুবন্ধ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গ্রন্থানুবাদ, প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র উৎসব ইত্যাদির মাধ্যমে এই সাংস্কৃতিক যোগ ক্রমেই ব্যাপকতর হচ্ছে।

বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশ ভারতীয়দের জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে; এইসব বৃত্তি নিয়ে ভারতের বিদ্যার্থীরা বিদেশে গিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ শিক্ষালাভ করবার সুযোগ পাচ্ছে।

ভারতের বৈদেশিক নীতি

ভারতের বৈদেশিক নীতি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পটভূমিকাতেই বুঝতে হবে। পৃথিবী আজ দুইটি শিবিরে বিভক্ত—একটি ধনতান্ত্রিক শিবির আর একটি সাম্যবাদী শিবির। একদিকে আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রমুখ ধনতন্ত্রী দেশ, আর একদিকে সোভিয়েট রাশিয়া, চীন প্রমুখ সাম্যবাদী দেশ। স্বভাবতই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক। প্রত্যেকে যার যার শক্তি বৃদ্ধি করে চলেছে নানাভাবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলো যার যার নীতি অনুসারে এই দুই শিবিরের একটিতে যোগ দিচ্ছে। কিন্তু ভারত কোনো শিবিরে যোগ না দিয়েও স্বতন্ত্র নীতি গ্রহণ করেছে। সে নীতি **শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি** (Peaceful Co-Existence)। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারত শান্তির সপক্ষে। ভারত আক্রমণকারী হিসেবে কোন দলে যায়নি, গিয়েছে শান্তির বাণী নিয়ে। এই প্রাচীন আদর্শই যুগোপযোগী রূপ পেয়েছে শ্রীনেহেরু-ঘোষিত "**পঞ্চশীলে**"। পাঁচটি 'শীল' হল:

(ক) প্রত্যেক জাতি অন্য জাতির স্বাধীনতা মেনে নেবে;

(খ) কোন জাতি অপর কোন জাতিকে আক্রমণ করবে না;

(গ) কোন জাতি অন্য জাতির নিজস্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না;

(ঘ) প্রত্যেক জাতি পরস্পরকে শ্রদ্ধা করবে;

(ঙ) ভাবধারার পার্থক্য সত্ত্বেও জাতিগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় থাকবে।

বান্দুং সম্মেলনে পঞ্চশীলের নীতি পুনর্ঘোষিত হয়। এই পঞ্চশীল নিঃসন্দেহে বিশ্বশান্তির সহায়ক।

শান্তির সপক্ষে ভারতের নীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সম্মান বৃদ্ধি করেছে। কোরিয়া এবং ইন্দোচীনের যুদ্ধবিরতি ব্যাপারে ভারতের মধ্যস্থতা, ভারতের নূতন চীনকে মেনে নেওয়া, মিশরের উপর ব্রিটেন ও ফ্রান্সের হামলার বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিবাদ—নিঃসন্দেহে ভারতের বলিষ্ঠ নিরপেক্ষতার প্রমাণ। অ্যাটম বোমা আর রকেট-স্পুটনিকের যান্ত্রিক উৎকর্ষ যে যুগে সম্ভব হয়েছে সে

যুগে উদারতার আন্তর্জাতিক দৃষ্টি নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়। Technology has brought us to the atom bomb and the hydrogen bomb and these high levels of techniqe demand higher levels of international co-operation. You cannot have advanced technology and out-of-date system of international relation. শ্রীনেহেরুর এই উক্তির মধ্যেও আছে পঞ্চশীলের সহাবস্থান নীতির অনুরণন।

বিশ্ব-শান্তির ইতিহাস রচনায় এই শান্তির দূত তাই আজও অধিকাংশ রাষ্ট্রনেতার প্রীতিভাজন হয়ে রয়েছেন। অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতের এই রাষ্ট্রনায়ক বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রে মৈত্রী সফর করেছেন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তিতে নিজেকে আবদ্ধ করেছেন। সীমান্ত আন্দোলন সমস্যা নিয়ে চীনের সাথে এবং কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে পাকিস্তানের সাথে মৈত্রী বন্ধন শিথিল হলেও ভারত আজও শান্তিকামী রাষ্ট্ররূপে এশিয়ার তথা বিশ্বের শ্রদ্ধার্হ। 'সংযুক্ত আরব রিপাবলিক' ভারতের এই সখ্য-সহযোগিতা-ধন্য স্মৃতিকে দীর্ঘ দিন বহন করবে। কঙ্গোর জাতীয় সরকারের ও মাদাগাস্কারের স্বাধীনতাকে ভারত জানিয়েছে তার অকুণ্ঠ সমর্থন। ঘানা ও নাইজিরিয়ার স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান করে বিশ্বশান্তির সমর্থক রূপে ভারত জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। স্বাধীনোত্তর যুগেও ভারত 'কমন ওয়েল্থ'-এর সাথে সম্পর্ক অব্যাহত রেখেছে। ইংলণ্ডের রাণীর ভারত সফর সৌভ্রাত্রবন্ধনকে দৃঢ়তর করেছে। নেহেরুর রাশিয়া, আমিরিকা সফরে, ক্রুশ্চেভ ও কেনেডিপত্নীর ভারত সফরের মধ্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের যে ইংগিত আমরা লক্ষ্য করি তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি যেরূপ বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করা প্রয়োজন ভারতের কোনদিনই তাতে কার্পণ্য ঘটেছে এ অপবাদ কেউ দিতে পারবে না। বর্মা, সিংহল, নেপাল, ভূটান, আফগানিস্থান প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে ভারতের প্রীতির সম্পর্ক আজও অমলিন রয়েছে। এক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির অমর্যদা হয়েছে এমন কোন দৃষ্টান্ত ভারতের নেই। ভারতের এই শান্তি দৌত্যের প্রয়োজন রয়েছে। পৃথিবীতে আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বিপুল উন্নতি চলেছে যুদ্ধের অশান্তি এলে তা আর কিছুতেই সম্ভব হবে না। ভারত এই চরম সত্যটি উপলব্ধি করেছে—মানুষে মানুষে যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে যে মহাশক্তির উদ্বোধন হবে সেই শক্তির সম্মুখে কোন অসজ্জন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না॥

রাষ্ট্রসঙ্ঘ (ইউ-এন-ও)

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে **লীগ অব নেশনস্** প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু প্রধান প্রধান সদস্যরাষ্ট্র নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শেষ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে, ফলে জাতিসঙ্ঘ ব্যর্থ হল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শান্তিকামী মানুষ যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাইল। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে ডাম্বারটন ওক্স্ পরে সান-ফান্সিস্কো শহরে অনুষ্ঠিত দুটি সম্মেলনে এ জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হল রাষ্ট্রসঙ্ঘ (United Nations Organisation)। ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিক ভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্বোধন হল। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদে (The Charter) বিশ্বে শান্তিপ্রতিষ্ঠার আদর্শ ঘোষিত হল। ঠিক হল শান্তিবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করা হবে, যে শান্তি ভঙ্গ করবে তাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ শাস্তি দেবে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করা হবে, রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি দেখা হবে, এবং সংস্কৃতি বিনিময়ের মাধ্যমে দেশে একটি সৌভ্রাত্রবন্ধন গড়ে তুলতে হবে। কাজের সুবিধার জন্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীনে ছয়টি সংস্থা গঠিত হল: (ক) সাধারণ পরিষদ—General Assembly, (খ) স্বস্তি পরিষদ—Security Council, (গ) আন্তর্জাতিক বিচার পরিষদ—International Court of Justice, (ঘ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ—Economic and Social Council, (ঙ) অছি পরিষদ—Trusteeship Council এবং (চ) কর্ম পরিষদ—(Secretariat)।

(ক) রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমস্ত সদস্যই **সাধারণ পরিষদের** সদস্য। রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদের অন্তর্ভুক্ত যে কোনো বিষয়েই সাধারণ পরিষদে আলোচনা করতে পারে। প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রেরই একটি করে ভোট আছে। প্রত্যেক সদস্যই অনধিক পাঁচ জন প্রতিনিধি পরিষদে পাঠাতে পারে।

(খ) **স্বস্তি পরিষদই** রাষ্ট্রসঙ্ঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এগারটি সদস্য নিয়ে এই পরিষদ গঠিত। এর মধ্যে পাঁচটি স্থায়ী সদস্য আর ছয়টি অস্থায়ী সদস্য। সাধারণ পরিষদ এই অস্থায়ী সদস্যদের দুই বছরের জন্যে নির্বাচন করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা এই পরিষদের প্রধান কর্তব্য। কোনো প্রস্তাবে যদি স্থায়ী সদস্যের একজনও অমত করেন (Veto) তবে সে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাবে আচ্ছা, সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের যখন সমমর্যাদা

ও তুল্যাধিকার স্বীকৃত হয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদে, তখন এই পাঁচটি শক্তির 'ভেটো' দানের অধিকার সনদ-বিরোধী নয় কি ?

(গ) **আন্তর্জাতিক বিচার পরিষদ** নয় বছরের জন্যে নির্বাচিত পনের জন বিচারপতি নিয়ে গঠিত। সনদের অন্তর্গত যে কোনো বিষয় এই পরিষদের এলাকার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের যে কোনো সদস্য এই বিচার পরিষদে মামলা রুজু করতে পারে।

(ঘ) **অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের** লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিবিধান। এই পরিষদ অনেকগুলি কল্যাণপ্রতিষ্ঠানে বিভক্ত: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। (World Health Organisation : W. H. O.) খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (Food and Agricultural Organisation : F. A. O.) আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (I. L O.), আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (ITO) শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO) শিশুকল্যাণ সংস্থা (UNICEF), বিশ্বব্যাঙ্ক (World Bank) ইত্যাদি।

(ঙ) **অছি পরিষদের** কাজ বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী করে গড়ে তোলা। এইভাবে আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ক্যারিবিয়ান ও প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তীর্ণ জলরাশির বুকে বিক্ষিপ্ত বহু ভূখণ্ডে আজ এই নূতন যুগের সূচনা হচ্ছে।

(চ) **কর্ম পরিষদের** কর্তা রাষ্ট্রসঙ্ঘের সম্পাদক-প্রধান বা Secretary-General। সম্পাদক-প্রধান প্রয়োজন বোধে বিশ্বশান্তি-সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন।

মানব অধিকারের ঘোষণাপত্র

সে আজ এগার বৎসর পূর্বের কথা। ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের প্যারিস সম্মেলনে **মানব অধিকার কমিশন** কর্তৃক প্রস্তুত বিশ্বজনীন ঘোষণাটি অনুমোদিত হল। এই ঘোষণাপত্রে শিক্ষা, চাকুরির সংস্থান, ধর্ম এবং বৃত্তিগত অধিকারের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার বৈষম্য দূর করে, দাসত্ব ও ও বেগার প্রথার মূলোৎপাটন করে, সংখ্যালঘুদের জন্য উপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি শুধু

রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর বেশ কিছু দিন কেটে গেল। কোনো কোনো প্রবল

রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের এখনও পরিবর্তন হল না। রাষ্ট্রসঙ্ঘের চোখের সামনেই 'ন্যাটো', 'সিয়াটো', বাগদাদ চুক্তি, ওয়ারশ চুক্তি ইত্যাদি সামরিক জোট গড়ে উঠল। এসব ব্যাপার বিশ্বশান্তির অনুকূলে নয় বলাই বাহুল্য। তবু রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার সামগ্রিক ফল ভালই হয়েছে বলতে হবে। পরস্পর-বিরোধী বৃহৎ শক্তিও আজ এক সম্মেলনে মিলিত হচ্ছে। ভারতের মত শান্তিকামী অন্যান্য রাষ্ট্রও শান্তির সপক্ষে প্রবল জনমতের সৃষ্টি করে রাষ্ট্র-সঙ্ঘকে ভ্রান্তির পথ থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করছে। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী আজ বড় আশা নিয়ে এই শান্তিপ্রতিষ্ঠানটির দিকে চেয়ে আছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘকে এ বিশ্বাস সফল করে তুলতেই হবে। পৃথিবী আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বিপুল উন্নতি করে চলেছে যুদ্ধের অশান্তি নেমে এলে তা আর কিছুতেই সম্ভব হবে না। মনীষী ডাঃ রাধাকৃষ্ণন বিশ্বশান্তির দিগ্‌নির্দেশ করে বলেছেন: "The way of peace requires that men and nations should recognise their common humanity and use *weapons of integrity, reason, patience, understanding and love.*" শান্তি বজায় থাকলে হয়ত এই শতাব্দীতে মানুষ পৃথিবী খুঁজে পাবে গ্রহ-গ্রহান্তরে, আর তৃতীয় মহাযুদ্ধ যদি ঘনিয়ে ওঠে তবে সভ্যতার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিয়ে মানুষ আবার ফিরে যাবে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে—আণবিক যুগ থেকে সেই পুরনো পাথরের যুগে। কিন্তু মানুষ তার অগ্রগতিকে আর কিছুতেই ব্যাহত হতে দেবে না। মানুষে মানুষে যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে যে মহাশক্তির উদ্বোধন হবে সেই শক্তির সম্মুখে কোন অসজ্জন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। যুগে যুগে সংস্কৃতি-সাধনার মধ্যে দিয়ে মানুষ হয়ে উঠেছে এক পৃথিবীর বৃহৎ পরিবার: 'সব ঠাঁই মোর আছে ঘর, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া'।

অনুশীলনী

১। বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ প্রথম কী সূত্রে ঘটেছিল? এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল? থন্‌ক কোন্ অবস্থার মধ্যে দিয়েই বা আবার এই যোগাযোগ ক্রমশ ব্যাপক হয়ে উঠল?

২। সম্প্রতি কোন্ কোন্ দেশের নেতা আমাদের দেশে এসেছেন? বিদেশের নেতাদের সংবর্ধনা দেবার জন্য যে প্রচুর অর্থব্যয় করা হয় তাকে কি তুমি অপচয় বলবে?

৩। সম্ভাবনা থাকলেও আজ সব দেশে সব কিছু উৎপন্ন করে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার পথ খোঁজে না—এর কারণ কী ?

৪। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ দৃঢ়তর করবার উপায় কী কী ?

৫। বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতিবন্ধন গড়ে তোলার ব্যাপারে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা কী ?

৬। বিতর্কের আসর॥ (ক) "ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিদেশী ঋণগ্রহণ অপরিহার্য নয়।" (খ) "U. N. O. লীগ অব নেশন্সএর মতই ব্যর্থ হবে।"

৭। তোমাদের বিদ্যালয়ে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে "মানবাধিকার দিবস" উদ্‌যাপন কর। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা কাপড়ে বা কাগজে এঁকে মঞ্চের উপর পিছন দিকে সাজাও। পিছনের পর্দার মাঝখানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বড়-করে-আঁকা প্রতীক চিহ্ন থাকবে। অনুষ্ঠানে কয়েকটি রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন কর। কলকাতা শহরে যে ক'জন বিদেশী রাষ্ট্রদূত (Consul) আছেন তাঁদের যোগদান করতে আমন্ত্রণ জানাও।

৮। Mock U. N. O. বা নকল রাষ্ট্রসঙ্ঘ। নিরাপত্তা পরিষদের এক দিনের একটি নকল অধিবেশনের আয়োজন কর। বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা এই অধিবেশন-কক্ষেও থাকবে।

৯। "Patriotism is not enough" (স্বদেশপ্রেমই যথেষ্ট নয়)—এই উক্তির তাৎপর্য কী ?

সমাজবিদ্যার অব্‌জেকটিভ প্রশ্নাবলী

[ক]

নিচের শূন্যস্থানগুলি ঐতিহাসিক / রাজনৈতিক শব্দদ্বারা পূরণ কর :—

(১) গান্ধার শিল্পের দেহ———কিন্তু আত্মা সম্পূর্ণ------।

(২) ভারত-শিল্পের ইতিহাসে গুপ্তযুগ———নামে খ্যাত।

(৩) গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে —— প্রথায় ভোটদান বলে।

[খ]

বন্ধনীমধ্যস্থ একাধিক উত্তর থেকে প্রতিটি বিবৃতির সঠিক উত্তরটি বার কর :—

(১) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভারত ভ্রমণে আসেন বিদেশী পর্যটক [টমাস রো, মেগাস্থিনিস, হিউয়েন সাঙ, ফা-হিয়েন]।

(২) 'বৃহৎ সংহিতা'র রচয়িতা [বররুচি, বেতালভট্ট, আর্যভট্ট, বরাহ মিহির, ব্রহ্মগুপ্ত]।

(৩) ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ রাষ্ট্রিক মর্যাদা পেয়েছে [১৯৪৭, ১৯৪৫, ১৯৫২, ১৯৫৬] সালে।

(৪) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিকে নির্বাচিত করেন [প্রধান মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, লোকসভার সদস্যগণ, রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ, আইনজীবী সংস্থার সদস্যগণ]।

[গ]

নিচের বিবৃতিগুলোর মধ্যে যেটি সত্য বলে তোমার মনে হয় তার ডান দিকে 'স' আর যেটি মিথ্যা তার ডান দিকে 'মি' লেখ :—

(১) গুপ্তরাজারা বিশেষভাবে ভাগবতের ভক্তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

(২) অপূর্ব স্থাপত্যের উন্নতির জন্য অজন্তার খ্যাতি।

(৩) হর্ষের সভাকবি কালিদাসের রচিত হর্ষচরিত সে যুগের বিশিষ্ট গ্রন্থ।

(৪) লর্ড ডালহৌসীর রাজত্বকালে সিপাহী-বিদ্রোহ দেখা দেয়।

(৫) কলকাতা কর্পোরেশন একটি স্বায়ত্তশাসক প্রতিষ্ঠান।

[ঘ]

নিচের ঘটনাগুলোকে সময়ের প্রাচীনতা অনুযায়ী পর পর সাজাও :

(১) পাঞ্জাবে সৎনামী বিদ্রোহ।

(২) বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রয়োজনে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা।

(৩) ভারতীয় কংগ্রেসের জন্ম।

(৪) পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রতিষ্ঠা।

[ঙ]

বাঁ দিকের সারির প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি করে বিষয় ডান দিকের সারিতে রয়েছে। ডান সারি থেকে বিষয়গুলো খুঁজে বাঁ সারির বিষয়গুলোর সঙ্গে মেলাও :—

(১) রামানন্দ	স্বপ্নবাসবদত্তা
(২) রাল্‌ফ‌ফিচ্‌	কাউন্সিলার
(৩) নাগার্জুন	আকবর
(৪) বিশ্ববিদ্যালয়	সিলেক্ট কমিটি
(৫) লোকসভা	১০ই ডিসেম্বর
(৬) মানব অধিকার ঘোষণাপত্র	চতুর্দশ শতাব্দী
	ফেলো
	সুহৃল্লেখা

[চ]

নিচে প্রথম কথাটির সঙ্গে দ্বিতীয় কথাটির যে সম্বন্ধ, তৃতীয় কথাটির সঙ্গে ঠিক সেই রকম সম্বন্ধ আছে এমন চতুর্থ কথাটি বসাও :—

(১) প্রদেশের শাসনকর্তা : রাজ্যপাল : : জেলার শাসনকর্তা :—

(২) পশ্চিমবঙ্গ : কলকাতা : জম্মু ও কাশ্মীর :—

[ছ]

বন্ধনীমধ্যস্থ উত্তরগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি খুঁজে বার কর :—

(১) পলাশীতে সিরাজের পরাজয়ের কারণ :
[দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া / সৈন্যবাহিনীর দুর্বলতা / সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতা/ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যাধিক্য]

(২) ইংরেজের ভারত পরিত্যাগের কারণ :—
[২য় মহাযুদ্ধে অতিরিক্ত লোকক্ষয় / যুদ্ধে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ভারতবাসীর রাজনৈতিক নবজাগরণ / পররাজ্য শাসনে অনিচ্ছা]

———